

সংস্কৃত শাস্ত্র ও সৃজনশীল সাহিত্যে গণিকাবৃত্তি: প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতোত্তর যুগের
নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে তার অভিব্যক্তি ও প্রভাব (১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য

প্রদত্ত গবেষণা-সন্দর্ভ

গবেষক

অয়ন্তিকা সরকার

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ দেবার্চনা সরকার

অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

কলা শাখা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর- ৭০০০৩২

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

সংস্কৃত জাতি ও সৃজনশীল সাহিত্যে গণিকাশ্রুতিঃ স্রাক-স্রাবীনতা
ও স্রাবীনতাভূষণের নির্গতিবাল্যনাশ্রুতির অধ্যয়ন প্রণয়ন (১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ)

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of -----
Dr. Debarchana Sarkar (Dept of Sanskrit)
Retired Professor

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor : Debarchana Sarkar

Dated : 24.01.2024

Dr. Debarchana Sarkar
Retired Professor
Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Candidate : Ayanika Sarkar

Dated : 25.01.24

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গণিকাবৃত্তি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে সমাজের প্রায় সর্বস্তরে আগ্রহ বর্তমান। গণিকা ও তাঁদের বৃত্তির প্রতি আগ্রহের কারণেই বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে তাঁদের উপজীব্য করে নানাবিধ গবেষণা হয়ে চলেছে। কিন্তু এই সংক্রান্ত গবেষণা নিরন্তর হলেও গণিকাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু বিষয়ই ইতিহাসের আলোর বিপরীতে রয়ে গেছে। সাহিত্যিক সাহিত্যে মানুষের কথা বলেন ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি তিনি ইতিহাস বর্ণনা করেন; বর্ণনা করেন সমাজের কথা। পরিবর্তিত সময় ও পরিস্থিতিতে দুটি ভিন্ন ভাষার সাহিত্যে এই বৃত্তির অভিব্যক্তি নির্মাণ আমাদের কাজক্ষিত। সাহিত্য, সাহিত্যে বর্ণিত সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান এই অভিব্যক্তি সেই বহমানতার পরিচায়ক আর সেই বহমানতার অনুসন্ধানই এই গবেষণার অনুপ্রেরণা।

একক প্রয়াসে কোনদিন কোনো গবেষণা বাস্তবায়িত হতে পারে না; হওয়া সম্ভব নয়। গবেষণার এই দীর্ঘ যাত্রাপথে যেমন অসংখ্য মানুষের শুভেচ্ছা-ভালবাসা-উৎসাহ পেয়েছি তেমনি বাধা-তিরস্কারও পেয়েছি। সেইসব কিছুকে পাথেয় করেই আমি আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চেয়েছি।

আমি প্রতিমুহূর্তে সশ্রদ্ধ চিন্তে স্মরণ করি তাঁদের, যাঁদের নিরন্তর শুভকামনায় আমার গবেষণা-সন্দর্ভটি রূপায়িত হতে পেরেছে। সবার প্রথমে আমি প্রণাম জানাই আমার গবেষণাকাজের তত্ত্বাবধায়ক, আমার ম্যাডাম, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রফেসর ডঃ দেবার্চনা সরকারকে। ম্যাডামের ছত্রচ্ছায়ায় গবেষণা করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। তাঁর প্রজ্ঞা, মনীষা সর্বোপরি তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মননশীল মন্তব্য গবেষণায় উদ্ভূত সমস্যাগুলির অনায়াস সমাধানে আমাকে সাহায্য করেছে। বিবিধ বিষয়ে ম্যামের অনায়াস বিচরণ কাজটিকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে আমাকে সাহায্য করেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরাল কমিটির সকল সদস্য এবং বিভাগীয় প্রধান তথা বিভাগের সকল অধ্যাপকদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের মূল্যবান মতামত ও উপদেশ আমার গবেষণা-

সন্দর্ভটিকে ঋদ্ধ করেছে। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পূর্বসূরীদের যাঁরা গণিকাবৃত্তি বিষয়ক গবেষণা করেছেন। তাঁদের গবেষণাগ্রন্থাদির পাঠ আমার কাজে সর্বাঙ্গীন সহায়তা করেছে।

আমার সকল শিক্ষকদের আমি প্রণাম জানাই। আমার বেথুন কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অলকাম্যাম, ক্যামেলিয়াম্যাম ও দেবমিত্রাম্যামকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। প্রণাম জানাই বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগের লীনাম্যাম, মণিদিপাম্যাম ও রীতাম্যামকে যাঁরা কলেজজীবন থেকে সবসময় সাহস দিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন, স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন।

প্রণাম জানাই শ্রদ্ধেয় শ্রী সুবীর সরকার মহোদয়কে। স্যারের আশীর্বাদ, স্নেহভরা কণ্ঠস্বর এই কাজে নিরন্তর ভরসা যুগিয়েছে।

গবেষণার প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি যাবতীয় উপাদান ব্যবহার ও সংগ্রহের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও কলকাতাস্থিত ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, The Ramakrishna Mission Institute of Culture Librar, Golpark, হীরালাল ভকত কলেজ (নলহাটী, বীরভূম)-এর গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ কলকাতার কলেজস্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকানের দাদাদের প্রতি। বিশেষ করে ‘বইমহল’-এর মালিক নাজবুলদার কাছে; সময়ে-অসময়ে অসংখ্য পুরনো বইয়ের খোঁজ দিয়ে আমার গবেষণা-কাজটিকে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন তিনি।

আমি ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. সেল এর সকল কর্মীদের, গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় অফিশিয়াল কাজ তাঁদের একান্ত সহযোগিতায় খুব সহজেই সম্পন্ন হয়েছে।

গবেষণাপত্রের বাঁধাই সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের জন্য ধর ব্রাদার্স-কে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার পরিবার-পরিজন, মা-বাবা-বোন, আমার বন্ধু সম্মুখকে অসংখ্য ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য, ভরসা করার জন্য। আমার যাদবপুরের অগ্রজ সুলগ্নাদি, দেবাজ্ঞানদা, অর্পণদা ও মানবদা ও অরিজিৎদা এবং অনুজ পোখরাজ, শুভ, হাসিনা, মনিকা প্রত্যেকে বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।

আমার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এঁদের সকলের কাছেই আমার অশেষ ঋণ রইলো।
আমি সবশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি আমার ঈশ্বরকে যাঁর আশীর্বাদে আমি কাজটি সমাপ্ত করার
প্রয়াস করেছি।

অয়ন্তিকা সরকার

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	১-৩
সূচিপত্র	৪-৬
সংকেতপঞ্জি	৭
প্রথম অধ্যায়: প্রাক্কথন	৮-৪০
১.১. প্রস্তাবনা	৮-১১
১.২. গবেষণার অনুপ্রেরণা ও লক্ষ্য	১২-১৩
১.২.১. গবেষণার অনুপ্রেরণা	
১.২.২. গবেষণার লক্ষ্য	
১.৩. প্রাপ্ত সাহিত্য-পর্যালোচনা	১৩-১৪
১.৪. অধ্যায় পরিকল্পনা	১৫-৩৯
১.৪.১. অধ্যায়সমূহের শিরোনাম	১৫
১.৪.২. অধ্যায় সারসংক্ষেপ	১৬-১৮
১.৪.২.১. কথামুখ	
গণিকাবৃত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: প্রাচীন ভারত (বৈদিক যুগ-গুপ্ত যুগ)	
১.৪.২.২. দ্বিতীয় অধ্যায়	
গণিকাবৃত্তি: বাৎসায়নের <i>কামসূত্রে</i> ও কৌটিল্যের <i>অর্থশাস্ত্রে</i>	
বর্ণিত তথ্যাবলী, তৎকালীন সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব।	

১.৪.২.৩. তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত সংস্কৃত কাব্যসমূহে চিত্রিত গণিকাচরিত্রের বিশ্লেষণ ও

সামাজিক-অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন: মাতা, বধূ, কন্যা।

১.৪.২.৪. চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচিত বাংলা গল্প ও উপন্যাসে গণিকা:

আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থান

১.৪.২.৫. পঞ্চম অধ্যায়

অভিব্যাপ্তির সন্ধানে: পেশাগত অভিব্যাপ্তি

১.৪.২.৬. ষষ্ঠ অধ্যায়

অভিব্যাপ্তির সন্ধানে: ব্যক্তিগত তথা মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তি

১.৪.২.৭. সপ্তম অধ্যায়

শেষের কথা

সংযোজনী ১

সংযোজনী ২

১.৪.২.১. কথামুখ

১৮-৩৯

গণিকাবৃত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: প্রাচীন ভারত (বৈদিক যুগ-গুপ্ত যুগ)

১.৫. গবেষণাপদ্ধতি ও আকারগত লিখনশৈলীর বিবরণ

৩৯-৪০

	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় অধ্যায়	৪১-১১২
গণিকাবৃত্তি: বাৎসায়নের কামসূত্রে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে	
বর্ণিত তথ্যাবলী, তৎকালীন সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব।	
তৃতীয় অধ্যায়	১১৩-২১১
নির্বাচিত সংস্কৃত কাব্যসমূহে চিত্রিত গণিকাচরিত্রের বিশ্লেষণ ও	
সামাজিক-অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন: মাতা, বধূ, কন্যা।	
চতুর্থ অধ্যায়	২১২-৩২৬
নির্বাচিত বাংলা গল্প ও উপন্যাসে গণিকা:	
আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থান	
পঞ্চম অধ্যায়	৩২৭-৩৮১
অভিব্যাপ্তির সন্ধানে: পেশাগত অভিব্যাপ্তি	
ষষ্ঠ অধ্যায়	৩৮২-৪৩৮
অভিব্যাপ্তির সন্ধানে: ব্যক্তিগত তথা মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তি	
সপ্তম অধ্যায়	৪৩৯-৪৪৯
শেষের কথা	
সংযোজনী ১	৪৫০-৪৫২
সংযোজনী ২	৪৫৩-৪৫৭
গ্রন্থপঞ্জি	৪৫৮-৪৭১

সংকেতপঞ্জি

অনু. – অনুবাদ / অনুবাদক

কা.সূ. – কামসূত্র

কুউনী. – কুউনীমত

খ্রি.পূ. – খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

পৃ. / পৃপৃ. – পৃষ্ঠা/ পৃষ্ঠাসমূহ

বা.গ. – বারবনিতাদের গল্প

ভ.না. – ভরত নাট্যশাস্ত্র

মৃচ্ছ. – মৃচ্ছকটিক

সা. দ. – সাহিত্যদর্পণ

সম্পা. – সম্পাদনা

Abbreviations

ed. – Edition

Ed. - Editor

p. / pp. – Page / pages

Prnt. – Printed

Pub. - Published

Rpt./rpt. – Reprint/reprint

Trans. – Translation

vol./Vol. - Volume

প্রথম অধ্যায়: প্রাক্কথন

১.১. প্রস্তাবনা:

কবে থেকে নারীর দেহ তার জীবিকার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও গণিকাবৃত্তি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম পেশা একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই পেশার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- “A person, typically a woman, who engages in sexual activity for payment.”^১। Dr. S.C. Banerji ও R. Banerji সমমনোভাবাপন্ন- “Prostitution usually means the surrender of a woman’s body for the sexual enjoyment by a man in exchange of money.”^২ দেহোপজীবিত্ব অবশ্য পুরুষেরও বৃত্তি হতে পারে। কিন্তু এই পেশা-আশ্রয়কারীর পরিচয় নির্দেশক সংস্কৃত ও বাংলা শব্দগুলি সবই স্ত্রীলিঙ্গ। পুরুষের ক্ষেত্রে হাস্যকর শব্দ পুং-বেশ্যা, পুরুষ-যৌনকর্মী কোথাও কোথাও দেখা গেলেও আধুনিক বাংলায় ইংরাজি ‘gigolo’ শব্দটিই আজকাল এই অর্থে বেশি স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে গৃহীত ও প্রযুক্ত। অবশ্য ইংরাজি শব্দটির আভিধানিক অর্থ একটু অন্যরকম- 1. A man supported by a woman as a lover and supported financially. 2. A man hired as a woman’s escort or a dancing partner. (*Webster’s II New Riverside University Dictionary*, p.530, column 2, entry 2).

গর্ভধারণ ও গর্ভপালন ক্ষমতার জন্য মনুষ্যজাতির কাছে নারীর মূল্য অনেকখানি, প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরেই মেয়েরা লাঞ্ছনার শিকার হয়। গণিকাবৃত্তি নারীত্বের অবমাননার এমন একটি দিক যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শোষণ-নিপীড়নের প্রকৃত চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরে। পণ্যের মতো, সম্পদের মতো তাকে করায়ত্ত করাতেই শক্তিমান পুরুষের চরম তৃপ্তি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে শক্তিপ্রদর্শনের অন্যতম সহজ উপায় হল নারী। দুটি রাজ্য-জাতি বা ধর্মের লড়াইতে আজও সবার আগে বলি হয় নারী ও শিশুরা। যখন থেকে নারীর উপর পুরুষের স্বত্ব বৈধতা পেয়েছে, ধরে নেওয়া যায় তখন থেকেই গণিকাবৃত্তির উদ্ভব। ‘গণিকা’, ‘জনপদকল্যাণী’, ‘নগরশোভিনী’, ‘রূপাজীবা’, ‘বারমুখ্যা’, ‘পণ্যাঙ্গনা’ থেকে ‘বেশ্যা’, ‘পতিতা’, ‘অবিদ্যা’, ‘রাঁড়ি’, ‘লাইনের মেয়ে’, ‘সাধারণী’ হয়ে আজকের ‘যৌনকর্মী’- এই

যাত্রার যেন কোনো শেষ নেই –“In formal Bangla, she is known as *beshya* (a woman who entices by her dress), *ganika* (a woman who counts, supposedly money), *patita* (a fallen woman), and *barangana* (a public woman); and in Bangla of the streets, she is *khanki*, *rhnarh* or *rhnarhi*, and *magi*. She is the woman prostitute.”^{১০}

যদিও যৌনতার প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, প্রকৃতিতে মানুষই বোধহয় এমন একমাত্র জীব যারা শুধুমাত্র সন্তানপালন বা বংশরক্ষার জন্য যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করে না। যৌনতা তার কাছে উদযাপনের বিষয়। বংশরক্ষা অন্যতম কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয় আর তার জন্য সমাজে ‘বিবাহ’ নামক প্রতিষ্ঠানটি উপস্থিত। Leo Markun তাঁর *PROSTITUTION IN THE ANCIENT WORLD* গ্রন্থে বলেছেন সমাজ যত উন্নত হয়েছে, যৌনতা ও সেই বিষয়ক সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।^{১১} আবার Simone de Beauvoir বিবাহ ও দেহবৃত্তিকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেছেন।^{১২}

গণিকাবৃত্তি এমন একটি বিষয় যাকে কেন্দ্র করে মানুষের আগ্রহ অসীম। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে, বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে গণিকাবৃত্তিকে উপজীব্য করে গবেষণা করা সম্ভব এবং সমগ্র পৃথিবী জুড়েই তা চলছে। ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক পাঠ ও অনুসন্ধান যেমন জরুরী তেমনি নারীবাদ, লিঙ্গসাম্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এই বিষয়ক গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদের গবেষণার মূল ভিত্তি হল সাহিত্য। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারতীয় সাহিত্যচর্চার ধারা ইতিহাসের সাথে অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। বৈদিক ভাষা, ধ্রুপদী সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত অথবা তামিলের মতো প্রাচীন ভাষায় লিখিত তৎকালীন সাহিত্যে সেই সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশদে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর প্রতিটি দেশের ইতিহাসেই নারীর উপর অত্যাচারের কথা আছে। গণিকাবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে কোনো একজন বা কয়েকজনের জীবিকা নয়; এটি একটি প্রতিষ্ঠান- যার প্রাচীনত্ব নির্ধারণ একপ্রকার অসম্ভব। সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর ‘Prostitution in Ancient India’ প্রবন্ধে ভারতবর্ষে এই বৃত্তি কতোটা প্রাচীন সে সম্বন্ধে ধারণা দিতে গিয়ে প্রাক-বৈদিক যুগের কথা বলেছেন।^{১৩} ইতিহাস আমাদের জানায় প্রাচীনকালে এই বৃত্তিটির যোগ অনেকক্ষেত্রেই ধর্মীয়

আচারের সাথে যুক্ত ছিল। যদিও ধীরে ধীরে এটি অনেকের জীবনধারণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে গণিকাবৃত্তি বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত। তবে এই বৃত্তির সাথে জড়িত যারা, তাঁদের জীবনযাপন সম্বন্ধে তথ্য অপ্রতুল হওয়ায় স্বভাবতঃ গবেষণায় নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা আছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে এই বৃত্তির উপস্থিতি, এর বহুমানতা স্পষ্ট। লক্ষণীয় হল এই পেশায় যারা জড়িত তাদের পর্যায়গুলি এক নয় এবং তাদের পরিচয়সূচক শব্দগুলির উৎপত্তির সময়ও এক নয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেহবৃত্তিকে অবলম্বন করে এগুলি সৃষ্টি হয়েছিল।

সাহিত্যে গল্পের মোড়কে, সুসংহত তথ্যের সন্নিবেশে মানবজীবনের জীবনচর্যার ইতিহাস ফুটে ওঠে। নানাবিধ বিষয়ের মতো গণিকাবৃত্তিও সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, কারণ তা অনতিক্রমণীয় বাস্তব। সময়ের সাথে সাথে আধুনিককালে এই পেশা-অবলম্বনকারিণীদের প্রতি প্রাচীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃতপক্ষে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা এই গবেষণা সেই অনুসন্ধানে রত আর সমাজবদলের ছাপ তো সাহিত্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাৎসর্যয়ন তাঁর *কামসূত্রে* বলেছেন-“রতিতঃ প্রবর্তনং স্বাভাবিকং কৃত্রিমমর্থার্থম্”।^১ লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মতে গণিকাবৃত্তি পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশা নয়, বরং তা মেয়েদের উপর হয়ে চলা পৃথিবীর প্রাচীনতম অত্যাচার কারণ “পুরুষেরা ‘বেশ্যাকে’ গাল দেয় ঠিকই কিন্তু বেশ্যা ছাড়া তাদের চলেও না, তারাই নিজেদের স্বার্থে নিজেদের নাগালের মধ্যে বেশ্যালয় খুলেছে।”^২ আসলে গণিকা ও গণিকাবৃত্তি সম্পর্কে সমাজ নিজেই সন্দেহান। অবিসংবাদী এঁদের অস্তিত্ব কিন্তু সেই অস্তিত্ব নিয়ে সমাজের অবস্থান বিসংবাদী। নিতান্ত ঘৃণার দৃষ্টি নাকি সম্মান, সহমর্মিতা গণিকাদের প্রাপ্য তা নিয়ে দোলাচল, অনিশ্চয়তা থাকলেও এঁদের সম্বন্ধে ক্রমশঃ পরিবর্তিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী সদর্থক বার্তাই বহন করে।

অন্ত্যটীকা ও তথ্যসূচি

১। Oxford eleventh edition. 2004. P- 690.

২। Dr. S.C. Banerji, R. Banerji, *THE CASTAWAY OF INDIAN SOCIETY History of Prostitution in India Since Vedic times, based on Sanskrit, Pāli, Prākṛit and Bengali Sources*. P-1.

৩। Indrani Sinha & Shamita Das Dasgupta, *MOTHERS FOR SALE Women in Kolkata's Sex Trade*, P-1.

৪। “The problems of sex are ever with us. The more complex our civilization becomes, the more difficult are certain sexual questions. Especially as the years of education and apprenticeship in the art of earning a living tend to grow longer, and to reach out far beyond the age of puberty, marriage ceases for many to be in any sense an answer to the sexual problems. Thus, even if man were essentially a monogamous animal, the occasion for prostitution would still arise.”

Leo Markun, *PROSTITUTION IN THE ANCIENT WORLD*. P-5

৫। “MARRIAGE, as we have seen, is directly correlated with prostitution...” Simone de Beauvoir, *The Second Sex*. (Trans. and Edit H.M. Parshley), p-568.

৬। “Prostitution as a profession appears in the literature of a few centuries after the *Vedas* although it must have been common in society much earlier.” Sukumari Bhattacharji. ‘Prostitution in Ancient India’. *Social Scientist*, vol.15 no.2, pp.32. JSTOR, accessed on 28.04.16 on 6.30 p.m

৭। বাৎস্যায়নের *কামসূত্র* (বঙ্গানুবাদ গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর)। নবপত্র প্রকাশন। পৃ. ১৮৮।

৮। তসলিমা নাসরিন, ‘আর রেখ না আঁধারে আমায় দেখতে দাও’, *নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য* পৃ. ১০-১১।

১.২. গবেষণার অনুপ্রেরণা ও লক্ষ্য

১.২.১. গবেষণার অনুপ্রেরণা

বইপড়া আমার অবসরযাপনের মাধ্যম। বিভিন্ন সৃজনশীল সাহিত্য পড়ার সময়ে নারীচরিত্রের এই বিশেষ দিকটি আমাকে আকর্ষণ করেছে। সংস্কৃতসাহিত্যে উল্লিখিত ধর্মীয় অভ্যাসে কিংবা গোষ্ঠীনির্মাণ ও ‘গণ’-এর জন্য নির্বাচিত জনপদকল্যাণীর সঙ্গে পরবর্তীকালের অন্য ভাষার সাহিত্যে দেহবৃত্তি অবলম্বনকারিণীদের বর্ণনাগত পার্থক্য স্পষ্ট। বিশদে জানার তাগিদে বিস্তারিত পড়ার সময় লক্ষ করলাম সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। খুব স্বাভাবিক এই তফাৎ, কারণ সংস্কৃতে রচিত কাব্য সাধারণতঃ রাজা, রাজপরিবার বা অভিজাতসম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত আর সেই কারণে অনেক বেশি আড়ম্বরপূর্ণ। তুলনায় বাংলা সাহিত্য অনেক নবীন। সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিককে সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে প্রণিধান করতে হয়, অন্যথা তাঁর সৃষ্টি বিশ্বাসযোগ্যতা পায়না। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত চরিত্রগুলি সামাজিক অবস্থানবিচারে কখনো কখনো রীতিমত সম্মাননীয়। অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের চরিত্রগুলি কোথাও বেশ্যা, পতিতাপত্নীর বাসিন্দা অর্থাৎ কেবল দেহব্যবসায়িনী, কোথাও তাঁরা অন্যান্য শিল্পের সাথে যুক্ত (দেবদাসী, বাঙ্গীজী, খেমটা-নাচনেওয়ালি, বুমুর ইত্যাদি) আবার কখনো কোনো লোকদেখানো চাকুরীরতার নির্মোহ তাঁদের আশ্রয়- যার আড়ালে তাঁদের দেহবৃত্তির ইঙ্গিত মেলে।

গণিকাবৃত্তি সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণা হলেও এই বিষয়ে আধারিত দুটি ভিন্ন ভাষার সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা সে ভাবে লক্ষিত হয়নি আর সেই তাগিদেই এই গবেষণার সূত্রপাত।

১.২.২. লক্ষ্য

১) কীভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সৃজনশীল সাহিত্যে বর্ণিত এই দেহোপজীবিনীদের পরবর্তীযুগের বাংলা সাহিত্যে ক্রমিক রূপান্তর (পেশাগত ও চারিত্রিক) ঘটেছে তা নির্ণয় করা।

২) গণিকাদের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বিনির্মাণ।

পেশাগত কারণে এঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম হয়ে এঁদের প্রতি সমানুভূতি পোষণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হলেও সহানুভূতির দৃষ্টিটুকু এঁদের প্রাপ্য। পরিবর্তিত সময়ের সাথে সাথে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা সেটি অনুসন্ধান করাও আমাদের উদ্দেশ্য।

৩) উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির যে পরিবর্তন হয়েছিল তার প্রভাব এই বৃত্তি ও বৃত্তি অবলম্বনকারিণীদের উপরে পড়েছিল কিনা অথবা পড়লেও সেই প্রভাব কতোখানি গভীর ছিল তা ফিরে দেখা।

১.৩. প্রাপ্ত সাহিত্য-পর্যালোচনা:

ভিন্ন আঙ্গিক, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গণিকাবৃত্তিসংক্রান্ত বহু গবেষণা হয়েছে, হচ্ছেও। এই বৃত্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেও দুটি ভিন্ন ভাষার সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্রের অভিব্যাপ্তির অনুসন্ধানমূলক গবেষণা সেভাবে আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই অভিব্যাপ্তির অনুসন্ধান শুরুর প্রাক-প্রস্তুতি পর্বে বেশ কিছু তথ্যসমৃদ্ধ, পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থের পাঠ করেছি। সংস্কৃত ও বাংলা মূল তথ্যভাণ্ডার হিসেবে আমরা মোট ষোলটি গ্রন্থ নির্বাচন করেছি, যেগুলি গ্রন্থপঞ্জিতে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এছাড়া সংস্কৃত শাস্ত্র ও কাব্য, ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বিবিধ গবেষণাপত্রও আমরা পড়েছি। বিভিন্ন গ্রন্থ-সমালোচনা, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং অন্তর্জাল মাধ্যমে লিখিত ব্যক্তিগত ব্লগ ইত্যাদিও আমরা পড়েছি, যেগুলি আমাদের গবেষণাকাজটিকে একটি নির্দিষ্ট গতিপথ অনুসারে স্বতন্ত্রভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। S.N. Sinha ও N.K. Basu *The History of Prostitution* গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় গণিকাদের অবস্থান, ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা আলোচনা করেছেন। Moti Chandra তাঁর *The World of Courtesans* গ্রন্থে রাজতন্ত্র তথা রাজপরিবারে তাঁদের উপস্থিতি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য *Prostitution in Ancient India* প্রাচীন ভারতীয় সমাজে, সভ্যতায় এই বৃত্তির শিকড় কতোখানি গভীরে বিস্তৃত ছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে বাংলার মেয়েদের পরিস্থিতি, এই পেশাকে কেন্দ্র করে তাঁদের অবস্থান সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় *Dangerous outcast the prostitution in Nineteenth Century Bengal*, অশ্রুত কণ্ঠস্বর ঔপনিবেশিক বাংলার বারবানিতা সংস্কৃতি ও

উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান ইত্যাদি গ্রন্থে উনিশ-শতকীয় বাংলায় পতিতাবৃত্তির অনুপঞ্জ্য বর্ণনা দিয়েছেন। বিশ্বনাথ জোয়ারদারের *Prostitution in India*, অন্য কলকাতা সমসাময়িক সময়কালের কথাই বলেছে। আবার কালীপ্রসন্ন সিংহ *হতোম প্যাঁচার নকশা*, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *নববাবুবিলাস*, নববিবিবিলাস ইত্যাদি গ্রন্থে আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতা ও সেখানকার পতিতাদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। Usha Chakraborty লিখিত *Condition of Bengali Women around the 2nd Half of The 19th Century* গ্রন্থটিতে বিশদে উনিশ শতকীয় বাঙালি রমণীর আর্থ সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া *চলমান যৌনকর্মী*, *যৌনকর্মীদের জীবনসত্য* ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁদের জীবনের দৈনন্দিনের চালচিত্র বর্ণিত রয়েছে। মধুপর্ণা মিত্রগুহ তাঁর 'Partition and The Saga of Uprooted Women in West Bengal: A Review'-এ ছিন্নমূল মেয়েদের লাঞ্ছনার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরীর *ফুলমণি এল কলকাতা উনিশ এবং বিশ শতকের নারী ও গণিকা সমাজ* এক তথ্যমূলক গ্রন্থ যা সেইসময়ের দলিল। তৎকালীন পরিস্থিতির বাস্তবচিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। কিছু গ্রন্থ গবেষণাকাজের সাথে সরাসরি যুক্ত আবার কিছু রচনা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠ, বিবিধ লেখক, প্রাবন্ধিক ও গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য আমাদের গবেষণাকার্যের দিকনির্দেশে সহায়তা করেছে।

১.৪. অধ্যায় পরিকল্পনা:

প্রস্তাবিত গবেষণাকার্যটি দুটি ভিন্ন ভাষার সাহিত্য নিয়ে বহমান। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি সময়কালও এই গবেষণাকার্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। শিরোনাম থেকে স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র দুটি ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন সময়কালেরই নয় এই গবেষণাকার্য প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন সাহিত্যকৃতি নিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র, সৃজনশীল সংস্কৃত সাহিত্য এবং একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যবর্তী বাংলা সাহিত্য নিয়ে মূলতঃ আমাদের গবেষণা-কাজ। অধ্যায়-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমরা সংস্কৃত শাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য ও তারপরে বাংলা ভাষার নির্বাচিত সাহিত্যগ্রন্থ- এই ক্রম অনুসরণ করেছি। 'গণিকাবৃত্তি'-র অভিব্যক্তি অনুসন্ধান করাই যেহেতু আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য সেই কারণেই এই

ক্রমানুসরণ। গবেষণাকার্যটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ই কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত, প্রাপ্ত তথ্যগুলি সেই অনুযায়ী আলোচিত হয়েছে। সামগ্রিক অধ্যায় পরিকল্পনাটি নিম্নরূপ-

১.৪.১. অধ্যায়সমূহের শিরোনাম

প্রথম অধ্যায় -

প্রাক্কথন

দ্বিতীয় অধ্যায় -

গণিকাবৃত্তি: বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত তথ্যাবলী, তৎকালীন সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব।

তৃতীয় অধ্যায় -

নির্বাচিত সংস্কৃত কাব্যসমূহে চিত্রিত গণিকাচরিত্রের বিশ্লেষণ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন: মাতা, বধূ, কন্যা।

চতুর্থ অধ্যায় -

নির্বাচিত বাংলা গল্প ও উপন্যাসে গণিকা: আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থান।

পঞ্চম অধ্যায় -

অভিব্যাপ্তির সন্ধানে: পেশাগত অভিব্যাপ্তি

ষষ্ঠ অধ্যায় -

অভিব্যাপ্তির সন্ধানে: ব্যক্তিগত তথা মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তি

সপ্তম অধ্যায় -

শেষের কথা

সংযোজনী ১

সংযোজনী ২

১.৪.২. অধ্যায় সারসংক্ষেপ

১.৪.২.১. কথামুখ

গণিকাবৃত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: প্রাচীন ভারত (বৈদিক যুগ-গুপ্ত যুগ)

এই অংশে ভারতবর্ষের গণিকাবৃত্তির ইতিহাস ও প্রাচীনত্ব ফিরে দেখার একটি প্রয়াস করা হয়েছে। অতিসংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় বৈদিক যুগ, মহাকাব্য, পুরাণাদি ও সংস্কৃত কাব্যে প্রাপ্ত গণিকা, তাঁদের বৃত্তি ও কিছু পর্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এই অংশটিকে মূল গবেষণাকার্যের সূত্রধার বলা যেতে পারে।

১.৪.২.২. দ্বিতীয় অধ্যায়

গণিকাবৃত্তি: বাৎসায়নের *কামসূত্রে* ও *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে*

বর্ণিত তথ্যাবলী, তৎকালীন সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব

দ্বিতীয় অধ্যায়ে *কামসূত্র* ও *অর্থশাস্ত্রে* এই বৃত্তিকে কতোখানি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। বাৎসায়ন ও কৌটিল্যের দৃষ্টিতে গণিকাবৃত্তি, পেশাগত বিভাগ, পেশার বৈচিত্র্য, তাঁদের জন্য নির্ধারিত নিয়মকানুন, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের পেশাগত ব্যবহারাদি আলোচিত হয়েছে।

১.৪.২.৩. তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত সংস্কৃত কাব্যসমূহে চিত্রিত গণিকাচরিত্রের বিশ্লেষণ ও

সামাজিক-অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন: মাতা, বধূ, কন্যা।

সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্য – *মৃচ্ছকটিক*, *কুটনীমত*, *চতুর্ভাগী* ও *শুকসপ্ততি*তে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্র, তাঁদের পেশা ইত্যাদির সাথে সাথে তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী, মাতা-কন্যা-বধূরূপে তাঁদের অবস্থান ইত্যাদি এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

১.৪.২.৪. চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচিত বাংলা গল্প ও উপন্যাসে গণিকা:

আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থান

১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়সীমায় নির্বাচিত দশটি গ্রন্থ যাঁদের নায়িকা এক বা একাধিক গণিকা তাঁদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাতটি উপন্যাস, একটি আত্মকথা ও দুটি গল্পসংকলন এই অধ্যায়ের আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তাঁদের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

১.৪.২.৫. পঞ্চম অধ্যায়

অভিব্যাপ্তির সন্ধানে: পেশাগত অভিব্যাপ্তি

আমাদের গবেষণার অন্বেষে প্রবেশ করেছি আমরা এই পর্যায়ে। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সৃজনশীল সাহিত্যে আমরা গণিকাদের পেয়েছি তাঁদের সাথে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাপ্ত গণিকাদের পেশাগত অভিব্যাপ্তি অনুসন্ধান করেছি এই অধ্যায়ে।

১.৪.২.৬. ষষ্ঠ অধ্যায়

অভিব্যাপ্তির সন্ধানে: ব্যক্তিগত তথা মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তি

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা অনুসন্ধান করেছি গণিকাদের ব্যক্তিগত অভিব্যাপ্তি। তাঁদের পারিবারিক, মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তি। একজন ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তাঁদের চারিত্রিক অভিব্যাপ্তি হয়েছে কিনা তারই বিশদ অনুসন্ধান রয়েছে এই অধ্যায়ে।

১.৪.২.৭. সপ্তম অধ্যায়

শেষের কথা

‘শেষের কথা’ তথাকথিত উপসংহার নয়। গবেষণার বিষয়, প্রাপ্ত ফলাফল, গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং আগামী সস্তাবনা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সংযোজনী ১

এই অংশে কিছু বিশেষ গ্রন্থাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে যেগুলি সরাসরি গবেষণা কাজের সাথে যুক্ত নয় কিন্তু আমাদের গবেষণাকাজটিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

সংযোজনী ২

এই পর্বে সংস্কৃত ও বাংলা শাস্ত্রে ও সাহিত্যে প্রাপ্ত ‘গণিকা’ সমতুল কিছু শব্দের তালিকা দেওয়া রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে গবেষণা কাজের সাথে সম্পর্কিত কিছু চিত্র।

১.৪.২.১.

এই গবেষণার সূত্রপাতে প্রাচীন ভারতে (বৈদিক যুগ-গুপ্ত যুগ) গণিকাবৃত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আভাস থাকা অনিবার্য। অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনাটি নিম্নরূপ:-

কথামুখ: গণিকাবৃত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: প্রাচীন ভারত (বৈদিক যুগ-গুপ্ত যুগ)

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস অভিনিবেশ সহ পাঠ করলে আগ্রহী পাঠকের দৃষ্টিতে গণিকাবৃত্তি ও এই বৃত্তি সম্পর্কে ভারতীয় সমাজের অবস্থানগত একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। এই বৃত্তির প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা রীতিমত দুঃসাধ্য কারণ মানবসভ্যতার একেবারে আদিম সময় থেকেই এই বৃত্তি (নানা রূপে) প্রচলিত ছিল। গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে বলা হয়, এটি পৃথিবীর অন্যতম আদিমতম পেশা কিন্তু ঠিক কতোখানি পুরোনো এই পেশা তার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। গণিকা ও গণিকাবৃত্তির উপস্থিতি সর্বজনস্বীকৃত, এখানে ‘স্বীকৃত’ বলতে আমরা বলতে চেয়েছি গণিকারা যে সমাজে যথেষ্ট প্রবলভাবে উপস্থিত ছিলেন তা সকলের কাছে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার একটি বিষয়।

অর্থ বা অন্য কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে কোনো নারী যখন শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়, কোনো পুরুষকে দেহদান করে তখন তাকে আক্ষরিক অর্থে গণিকাবৃত্তি বলা হয়। Dictionary of

Sociology অনুসারে ‘**prostitution**¹ (common usage) a practice involving sexual services for payment or other reward.’^১ যদিও এই অর্থটিকে বর্তমানে সময়ের প্রেক্ষিতে আরও একটু ব্যাঙ করে বলা যেতে পারে দৈহিক (কখনো কখনো মানসিক) চাহিদাপূরণের উদ্দেশ্যেও অনেকে এই বৃত্তিতে আসেন। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে, ব্যভিচারিতা ও গণিকাবৃত্তি একেবারেই সমার্থক নয় ও কখনোই শব্দদুটি এক পঙ্ক্তিতে বসার যোগ্য নয়।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-শাস্ত্রের ভাণ্ডার সুবিশাল। আকার ও গুণ উভয়তঃ তা বিপুলায়তন, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর এবং প্রচলিত বহুভাষাতেই এই গ্রন্থগুলি লিখিত হয়েছে। একেবারে বৈদিক সংস্কৃত থেকে আরম্ভ করে লৌকিক, ধ্রুপদী সংস্কৃত, পালি-প্রাকৃত, তামিল ইত্যাদি নানা ভাষায় অসংখ্য বই লেখা হয়েছিল। অধিকাংশ গ্রন্থেই সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার বর্ণনা রয়েছে এবং সমাজের বাস্তব চিত্রগুলি, রূঢ় সত্যগুলি সেইসমস্ত গ্রন্থে লেখা রয়েছে। যদিও রাজানুগ্রহে লিখিত গ্রন্থগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবনের কথা খুব কমই উঠে এসেছে। এগুলি ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয় কিন্তু ইতিহাসানুসারী গ্রন্থ অবশ্যই। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শৈলীর উদাহরণেই আমরা দেখতে পাই কোনো না কোনোভাবে গণিকা ও গণিকাবৃত্তির উল্লেখ রয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই একই সময়ে না হলেও বিভিন্নসময়ে এমনকি আদিম যুগের মানুষদের মধ্যেও অনিয়ন্ত্রিত যৌনসম্পর্ক ছিল। গণিকাবৃত্তিসংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এই বৃত্তির প্রাচীনত্বের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় এবং তার উত্তরে বলা যায়- “ভারতবর্ষে শুধু নয়, সর্বত্রই গোষ্ঠী ও কৌম ভেঙে পরিবারের পত্তন হচ্ছিল তখন থেকে অর্থাৎ নারীর উপর যখন পুরুষের স্বত্বাধিকার সমাজ মেনে নিতে শুরু করেছে তখন থেকেই আছে গণিকাবৃত্তি। যখন থেকে পরিবারের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যখন অন্য পুরুষকে অর্থ বা বস্তুপ্রাপ্তির বিনিময়ে দেহদান করে তখনই সে গণিকা বলে চিহ্নিত হয়।”^২ কিন্তু কেন, কোন পরিস্থিতিতে একজন নারী এধরণের কাজ করেন বা করতে বাধ্য হয়ে থাকেন অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার কিছু সম্ভাব্য কারণ অনুমিত হয়েছে তবে একথা সত্যি যে, এই বৃত্তির বীজ নিহিত রয়েছে পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ, নারীকে ভোগ করার কামনার মধ্যে। উপরিউক্ত কারণগুলির মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের কারণটিকে আমরা ব্যতিক্রমী ধরতে পারি, তা ব্যতীত নিতান্ত অসহায়, অপারগ না হলে কোনো মেয়ে এধরনের অপমানজনক পেশা বেছে নেন না।

পৃথিবীর ইতিহাসে গণিকাবৃত্তির প্রাচীনত্ব স্বীকৃত, ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। এমনকি বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই বৃত্তিকে একটি প্রতিষ্ঠান বললেও ভুল হবে না। সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষের কাছে নিন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও গণিকাদের উপস্থিতি অনস্বীকার্য কারণ সমাজ নিজের স্বার্থেই এই বৃত্তিটিকে আবহমান কাল ধরে প্রশয় দিয়ে চলেছে।

এই গবেষণার সূত্রপাতে প্রাচীন ভারতে (বৈদিক যুগ-গুপ্ত যুগ) গণিকাবৃত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আভাস থাকা অনিবার্য। যে প্রেক্ষাপটের সূচনালগ্ন অনুসন্ধান ও অনুধাবনের জন্য প্রায় আনুষঙ্গিক সমস্ত প্রকৃতির সাহিত্যকৃতি অতি সংক্ষেপে ফিরে দেখা প্রয়োজন। তবে ‘গণিকা’, ‘বেশ্যা’ ইত্যাদি যে শব্দগুলি তুলনামূলক বহুল প্রচলিত সেগুলির অর্থ কিন্তু এক নয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে-শিল্পে যাঁদের ‘গণিকা’ সম্বোধন করা হত তাঁরা কোনো সাধারণী, পণ্যস্ত্রী ছিলেন না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যাঁদের Courtesan (a prostitute, especially one with wealthy or noble clients)^৩ বলা হয় তাঁদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে- “A woman who frequents a court and who, like a courtier, is well dressed, well mannered, and skilled in diplomatic insincerity.”^৪

এছাড়াও তাঁদের শিক্ষা, রুচি ইত্যাদি সম্বন্ধে একই কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় সমাজ যাঁকে ‘গণিকা’ আখ্যা দিয়েছে তিনি প্রকৃতপক্ষে The Indian courtesan (*courtesan de luxe*)^৫ এর তুল্য। Doris M. Srinivasan এর দৃষ্টিতে গণিকা হলেন সেই নারী যিনি সামাজিক পদমর্যাদা, ক্ষমতার নিরিখে রাণীর সমতুল ছিলেন।^৬ Kirit K. Shah বলছেন নিজের আকর্ষণী ক্ষমতা, শৈল্পিক দক্ষতা, বিবিধ বিষয়ে পটুত্বের কারণে এঁরা ‘গৃহবধূ’র থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতেন^৭। আসলে কলাবিদ্যার চর্চা, তা শিল্পকলায় হোক অথবা কামকলায়, গণিকারা ছিলেন নাগরিকসমাজে পুরুষদের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত সহচরী। হরিচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ বলেছেন- “গণিকা স্ত্রী- গণ+ইক (ঠন) অস্ত্যর্থ+ স্ত্রী আ (টাপ) গণ(সমূহ) যাহার ভর্তৃরূপে আছে, বেশ্যা।”^৮ আবার V.S. Apte ‘Harlot’ এর অর্থ বলেছেন - ‘বেশ্যা, পণ্যস্ত্রী, বার-স্ত্রী-যোষিত-যোষা, পণ্যঙ্গনা, গণিকা, বারঙ্গনা, রূপাজীবা; বন্ধকী, পুংচলী, কুলটা’।^৯ যৌনসম্পর্কস্থাপনকারী নারীমাত্রই গণিকা নন কিন্তু গণিকারা অবশ্যই দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হতেন। ‘বেশ্যা’ বা ‘গণিকা’ শব্দদ্বয়ের অর্থ ভিন্ন হলেও দেখা গেছে অধিকাংশ গ্রন্থেই একই নারীকে বোঝানোর জন্য এই

শব্দদুটি প্রয়োগ করা হত। সাধারণী ও কলানিপুণা গণিকার মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবনের জন্য গণিকাবৃত্তির এই প্রতিষ্ঠানটিকে অনুপুঞ্জভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য আমরা আমাদের গবেষণায় সচেতনভাবেই সকল শ্রেণীর দেহবিলাসিনীদের সাধারণভাবে ‘গণিকা’ শব্দটির দ্বারা চিহ্নিত ও অভিহিত করেছি।

সভ্যতার আদিপর্বে বিবাহপ্রথার সেভাবে প্রচলন ছিলনা। নারী-পুরুষ উভয়েই অন্যান্য জীবকূলের মত একত্র সহাবস্থান করতো। মাতৃতন্ত্রের যুগ পেরিয়ে পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পুরুষেরা একাধিক নারীকে সঙ্গী হিসাবে বেছে নিতে থাকে, শুধু তাইই নয় পুরুষেরা নিজের ও অন্য গোষ্ঠীর নারীদের দখল করাকে নিজের ক্ষমতার পরিচায়ক বলে মনে করতে থাকে। অবাধ যৌন মেলামেশার সম্ভাবনা থাকলেও নারীকে করায়ত্ত করা আসলে ক্ষমতাসীন হওয়ার নামান্তর। নারীকে দুর্বলতর হিসেবে প্রতিপন্ন করা ও তাকে পণ্যের মত, সম্পত্তির মত ব্যবহার করা থেকে ধীরে ধীরে গণিকাবৃত্তির শুরু।

প্রাক-বৈদিক যুগে বিশেষ করে সিংহসভ্যতার আমলে গণিকাবৃত্তি প্রচলিত ছিল কিনা তার খুব স্পষ্ট উদাহরণ লক্ষিত না হলে মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের নৃত্যরত নারীমূর্তিটি যেন এই বৃত্তির অস্তিত্বের স্বপক্ষে বার্তা দেয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে ব্যবসাবাণিজ্যের কারণে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত বণিকসম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্যই নৃত্যগীতে পটু দেহবিলাসিনীদের প্রয়োজন হতো। এই মূর্তিটিকে নৃত্যরত নারী অভিহিত করা হয়।^{১০}

এরপরে বৈদিক যুগ। ‘আর্য-অনার্য’ - উভয় জনগোষ্ঠী প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিল। ভারতে বসবাসকারী তথাকথিত ‘অনার্য’ জনজাতি ছিল ‘যোনি’, ‘লিঙ্গ’ ইত্যাদির যৌনচিহ্নের উপাসক। এই ধরনের উপাসনা ও তার ফলে উদ্ভূত প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি এঁদের অদম্য বিশ্বাস ছিল। কৃষিকাজ করার সময় নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি কিংবা ভালো ফলনের আশায় উভয়পক্ষই অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপরে নির্ভর করতে শুরু করেন। যার ফলে পূজার্নার সূত্রপাত হয় আর তারই অন্যতম অনিবার্য ফলশ্রুতি হল ধর্মীয় যৌনাচার। নারীশরীরকে, তার সম্ভানধারণের ক্ষমতাকে উর্বরতার প্রতীকরূপে ধরে নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বাধ্য করেছে

বিভিন্ন যৌন আচার-অভ্যাস পালন করতে। দেবমন্দিরে দেববিগ্রহকে সাক্ষী রেখে পুরোহিত বা রাজা স্থানীয় কোনো ব্যক্তির কাছে কুমারীত্ব দান করার প্রথা প্রচলিত ছিল।^{১১}

মানবসভ্যতা তথা বিবাহপ্রথার ফল এই গণিকাবৃত্তি একথা বললে অত্যাুক্তি হয়না। S.N.SINHA N.K.BASU তাঁদের *History of Prostitution in India* গ্রন্থে এই মতই ব্যক্ত করেছেন^{১২}।

ঋক্বেদ ও যজুর্বেদ-এর সময়ে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির সূচনা। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে সাধারণতঃ একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় (যদিও পুরুষের বহুবিবাহ সমাজমান্য ছিল)। ঋক্বেদিক যুগে বৃত্তি হিসেবে প্রচলিত না থাকলেও ‘গণিকা’-র সমতুল কিছু শব্দ প্রচলিত ছিল তাই তৎকালীন যুগে এঁদের উপস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হত তাঁদের। ঋগ্বেদে উল্লিখিত গণিকাবাচক শব্দগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল, যেটি সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য* গ্রন্থে দিয়েছেন- ঋগ্বেদেই ভারতের উপলব্ধ প্রাচীনতম সাহিত্য এবং এখানেই গণিকাবাচক বেশ কয়েকটি শব্দ পাই: “হস্ত্রা, অগ্র [৪/১৬/১৯/৩০ ; ৪/১৯/৯] ; সাধারণী [১/১৬৭/৪ ; ২/১৩/১২, ১৫, ১৭]। এর কিছু পরে অথর্ববেদে আছে পুংশলী [১৫/১/৩৬; ২০/১৩৬/৫], শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় সাধারণী ও সামান্য [৩০/১২]; কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও এ শব্দ দুটি পাওয়া যায় [৩/৪৭]। আরও কিছু পরে নতুন দুটি শব্দ পাই, অতিস্কন্ধরী ও অপস্কন্ধরী, যে (নিয়ম) উল্লঙ্ঘন করে, [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩/৪/১১/১] আর পাই রজয়িত্রী, যে আনন্দ দেয়। [বাজসনেয়ী সংহিতা ৩০/১; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩/৪/৭/১] পালি বিনয়পিটকে একটি শব্দ পাই মুহুত্তিয়া (সংস্কৃত মুহূর্তিকা), যে ক্ষণকালের সঙ্গিনী। [৩/১৩৮] জাতকে পাই রূপদাসী, বগ্নদাসী, বেশী, নারিয়ের, গামনী ও নগরশোভিনী ইথি [১/৪৩] এবং জনপদকল্যাণী। এদের মধ্যে রূপদাসী ও বগ্নদাসী অন্য প্রধান গণিকার অধীনে অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থীকে আপ্যায়ন করতে পারত [অর্থশাস্ত্র ২/২৭]; জাতকেও এদের কথা পাই [২/৩৮০; ৩/৫৯-৬৩, ৫৯-৭২; ৪৭৫ ৮]।”^{১৩}

বিবাহসম্পর্কের বাইরে কোনো নারীপুরুষের মধ্যে উভয়ের সম্মতিক্রমে যৌনসম্বন্ধস্থাপিত হলে তাঁদের ‘জার’ বা ‘জারিণী’ বলা হত^{১৪} কিন্তু বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হলেও অর্থ বা অন্য উপহার, দ্রব্যগ্রহণ বা বিনিময়ের প্রসঙ্গ যেহেতু থাকে না তাই এই সম্পর্ক গণিকাবৃত্তি নয়।

আমরা এই আলোচনার শুরুতে বলেছি যে, আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে সচেতনভাবেই আমরা সকল দেহজীবাদের ‘গণিকা’ সম্বোধন করেছি। কিন্তু তাঁদের যে পেশাভিত্তিক স্তরবিন্যাস ছিল বা শ্রেণীবিভাগ ছিল তা স্পষ্ট। সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রদত্ত তালিকা আমরা আগেই দিয়েছি এবং আমাদের নির্বাচিত গ্রন্থগুলিতে আমরা কী কী পর্যায় পেয়েছি তার একটি গ্রন্থানুসারী তালিকাও আমরা সংযোজন করেছি। এই প্রেক্ষিতে Dr. S.C. Banerji ও R Banerji *THE CASTAWAY OF INDIAN SOCIETY History of Prostitution in India Since Vedic times, based on Sanskrit, Pāli, Prākṛit and Bengali Sources* গ্রন্থে যে বিশদ তালিকা দিয়েছেন আমরা সেটি তুলে ধরেছি এখানে। এই তালিকাটির পাঠ তৎকালীন যুগে গণিকাদের পর্যায়-বৈচিত্র অনুধাবনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে-

“*Veśyā* (rarely *veṣyā*) – A woman tempting men by her *Veśā* or dress.

Sādhāraṇī- Common or enjoyable by all (public woman).

Puṁścalī- A woman running after a man.

Vandhakī- A woman having sexual tie with many men.

Rūpajīvā- A woman earning bread by physical charm

Gaṇikā- Enjoyed by gaṇa, i.e. many or one who lives in a group.

Vārāṅgaṇā (also *vārāstrī*, *Vārāyoṣit*, *Vārāvanitā*, *Vārāvadhū*, *Vārānārī*)-

A woman enjoyed by men by turn.

Kuṭṭanī or *Sambhalī*- A prostitute procuring men.

Paṇyāstrī or *Paṇyayoṣit* - A woman used as a commercial commodity.

Kumbhikā- Perhaps the same as *Kumbhādāsī* denoting *Kuṭṭanī*.

Rūpadāsī- Enslaved for physical beauty.

Patākāveśyā-Such a prostitute is stated to be a forest-dweller.”^{১৫}

এছাড়াও কয়েকটি অভিধানে প্রাপ্ত শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকাও এই গ্রন্থে আছে-

“*Kṣudrā*, *Śālabhaṅjikā* (Jaṭādhara), *Jharjharā*, *Śūlā*, *Vāravāṇī*, *Bhaṇḍahāsinī* (*Śabdaratnāvalī*), *Lañchikā*, *Bandhurā*, *Kāmārekḥā*, *Barbatī* (*Śabdamālā*), *Bhujiṣyā* (Hemacandra), *Bhogyā*, *Smaravīthikā* (*Rājanirghaṇṭa*), etc.”^{১৬}

Winternitz বলছেন ঋকবেদে বলা হয়েছে- “unprotected women, like brotherless girls, used to adopt prostitution.”^{১৭}। অথর্ববেদেই incest-এর উল্লেখ আছে, ‘মহানগ্নী’, ‘পুংচলী’ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়েছে।

বেদ পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, এই সময়ে গণিকাবৃত্তি একটি পেশা হিসেবে সমাজে স্বীকৃত হয়েছিল। তাঁদের ‘বিশ্যা’ সম্বোধন করা হত। মনে করা হত এঁরা ‘বিশ্’ বা ‘বৈশ্য’ সম্প্রদায়ভুক্ত। এই বৈশ্যরা ছিলেন মূলতঃ বণিকশ্রেণীর যাঁরা পরিবার-পরিজন থেকে দূরে কোনো নগরীতে বাস করতেন। এই ‘বিশ্যা’ পদটি পরে ‘বৈশ্যা’-য় পরিবর্তিত হয় এবং এর অর্থগত পার্থক্য হয়ে যায়- এমন ব্যক্তি (নারী) যিনি সর্বজনভোগ্যা অথবা এমন নারী যিনি নিজেকে সুন্দর ভাবে সজ্জিত রাখেন।^{১৮} সমাজনির্দিষ্ট বিবাহসম্পর্কিত নিয়মাবলীর বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয় এই যুগে।

পুরাণ সাহিত্যে গণিকাদের তুলনায় অঙ্গরাদের উল্লেখ বেশি পাওয়া যায়। অঙ্গরারা গণিকাদের পূর্বসূরি। তাঁরা স্বর্বেশ্যা বা স্বর্গবেশ্যা নামেও পরিচিত ছিলেন। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ধৃত্যী প্রমুখেরা ছিলেন স্বনামধন্যা অঙ্গরা-

(৫০) “স্ত্রিয়াং বহুস্পসরসঃ স্বর্বেশ্যা উর্বশীমুখাঃ (ত)।।”^{১৯}

এছাড়া অমরকোষে প্রাপ্ত শব্দতালিকা হল-

নাট্যবর্গঃ - (৩৮৯) নাট্যোক্তৌ গণিকাংজ্জুকা - গণিকা বেশ্যা অজ্জুকা। (পৃ.৭৪)।

মনুষ্যবর্গঃ - (২২) ইচ্ছাবতী কামুকা স্যা-(২৩) দ্ব্যস্যন্তী (ড) তু কামুকী।।

(২৪) কান্তার্থিনী (ঢ) টু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা।

(২৫) পুংচলী ধর্মিণী বন্ধক্যসতী কুলটেত্বরী।। স্বৈরিণী পাং[সু]শুলা—

২২ সুখভোগাভিলাষিণী স্ত্রীর নাম - ইচ্ছাবতী, কামুকা (স্ত্রী)।

২৩ কামুকী স্ত্রীর নাম - দ্ব্যস্যন্তী, কামুকী (স্ত্রী)।

২৪ নায়কের জন্য যে স্ত্রী সংকেতস্থানে যায় সেই স্ত্রীর নাম- অভিসারিকা(স্ত্রী)

২৫ অসতী স্ত্রীর বাচক- পুংচলী, ধর্ষিণী, বন্ধকী, অসতী, কুলটা, ইতরী, স্মেরিণী পাংশুলা[পাংসুলা]
(পৃ.১৭৩-১৭৪)

নানার্থবর্গঃ -

(৩৫২) বাগিন্যো নর্তকী-[দূতৌ] মত্তে - বাগিনী - নর্তকী, মত্তা(স্ত্রী)। (পৃ.৩৫৯)

(৫৩৯) ক্ষুদ্রা ব্যঙ্গা নটী বেশ্যা সরঘা কন্টকারিকা - ক্ষুদ্রা- কনিষ্ঠা, বিকলাঙ্গা, নটী, বেশ্যা, মধুমক্ষিকা, কন্টকারিকা(স্ত্রী)। (পৃ.৩৭২)

যদিও মহাকাব্যে বিশেষ করে *মহাভারতে* এঁদের বহুল উল্লেখ লক্ষিত হয়। *অগ্নিপুরাণ* ও *মৎস্যপুরাণে* গণিকাদের সম্বন্ধে সম্মানজনক উক্তি নেই। যদিও *অগ্নিপুরাণে* এই পেশা সম্পর্কিত কিছু অপরাধ ও তার শাস্তির বিধান আছে।^{২০} পুরাণেই বলা হয়েছে একপুরুষে আসক্ত নারী ‘পতিব্রতা’, দুজনে আসক্ত হলে ‘কুলটা’, তিনজন হলে ‘ধর্ষিণী’, চারজনের ক্ষেত্রে ‘পুংচলী’, পাঁচজন পুরুষের সাথে সম্পর্কিত হলে ‘যুঙ্গী’ ও তার বেশি হলে ‘মহাবেশ্যা’।^{২১} গণিকারা যে শুভবোধক, মঙ্গলসূচক তার উদাহরণ রয়েছে *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ* ও *ভবিষ্যত্তরপুরাণে*।^{২২}

রামায়ণ-মহাভারতের মত মহাকাব্যের যুগে এই পেশা সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। *রামায়ণ* ও *মহাভারত* এই দুটিই একাধারে স্মৃতি, ইতিহাস ও কাব্যের মর্যাদা পেয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই রাজসভায় গণিকাদের উপস্থিতির উল্লেখ দেখা যায়। সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণী উৎসবে তাঁদের আমন্ত্রণ করতেন। *রামায়ণে* দেখা যায়, অযোধ্যার রাজসভাতেই গণিকা-নর্তকী ছিলেন। তাঁরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আমন্ত্রণ জানাতে গেছিলেন রাজাদেশে।^{২৩} *মহাভারতেও* এ ধরনের উল্লেখ রয়েছে। সেখানেও যুদ্ধযাত্রার সময় পাণ্ডবসেনার সঙ্গে যুদ্ধসামগ্রীর সঙ্গে গণিকাদের উপস্থিতির কথাও জানা যায়। ‘উদ্যোগপর্বে’^{২৪}, ‘বিরাতপর্বে’^{২৫} এঁদের উপস্থিতি লক্ষিত হয়েছে। এছাড়া সমগ্র মহাকাব্য জুড়েই এঁদের কথা নানা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। তবে তাঁদের বিবিধ ‘পর্যায়’ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে।

সমগ্র *রামায়ণ* ও *মহাভারতে* অসংখ্যবার এঁদের উল্লেখ রয়েছে। সামগ্রিক বিচারে তাঁদের উপস্থিতি সমাজমান্য, সম্মানজনক বলেই মনে হয়েছে তবে একথাও উল্লেখযোগ্য নগরের বা রাজ্যের সকল গণিকাদের অবস্থা একরকম ছিলনা।

রাজসভায়, উৎসবে-অনুষ্ঠানে, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় নৃত্যপটীয়সী গণিকারা অংশগ্রহণ করতেন। গণিকাদের উপস্থিতি, তাঁদের দর্শন শুভ বলে মনে করা হতো। রক্তবর্ণের বস্ত্র, রক্তবর্ণের পুষ্পমালা ও স্বর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন তাঁরা।^{২৬} কারণস্বরূপ বলা হয়েছে এটি মৃত্যু বা যমের চিহ্ন। সাধারণ জনগণের থেকে তাঁদের পৃথক করার জন্য ও জনগণকে গণিকাসঙ্গের নেতিবাচক দিকটি বোঝানোর উদ্দেশ্যে এহেন সাজসজ্জা নির্দিষ্ট করা হত। কৌটিল্য বলছেন নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে এঁদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।^{২৭}

আনুমানিক ৬৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-৫৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কাল বৌদ্ধযুগ হিসেবে মান্যতা পেয়েছে। বৌদ্ধসাহিত্য বলতে *জাতক* (বুদ্ধজন্মের কাহিনী), *অবদানশতকসাহিত্য* অর্থাৎ প্রশস্তিমূলক রচনা এবং গাথা সাহিত্যগুলিকে বোঝায়। বৌদ্ধযুগে সমাজব্যবস্থার আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, গণিকাদের প্রতি বৌদ্ধদের অবস্থান অত্যন্ত কঠিন। বহুসংখ্যক গণিকাচরিত্রের উল্লেখ এইসমস্ত সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। সমাজে তাঁদের স্থান রীতিমত আকর্ষক ছিল। বিত্তে-প্রতিপত্তিতে তাঁদের অনেকেই রাজার সমতুল ছিলেন। ‘নগরশোভিনী’, ‘নগরবধূ’ অথবা ‘জনপদবধূ’ নামেও তাঁদের অভিহিত করা হত। গণিকা ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক উভয়ের প্রতি বৌদ্ধদের যথেষ্ট নেতিবাচক মনোভাব থাকলেও তথাগত বুদ্ধের শরণাগত ‘জনপদবধূ’ আম্রপালীর কথা বৌদ্ধসাহিত্যে পাওয়া যায়।^{২৮}

একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্র ও অভিজাত সম্প্রদায়ের উৎপত্তির সাথে সাথে নাগরিক সমাজে যে পরিবর্তন এসেছিল সেই পরিবর্তিত নগরায়ণ এই জীবিকার উপরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। শুধু তাই নয়, এর বিস্তারে সাহায্য করেছিল।^{২৯} শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নির্মিত ‘গণ’, ‘সঙ্ঘ’-এর সদস্যরাই নগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারীকে ‘গণিকা’র পদাভিষিক্ত করতেন। এক উদ্যানপালকের পালিতা কন্যা অপরূপা, সর্বাঙ্গসুন্দরী আম্রপালী তাই নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন না; তিনি হবেন সর্বজনভোগ্যা, ‘গণ’ তাঁকে নিযুক্ত করেছিল সেই পদে। এক রাত্রির জন্য পাঁচশত কার্ষাপণ ছিল তাঁর নির্ধারিত মূল্য।^{৩০} যদিও তিনি বুদ্ধের দেশনা শুনে বৌদ্ধধর্মগ্রহণ করেছিলেন, সঞ্চিওত যাবতীয় সম্পদ সঙ্ঘারামে দান করেছিলেন। আম্রপালী ছাড়াও এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন গণিকা হলেন শালাবতী, শ্যামা(সামা), সুলসা, অন্ধকাশী প্রমুখ।^{৩১}

জাতকের বিভিন্ন কাহিনীতে, অবদানশতকের কাহিনীতে বৌদ্ধযুগের গণিকাদের জীবনযাত্রার যে গল্পগুলি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, ভোগসুখ ইত্যাদির বিলাসিতা থাকলেও কোনো না কোনো ঘটনায় (প্রেমিকের প্রতারণা, কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত অথবা নিজের লাঞ্ছিত জীবন, কলুষিত নারীদেহ থেকে মুক্তি ইত্যাদি) শেষে পরিতাপ, অনুশোচনা ও ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হওয়া। তবে ব্যতিক্রমও আছে সদ্যোজাত সন্তান পরিত্যাগ, নিরপরাধ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অপরাধীর তকমা দিয়ে শাস্তিগ্রহণে বাধ্য করার মতো ঘটনা।

বিশদে বৌদ্ধসাহিত্যসমূহ পাঠ করলে সেই সময় ও সমাজের পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। সমাজে তাঁরা পেশার কারণে নিন্দনীয় হলেও তাঁদের রূপ-গুণ ও কলাবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য অনেকের কাঙ্ক্ষিতা ছিলেন। সমাজ তাঁদের অর্থে বা দানে হওয়া উন্নয়নমূলক কাজে আপত্তি করেনি। তবে পাশাপাশি একথাও বলা যেতে পারে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে, এই ধর্মের মহত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই দেহবিলাসিনী গণিকাচরিত্রগুলির লোভ, ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতা ও পরিশেষে তথাগতের আশ্রয়ে মুক্তিলাভ। সেই সময়ের গণিকাদের জীবনযাপন, তাঁদের বক্তব্য ও কার্যকলাপ, তা সে ঠিক অথবা ভুল যাইহোক না কেন, তাঁদের নিজস্বতা রীতিমত বিস্ময়োদ্বেককারী।

জৈন প্রাকৃত সাহিত্যে গণিকা, তাঁদের জীবন ও পেশাগত যে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে তা অনেকটাই বৌদ্ধ সাহিত্যের সাথে তুলনীয়। জৈনগ্রন্থ বৃহৎকল্ল-এ গণিকাদের শিক্ষা-দীক্ষার উল্লেখ আছে। প্রয়োজনীয় সমস্তপ্রকার কলাবিদ্যার চর্চা তাঁদের করতে হত। ‘চম্পা’ নামী প্রসিদ্ধ রমণীর কথা জানা যায় যিনি মুখ্য গণিকারূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের মত একইভাবে ধর্মের আশ্রয়ে এসে এঁদের কলঙ্কময় জীবন থেকে মুক্তিলাভ হতো। নিজেদের সঞ্চিৎ সম্পদ অনেকেই ধর্মের নামে দান করতেন।^{১২} তবে বেশ্যা ও গণিকা যে পৃথক তার উল্লেখ জৈন সাহিত্যে পাওয়া যায়।

মৌর্যযুগে গণিকাবৃত্তিকে কেন্দ্র করে মহামতি কৌটিল্য তাঁর পরিকল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। গণিকারা যে আদতে রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ, সমাজের অন্যতম করপ্রদানকারী গোষ্ঠী সেকথা তিনি প্রথম উল্লেখ করেছেন তাঁর অর্থশাস্ত্রে। দেহোপজীবিনীদের গণিকা, প্রতিগণিকা, রূপাজীবা প্রভৃতি নামকরণ করেছেন। তাঁদের শিক্ষা, পেশাগত ব্যবস্থাপনা, আইনী সুযোগসুবিধা সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর ছিল তাঁর।^{১৩} কাজ, প্রয়োজন, ব্যবহারবিধি অনুসারে কৌটিল্য এঁদের বিবিধ স্তরবিভাগ করেছিলেন, যেগুলি আজও সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

বাৎস্যায়ন তাঁর *কামসূত্রে* ও আচার্য ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* গণিকাদের সম্বন্ধে প্রাপ্ত যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ সংকলন করা ছাড়াও তাঁরা এই বিষয়ে নিজস্ব মতামতও রেখেছেন। গণিকাদের বসবাসের জন্য নগরে পৃথক গণিকাপল্লীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শিক্ষিত-ভদ্র-পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি লম্পট, ধূর্ত, দুর্বৃত্ত ব্যক্তিরও গণিকাসঙ্গ করতে পারতো। বাৎস্যায়নের আনুমানিক সময়কাল তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। তাঁর মতে বিদেশি সৈন্যেরা স্থানীয় গণিকাদের সঙ্গেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। যে সময়ে তিনি গ্রন্থটি সংকলন করছিলেন সেই সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস যুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ, প্রভাববিস্তারকারী ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে। গণিকাবৃত্তির প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিক দিক নিয়ে বাৎস্যায়ন আলোচনা করেছিলেন। বলেছেন ‘নাগরক’ সমাজের কথা; যাঁরা মূলতঃ গণিকাসঙ্গ করতেন। ‘গম্য’, ‘অগম্য’ পুরুষের লক্ষণ ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি।^{৩৪} গণিকাদের অবস্থানগত অনুক্রম (hierarchy) করেছেন। ‘কুম্ভদাসী’, ‘পরিচারিকা’, ‘কুলটা’, ‘স্বৈরিণী’, ‘নটী’, ‘শিল্পকারিকা’, ‘প্রকাশ-বিনষ্টা’, ‘রূপাজীবা’, ‘গণিকা’ প্রভৃতি ভাগের উল্লেখ আছে *কামসূত্রে*।^{৩৫}

গুপ্তযুগে এই প্রথার উল্লেখযোগ্য বিবর্তন ও বিবর্ধন হয়েছিল। শুধু তাই নয় তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতিতে, মানুষের জীবনযাত্রায় এই বৃত্তি ও বৃত্তিগ্রহণকারিণীরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেন। আচার্য ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* একজন আদর্শ গণিকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে-

“কলাপ্রয়োগে চাচার্যশুশ্রূষাভিরতা সদা

লীলয়া হাবভাবাভ্যাং সন্তেন বিনয়েন চ।। ৮১।।

মাধুর্যেণ চ সংযুক্তা চতুষ্টিকলাশ্রিতা।

রাজোপচারকুশলা স্ত্রীদোষৈশ্চ বিবর্জিতা।। ৮২।।

প্রিয়বাদী প্রিয়কথা স্ফুটী দক্ষা জিতশ্রমা।

এভিগুণৈস্তু সংযুক্তা গণিকা পরিকীর্তিতা।। ৮৩।। (ভ.না./অধ্যায় ৩৫, পৃ. ২৩৩)

প্রাচীন ভারতের গণিকা প্রসঙ্গে সাধারণতঃ বংশানুক্রমিকভাবে যাঁরা এই পেশায় আসেন তাঁদের কথাই আলোচিত হয়ে থাকে। তাই তাঁদের শিক্ষার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, শিশুবয়স থেকেই ‘গন্ধর্বশালা’ নামক প্রতিষ্ঠানে চৌষট্ঠিকলা শিক্ষার জন্য, কামশাস্ত্র সম্পর্কিত পাঠ ও প্রয়োগকুশলতা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল। কামসূত্রে বিশদ তালিকা বিদ্যমান।^{৩৬} গুপ্তযুগে উজ্জয়িনী ছিল গান্ধর্বকলাসমূহ শিক্ষা ও চর্চার পীঠস্থান।

স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এই বৃত্তি ও বৃত্তিগ্রহণকারিণীদের একরকম অপরাধীর সমতুল প্রতিপন্ন করেছে। এই গ্রন্থগুলিতে দৈহিক শুদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। মহাকাব্যের সময় থেকেই গণিকাবৃত্তি আসলে শুধু রাজসভায় বা উচ্চবিত্তদের মধ্যে নয়; সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছিল। ক্রমশঃ গণিকারা সমাজের চোখে অস্পৃশ্য, অচ্ছুতের তকমা পাচ্ছিলেন এমনকি গণিকার দান বা তাঁর স্পর্শ করা খাদ্য ব্রাহ্মণের কাছে গ্রহণীয় নয় এরকম ধারণার প্রচলন দেখা যায়।^{৩৭} গৌতমধর্মসূত্রে বলা হয়েছে গণিকা হত্যার কোনো ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন নেই।^{৩৮} ‘বেশ্যা’, তস্কর, জুয়াড়ি স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতারণার নিরিখে এরা সমান। স্মৃতি ও ধর্ম শাস্ত্রসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এরা পাপিষ্ঠা, অপরাধী, ও অস্পৃশ্য প্রায়। যদিও কখনো কখনো গণিকাদের বিবাহের কথা জানা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিবাহের ফলে সামাজিকভাবে বিশেষ কোনো সম্মানজনক অবস্থান প্রাপ্তি তাঁদের হত না। তাঁরা কেবলমাত্র উপপত্নী বা রক্ষিতার পরিচয়ে পরিচিত হতেন।

প্রাচীন ভারতে যে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল তার অনিবার্য ফলশ্রুতি ছিল শূদ্রদের দাসপ্রথা। নিম্নবর্ণীয় রমণীরা তুলনায় উচ্চবর্ণের সেবা করতে, দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য করতে হতেন। সেই গৃহদাসীদের সঙ্গে গৃহকর্তা ও বাড়ির অন্যান্য পুরুষেরা শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতেন। কখনো জোর করে আবার কখনো অর্থ বা দ্রব্যের লোভ দেখিয়ে। আর্থিকভাবে দুর্বলশ্রেণীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন একপ্রকার শোষণ তো অবশ্যই, সেইসঙ্গে এইভাবে যেন তাঁদের বোঝানো হত প্রয়োজন পড়লে দেহকে মাধ্যম করেও উপার্জন করা সম্ভব। ফলতঃ অনেকের কাছেই এই বৃত্তিটি উপার্জনের অন্যতম উপায় হিসেবে প্রতিপন্ন হয়ে উঠেছিল। যদিও প্রাচীন যুগের স্মৃতিকারেরা এই ধরনের সম্পর্ক ও তার ফলে জাত সন্তানদের সামাজিক অবস্থান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নানাবিধ আলোচনা করেছেন।

দেবদাসীপ্রথা ও মন্দিরে নৃত্যরতা নর্তকীদের উল্লেখ ভারতবর্ষের ইতিহাসে যথেষ্ট বিদ্যমান। মন্দিরে কুমারী কন্যাদের উৎসর্গ করার প্রথা বহু প্রাচীন। গ্রীস, ব্যাবিলনের মত ভারতবর্ষেও এই প্রথা শতাব্দী প্রাচীন কিন্তু কত প্রাচীন সেকথা নির্দিষ্ট করা বলা একরকম অসম্ভব। প্রথাটি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলা যায়, মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে কুমারী মেয়েদের উৎসর্গ করা হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেববিগ্রহের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ দেওয়া হতো ও বলা হতো তাঁদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল দেবসেবা করা।

মনে করা হয় যখন থেকে দেবমন্দির স্থাপনার শুরু তখন থেকে দেবতাদের সঙ্গীত-নৃত্যাদি প্রিয় হওয়ার কারণে তাঁদের মনোরঞ্জনহেতু মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগ আরম্ভ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে দেবদাসীরা গণিকাই। দেবদাসীরা দেবতাদের জন্য নিবেদিত - এই নির্মোকের আড়ালে মন্দিরের পুরোহিত, রাজা অথবা সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের যৌনকামনা পূরণের মাধ্যম ছিলেন তাঁরা।

সিদ্ধু সভ্যতার যে নারী মূর্তিটির উল্লেখ আমরা আগে করেছি অনেকে সেটিকে দেবদাসীর মূর্তি বলেও মনে করেন।^{৭৯} মনে করা হয় দেবদাসীপ্রথার সবথেকে প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় অশোকের সময়ের একটি শিলালিপিতে (২৭৩-২৩২ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ)। রূপদক্ষ 'দেবদত্ত' নামান্তরে 'দেবদিস্ন' 'সুতনুকা' নামী এক দেবদাসীর প্রেমাভিলাসী ছিলেন। এই শিলালেখটির সন্ধান রামগড়ের যোগিমারা গুহায় পাওয়া গেছে।^{৮০} সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে এঁদের উল্লেখ দেখা গেছে। পতঞ্জলির রচনায় এঁদের কথা রয়েছে। সংস্কৃত কাব্যেও এঁদের অবাধ বিচরণ। কালিদাসের মেঘদূত,^{৮১} দামোদরগুপ্তের কুটনীমত, ক্ষেমেন্দ্রের সময়মাতৃকা-র মত কাব্যে দেবদাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। উভয়াভিসারিকার মত দৃশ্যকাব্যেও এঁদের স্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষিত হয়। কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে দেবদাসী (মতান্তরে নর্তকী) মুক্তি ও বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।^{৮২}

দেবদাসীরা সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন-

১. পিতামাতা যাঁদের পুণ্যলাভহেতু দেবতাদের নিবেদন করেছেন - দত্তা।
২. যাঁরা দেবতাদের কাছে আত্মবিক্রয় করেন (মতান্তরে মন্দির ক্রয় করতো) - বিক্রেতা।
৩. পরিবারে পুণ্যপ্রাপ্তিহেতু যাঁরা স্বেচ্ছায় মন্দিরের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন- ভৃত্যা।

৪. যাঁরা কেবলমাত্র ভক্তির টানে সংসার ত্যাগ করতেন (এঁদের মধ্যে রাজকন্যারাও থাকতেন) – ভজ্ঞা।

৫. প্রতারণা করে অথবা ভুলিয়ে, মিথ্যাকথা বলে যেসব মেয়েদের মন্দিরে আনা হত – হত।

৬. সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবদাসী হলেন তাঁরা, যাঁদের রাজা নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করাতেন। সাজসজ্জা থেকে শরীরগঠন সবকিছুই তাঁদের শিখতে হত। এঁরা ছিলেন – সালংকারা বা অলংকারা।

৭. সপ্তম শ্রেণীটি হল এমন একটি শ্রেণী যাঁরা প্রকাশতঃ পণ্যা। যদি মন্দির থেকে অর্থ উপার্জনের (নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক) সম্ভাবনা থাকে তবে তাঁরা মন্দিরে(মূলতঃ শিব বা বিষ্ণু) এসে নৃত্য প্রদর্শন করতেন। এঁরা – রুদ্রগণিকা বা গোপিকা।^{৪৩}

উপরের এই সাতটি কারণ ছাড়া আরও কিছু আর্থ-সামাজিক কারণ প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য বলা যেতে পারে আর্থসামাজিক কারণগুলিই মূল এবং সেইগুলিই উপরিউক্ত সাতটি শ্রেণীর কারণ রূপ ধারণ করেছে, যেমন – দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা গেলে তার অব্যবহিত পরেই মন্দিরে দাসী সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। যুদ্ধবিগ্রহের হলেও সেবাদাসির সংখ্যা বৃদ্ধি পেত কারণ জনসমাজে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মন্দির, দেবস্থান এগুলি সচরাচর বিপদসীমার বাইরে থাকে আর এখানে অর্থের অভাব হয়না।

দেবদাসীর জীবন রূপোপজীবিনীর জীবন হলেও সামাজিক সম্মান তুলনায় অন্যান্যদের থেকে অনেকংশেই বেশি কারণ এঁদের সঙ্গে ‘দেবতা’ বা ‘দেবত্ব’ এর মত স্পর্শকাতর বিষয় জড়িয়ে থাকে। মনে করা হয় দেবতার সেবাদাসী তাই এঁরা দেবতার বিবাহিতা স্ত্রী, চিরায়ুস্মৃতি, বৈধব্য-যন্ত্রণা মুক্ত। সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষতঃ বিয়েতে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয় কেননা তাঁরা শুদ্ধা। দেবদাসীরাও সন্তানরূপে কন্যাসন্তানই কামনা করেন কারণ তাঁরাই ভবিষ্যতে দায়িত্ব নিয়ে থাকেন।

এই দেবদাসীরা সমাজে দাতা হিসাবেও যথেষ্ট সম্মাননীয় ছিলেন। পুষ্করিণী, হ্রদ, উদ্যানদান করতেন তাঁরা। দেবদাসীপ্রথার অন্যতম দান, তাঁদের অবিরাম সাধনার ফল ‘ভরতনাট্যম্’ ভারতীয়

নৃত্যশৈলীর এক নিরুপম নিদর্শন। সাহিত্যে – স্থাপত্যে – ভাস্কর্যে সবখানেই তাঁদের অপরিসীম দান।

এতকিছুর পরেও এই প্রথাকে গণিকাবৃত্তির নামান্তর ব্যতীত অন্য কিছু বলতে ইচ্ছে করেনা। দেবতার নাম-মাহাত্ম্যের সাহায্যে প্রথাটিকে মহিমান্বিত করার প্রয়াস করা হয়েছে যুগ যুগ ধরে। আমরা আগে বলেছি সামগ্রিকভাবে সারা দেশে প্রচলিত থাকলেও দক্ষিণ ভারতে তুলনায় বেশি লক্ষিত হয়। ভৌগলিক অবস্থান, বৈদেশিক আক্রমণ ইত্যাদি তার কারণ। সেই দক্ষিণ ভারতেই ১৯১০ সালে মহীশূররাজ মন্দিরে দাসী-উৎসর্গ নিষিদ্ধ করেছিলেন। ১৯৩০ এ নিষিদ্ধ করেন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী। ১৯৩৪ সালের ১৭ই আগস্ট বোম্বে বিধান পরিষদে রাও বাহাদুর বোলের বিলটি পাস হয় এবং আরও দীর্ঘ লড়াই এর পর ১৯৪৭ এ স্বাধীনতার আগের মাসে মিসেস মুখলক্ষ্মী রেড্ডির লড়াই স্বীকৃতি পেল এবং আইনিভাবে এই প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছিল।^{৪৪} কিন্তু এখনও এই প্রথা গোপনে প্রচলিত বলেই শোনা যায়। দেবদাসীরা যৌবনাবস্থায় যতখানি সম্মানের পাত্রী ছিলেন তাঁদের শেষজীবন ততখানি দুঃসহনীয় দারিদ্র্যে, নৈরাশ্যে অতিবাহিত হত। আসলে যতক্ষণ যৌবন ততক্ষণই সমাজে এঁদের প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চা করলে যে বিষয়টি সহজেই বোঝা যায় তা হল, গণিকারা রাজার অন্তরমহল অথবা রাজসভা সবক্ষেত্রেই রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। প্রায় সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁরা আমন্ত্রিত হতেন; অংশগ্রহণ করতেন। সংস্কৃত সৃজনশীল কাব্যে গণিকাদের যে চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তা সংস্কৃত শাস্ত্রের বর্ণনা অবলম্বন করেই করা হয়েছে। আমাদের গবেষণায় আমরা নির্দিষ্ট সংস্কৃত শাস্ত্র ও সৃজনশীল সাহিত্য নির্বাচন করে বিস্তারিত আলোচনা করলেও এই অবসরে এমন আরও কয়েকটি কাব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো যেগুলিতে গণিকা বা গণিকাসম্পর্কিত বিষয়বস্তু রয়েছে। ভাস্কর চারুদত্ত এরকমই একটি দৃশ্যকাব্য (আনুমানিক ২য়-৩য় শতাব্দী) যার নায়িকা একজন গণিকা বসন্তসেনা।^{৪৫} অসামান্য সুন্দরী, বিদুষী ও কলানিপুণ এই গণিকাচরিত্রটি সংস্কৃত সাহিত্যে এক অন্যতম উদাহরণ। মনে করা হয় এই চরিত্রটিরই ছায়া অবলম্বনে শূদ্রক *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণ রচনা করেছিলেন এবং তিনিও একইভাবে চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করেই চরিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। *মুদ্রারাক্ষস* নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র নারীচরিত্রবর্জিত নাটক। সেখানেও কৌমুদীমহোৎসবে গণিকারা তাঁদের সঙ্গীসহ উৎসবে যোগ

দিতেন সেই উল্লেখ আছে।^{৪৬} এই নাটকেও গণিকাদের উৎকর্ষের বিবরণ রয়েছে। গুপ্তযুগে রচিত চতুর্ভাষী সংস্কৃত সাহিত্যে গণিকাবৃত্তিসংক্রান্ত পাঠের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গণিকাসমাজ, তাঁদের জীবনযাপন, তাঁদের বাসস্থান সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থে। উচ্চশ্রেণীর দেহবিলাসিনী থেকে আরম্ভ করে নিতান্ত সাধারণী প্রায় সবধরনের চরিত্রের সমাবেশ লক্ষিত হয় এখানে। তুলনামূলক পরবর্তী সময় লিখিত দণ্ডীর *দশকুমারচরিত* সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের নিদর্শন। সেখানে গণিকাদের শিক্ষাপদ্ধতি, কলাভ্যাস ইত্যাদি যেমন আছে তেমন রাজা তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে তাঁদের সম্বন্ধ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। কলহনের *রাজতরঙ্গিনী*, ক্ষেমেত্রের *সময়মাতৃকা*, *দেশোপদেশ*, *কলাবিলাস*, *নর্মমালা*, ভোজের *শৃঙ্গারমঞ্জরীকথা*, সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর* এই সবগুলি সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্যের উদাহরণ এবং প্রতিটি গ্রন্থেই একাধিক গণিকা চরিত্র রয়েছে (মূলতঃ মুখ্য চরিত্ররূপে, কোন কোন ক্ষেত্রে গৌণচরিত্র রূপে)। এই সমস্ত চরিত্রগুলি সুন্দরী, বিদুষী, চতুঃষষ্ঠী কলানিপুণ, সর্বোপরি তুখোড় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। রাজনীতির পাঠ তাঁদের নিতেই হতো। সেই রাজনীতিজ্ঞানের প্রয়োগ তাঁরা করতেন কখনো স্বেচ্ছায় আবার কখনো রাজাদেশে। রাজা বা উচ্চপদাধিকারী রাজকর্মচারীর রক্ষিতা কোনো গণিকা আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় দুই ধরনের রাজ্য-রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। কলহনের *রাজতরঙ্গিনী*তে শাম্ভবতী, কমলার উদাহরণ রয়েছে। যাঁরা রাজনীতিতে অংশ নিয়ে রাজ্য ও সিংহাসন পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। কমলা ছিলেন স্বনামধন্যা গণিকা, যাঁকে রাজা জয়্যাপীড় বিবাহ করেছিলেন। আবার এরই বিপরীতে দেখি রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজসভায় আগত নোন নামের এক বণিকের কথা যার স্ত্রী নৃত্য-গীত কুশলা ছিলেন। রাজা তার প্রতি আসক্ত বুঝতে পেরে নোন স্বয়ং নিজের পত্নীকে মন্দিরে দেবসেবার জন্য দেবদাসী/ নর্তকী রূপে দান করে।^{৪৭} এই দুটি ঘটনায় গণিকার পত্নীরূপে স্থান পাওয়া আর এক সাধারণ বণিকপত্নীর মুহূর্তের মধ্যে নর্তকী তথা সেবাদাসীতে পরিণত হওয়া – যেন একটি বিষয়ের উপরেই আলোকপাত করে, নারী কেবল পুরুষের ইচ্ছাধীন। পুরুষের ইচ্ছাতেই তার ‘পত্নী’ পরিচয় আবার পুরুষের ইচ্ছাতেই তার ‘গণিকা’ পরিচয়। যদিও কলহন গণিকাদের সম্বন্ধে, তাঁদের পেশা সম্বন্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিই পোষণ করেছেন-

“Courtezans, the officials (*kāyastha*), the clerk (*divira*) and the merchant, being [all] deceitful by nature, are [in this respect] superior to a poisoned arrow that they have been trained under a teacher’s advice.”^{৪৮}

সময়ের সাথে সাথে সমাজে গণিকাদের অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে আর তাঁদের অবস্থানগত পরিবর্তন ধরা পড়েছে সাহিত্যে। ধীরে ধীরে তাঁরা অন্যান্য দেহজীবাদের তুলনীয় হয়ে পড়ছিলেন। শিক্ষা ও কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁদের যে শ্রেণীবিন্যাস ছিল তা মুছে গিয়ে সকলেই একই পণ্ডিতভুক্ত হয়ে পড়ছিলেন এবং সাধারণভাবে তাঁদের পেশায় যৌনসংসর্গের বিষয়টিই জনমানসে মুখ্যরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। যদিও এরকম ধারণার পেছনে অন্য আরেকটি কারণ ছিল, গণিকাবৃত্তি ক্রমশঃ পেশা হিসেবে আরও সংগঠিত হয়ে উঠেছিল এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করছিল। সমাজে এঁদের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রবল, এতোটাই যে, এঁদের অস্বীকার কোন উপায় থাকেনা। গুপ্ত যুগের সাহিত্যকৃতিগুলিতে সেই উদাহরণ দেখা যায়। নগরের একটি নির্দিষ্ট অংশে গণিকাপল্লীর অবস্থান, তাঁদের যাপন সমস্তকিছুই এই বিষয়ে সহমত পোষণ করে। শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক, পরিশীলিত, বিত্তে-বৈভবে রাজার তুল্য আম্রপালী বা বসন্তসেনার মত গণিকাদের বর্ণনা সাহিত্যে কমে আসতে শুরু করেছিল। পরিবর্তে প্রতারণা-প্রবঞ্চনা-নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি রূপে চিত্রিত করা হতে থাকে তাঁদের। গুপ্তযুগের সময়ে ও তার কিছু পরে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক বদল, রাজনৈতিক পরিকাঠামোর ক্রমিক পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই এই পেশা ও পেশাবলম্বিনীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। উত্তরভারত ও দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে মূলতঃ ছিল দেবদাসী প্রথা। যদিও নারীর দেহ ও পুরুষের ভোগতৃষ্ণা, নারীকে অবদমিত করার প্রয়াস সমস্ত কিছুকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে দেয়। তখন পৃথক করার মত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

সর্বাস্তীর্ণভাবে সচেতন হয়ে ‘গণিকা’ বা হালের ‘যৌনকর্মী’ যে শব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন শিক্ষা-বিদ্যা-কলানৈপুণ্য-বুদ্ধিমত্তা-জ্ঞান সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে কোথাও যেন তাঁদের দেহপট্টুকুই একমাত্র সত্যি হয়ে উপস্থাপিত হয়। নিন্দা, কলঙ্ক, অবমাননা আর লাঞ্ছনাকে সঙ্গী করেই আবহমানকাল ব্যাপী যাত্রা তাঁদের।

অন্ত্যটীকা ও তথ্যসূচি

- ১। David Jary & Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, Glasgow: Harper Collins Publishers. P-529, Borrowed on 01.10.2023.
- ২। সুকুমারী ভট্টাচার্য, ‘প্রাচীন ভারতে গণিকা’, *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য*, পৃ. ৫৬।
- ৩। *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Fifth Edition, Oxford University Press, 1997, p-267.
- ৪। Claude Conyers, ‘Courtesans in Dance History: Les Belles de la Belle poque’. *Dance Chronicle*, Vol 26, No.2. p-219.
- ৫। Wendi Doniger and Sudhir Kakar (trans.) *Kamasutra of Vatsyayana Mallanga*, Oxford University Press, New York, 2002, they have translated ‘ganikā’ in this way.
- ৬। Doris M Srinivasan, ‘The Mauryan Ganika from Didarganj (Pataliputra), East and West, Vol. 55, p. 346.
- ৭। Kirit K. Shah, *The Problem of Identity: Women in early Indian Inscriptions*, Oxford University Press, p.164.
- ৮। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রথম খণ্ড*।। অ-ন, পৃ. ৭৬১।
- ৯। Vaman Shivram Apte. *The Student's English-Sanskrit Dictionary*. p.198.
- ১০। as cited in Ajay Jacob Thomas, ‘The Story of the ‘Dancing-Girl’ of Mohenjo-daro: Interpreting the Social Life of a Bronze Figurine’, *Heritage: JMSA* 8.1 (2020), p. 619.
“At one end of this paving is a little fireplace, by the side of which was lying one of the most interesting antiquities unearthed during the session. It is a bronze statuette of a naked, slender-limbed dancing-girl...cast in the round. It is 4.25 inches high and in good preservation save for the feet, which are broken off. The figure is characterized by negroid facial features, and executed with some primitive vigour. The Hair is gathered in a heavy coil over the right shoulder, the left leg is bent forward and the right hand placed on the right hip. The left arm, which hangs down is covered with bangles from the shoulder to the wrist...The right arm is adorned with only two bangles above the elbow and with another round the wrist (Marshall 1931:209-210).”
- ১১। Iwan Bloch, *Anthropological Studies in the Strange Sexual Practices of All Races in All Ages Ancient and Modern Oriental and Occidental Primitive and Civilized*, pp.83-84:

“In the latter fact is the only explanation of religious prostitution. The act of prostitution as such, of unreserved sexual yielding without love, as an act of crude sensuality and for pay, is here identified with a religious act, with a divine consecration, a sacrifice offered to the deity. The never-repeated sexual sacrifice to the deity is made in one of the two ways. Either the woman gives herself directly to the deity, is physically deflowered by a physical image of the god, or she gives herself to the human substitute for the deity, a priest, king, stranger indeed, at times, a blood relative, father among others. From this it is evident that the so-called “hospitality prostitution.”

১২। S.N. Sinha & N.K. Basu, ‘The Vedic Age’(Chapter1), *History of Prostitution in India*, p.1:

“It is an admitted fact that prostitution, as we understand it today, is a product of civilization and a by-product of the marriage-institution

১৩। সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাণ্ডু*, পৃ.৫৫।

১৪। তত্রৈব।

১৫। Dr. S.C. Banerji, R. Banerji, *The Castaway of Indian Society History of Prostitution in India Since Vedic times, based on Sanskrit, Pāli, Prākṛit and Bengali Sources*, Introduction, pp. 1-2.

১৬। *Ibid.* p-2.

১৭। M. Winternitz, *A History of Indian Literature, Vol.I*, p.67:

"It is not to be denied, however, that already at the time of the R̥gveda, many solitary, unprotected women — “brotherless maidens” as a poet calls them— gave themselves up to prostitution

১৮। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, *বৈদিক যুগের জাতিভেদ*, পৃ.৫।

১৯। *সটীকানুবাদ অমরকোষ বা অমরার্থ চন্দ্রিকা* (সম্পা. শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি- ভট্টাচার্য), স্বর্গবর্গ, পৃপৃ.২৮-২৯:

(৫০) উর্বরশীপ্রমুখ স্বর্গবেশ্যার বাচক শব্দ।---অঙ্গরস্। [বহুবচনান্ত] স্বর্বেশ্যা। (স্ত্রী)।

(ভ) অঙ্গোতি। দ্বয়ং স্বর্বেশ্যায়াম্। ‘স্ত্রিয়াং বহুপ্সরস’ ইতি বহুত্বে প্রচুরপ্রয়োগ দর্শনাদুক্তম্, একবচনপি প্রযুক্তং কম্পিলাভ্যুদয়ে- “সান্দ্রবাণপটসংবৃতমূর্ত্তেদন্তি দত্তশয়নীশয়স্য। মানিনঃ কুলবধূরিব রাগাদঙ্গরা ব্যাধিতপার্শ্বশূন্যম্” ইতি। “উর্বরশ্যাদ্যা ইমে জেয়া বিদ্যুৎপর্ণা তিলোত্তমা।

পুণ্ডরীকা সুবাহুশ্চ সুরথা প্রমাথিনী।

মেনকা চ সুকেশী চ রুচিরা পুঞ্জিকা স্থলা।

অলম্বুষা চ রম্ভা চ সুমধ্যতে বামদয়ঃ।।

২০। *Agnimahāpurāṇam*, ed. K.L. Joshi (Sanskrit Text and English Translation M.N. Dutt) Vol. II, pp.226-227.

২১। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, (অনু. মথুরানাথ তর্করত্ন), *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড* (অধ্যায় ৩১), পৃপৃ.৯২১-৯২২।

২২। Devangana Desai, *Erotic Sculptures of India: A Socio-Cultural Stud*, p.100.

২৩। Makhan Lal Sen, *The Ramayana Vol.1 Bala Kandan*, pp.21-22:

“Then the courtiers acted according to the instructions of the priests and sent fascinating courtezans to the forest, and they stopped at some distance from the hermitage.”

২৪। J. A. B. Van Buitenen (ed. and trans.), *The Mahābhārata: The Book of the Effort*, 1978, V, pp.30-36.

২৫। *Ibid.*, IV, p.122 20-25:

Let my royal roads be decked with bunting and all the deities be worshiped with auspicious offerings! Let the princes, chief warriors, and well-adorned courtesans, and all musical instruments go out to meet my son!

২৬। Johann Jakob Meyer. *Sexual Life in Ancient India A Study in the Comparative History of Indian Culture*, pp.264-265:

“if the “public woman, open to the visits of all’ (nārī prakāṣā sarvagamyā) wore a red garment, a red wreath, and red gold by this garb, recalling the god of death and public execution.”

২৭। R. P. Kangle. *The Kautilīya Arthaśāstra, Part II*, p.69:

“Beyond that, grain-dealers.....courtesans, dancers and Vaiśyas should live in the southern quarter.”

২৮। জাতক: ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা-নামক মূল পালিগ্রন্থ (অনু. ঈশানচন্দ্র ঘোষ), পৃপৃ.২৭৯-২৮২।

২৯। A.L. Basham, *The Wonder That Was India*, pp. 97-98.

৩০। বিমলা চরণ লাহা, *বৌদ্ধরমণী*, ‘বৌদ্ধযুগে নর্তকী ও বারবণিতা’, পৃপৃ. ৩৫-৩৬।

৩১। *তদেব*, পৃপৃ. ৩৮-৪৫।

৩২। Moti Chandra, *The World of Courtesans*, p 32.

৩৩। R. P. Kangle. *op.cit*, pp.158-162.

৩৪। ত্রিদিবনাথ রায়, বাৎসায়নের *কামসূত্র* (বঙ্গানুবাদ গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর), নবপত্র প্রকাশন, পৃ. ১৯০-১৯৪।

৩৫। *তদেব*, পৃ. ২৪।

৩৬। *তদেব*, পৃ. ৫৫-৭৯।

৩৭। *Dharmasūtras: The Law Codes of Āpastamba, Gautama, Baudhāyana and Vāsiṣṭha*. (trans. Patrick Olivelle), *Gautama*, 17.17.

৩৮। *Ibid*, *Gautama*, 22.27.

৩৯। Moti Chandra, *op. cit*, p.9:

“There is some likelihood that the bronze figure of the dancing girl from Mohenjodaro represents a sacred prostitute carrying out her duties within the precincts of the temple of some mother goddess and we know that this cult was quite well established in the Indus Valley culture”

৪০। সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১১৯।

৪১। কালিদাস, *মেঘদূতম্*, (সম্পা. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী), পৃ. ১৮৮-

“পাদন্যাসৈঃ কণিতরশনান্তত্র লীলাবধূতৈঃ

রত্নচ্ছায়াখচিত বলিভিচ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।

বেশ্যাস্ত্বভো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দু-

নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকর শ্রেণি দীর্ঘান্ কটাক্ষান্।। ৩৬।।”

৪২। কল্হন, *রাজতরঙ্গিনী* (অনু. হরিলাল চট্টোপাধ্যায়, সম্পা. অমিত ভট্টাচার্য), পৃ. ১১৮।

৪৩। Sukla Das. ‘Under The Veneer of Religion: Evolution of The Institution of Devadāsīs’, *সুকুমারীসৌকুমার্যম্*. p.37.

৪৪। Bindu S. Rao. *IJSER*. ‘Dr. Muthulakshmi Reddy, the Devadasis, and the Events that shaped Post-Colonial Bharatnatyam’, Vol.9, Issue 4, April 2018. pp. 774-779.

৪৫। Bhāsa, *The Chārudatta*, (ed. T. Ganapati Sāstrī), Trivandrum Sanskrit Series No. XXXIX.

৪৬। Viśākhadatta, *Mudrārākṣha* (ed. M.R.Kale), 3rd act, pp.77-79.

৪৭। কল্হন, *রাজতরঙ্গিনী* (সম্পা.মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), পৃ.২৫৭।

৪৮। *Rājatarāṅgiṇī*, VIII, p. 131.

১.৫. গবেষণাপদ্ধতি ও অনুসৃত লিখনশৈলীর বিবরণ:

এই গবেষণাসন্দর্ভটি লেখার জন্য যে গবেষণাপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে তা নীচে দেওয়া হল-

১) যেহেতু সংস্কৃত থেকে বাংলায় এই অভিব্যক্তি নির্মাণ করা হচ্ছে সে কারণে গবেষণাসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় প্রণীত হয়েছে।

২) সংস্কৃত গ্রন্থাদির উদ্ধৃতি ও প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বাংলা হরফে উদ্ধৃত হয়েছে। এছাড়া দেবনাগরীর পৃষ্ঠা সংখ্যা রোমান নিউমেরিকে লিখিত হয়েছে।

৩) বিস্তারিত অধ্যায়-বিভাগ করা হয়েছে এবং অধ্যায়গুলি প্রসঙ্গানুসারী কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত রয়েছে।

৪) এই সন্দর্ভটি ‘কালপুরুষ’ ফন্টে (১৪ পয়েন্ট) লেখা হয়েছে। শিরোনাম (১৬ পয়েন্ট), বাংলা ও ইংরাজি উদ্ধৃতি যথাক্রমে ‘কালপুরুষ’ ও Times New Roman’ (12 points) ও তথ্যসূচীর ক্ষেত্রে ‘কালপুরুষ’ ও ‘Times New Roman’ (12 points) ব্যবহৃত হয়েছে। অধ্যায়ের ক্ষেত্রে ১.১৫ ও তথ্যসূচী প্রদানের ক্ষেত্রে লাইনস্পেসিং ১.৫ ব্যবহৃত হয়েছে।

৫) বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ‘পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি’র *বাংলা বানান অভিধান* অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু উদ্ধৃতিগ্রহণের ক্ষেত্রে মূলরচনার যে বানান তাকেই অবিকৃত রাখা হয়েছে।

৬) উদ্ধৃতি ‘ডবল কোট’ এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং গ্রন্থনাম (আকর ও সহায়ক উভয়ই), পত্র-পত্রিকার নাম বক্রাক্ষরে করা হয়েছে। একক গল্পের শিরোনামের ক্ষেত্রে ‘সিঙ্গল কোট’ ব্যবহার করা হয়েছে।

৭) গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের ক্ষেত্রে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। গ্রন্থকারের পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমে পদবী ও পরে নাম এই ক্রম অনুসৃত হয়েছে। MLA HANDBOOK পদ্ধতি অনুসরণ করে সমগ্র বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে।

৮) বিবিধ গ্রন্থাগার ও অন্তর্জালের সাহায্য গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণিকাবৃত্তি:

বাৎস্যায়নের *কামসূত্রে* ও *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে* বর্ণিত তথ্যাবলী: তৎকালীন সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব।

ভূমিকা:

আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ের ‘কথামুখ’ অংশে আমরা গণিকাবৃত্তি ও তার প্রাচীনত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার একেবারে প্রাথমিকস্তর থেকে কারণ তবেই এই বৃত্তির ক্রমবিবর্তনের ধারাটি বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। প্রথম অধ্যায়ে গণিকাবৃত্তি সংক্রান্ত কিছু সাধারণ আলোচনা রয়েছে আর সেই সূত্র ধরেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা একটি বিশেষ অভিমুখ পেয়েছে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট গতিপথে আমাদের গবেষণাকাজটি অগ্রসর হয়েছে।

প্রস্তাবিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনার জন্য মূলতঃ দুটি গ্রন্থ নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত গ্রন্থ দুটি হল-

১. বাৎস্যায়ন প্রণীত *কামসূত্র*,

২. কৌটিল্য প্রণীত *অর্থশাস্ত্র*।

কামসূত্র এবং *অর্থশাস্ত্র*- এই দুটি গ্রন্থ নির্বাচনের অন্যতম কারণ হলো আমার গবেষণার (নির্ধারিত) শিরোনাম- “সংস্কৃত শাস্ত্র ও সৃজনশীল সাহিত্যে গণিকাবৃত্তি: প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতান্তর যুগের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে তার অভিব্যক্তি ও প্রভাব (১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ)”।

শিরোনামে বিদ্যমান ‘সংস্কৃত শাস্ত্র’- এই শব্দবন্ধটিকে যথাযথ মান্যতা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ এই গ্রন্থদুটি নির্বাচন করা হয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম মূল স্তম্ভ হল ‘চতুর্বর্গ’। চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ - এই চারটিকে অবলম্বন করে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফল্গুধারা আজও নিরবিচ্ছিন্নভাবে বহমান। চতুর্বর্গ পুরুষার্থ- এর মধ্যে চতুর্থ তথা অন্তিমবর্গ মোক্ষের সেবাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে

করা হয় কিন্তু প্রাচীন আচার্যগণ প্রত্যেককে একথাও সমানভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, পূর্বাপর তিনটি পুরুষার্থের সেবা অত্যন্ত প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে ধর্ম-অর্থ-কাম এর সেবায় তুষ্ট না হয়ে থাকেন তবে তাঁর মোক্ষলাভের সাধনা ব্যাহত হবে এবং কাঙ্ক্ষিত ফললাভ কোনো মতেই সম্ভব হবে না। অতএব প্রতিটি পুরুষার্থেরই সেবা প্রয়োজন।

S.K. De তাঁর *Ancient Indian Erotics* গ্রন্থে বলছেন,

“The Śāstras of Artha and Kāma, wealth and love, more than that of Dharma or duty, would naturally spread beyond the narrow group of ritualistic thinkers and become more thoroughly secularized and specialized with a greater appreciation of the realities of life. It is possible to assume that there must have been a time when the primitive Kāma-śastra was studied and taught quite as seriously, in the same schools, as the other two allied Śāstras in their primitive forms. Such in need not mean a decline of Dharma or austerity, but it is an upholding of the economic and erotic activity, Artha, and Kama as important factors of human nature.”

ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ এই চারটির মধ্যে ‘অর্থ’ ও ‘কাম’ এই দুটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে গবেষণার কাজে। যদিও ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনটি বর্গ কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং অন্তিমে মোক্ষ নামক পুরুষার্থের প্রাপ্তিতেই তাদের সার্থকতা।

এই অধ্যায়ে সংস্কৃতশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান দুটি গ্রন্থকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতার সময়কাল, জীবন, রচনা ইত্যাদি কিছু বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে সমগ্র বিষয়টিকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে পরবর্তীতে সেগুলির বিশদ আলোচনা বিদ্যমান।

যথা – *কামসূত্র*

- বাৎস্যায়নের সময়কাল
- বাৎস্যায়নের বংশপরিচয়
- বাৎস্যায়ন রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী
- *কামসূত্রে* বর্ণিত বিবিধ বিষয়

- নির্বাচিত বিষয়সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাবলী।

অর্থশাস্ত্র-

- কৌটিল্যের সময়কাল,
- কৌটিল্যের বংশপরিচিতি,
- কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র ও পরিচয় সমস্যা,
- কৌটিল্য প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ,
- অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত গণিকাবিষয়ক যাবতীয় তথ্যসমূহ ও তৎসম্পর্কে কৌটিল্যের অভিমত।

উপরে বর্ণিত উপবিভাগগুলি করা হয়েছে এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু এবং যথাযথ আলোচনার সুবিধার্থে। তবে একথাও অবশ্যই উল্লেখ্য যে, এই দুটি গ্রন্থে আচার্য বাৎসর্যায়ন এবং মহামতি কৌটিল্য যে যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন সেগুলির উপর ভিত্তি করেই তৎকালীন যুগের গণিকাবৃত্তি, তার সংজ্ঞা, তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি পরিস্ফুট হয়েছে। এই দুটি গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা সেই বিষয়ে পরিষ্কার চিত্র পেতে আমাদের সহায়তা করেছে।

কামসূত্র:

কামশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ হল কামসূত্র। যৌনতা মনুষ্যজীবনের অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ঘটনা। এই যৌনসম্পর্ক বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী কিংবা প্রেমজ সম্পর্কে আবদ্ধ নরনারীর মধ্যে হতে পারে। তবে ভিন্ন লিঙ্গই নয়, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ এবং যৌনসম্পর্ক স্বাভাবিক এবং সাধারণ বিষয়। যে বিষয়টি লক্ষ্যনীয় সেটি হল, প্রেম অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দৈহিক মিলন। কিন্তু যে দৈহিক মিলনে প্রেম অথবা বিবাহের সম্পর্ক থাকেনা সেই ক্ষেত্রে সেই সম্পর্কের ভিত্তি কী? যদি বলপূর্বক কোনোরকম যৌনসংসর্গ স্থাপন করা হয় তবে সেক্ষেত্রে তাকে ‘ধর্ষণ’ আখ্যায় আখ্যায়িত করা যেতে পারে কিন্তু যদি সেই যৌনসম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় অর্থের বিনিময়ে তখন কোথাও যেন কেবলমাত্র ক্রেতা এবং বিক্রেতা সম্পর্কটুকুই একমাত্র বাস্তব সত্য হয়ে থাকে।

যেকোনো শাস্ত্র বা যেকোনো বিদ্যা নিরন্তর চর্চার দ্বারা উন্নত হয়। প্রতিনিয়ত প্রয়াসের মাধ্যমে যেকোনো কাজে দক্ষতা, নৈপুণ্য আনা সম্ভব। যৌনক্রিয়া আদতে একপ্রকার শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া; যে কারণে একে জৈবিক প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। অন্যান্য জীবজগতের সঙ্গে মনুষ্যকুলের পার্থক্য এটাই যে, এই ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্যজীবের কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদন ও বংশগতির তাগিদ রয়েছে আর মানুষের ক্ষেত্রে এই দুটি কারণ ছাড়াও আরও একটি কারণ শরীরকে উপভোগ করা, দৈহিক কাম চরিতার্থ করা। শেষোক্ত কারণটির জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষে *কামসূত্রের* মতো গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

‘কামকলা’, ‘রতিবিদ্যা’ প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার যথেষ্ট সচেতনভাবেই করা হয়েছে, যাতে করে এই বিদ্যা যে কেবলমাত্র সন্তানাদিধারণ হেতু নয় সেই বিষয়ে কোনোরকম ভ্রান্তধারণা জনমানসে না থাকে। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য প্রাচীন ভারতীয় চিন্তন যথেষ্ট উন্নত, উদার এবং বিজ্ঞানমনস্ক ছিল অন্যথায় এই বিষয়ক গ্রন্থরচনা, প্রকাশ এবং চর্চা সম্ভবপর ছিল বলে মনে হয়না।

বাৎস্যায়নের সময়কাল:

বাৎস্যায়ন স্বয়ং নিজেকে বারংবার একজন দক্ষ সম্পাদকের আসন দিয়েছেন। তিনি নিজেকে কামসূত্রের প্রণেতা হিসেবে ভাবেননি। S.N.Sinha ও N.K.Basu আরও একটু বিশদে বলেছেন, বাৎস্যায়ন এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করলেও নিজেকে সম্পাদক মনে করেছিলেন এবং জনসচেতনতাবৃদ্ধির জন্যই তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।^২

আচার্য বাভ্রব্যের প্রণীত কামশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের এক একটি অধ্যায়কে উপজীব্য করে চারায়ণ সাধারণ, ঘোটকমুখ কন্যাসংপ্রযুক্তক, গোনদীয় ভর্যাধিকারিক, গোণিকাপুত্র পারদারিক, দত্তক বৈশিক, সুবর্ণনাভ সাম্প্রয়োগিক এবং কুচুমার ঔপনিষদিক অধিকরণ ইত্যাদি রচনা করেন। কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে পাঠ এবং শাস্ত্রানুসারীচর্চা করা সহজ নয় তাই আচার্য বাৎস্যায়ন সবগুলিকে একত্রিত করে সাত অধিকরণে, ছত্রিশটি অধ্যায়ে এবং চৌষটি প্রকরণে *কামসূত্র* রচনা করেছিলেন। তিনি প্রতিটি পর্যায়ে পূর্বাচার্যদের মতামত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন এবং অন্তিমে নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাই বিনয়ী হয়ে তিনি নিজেকে সম্পাদক মনে করলেও পাঠক ও গবেষক হিসেবে তাঁকে রচয়িতার স্থান দেওয়াই যথাযথ মনে হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল বাৎস্যায়নের আবির্ভাবকাল। কোন সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং এই গ্রন্থটি রচনার সময়কাল কী? সংস্কৃত সাহিত্যে ক্ষেত্রে যে কোনো সাহিত্যের কালনির্ণয় একটি জটিল এবং দুষ্কর প্রক্রিয়া। একেবারে নিরঙ্কুশভাবে সব দেশকালের পণ্ডিতব্যক্তি এবং গবেষকেরা কোনো কবির সময়কাল নিয়ে একমত হতে পারেননি এবং তার জন্য অনেকাংশে দায়ী সেই কবি স্বয়ং। প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী বিনীতস্বভাব কবি নিজের বংশপরিচয়, সময়কাল ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় নিশ্চুপ থাকতেন তার ফলেই এরকম মতানৈক্য সৃষ্টি হতো। বাৎস্যায়ন ও এর ব্যতিক্রম নন। S.N SINHA এবং N.K BASU তাঁদের *History of Prostitution In India* গ্রন্থে বলেছেন কামসূত্র মৌর্য যুগের রচনা।^৭ আবার *History of Classical Sanskrit Literature* এর প্রণেতা M. Krishnamachariar -এর মতে বাৎস্যায়ন তৃতীয় বা চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সমসাময়িক।^৮ A.B. Keith তাঁকে চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলেছেন^৯ H.C.Chaklada তাঁর ধারণায় গ্রন্থটি তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত।^{১০} Winternitz বাৎস্যায়নের সময়কাল চতুর্থ শতাব্দী মনে করে।^{১১} অর্থশাস্ত্র থেকে বেশ কিছু বিষয়ের উল্লেখ কামসূত্রে থাকার কারণে অনেকেই তাঁকে কৌটিল্যের পরবর্তী বলে মনে করেছেন। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুযায়ী, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের একেবারে সূচনা পর্বে গ্রন্থ বিশেষ করে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনার একটি ধারা লক্ষিত হয়। ‘উদ্দেশ্য-নির্দেশ-প্রতিনির্দেশ’-এই পদ্ধতি অনুসারে গ্রন্থ রচিত হত, কামসূত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে মনে করা যেতে পারে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় বা প্রথম দশকের মাঝামাঝি কোনো সময়ে এটি রচিত হয়েছিল। এরকম নানাবিধ মতভেদের কারণে একটি নির্দিষ্ট সময় বা যুগের উল্লেখ না করে তার পরিবর্তে খুব প্রাসঙ্গিকভাবে একটি সময়খণ্ডকে বাৎস্যায়নের কাল বলে নির্ণীত করা যায়। তৃতীয় বা দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দকে কামসূত্র রচনার সময়কাল এবং খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত গ্রন্থটির পরিমার্জনের কাল বললে যথায়থ বলে মনে হয়। বাৎস্যায়ন স্বয়ং বলেছেন যে তিনি কৌমার্যব্রত পালনরত অবস্থায় গ্রন্থটি রচনা করেন-

“তদেতদ্রক্ষচর্যেণ পরেণ চ সমাধিনা।

বিহিতং লোকযাত্রায়ৈ ন রাগার্থোহস্য সংবিধিঃ।।^৮ কা.সূ. ৭.২.২৬

বাৎস্যায়নের বংশপরিচয়:

আচার্য বাৎস্যায়নের বংশপরিচয় সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা মূলতঃ কিংবদন্তী নির্ভর। তাঁর সময়কাল নির্ণয় করাই যেখানে দুঃসাধ্য একটি বিষয় সেখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জন্মস্থান, বংশপরিচয় ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণ সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়না। যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তার কিছু বাৎস্যায়ন নিজেই *কামসূত্রের* প্রারম্ভিক অংশে লিখে গেছেন। সেই তথ্যের উপর নির্ভর করে যেটুকু জানা যায়, প্রাচীন ভারতের পঞ্জাবের তক্ষশীলার(যা বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত)এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর পিতার নাম কোকদেব। বাৎস্যায়ন তাঁর পূর্বাচার্যগণের কৃতিত্ব যথাযথ স্মরণ করেছেন কারোর প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিলোনা। তিনি তাঁর গ্রন্থে সমগ্র ভারতবর্ষের বিবিধ জনসাধারণের কথা, তাঁদের অভ্যাস-জীবনচর্যা বিশদে বর্ণনা করেছেন এমনকী স্থাননির্দেশ করে তিনি সেই জায়গার রীতি অনুসারী তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই তথ্যসমূহের উপস্থাপনেও কিন্তু বিশেষ পক্ষপাত ছিলোনা। তারই মধ্যে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ প্রান্ত সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল বলেই মনে করা হয়। তুলনায় উত্তর-পশ্চিম ভারত বা দক্ষিণদেশীয়দের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য নেই আবার পূর্বভারতদের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের উল্লেখ রয়েছে একবারমাত্র। ‘নাগরককাঃ’শব্দের ব্যবহার করেছেন তিনি^৯। যদিও গবেষক H.C.Chakladar মনে করেন, আদতে এই শব্দটির প্রয়োগের মাধ্যমে বাৎস্যায়ন কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিশেষ জনজাতিকে বোঝাতে চাননি, তার পরিবর্তে প্রজাতান্ত্রিক দেশের জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন^{১০}। কারণ বর্ণনাপাঠের পরে একথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি ভারতীয় নাগরিকদের জীবনযাপনের একটি মান্যরূপকে তাঁর রচনায় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আসলে প্রথমেই যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু কামসূত্রে একাধিক পূর্বতন আচার্যের রচনার প্রভাব রয়েছে তাই শুধুমাত্র স্থান-কাল-পাত্রের উদাহরণ দেখে বাৎস্যায়নের জন্ম ও বাসস্থান নির্ণয় করা বেশ কষ্টকর।

বাৎস্যায়ন প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী:

আচার্য বাৎস্যায়ন *কামসূত্র* নামক কামশাস্ত্রের রচয়িতারূপে পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত বলে অন্য কোনো সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়না। কিন্তু এই *কামসূত্রের* সর্বাপেক্ষা প্রচলিত ‘জয়মঙ্গলা টীকা’ অনুসারে একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গবেষণা কাজের ক্ষেত্রে

কিংবদন্তী, জনশ্রুতি এগুলি হয়তো সূত্র হিসেবে সেভাবে মান্যতা পায়না কারণ প্রমানিত না হওয়ার কারণে যুক্তিগ্রাহ্য নয় তবে এইক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। টীকাকার এই ধারনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন-কামসূত্রের প্রণেতা ছিলেন মল্লনাগ।^{১১} তিনি কলিযুগের ২৪২৪ বর্ষে এটি রচনা করেন, অগ্রজ বাভ্রব্যের সংগৃহীত তথ্যাদির পরিবর্তন সাধন করে। এবার শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর মহোদয় আরও বিস্তৃত যে বক্তব্যটি দিয়েছেন সেটি অনুযায়ী সুবিখ্যাত আচার্য চণকের পুত্র মল্লনাগ বাৎস্যগোত্রে জন্মের কারণে বাৎস্যায়ন অভিধায় অভিহিত হতেন। শুধু তাইই নয় তাঁর বেশ কয়েকটি উপাধির উল্লেখ করেছিলেন তিনি যেমন- চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত, দ্রমিল, অংশুল, কৌটিল্য ইত্যাদি^{১২}। ইনিই একাধারে কামসূত্র, নীতিশাস্ত্র আবার শব্দশাস্ত্রের রচয়িতা। এছাড়াও ইনি ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার ছিলেন।

কামসূত্রে বর্ণিত বিবিধ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা:

বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে যৌনতাবিষয়ক যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কামসূত্রে একজন যথার্থ সামাজিক মানুষ (নর-নারী উভয়ের) জীবনযাপনপদ্ধতি অত্যন্ত বিশদে ব্যাখ্যা করা রয়েছে। শিক্ষা-জীবিকা-বিবাহ-দাম্পত্য এবং স্বাভাবিক নিয়মেই পরবর্তী পর্যায়ে যৌনতার প্রসঙ্গ এসেছে। কামসূত্র মূলতঃ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিরিখে রচিত যৌনবিজ্ঞান। কেবলমাত্র বৈবাহিক কারণ বা সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজনে শারীরিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ নয়; দৈহিক সুখ এবং শারীরিক মিলনকে যথাযথ উপভোগ করার জন্য যাবতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বাৎস্যায়ন তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। কামসূত্র পাঠ করার সময় আমাদের যে কথাটি বারবার মনে হয়েছে তা হল, অগ্রজ আচার্যদের বর্ণিত বিষয় তুলে ধরলেও এই গ্রন্থটি কেবলমাত্র একটি সম্পাদিত গ্রন্থ নয়। এতে বাৎস্যায়ন নিজের চিন্তাভাবনা এবং সর্বোপরি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছিলেন। আরও একটি কথা, যদি কেবলমাত্র একটি সম্পাদিত গ্রন্থ হিসেবে এর বিচার করতে হয় তবে এর সম্পূর্ণতার কথাও অবশ্যই বলা প্রয়োজন কেননা এর আগে বিবিধ বিষয় নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা হলেও এইরকম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সেইসময়ে বোধহয় আরেকটি পাওয়া যায়না আর এই কারণেই Havelock Ellis বাৎস্যায়নকে প্রাচ্যের যৌনকলাবিদ্যা বা যৌনবিজ্ঞান বিষয়ের পুরোধা বলে মনে করেছেন।^{১৩}

আমাদের গবেষণা কাজের জন্য নির্দিষ্ট এবং প্রয়োজনীয় অংশটিতে বিশদে প্রবেশ করার আগে বাৎসর্যয়ন তাঁর গ্রন্থে কী কী বিষয় বর্ণনা করেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। বাৎসর্যয়ন সমগ্র গ্রন্থটিকে বিষয়ানুসারী সাতটি অধিকরণে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেকটি অধিকরণ কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধিকরণের নাম- ‘সাধারণাধিকরণম্’। এটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা -শাস্ত্রসংগ্রহম্, ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ, বিদ্যাসমুদ্দেশঃ, নাগরকবৃত্তম্, নায়কসহায়দুতকর্মবিমর্শঃ।

দ্বিতীয় অধিকরণটি ‘কন্যাসম্প্রযুক্তকাধিকরণম্’। এর অধ্যায় সংখ্যা প্রথমটির মতোই পাঁচটি- বরণবিধানম্ ও সম্বন্ধনিশ্চয়ঃ, কন্যাবিস্রুতম্, বালোপমা ও ইঙ্গিতাকারসূচনম্, একপুরুষাভিযোগঃ- অভিযোগতশ্চ ও কন্যায়প্রতিপত্তিঃ এবং বিবাহযোগঃ।

‘ভার্যাধিকারিকাধিকরণম্’-নামক তৃতীয় অধিকরণটি তুলনায় সংক্ষিপ্ত। এটি কেবলমাত্র দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত- একচারিণীবৃত্তম্ ও প্রবাসচর্যহা এবং ‘সপত্নীষু জ্যেষ্ঠাবৃত্তম্, কনিষ্ঠাবৃত্তম্, পুনর্ভূবৃত্তম্, দুর্ভগাবৃত্তম্, আন্তঃপুরুষিকম্, ও পুরুষস্যবহবীভিপ্রতিপত্তিঃ’।

চতুর্থ অধিকরণ ‘বৈশিকাধিকরণম্’। তার অধ্যায়বিভাগগুলি হল- ‘সহায়গম্যাগম্যচিত্তা, গমনোকরণম্, গম্যাপাবত্তনম্’, ‘কান্তানুবৃত্তম্’, ‘অর্থাগমোপায়াঃ, বিরক্তলিঙ্গানি, বিরক্তপ্রতিপত্তিঃ ও নিকাসনক্রমা’, ‘বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানম্’, ‘লাভবিশেষঃ’, ‘অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়বিচারাঃ ও বেশ্যাবিশেষাঃ’।

‘পারদারিকাধিকরণম্’ নামক পঞ্চম অধিকরণের ছয়টি অধ্যায়। যথা- ‘স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপনম্, ব্যাবর্তনকারণানি, স্ত্রীষুসিদ্ধাপুরুষাঃ ও অযত্নসাধ্যায়োষিতঃ’, ‘পরিচয়কারণানি ও অভিযোগাঃ’, ‘ভাবপরীক্ষা’, ‘দূতীকর্মাণি’, ‘ঈশ্বরকামিতম্’, ‘আন্তঃপুরুষিকম্ ও দাররক্ষিতম্’।

ষষ্ঠ অধিকরণ ‘সাম্প্রযোগিতাধিকরণম্’। অধ্যায়ের সংখ্যা এবং বর্ণিত বিষয়ের বিপুল বৈচিত্রে এই অধিকরণটি অন্যান্যগুলির তুলনায় বৃহৎ। এই একটি অধিকরণে সাকুল্যে দশটি অধ্যায় বর্তমান। সেগুলি হোল ‘প্রমাণকালভাবেভ্যেরতাস্থাপনম্ ও প্রীতিবিশেষাঃ’, ‘আলিঙ্গনবিচারাঃ’, ‘চুম্বনবিকল্পাঃ’, ‘নখরদনজাতয়ঃ’, ‘দর্শনচ্ছেদ্যবিধয়ঃ ও দেশ্যোপচারাঃ’, ‘সম্বেশনপ্রকারাঃ ও

চিত্রতানি’, ‘প্রহণনযোগাঃ ও সীৎকৃতক্রমাঃ’, ‘পুরুষায়িতম্ ও পুরুষোপসৃষ্টানি’, ‘ঔপরিষ্টকম্’, ‘রতারম্ভ, রতাবসানিকম্ ও প্রণয়কলহঃ’।

অন্তিম অধিকরণ ‘ঔপনিষদিকাধিকরণম্’; যার অধ্যায় সংখ্যা দুই। যথা- ‘সুভগঙ্করণম্, বশীকরণম্ ও বৃষযোগাঃ’ এবং ‘নষ্টরাগপ্রত্যায়নম্, বুদ্ধিযোগাঃ ও চিত্রযোগাঃ’।

কামসূত্রে বর্ণিত গবেষণা-বিষয়ক (প্রাপ্ত) তথ্যাবলী:

আমরা দেখেছি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায়, ভারতীয় সমাজে ‘গণিকা’-দের স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, সম্মানজনক। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের উপস্থিতি রীতিমত উজ্জ্বল তাঁদের উপস্থিতি যে Sir Richard F. Burton বলেছিলেন - “The details of the domestic and social life of the early Hindoos would not be complete without mention of the courtesan.”^{১৪}

বাৎসর্যায়ন তাঁর কামসূত্রের ‘বৈশিকাধিকরণম্’ শীর্ষক অধিকরণে গণিকাদের আচরণ, তাঁদের বৃত্তি ও সেই সম্পর্কিত যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়, তাঁদের প্রকারভেদ ইত্যাদি আলোচনা করেছিলেন। যদিও সমগ্র কামসূত্র গ্রন্থেই আমাদের গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ রয়েছে আর সেকারণেই আমাদের আলোচনা কেবলমাত্র ‘বৈশিকাধিকরণম্’ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রথম অধিকরণটি ‘সাধারণমধিকরণম্’ নামে পরিচিত। কামসূত্রের বর্ণিত বিষয়গুলির সামগ্রিক আলোচনা এখানে রয়েছে এবং এই অধিকরণেই প্রথম ‘বৈশিক’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- “তদেবপুনরধ্যর্ষ্বেনাধ্যায়শতেন ‘সাধারণ’- ‘কন্যাসম্প্রযুক্তক’ ‘ভার্যাধিকারিক’- ‘বৈশিক’ - ‘পারদারিকাদিকরণম্’ ‘সাম্প্রয়োগিকৌপনিষদিকৈঃ সগুভি-রবিকরণৈরবাস্যঃ পান্থগলঃ সন্ধিক্ষেপ।।”^{১৫}

‘বৈশিক’ নামক অধিকরণটিতে বেশ্যা ও তাঁদের সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে- “বেশ্যাবিশেষাশ্চ..”^{১৬}।” বাস্তব্য যে অধিকরণ বিভাগ করেছিলেন তাতে বর্ণিতব্য সাতটি বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে কিন্তু পাটলিপুত্রনগরের অধিবাসী দত্তকাচার্য তার চতুর্থ অধিকরণটি নিয়ে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গণিকাবৃত্তি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ‘বৈশিকাধিকরণম্’-এর মূল আলোচ্য বিষয় হল, এই বৃত্তি এবং বৃত্তিঅবলম্বনকারিণীদের সম্বন্ধীয় যাবতীয় আলোচনাযোগ্য তথ্যাবলীর বিস্তারিত বর্ণন। বিশদ বর্ণনার জন্য তিনি যেমন পূর্বাপর

অধিকরণগুলিকে কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন তেমনি আলোচ্য অধিকরণটিকে ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন এবং প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

‘বৈশিকাধিকরণম্’ এর অধ্যায়গুলি হল-

প্রথমোধ্যায়ঃ - সহায়গম্যাগম্যচিন্তা, গমনোকরণম্, গম্যাপাবর্তনম্।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ - কান্তানুবৃত্তম্।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ - অর্থাগমোপায়াঃ, বিরক্তলিঙ্গানি, বিরক্তপ্রতিপত্তিঃ ও নিক্ষাসনক্রমাঃ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ - বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানম্।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ - লাভবিশেষঃ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ - অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়বিচারাঃ ও বেশ্যাবিশেষাঃ।

‘দেহোপজীবিনী’ অর্থাৎ দেহ যাঁদের জীবনযাপনের মাধ্যম। এই অধিকরণটি বাৎস্যায়ন সম্পূর্ণভাবে এই দেহোপজীবিনীদের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন।

‘বৈশিক’-এই পদটির অর্থ হল- ‘বেশ্যাসম্বন্ধী’, ‘বেশ্যাবৃত্তি’ অর্থাৎ যাঁরা এই বৃত্তি অবলম্বন করেছেন তাঁদের সম্পর্কিত আলোচনা।

প্রতিটি অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করলে আমাদের কাছে তৎকালীন চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

প্রথমঅধ্যায়ের শীর্ষক- ‘সহায়গম্যাগম্যচিন্তা, গমনোকরণম্, গম্যাপাবর্তনম্’। এর পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির বক্তব্য বিষয় আগে আলোচনা করা হয়েছে, এবার এই প্রসঙ্গক্রমেই বাৎস্যায়ন এই বিষয়টিতে প্রবেশ করেছেন। এই পেশা বহু প্রাচীনকাল থেকেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সমাজে বিদ্যমান। এই পেশা বা পেশাবলম্বনকারী নারীদের অস্বীকার করা কোনো উপায় কোনোভাবেই এই সমাজের নেই; এতোটাই জোরালো এঁদের উপস্থিতি।

‘গণিকা’- কাদের বলা যেতে পারে? *নাট্যশাস্ত্রে* আচার্য ভরত তার উত্তর দিচ্ছেন-

‘রূপগুণশীলযৌবনসুবর্ণমাল্যভরণৈঃ সংপন্না।

বিশদা স্নিগ্ধা মধুরা পেশলবচনশুভরজকণ্ঠী চ।। ৮৪।।

যোগ্যায়ামক্ষুভিতা লয়তালজ্জা রসৈশ্চ সম্পন্না।

সর্বাভরণসংযুক্তা গন্ধমাল্যোপশোভিতা।। ৮৫।।

এবংবিধগুণৈর্যুক্তা কর্তব্য নায়িকা তজ্জৈঃ।” ২৩৪

যদিও এই শ্রেণীর মেয়েদের বহু অভিধায় অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে ‘গণিকা’র স্থান সর্বাপেক্ষা উঁচুতে, অনেক বেশি সম্মানজনক। কিন্তু বাৎস্যায়ন কিন্তু ‘গণিকাধিকরণম্’ প্রয়োগ করেননি পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছেন ‘বৈশিকাধিকরণম্’। তাঁর অধ্যায় শুরু হয়েছে ‘বেশ্যানাং...’-এই পদটি দিয়ে কারণ এই অধ্যায়ে তিনি সর্বপ্রকার দেহপশারিনীদের কথাই বলেছেন।^{১৭}

এই অধ্যায়টিতে তিনি মূলতঃ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন যথাক্রমে, সহায়গম্যাগম্যচিন্তা, গমনোকরণম্, গম্যাপাবর্তনম্।

রতিফল বা যৌনপরিতৃপ্তি নারী এবং পুরুষ উভয়ের সমান হলেও যখন সেই নারী-পুরুষের মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকা অথবা স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের পরিবর্তে একজন বেশ্যা ও একজন পুরুষের মধ্যবর্তী সম্পর্ক হয় তখন প্রয়োগকর্ত্রী হয়ে থাকেন সেই বেশ্যারমণী। প্রয়োগে অধিকার সেই বেশ্যার হয়ে থাকে তাঁর কারণ এটি তাঁর জীবিকা।

এখানেই অন্যান্য কামজসম্পর্কের সঙ্গে বেশ্যার সাথে কাম-সম্পর্কের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে সেই রমণীর পেশা অর্থাৎ আর্থিক সম্বন্ধ নির্মিত হচ্ছে। ‘অর্থ’ হল এই সম্পর্ক তৈরি হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ আর ঠিক সেই কারণেই বাৎস্যায়ন এইধরনের সম্বন্ধকে বলেছেন –‘রতিতং প্রবর্তনং স্বাভাবিকং কৃত্রিমমর্থার্থম্’।^{১৮} পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাৎস্যায়ন বলেছেন অর্থের জন্য যে কামপ্রবৃত্তির উদ্ভব হয় সেটি কৃত্রিম, অস্বাভাবিক। ঠিক তারপরেও শিক্ষক তথা অভিভাবকতুল্য ভঙ্গিমায় তিনি এটিও বলেছেন বা বলা ভালো তিনি যেন নতুন যাঁরা এই পেশায় আসবেন তাঁদের শেখানোর উদ্দেশ্যে বলেছেন, কৃত্রিম হলেও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মতোই অনুকরণ করবেন –“স্বাভাবিকদ্রুপয়েৎ...”।^{১৯}

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ‘রূপয়েৎ’-এই পদটি। যার অর্থ হল অনুরূপ আচরণ করা। রূপের আরোপ করা হলে তাকে রূপক বলে; নিজস্বতা ত্যাগ করে অন্যের মতো হওয়ার অভিনয় বা অনুকরন। অধ্যায়ের সূচনাতেই বাৎস্যায়নের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বেশ্যাদের চরিত্রের একটি দিক আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে-তারা কাম এবং প্রেমের অভিনয় করেন, অর্থের জন্য। অভিনয়ের মাধ্যমে একটি কৃত্রিম বিষয়কে, একটি কৃত্রিম মনোবৃত্তিকে স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন করেন। প্রথমেই যেন বলা হচ্ছে এই বৃত্তিটি প্রবঞ্চনার নামান্তর এর মধ্যে সামাজিকদের প্রবঞ্চিত করার একটি প্রবণতা লক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ঠিক পরেই তিনি যে কথাগুলি বলেছেন তাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জীবিকানির্বাহের জন্যই এই মিথ্যাচারের আশ্রয় নেওয়া কেননা পুরুষ মাত্রেই কামাতুরা নারীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবোধ করে থাকে, সেই কারণে নিজের যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষাকে, ইচ্ছাকে অভিনয় করে প্রদর্শন করতে হবে-“.....কামপরাসু হি পুংসাং বিশ্বাসযোগাৎ।”^{২০} S.C. Upadhyay তাঁর অনূদিত *Kamasutra of Vatsayana* গ্রন্থে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছেন-

“Sutra 1- The courtesans court their paramours partly for physical pleasure but basically for their own livelihood.

Sutra 2-3 – The first of these is a natural instinct, but the second is certainly not natural, yet they have to make it appear natural.

Sutra 4 – Men become attached to those courtesans who are attractive towards them physically since they inspire a feeling of confidence in them.”^{২১}

এরপরে তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন

“The courtesan must make an effort to impress upon him the fact that her love for him is genuine and not a means to satisfy her want. (Sutra 5)”^{২২}

অর্থাৎ গণিকাবৃত্তি যে বস্তুতঃ অভিনয়নির্ভর সেকথাই বলা হয়েছে। অর্থোপার্জনের জন্য তারা প্রেমের অভিনয় করে থাকেন। এরপরের অংশটিতে বাৎস্যায়ন বুঝিয়ে দিয়েছেন বেশ্যার প্রকৃত সামাজিক অবস্থান। কিভাবে? তিনি বলছেন-“পণ্যসধর্মত্বাৎ’-বেশ্যার স্থান আসলে পণ্যের মতোই।^{২৩} বিক্রয়যোগ্য জিনিসকে সাধারণের সামনে সাজিয়ে রাখা বিক্রেতার কর্তব্য যাতে ক্রেতা সেই জিনিসটি কেনার আগে তুল্যমূল্য বিচার করে নিতে পারেন। ঠিক সেভাবেই বেশ্যারাও নিজেদের সজ্জিত করে পণ্যের মতোই নিজেদের উপস্থাপন করবেন যাতে কোনো ক্রেতা পুরুষ বিভিন্ন জনের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠজনকে বেছে নিতে পারেন। বেশ্যা মাত্রেই সমাজের নির্ধারিত

নিয়মে যেন পণ্য কিন্তু প্রাণহীন পণ্য আর জীবিত রক্তমাংসের নারীশরীরের মধ্যে তো পার্থক্যও আছে,তাই তাঁকে সবসময় অলঙ্কারাদি পরে সাজ-সজ্জা করে প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে তারও শর্ত রয়েছে। নিজের বাসগৃহ থেকে রাজপথ দেখার সময় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশিত করে দেবেননা কারণ মানুষ স্বভাবজ প্রবৃত্তির বশে অচেনা,অজানা কিংবা অর্ধপরিচিত ব্যক্তি ও বিষয়ের প্রতি তুলনামূলকভাবে বেশি আকর্ষণ বোধ করে। এখানে বাৎসর্যায়ন মানুষের বিশেষ করে পুরুষের স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে গণিকারা সাধারণতঃ নিজেদের বাসগৃহের দরজা, জানালা অথবা বারান্দায় সাজসজ্জা করে অপেক্ষা করতেন।

কিন্তু শুধুমাত্র সাজসজ্জা বা ক্ষণিকের দর্শন দিয়েই তাঁদের কার্যসিদ্ধি হয়না আর তাই প্রয়োজন হয় ‘সহায়’-এর। এই সহায় বা সহায়কের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন বাৎসর্যায়ন- “ত্বারক্ষকপুরুষা ধর্মাধিকরণস্থা দৈবজ্ঞা বিক্রান্তাঃ শূরাঃ সমানবিদ্যাঃ কলাগ্রাহিণঃ পীঠমর্দবিটবিদূষকমালাকারগান্ধিকশৌণ্ডিকরজকনাপিতভিক্ষুকান্তে চ তে চ কার্যযোগাৎ।”^{২৪} এঁদের প্রয়োজন কী? এঁরা এমন কিছু পেশার সাথে যুক্ত যার সাথে কোনো না কোনো ভাবে বেশ্যাবৃত্তির যোগাযোগ রয়েছে। যিনি পেশাগত দিক দিয়ে সহায়তা দান করেন তাঁকেই ‘সহায়’ বলা হয় যেহেতু তাঁর সাহায্যেই জীবনধারণ সম্ভব হচ্ছে। বেশ্যার ক্ষেত্রে এই সহায়দের কাজ একটু অন্যরকম, এঁরা নিজেরা সরাসরি অর্থসাহায্য করেননা পরিবর্তে নায়ক অর্থে ক্রেতা আনার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। বিপদে উপকার করেন। কোনো বেশ্যার নির্দিষ্ট ক্রেতা বা গ্রাহক পুরুষটি যাতে অন্য বেশ্যাসক্ত হয়ে না পরে তার জন্য যত্নবান হয়ে থাকেন, দরকারে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন এছাড়াও যেসকল পুরুষ বেশ্যালয়ে যেতে ইচ্ছুক তাঁদের উপযুক্ত সমাদর করে নিয়ে আসা আর পরিস্থিতি অনুযায়ী নায়িকা অর্থাৎ বেশ্যাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেও সক্ষম এঁরা। S.C. Upadhyaya আরও বলেছেন-“.....and in case she is overpowered by those who approach her, they should be able to save her.”^{২৫} প্রকৃতপক্ষে এঁরা সদর্থক অনুঘটকের কাজ করে থাকেন, যাঁদের সাহায্যে একজন বেশ্যা ও তাঁর ক্রেতা ব্যক্তিটির মধ্যে সম্বন্ধ তৈরি হয়, প্রায় সব অর্থেই তাঁরা ‘সহায়’ হয়ে থাকেন।

এরপরে যে বিষয়টি নিয়ে বাৎসর্যায়ন বর্ণনা করেছেন সেটি হল ‘গম্য’ ও ‘অগম্য’ পুরুষের তালিকা। কোন কোন পুরুষের গম্য তার একটি তালিকা দিয়েছেন তিনি। ‘গম্য’ অর্থে গমনীয়, যে পুরুষের সাথে সম্পর্ক অর্থসিদ্ধিকর তিনিই গম্য।

যদিও ‘গম্য’ পুরুষকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং সেই বিভাগটি হয়েছে প্রাপ্তির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে –

ক) অর্থসিদ্ধিকর- যাঁদের থেকে অর্থলাভ নিশ্চিত। এর আবার কতোগুলি উপবিভাগ রয়েছে-

- স্বাধীন পুরুষ যারা (যাঁদের কোনধরনের বন্ধন নেই),
- যুবক
- অল্প বয়স থেকে ধনবান অর্থাৎ ধনের জন্য তাঁরা কারো উপর নির্ভরশীল নন।
- যাঁরা অবগতবৃত্তি, উত্তরাধিকারে ধন লাভ করেছেন অর্থে পুরুষানুক্রমিক ধনবান এমন ব্যক্তি।
- রাজকর্মচারী
- স্পর্ধাস্থিত কোন পুরুষ
- যাঁর আয় নিরবিচ্ছিন্ন,
- নিজেকে রূপবান মনে করেন এমন পুরুষ
- আত্মপ্রশংসাকারী ব্যক্তি,
- শারীরিক ভাবে অক্ষম অর্থাৎ যৌন সম্পর্কস্থাপনে অক্ষম এমন পুরুষ,
- প্রবল দুর্ভাগ্যেও যিনি অবিচল থাকেন, স্থির এবং নিজের ভাগ্যে বিশ্বাসী,
- কুল-ধন-মান অথবা বিদ্যা এগুলির মধ্যে যেকোনো একটিকে আশ্রয় করে থাকে; সেই সমানস্পর্ধী ব্যক্তি,
- যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ দানশীল,
- গ্রাহ্যবচন যে অর্থাৎ যাঁর কথা রাজা, মন্ত্রী প্রমুখ উচ্চপদস্থ কর্তা ব্যক্তির শোনে,
- এমন কিছু পুরুষ থাকে যাঁরা মনে করেন ধননাশ কেবলমাত্র কপালে থাকলে বা দৈব কারণবশতঃ হয়; উপভোগের দ্বারা ধননাশ হয়না।

এছাড়াও আরও কয়েকজনের কথা উল্লেখ করেছেন বাৎসায়ন। যেমন-

- ধনের প্রতি মমত্বহীন ব্যক্তি,
- যাঁর উপরে কোন গুরু বা বয়ঃজ্যেষ্ঠের সান্নিধ্য নেই ফলে তাকে উচিত-অনুচিতের শিক্ষা দেওয়ার কেউ নেই।
- যে সন্ন্যাসীর কামনা প্রশমিত হয়নি,
- বিভবান যুদ্ধকুশলী ব্যক্তি
- চিকিৎসক কারণ তিনি অর্থবান না হলেও প্রয়োজনে চিকিৎসা বিষয়ক সহায়তা দিতে পারবেন।
- পূর্বপরিচিত ব্যক্তি।^{২৬}

খ) অপরপক্ষ এমন ব্যক্তিদের সংসর্গ করার কথা বলা হয়েছে যাঁরা গুণী। ফলে বেশ্যাদের বিবিধ গুণের মর্যাদা রাখা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব হয় আর সেই কারণেই গুণবানের সাহচর্যে প্রীতি ও যশ প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

এই অংশটি থেকে একথা পরিষ্কার যে গণিকামাত্রেরই কেবলমাত্র অর্থপ্রত্যাশী নন; কিছু কিছু বেশ্যা যশ-প্রীতির মুখাপেক্ষী ছিলেন। সেইসব পুরুষদের তালিকাও বাৎসায়ন দিয়েছিলেন *কামসূত্রে*।

‘নায়িকা’-এই অভিধায় বেশ্যাদের অভিহিত করেছেন বাৎসায়ন। তিনি তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী ব্যক্ত করেছেন-

“নায়িকায়াঃ পুনা রূপযৌবনলক্ষণমাধুর্যযোগিনী গুণেষবনুরক্তা ন তথার্থেষু প্রীতিসংযোগশীলা স্থিরমতিরেকজাতীয়া বিশেষার্থিনী নিত্যমকদর্যবৃত্তিরগোষ্ঠীকলাপ্রিয়া চেতি।^{২৭}

এই তালিকা থেকে যে গুণগুলি জানা যায় সেগুলি হল- রূপযৌবনশালিনী, মাধুর্যলক্ষণযুক্তা এমন এক নারী যাঁর অর্থে আকর্ষণ নেই কিন্তু নানাবিধ গুণে অনুরাগ রয়েছে। যে প্রীতিপূর্ণা, স্থিরমতি অর্থাৎ যে বহুবল্লভা নয়। যেকোন বস্তুতে তাঁর মোহ থাকবেনা; থাকবে কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি। অকদর্যবৃত্তি এবং গোষ্ঠীকালানুরাগ থাকবেই। আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ‘নায়িকা’র লক্ষণে বলেছেন-

“অস্থানহাসিনী রূক্ষা আবিদগতিচেষ্টিতা।।৮৬।।

দীর্ঘরোষা চ দীনা চ তথোদ্ধতোড়টা সদা ।

এবংবিধা (ত্ব) কর্তব্য প্রেক্ষায়াং প্রকৃতিবুধৈঃ ॥৮৭॥”

নায়ক-নায়িকার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে বাৎস্যায়ন বলেছেন।

‘গম্য’এর আলোচনার পরে স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে ‘অগম্য’-এর প্রসঙ্গ। সমাজ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বেশ্যা হল ‘সাধারণ্য’ অর্থাৎ সর্বসাধারণের উপভোগ্য। কিন্তু যা স্বাভাবিক তারও কিছু ব্যত্যয় থাকে। এই অংশটি তার উদাহরণ বলা যেতে পারে। একজন বেশ্যা রমণীর কাছে কোন কোন পুরুষ ‘অগম্য’ তার তালিকা দিয়েছেন বাৎস্যায়ন- “ক্ষয়ী রোগী কৃমিশ কৃদ্বায়সাস্যঃ প্রিয়কলত্রঃ পরুষবাক্কদর্যো নির্ঘৃণো গুরুজনপরিত্যক্তঃ স্তেনো দম্ভশীলো মূলকর্মাণি প্রসক্তো মানাপমানয়োরনপেক্ষী দ্বৈষ্যৈরপ্যর্থহার্যো বিলজ্জ ইত্যগম্যঃ।”^{২৮} অর্থাৎ যক্ষ্মারোগী, কুষ্ঠরোগী, যে পুরুষের সঙ্গে মিলনমাত্রেই গর্ভাধান হয় সেইরকম পুরুষ, দুর্গন্ধমুখমণ্ডলযুক্ত, ভেদাভেদ জ্ঞানহীন ভাবে যে কোনো স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় যে পুরুষ আবার যে নিজের স্ত্রীকে যে পুরুষ ভালোবাসে, যে পুরুষ বাক্যের প্রয়োগকারী, যে গুরুজনের স্নেহচ্ছায়া বঞ্চিত, তক্ষর তথা অহংকারী আবার বশীকরণাদিতে দক্ষ,আত্মসম্মানহীন,লজ্জাহীন এবং সর্বোপরি অর্থের লোভ যাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও দুর্বলচিত্ত করে দিতে পারে এমন সমস্ত ব্যক্তি অগম্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

উপরের এই তালিকাটি শুধুমাত্র যে অগম্য পুরুষের তালিকা তা নয়, বাৎস্যায়ন অত্যন্ত সুচতুর ভঙ্গীতে এই তালিকাটির মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিক এবং আইনগত কিছু চিত্র স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সেই যুগে সমাজে এইসকল ব্যক্তিদের বেশ্যাসঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল এমনকি আইনগত বিধিনিষেধ থাকাও বিচিত্র নয়।

এরপরে বর্ণিত হয়েছে অভিগমনের কারণসমূহ যার তালিকা বিস্তৃত। তালিকাতে বলা হয়েছে- স্বভাবজাত অনুরাগ, কোনোরকম বশীকরণাদিতে ভয়,আর্থিক লাভ, কোনো অন্য বেশ্যার সাথে প্রতিস্পর্ধা , পণ্ডিত ব্যক্তির পাণ্ডিত্যবিচার করার ছলে আবার আশ্রয়হেতু অভিগম। কখনো বা আশ্রয়, পরিশ্রম (নিরন্তর অভ্যাস রাখা),দরিদ্র বিদ্বানব্যক্তির সাথে সম্প্রয়োগ ‘ধর্ম’ নামে কথিত হয়ে থাকে। বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট তিথিতে অভিগমনের ফলে বিশেষ যশ লাভ হয়ে থাকে। কোন

দয়াপ্রার্থী পুরুষের প্রতি দয়াহেতু কামদান অথবা কোনো বন্ধুর(সুহৃদবচন) প্রণয়ীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া কিংবা গুরুস্থানীয়ের ক্ষেত্রে লজ্জাহেতু অভিগমন। প্রিয়দর্শন ব্যক্তি, ধনবান ব্যক্তি ও পুণ্যবান ব্যক্তির সাথে সম্পর্কে সমফল লাভের আকাঙ্ক্ষাহেতু অভিগমনেচ্ছা। আচম্বিত কামাবেগ প্রশমিত করার কারণে যেকোনো পুরুষের সাথে শয়ন- এগুলি সবই বাৎস্যায়নের পূর্ববর্তী অগ্রজেরা স্বাভাবিক বলেছেন। এছাড়াও স্বজাতি, প্রতিবেশী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির অভিগমনের ফলে যেহেতু গণিকার নিজের নানাপ্রকার উন্নতি সাধনসম্ভব হয়ে থাকে তাই সেগুলি অভিগমনের কারণ রূপে গ্রাহ্য হবে। যদিও পরবর্তী সময়ে বাৎস্যায়ন কিছুটা সরলীকরণ করেছিলেন, তাঁর মতে অভিগমনের মুখ্য কারণ হল অর্থপ্রাপ্তি, কোনরকম বিপদের(শারীরিক বা আর্থিক) দূরীকরণ এবং প্রীতিবোধ (জনৈক ব্যক্তির প্রতি প্রেম)- এই তিনটিই অভিগমনের আসল কারণ যদিও তার মধ্যেও অর্থই মূল- ‘অর্থস্তু প্রীত্যা ন বাধিতঃ। অস্য প্রাধান্যং’।^{২৯} “Vatsyayana decides that desire of wealth, freedom from misfortune, and love, are the only cause that affect the union of courtezans with men.”^{৩০}

কিন্তু এইখানে আরও যে বিষয়টি বিশদে বলা হয়েছে-“Now a courtesan should not sacrifice money to her love, because money is the chief thing to be attended to. But in cases of fear, etc, she should pay regard to strength and other qualities.”^{৩১} যে কোনো পরিস্থিতিতেই ‘অর্থলাভ’ করাই যেন গণিকাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় কারণ সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের জন্য অর্থই প্রয়োজন।

এই অধ্যায়ের শেষ পর্যায়টির নাম ‘গম্যোপাবর্তনম্’। এই অংশে মূলতঃ বেশ্যাদের কার্যাবলী, তাঁদের কাজের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নায়ক নিজে কামপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হলেও প্রথমেই সেই প্রস্তাবে রাজি হওয়া উচিত নয় কেননা পুরুষেরা সহজলভ্য বিষয়ে আকর্ষণ বোধ করেননা; পুনরায় পুরুষ-মনস্তত্ত্বের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। একজন গণিকাকে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছেন বাৎস্যায়ন। পরিচারক- গাত্রসংবাহক-গায়ক বা বিদূষক প্রমুখকে নিযুক্ত করে গম্য নায়ক সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে পীঠমর্দ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করবেন এবং নায়কের

শৌচাদি,রাগ,আগ্রহ-অনাগ্রহের বিষয়বস্তু, তার ক্ষমতা-অক্ষমতা,দান ইত্যাদি বিষয় জানবেন।
এগুলি জানার কারণ হল সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার গ্রহণ।

নায়ক-নায়িকা উভয়ে উভয়ের গৃহে যাতায়াত করবেন;সঙ্গী হবেন পীঠমর্দ।কিন্তু এই যাতায়াতের মাধ্যম বা উপায় কী হবে? তার উত্তরে অনেকগুলি পদ্ধতি বলা হয়েছে যেমন কুক্কট-মেষযুদ্ধ,শুকসারির আলাপ,নাটক বা অভিনয়ের হেতু আবার কোনপ্রকার কলাচর্চায় দুজনেরই আকর্ষণ ইত্যাদি। আবার কোনো বিশেষ দ্রব্য সাধারণের ভোগের জন্য নয় কেবলমাত্র নায়কেরই ভোগের যোগ্য এইরূপ ব্যবহার করে স্বয়ং নায়ককে দেবেন। কোনো বিশেষ কাব্য অথবা কলাসম্প্রদায়ের প্রতি তিনি আসক্ত বুঝে সেই কাব্যের পাঠ-প্রশংসা বা সেই কলার চর্চা করবেন। এছাড়াও সেই গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা,মালা-তাম্বুল ইত্যাদি উপাচার দ্বারা নায়কের মনোরঞ্জন্যের ব্যবস্থা করা। নায়কের গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময়ে উপহারসামগ্রী চিহ্নস্বরূপ দেওয়া কিংবা দাসী বা সখীকে পাঠাবেন যিনি বুদ্ধিমতী, বাকপটু ও কৌতুকপ্রিয় হবেন। এছাড়াও কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের অছিলায় গণিকা স্বয়ং নায়কের সঙ্গে নেবেন কিন্তু সেই সব পরিস্থিতিতেও তাঁর সঙ্গে পীঠমর্দের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

এরপরের পর্যায়ে বলা হয়েছে নায়ক নায়িকার গৃহে উপস্থিত হলে প্রথমে নায়িকার পরিচারিকা নানা উপকরণ নিয়ে বারবার আসা যাওয়া করবে,তবে নায়িকা কখনো কখনো সেইখানে উপস্থিত হবেন। এর দ্বারা নায়কের অপেক্ষা এবং তৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে।

বাৎস্যায়ন এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রচলিত শ্লোকের উল্লেখ করেছেন- যার মূল নির্যাস হল পূর্বোক্ত বস্তুসমূহের আদানপ্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যদি প্রকৃত প্রণয় উৎপন্ন হয় তাহলে সবথেকে ভাল অন্যথায় কৃত্রিমভাবে উত্তরীয় ও অঙ্গুরীর আদানপ্রদান করা কর্তব্য। অন্তিমে সম্প্রয়োগের ইঙ্গিত নিজেই দিতে হবে; এইক্ষেত্রটিতে অন্যের দ্বারা প্রয়োগে নিষেধ রয়েছে। গম্য নায়ককে নিজের গৃহে রাত্রিবাস করিয়ে তাকে সম্পূর্ণ মাত্রায় তৃপ্ত করাই প্রধানতম উদ্দেশ্য।

এই পর্যায়ে আচার্য বাৎস্যায়ন যে আলোচনা করেছেন তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে একজন গণিকাকে যেমন চৌষটি কলাবিদ্যার অভ্যাস করতে হতো ঠিক সেইরকম ভাবেই কোনো পুরুষকে

কী করে আকর্ষিত করতে হবে, তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং ধীরে ধীরে কীভাবে তাঁকে নিজের বশে আনতে হবে- এই বিষয়গুলি রীতিমত অভ্যাস করতে হয়। শুধু তাইই নয় এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়িত করা একা গণিকার পক্ষেও সম্ভব হয়না তাই পারিপার্শ্বিক ও সহায় ইত্যাদির সাহায্য নিতেই হয় অতএব এই বৃত্তি কিছুটা হলেও দলবদ্ধ প্রয়াস বলা যেতেই পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম ‘কান্তানুবৃত্তম্’, যার অর্থ কান্তা বা পত্নীর ন্যায় অনুবৃত্তি বা আচরণ অর্থাৎ যিনি পত্নীর মত ব্যবহার করবেন। Hindoo Kama Society এর সংস্করণে^{৩২} এবং S.C. Upadhyay^{৩৩} এরই অনুবৃত্তি করেছেন।

অর্থাৎ গম্য নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে একজন গণিকা একচারিণী, পতিব্রতা পত্নীর মত আচরণ করবেন। যদিও সেই আচরণ সম্পূর্ণভাবেই কৃত্রিম, পরিকল্পিত হবে যাতে পুরুষটির মনে তাঁর (গণিকা) সম্পর্কে এই বিশ্বাস জন্মায় যে তিনি একান্তভাবেই প্রেমপূর্ণা।

এই অধ্যায়টিতে নায়িকার নির্দিষ্ট কাজের কথা বলা হয়েছে। তাঁর কর্তব্য ও অকর্তব্য, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। যদি নায়িকা(এখানে বেশ্যা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে) একচারিণী হয়ে থাকেন তবে নায়কের মনোরঞ্জনের কারণে তিনি একচারিণী ব্রত করবেন। কিন্তু যদি একমুখী না হন তবে নায়কের অনুকূল ব্যবহার ও আচরণ করলেও কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ একজনের প্রতি তিনি আসক্ত হবেননা।

এই পেশাবলম্বিনীদের জীবনযাপনে তাঁদের মা বা মাতৃস্থানীয় কোন চরিত্রের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। যদি নিজের মাতা থাকেন তাহলে তিনি অন্যথায় কোন মাতৃস্থানীয় মহিলা তাঁর অভিভাবকের ভূমিকা নিতে থাকেন। এই ‘মাতৃস্থানীয়া’ মহিলা জীবনের পূর্বভাগে হয়ত একই বৃত্তিভোগী ছিলেন তাই নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে তিনি পরবর্তী প্রজন্মকে সেইমত চালনা করে থাকেন, আচারব্যবহারাদি যথাযথভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। স্বভাবে স্বার্থপর, অর্থলোভী ও দ্রুতপ্রকৃতির মায়ের অধীন হয়ে থাকবেন নায়িকা। স্বভাবগত কারণের জন্য তিনি নায়কের পছন্দসই হবেন না। কিন্তু শুধু তো স্বভাবহেতু অপছন্দের তালিকায় থাকবেন তাইই নয়; তাঁর কাজের জন্য

নায়কের অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি উৎপাদন করবেন। মাতৃস্থানীয়া সেই রমণীর কাজের কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন- জোর করে নায়িকাকে এক নায়ক থেকে অন্য নায়কের দিকে চালিত করা। যদিও এই ধরনের আচরণের অনেকাংশেই অভিনয় এবং তার পরবর্তী ধাপগুলি নায়িকাই অভিনয় করে থাকেন। মায়ের এরকম ব্যবহারে অতিরিক্তমাত্রায় দুঃখিত-লজ্জিত-ভয়ের সাথে সাথে একরকম বৈরাগ্য দেখা দেবে তাঁর আচরণে যাকে বাৎসর্যয়ন ‘অরতি’ বলেছেন* কিন্তু মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। কখনো কখনো সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটি ব্যাধির কথা নায়ককে জানানো, যাতে মায়ের শাসন অতিক্রম করে নায়কের অভিগমন করতে না হয়। যদিও এই ধরনের কাল্পনিক ব্যাধির উল্লেখ করার কারণ হল অন্য নায়কের সাথে সম্পর্ক স্থাপন-^{৩৪} বিশদে বলছেন (As she is under orders to go to another lover) this pretended illness becomes sufficient cause for not uniting with her previous lover. (S.C Upadhyay 7/209)

অদর্শনের সময়েও নায়কের ব্যবহৃত মালা-তাম্বুল প্রভৃতি প্রসাদরূপে পাওয়ার জন্য গণিকা নিজের কোনো সখী বা চেটীকে পাঠাবেন কিন্তু এইধরনের আচরণের কারণ কী? আমাদের মনে হয়েছে এর কারণ হল যেহেতু তিনি নায়কের কাছে উপস্থিত হতে অপারগ তাই কোনোভাবে নায়কের সঙ্গে সংযোগ রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য যাতে দীর্ঘকালীন অদর্শনে নায়কের মন থেকে তাঁর উপস্থিতি মুছে না যায় বা অন্য নায়িকা সেই স্থানটি দখল করে নিতে না পারে। নায়ক যেন মনে করেন যে তিনি (গণিকা) তাঁকে অত্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও স্মরণ করছেন ফলে নায়কের মনে নায়িকা সম্পর্কে সদর্শক অনুভূতি জন্ম নেয়।

সম্প্রয়োগের কালে নায়ক আনুষঙ্গিক যে যে দ্রব্যাদি দেবেন সেগুলি যত সাধারণ বা যত সামান্যই হোক না কেন তা নায়িকার কাছে অমূল্য উপহার এরকম ব্যবহার করবেন। নিজে চতুঃষষ্টি কলায় পারঙ্গম হলেও যে ধরনের কলাবিদ্যায় নায়ক নিপুণ তা শেখায় উদ্যোগী হবেন আর বারবার অভ্যাস করবেন, নায়কের পটুত্ব স্বীকার করবেন। এছাড়া নায়কের যাতে আনন্দ হয় তার নিরন্তর চর্চা করবেন। এইসব কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হল নায়কের কাছে নিজেকে একমুখী প্রেমসীরূপে

প্রতিপন্ন করা যাতে নায়ক মনে করেন যে, তিনি(গণিকা) নায়কের আনন্দবিধানের জন্য নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে বাৎস্যায়ন যে তথ্যটি নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটি একটু অন্যরকম। আগেই বলা হয়েছে এই গ্রন্থটিতে বেশ্যাদের করণীয় বিষয়াদি বর্ণিত রয়েছে। বাৎস্যায়ন বলছেন নিজের শরীরে যে যে অঙ্গবৈরূপ্য রয়েছে সেগুলি প্রদর্শন করবেননা কিন্তু সবসময় নায়কের অভিমুখেই শয়ন, তাঁর মুখদর্শন করা কর্তব্য। যদি নায়ক গোপনাস্প স্পর্শে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তাহলে বাধা না দেওয়াই বিধেয়।

নায়ককে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা তাঁর অবশ্যকর্তব্য। এমনকি পথ দিয়ে যাওয়ার সময়েও তিনি নিজের বাড়ি থেকে নায়কের যাত্রা পথের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। যদি তিনি নায়কের দৃষ্টিগোচর হয়েও পড়েন তাহলে লজ্জিত হওয়ার, ধরা পড়ে যাওয়ার ভাণ করবেন।^{৩৫}

তাঁর উদ্বেগের বিষয়ে নজর রাখা,চিন্তাশ্রিত হওয়া ইত্যাদি অবশ্যকর্মের মধ্যে পড়বে। নায়কের প্রিয় বিষয়ে আকর্ষণ তথা প্রীতি আর অপছন্দের বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ তাঁর স্বাভাবিকভাবেই আচরণে প্রকাশ পাবে। নায়কের অনুসারী ব্যবহার হবে তাঁর। অন্য রমণীর প্রতি তাঁর কান্ড অনুরক্ত কিনা সেই তথ্যসংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করবেন। স্বপ্ন সময়ের জন্য হলে ছদ্মকোণ প্রদর্শন করা,স্বয়ংকৃত দন্ত-নখের ক্ষত অন্যে করেছে বলে আশঙ্কিত হওয়া।^{৩৬} এই ধরনের ব্যবহারের কারণ, নিজেকে নায়কের কাছে অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন করা।

নিজমুখে সম্প্রয়োগের বা অনুরাগের কথা না বললেও মন্ত বা সুগ্ভাবস্থায় তা প্রকাশ করবেন। নায়ক জনহিতকর কাজ করলে সেই কথা বারবার বলে সেই কীর্তির কথা বলবেন। নায়কের বক্তব্যের বাক্যার্থগ্রহণ, তাঁর রুচি অনুযায়ী নিজের রুচির গঠন, নায়কের প্রশংসা করা, স্নেহপ্রবণ নায়কের কথার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রভৃতি। কিন্তু সপত্নী প্রসঙ্গে ঈর্ষাকাতরতা দেখানো কর্তব্য। তাঁর পীড়াদি না হওয়ার কামনা করা, তাঁর সাথে কারো তুলনা করা অকর্তব্য আবার নায়কের পরিবারের কারো ক্ষতি অথবা পুত্রাদির মৃত্যুতে অলংকার পরিধান করবেননা এবং বিলাপ করবেন। এই ধরনের যেকোনো ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল,নায়কের সাথে একাত্মতা স্থাপন।

নায়ক যাতে মনে করেন নায়িকা সম্পূর্ণভাবে তাঁর প্রতি আসক্ত, তাঁর ও তাঁর পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী।

অধ্যায়ের শুরুতে মায়ের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে যিনি নায়িকার উপরে নানারকম জোর করে থাকেন। সেই কারণবশতঃ নায়কের সাথে দেশত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেন তিনি। কিন্তু দেশের আইনের প্রসঙ্গ আসে খুব স্বাভাবিকভাবেই যে আইনের বলে দেশত্যাগ করলেও রাজার হস্তক্ষেপে নায়িকার মা তাকে নিজের অধিকারে ফিরিয়ে আনতে পারেন। অবশ্য তার প্রতিকার রয়েছে রাজার কাছ থেকে নায়িকাকে যোগ্যমূল্যে কিনে নেওয়া। নায়কের কোন কিছু শুভ সম্পাদিত হলে পূজা-প্রার্থনা করার কথা ব্যক্ত করবেন।

নায়িকার কর্তব্য-কর্ম সম্বন্ধে বাৎসর্যয়ন বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন, “নিত্যমলঙ্কারযোগাঃ। পরিমিতোহব্যবহারঃ। গীতে চ নামগোত্রয়োঃগ্রহণম্। গ্লান্যামুরসি ললাটে চ করং কুরক্বীত। তৎসুখমুপলভ্য নিদ্রালাভঃ। উৎসঙ্গে চাস্যোপবেশনং স্বপনং চ। গমনং বিয়োগে। তস্মাৎ পুত্রার্থিনী স্যাৎ। আয়ুষোনাদিক্যমিচ্ছেৎ...”^{৩৭}

নায়কের সবকিছু(কূল-শীল-জাতি-বিদ্যা)শ্রেষ্ঠ। দেশ-গুণ-মিত্র-উপার্জন সবকিছু সবথেকে উন্নত। তাঁর তুলনীয় কেউ নেই। সবসময় তাঁর অনুসরণ করবেন এবং সেই উপলক্ষ্য করে মায়ের সাথে কৃত্রিম কলহ করবেন। আত্মহত্যা ও প্রাণনাশের কথা বলে পরিস্থিতি নিজের আনুকূল্যে আনায় প্রয়াসী হবেন। নিজের জীবিকার প্রতি নিজেই বিতৃষ্ণাবোধ করেন।

নায়ক প্রবাসে গেলে প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার মতো আচরণ করা এবং সেই মতো উপযুক্ত বেশবাস ধারণ করবেন। শরীরসংস্কার ও অলঙ্কারধারণ করবেননা কিন্তু শঙ্খ-বলয়াদি মঙ্গলসূচক আভরণ ধারণ করবে। চূড়ান্ত কৃচ্ছসাধনের চেষ্টা করবেন। শুভস্বপ্ন দেখে নায়কের পরিচিতিজনকে জানিয়ে নায়কের দ্রুত প্রত্যাগমনের আশা করবেন। কোনো দুঃস্বপ্ন বা অনিষ্ট সংবাদ জানলে শান্তিকর্ম করাবেন। নায়কের প্রত্যাবর্তনের পরে কামপূজার আয়োজন করবেন; শুধু তাইই নয় আরও নানা আনুষঙ্গিক যাবতীয় কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান করবেন।

এই অধ্যায়ের শেষে সত্তাসত্ত বিচার করা হয়েছে। যার অর্থ সক্ষম ও অসক্ষম বিচার করা এবং তা অবশ্যই পারস্পরিক তুলনায় মাধ্যমে। সত্তের লক্ষণে বলা হয়েছে, “নিসৃষ্টভাবঃ সমানবৃত্তিঃ প্রয়োজনকারী নিরাশঙ্কো নিরপেক্ষোহর্থোস্থিতি সত্তলক্ষণানি”^{৩৮}। যদিও এই লক্ষণটি দত্তকাচার্য কথিত এবং এর সঙ্গেই বাৎস্যায়ন নিজের মতামতও ব্যক্ত করেছেন;

নারীর কাম স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী জটিল; সহজে তা বর্ণনাযোগ্য নয়। সেই কামনা স্বাভাবিক নাকি কৃত্রিম তা অনায়াসে নির্ণয় করা যে কারো পক্ষেই দুঃসাধ্য। যেহেতু কামাতুরা স্ত্রীতে পুরুষেরা সহজেই বিশ্বাস করেন তাই অর্থলোভী বেশ্যারমণী কামের অভিনয় করে থাকে সুচারুভাবে। তাঁদের প্রেম-বিরাগ-পুনরায় মনোরঞ্জনের চেষ্টা আদতে সবকিছুই নকল, কৃত্রিম। নায়কের কাছ থেকে অর্থ, অন্যান্য কাজ্জিত সামগ্রী সবকিছু পেলেও পরিশেষে তাঁকে পরিত্যাগ করে থাকে কারণ আসলে এটি তাঁদের পেশা। সেই কারণেই বাৎস্যায়ন বলেছেন এই ধরনের নারীদের প্রতি আসক্ত হওয়া একান্তই অনুচিত। পেশাগত কারণেই এঁরা সাধারণতঃ কোনো এক পুরুষাভিমুখী হননা। কামসূত্র পাঠ করলে এই ধরনের নারীদের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা সম্ভব হয়।

‘কান্তানুবৃত্তম্’-এর পরের অধ্যায় ‘অর্থাগমোপায়াঃ, বিরক্তলিঙ্গানি, বিরক্তপ্রতিপত্তিঃ, নিকাসনক্রমাঃ’। নামকরণ থেকেই স্পষ্ট যে, একজন বেশ্যা কী কী পদ্ধতি বা উপায় অবলম্বন করে কান্তের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করবেন এবং সেই পুরুষটি কপর্দকশূণ্য হয়ে পড়লে কীভাবে তাঁর সংশ্রব ত্যাগ করবেন সেই বিষয়গুলি বাৎস্যায়ন আলোচনা করেছেন।

নায়কের কাছ থেকে অর্থগ্রহণের জন্য যে যে পদ্ধতি রয়েছে সেইগুলিকে অবশ্যই উপায় অনুসারী হবে কারণ সেটিই মান্য। আবার সেই গ্রহণের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দুটি ভাগ রয়েছে। স্বাভাবিক শব্দের দ্বারা প্রাকৃতিক পদ্ধতি আর অস্বাভাবিক অর্থে কৃত্রিম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সত্ত ব্যক্তির কাছ থেকে স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থগ্রহণ করা কর্তব্য আর অসত্ত ব্যক্তির কাছ থেকে ধনলাভের পূর্বে প্রকৃষ্টরূপে যত্ন করতে হয়। যদি স্বাভাবিকভাবে অর্থপ্রাপ্তি হয় তবে উপায় প্রয়োগের প্রয়োজন হয়না।

বাৎস্যায়নের পূর্বজেরা মনে করেছেন একজন বেশ্যা যদি কোনো পুরুষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়ে থাকেন তাহলে তাঁর কোনোরকম কৃত্রিম পদ্ধতি বা প্রযত্ন করা উচিত নয়। কিন্তু বাৎস্যায়ন এ প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রমতের অধিকারী। তাঁর মতে উপায় অবশ্যকর্তব্য কারণ স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করলে একজন বেশ্যা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারবেন তার সঙ্গে প্রযত্ন মিলিত হলে সেক্ষেত্রে দেয় ধনরাশির দ্বিগুণ প্রাপ্তি হবে আর যে কোনো পরিস্থিতিতেই অধিক উপার্জন একজন বেশ্যার কাম্য বিষয়।

কামসূত্রে বাৎস্যায়ন বেশ্যাদের অর্থ উপার্জনের অসংখ্য উপায় বলেছেন। সেগুলির মধ্যে বেশকিছু এমন উপায় বলা হয়েছে যেগুলি কোনো গণিকা অবলম্বন করলেও বোঝা যায়না যে এর পেছনে কেবলমাত্র অর্থের প্রতি আসক্তি আছে। কারণ তাঁরা তাঁদের বক্তব্য-আচরণ-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন থাকেন।

এই তালিকাটি যথেষ্টই দীর্ঘ এবং একজন বেশ্যার প্রাত্যহিক জীবনধারণের জন্য ব্যবহার্য বেশ কিছু উপাদানের কথা এখানে বলা আছে। অলংকার-ভক্ষ্য-খাদ্য-পানীয়-চতুর্বিধ বস্ত্র-মাল্য-তাম্বুল-সুপারি,এছাড়াও পশু বা তৈজসাদি বিক্রেতা কোনো ব্যক্তির কাছে পূর্বের ধার আছে বলে তা পরিশোধ করানোর জন্য অর্থ গ্রহণ করবেন। সমাজসেবামূলক কাজ যেমন বৃক্ষরোপণ, জলাশয় নির্মাণ, বড় উদ্যান প্রতিষ্ঠা অথবা ধর্মমূলক কাজ যেমন মন্দির তৈরী-ব্রত প্রভৃতির কারণে ধন ব্যয় করানো। আবার নায়কের কাছে অভিগমন হেতু আসার সময় তাঁর অলংকারাদি অপহৃত হয়েছে এরকম বললেও নায়ক অর্থ দেবেন। কখনো আবার নিজের বাড়ি থেকেই অর্থ চুরি হওয়ার কথা বলবেন। যে সকল গহনা নায়কপ্রদত্ত বা অন্য কোথাও থেকে প্রাপ্ত সেগুলি নায়কের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করার জন্য ব্যয় করা হয়েছে এমন বলতে হবে কিংবা এমন পরিস্থিতি তৈরী করতে হবে যেন তিনি তাঁর নায়কের জন্য ধার করছেন, নিজের মা বা মাতৃস্থানীয়ার সাথে কলহে লিপ্ত হবেন। সামাজিক উৎসব বা অনুষ্ঠানে যথাযোগ্য উপহার দেওয়ার ক্ষমতা না থাকার কারণে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন।

এই প্রকার আচরণের উদ্দেশ্য হল একইসাথে অর্থ আদায় এবং সামাজিক প্রতিপত্তি বিধান। একান্তভাবেই নিজের কথা, নিজের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের কথা ও সেই সংক্রান্ত ব্যয়ের কথা জানালে নায়ক অর্থসাহায্য করবেন। আবার কোনো শিল্পীর কাজ অপূর্ব কিন্তু বহুমূল্য; তাঁর কাজ নায়কের জন্য নায়িকা করাতে ইচ্ছুক কিন্তু অর্থের কারণে অসম্ভব তাই নায়ক সেইক্ষেত্রেও সাহায্য দেবেন। কোনোসময়ে উপকার হতে পারে এই ভেবে বৈদ্য-মহামাত্রের উপকার করা কর্তব্য আবার নায়কের বন্ধুস্থানীয় কারো বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। গৃহকাজের ছলে অর্থব্যয় করানো বা নিজের অথবা সখীর সন্তানের জন্য অলঙ্কার প্রস্তুত করাবেন। এখানেই শেষ নয় তাঁদের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য যে সাধু এবং সৎ সেটি দেখানোর জন্য নিজের আভরণাদি, গৃহকর্মের ব্যবহার্য বস্তুসমূহ আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখা জনৈক ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে দেওয়ার অভিনয় করবেন বা সত্যি সত্যি খুব অল্প হলে বিক্রয় করে দেবেন কারণ তাতে তাঁর আচরণ অনেকখানি বাস্তবসম্মত হয়। গল্পচ্ছলে নিজের সমপেশা অবলম্বনকারিণীর আর্থিক উন্নতি হয়েছে, কোন কোন বিষয়ে নায়িকা তাঁদের থেকে ন্যূন তা বলে নায়কের কাছ থেকে সেই সেই দ্রব্য বা সমপরিমাণ অর্থসংগ্রহ করবেন, এই বিষয়টিকে Wendy doniger একটু ব্যাখ্যা করেছেন-“ Here V cites the teaching of Dattaka-‘ When there is a pooling of similar households goods ,she takes the special ones’-and adds a phrase to clarify it: ‘with rival courtesans de luxe.’ Because the goods are similar, they accidentally get exchanged, and so that this should not happen again, in the presence of her lover she takes from the hand of the merchant, from time to time, some goods that are superior in both size and quality, so that the lover will give her money to pay for it. Generally, courtesans of the same class borrow one another’s household goods as the need arises.” ৩৯

তবে সেই সঙ্গে নায়কের কাছ থেকে আগে কী কী উপকার বা অর্থ সাহায্য পেয়েছেন তাও স্মরণ করবেন ও নায়কের সম্মুখেই তাঁর উচ্চারণ করবেন যাতে নায়ক উপলব্ধি করেন, নায়িকা কৃতজ্ঞ এবং পূর্বের কথা মনে রেখেছে ফলে নায়কের চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই দ্রব হয়ে থাকবেন। কোন বালককে দিয়েও নায়কের কাছ থেকে সাহায্য নেবেন কারণ অনেক সময় শিশুর প্রতির মায়াবশতঃ লোকে সাহায্য করে থাকেন।

যদি উপরে কথিত এতগুলি পন্থার কোনটিই কার্যকরী না হয় তাহলে সমস্ত লজ্জা পরিত্যাগ করে স্বয়ংপ্রার্থী হতে হবে। তবে পন্থা যাইই হোক না কেন তা প্রয়োগ করার পূর্বে দেশ-কাল-অবস্থার প্রতি বিচার করা অবশ্যকর্তব্য-

যে তালিকা বাৎসর্যায়ন দিয়েছেন তাতে পরিষ্কার যে, গণিকারা ছলে-বলে-কৌশলে অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন। যদিও ছল বা কৌশল অবলম্বন করাই তাঁদের অন্যতম পন্থা। সহজাত না হলেও দীর্ঘ অভ্যাস তাঁদের এই উপায় অবলম্বনে বাধ্য করে।

নায়ক কোনো কারণবশতঃ বিরক্ত বা তাঁর আসক্তি কমে এসেছে বুঝতে পারলে তাঁর কাছ থেকে ধনগ্রহণের পদ্ধতি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিরক্তের লক্ষণে বলা হয়েছে মানুষের স্বাভাবিকভাবের বিপরীত আচরণকারী, মুখবিকৃতির দ্বারা বোধ্য এমন ব্যক্তিকেই বিরক্ত বলে-

“নিত্যমেবেতি। সর্বত্র ক্রিয়াসু বর্তমানম্। প্রকৃতিবিক্রিয়াত ইতি। স্বভাবান্যথা ত্বেনেতর্থঃ। অনেনেঙ্গিতমন্যথা বৃন্তিলক্ষণং দর্শয়তি। মুখবর্ণাচ্চ বিদ্যা দিত্যেব। মুখরাগাদিত্যর্থঃ। কশ্চিদেব মুখ রাগেহভিরাগং সূচয়তি। তেনেঙ্গিতাকারাভ্যাং রক্তবদ্বিরক্তমপি বিদ্যা দিত্যুক্তম্। ১৩। (কা। সূ। প-২১২।)”

বিরক্ত স্বভাবের কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন, দেয় বস্তুর পরিমাণ কম হওয়া অর্থাৎ যে পরিমাণে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল তাঁর থেকে কম অথবা সম্পূর্ণ অন্য বস্তু দান করা, নায়িকার অপছন্দের বা বিরুদ্ধপক্ষীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, কোন কিছু প্রতিজ্ঞা করা থাকলে না দেওয়া, বিস্মৃত হওয়া ইত্যাদি। আবার যদি মিথ্যাচার করে অন্য নায়িকার সঙ্গে শয়ন করেন, পূর্বে সংসর্গ করা নায়িকার সংশ্রব রাখেন অর্থাৎ সেই ব্যক্তি বিরক্ত।

‘বিরক্ত’ ব্যক্তির কাছ থেকে যত দ্রুতসম্ভব অর্থ-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা বেশ্যাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।^{৪০}

যদি বিরক্ত নায়ক স্বয়ং নিষ্কাশিত হয়ে যান ফলে তাঁর জন্য কোন বিশেষ বা পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়না। কিন্তু সত্ত্ব নায়কের নিষ্কাশনে বিশেষ বেগ পেতে হয়- “সত্ত্বং তু পূর্ববোপকারিণমপ্যল্লফলং ব্যলীকেনানুপালয়েৎ”^{৪১} ইত্যাদি। অন্য রমণীর প্রতি কামাসত্ত্ব হলে নানা

ষড়যন্ত্র করে তাঁকে এমন অবস্থা করে দিতে হবে যাতে তিনি নিজেই আসতে লজ্জিত হন। অন্যদিকে যদি তিনি অসার হয়ে পড়েন;যাঁর আর নতুন করে কিছু দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে তাঁকেও নিষ্কাশন করতে হবে,তবে সে ক্ষেত্রে নিয়ম আলাদা। নতুন নায়ককে অবলম্বন করে তারপরে সেই পূর্বতন নায়ককে অবগত করেই তাঁকে নিষ্কাশন করে দিতে হবে।

নিষ্কাশনের দ্বিবিধ উপায় আছে-প্রকাশ্য এবং গুপ্ত। প্রকাশ্যের মধ্যে রয়েছে নায়কের অপ্রিয় বিষয়ের অভ্যাস। যে সমস্ত অভ্যাস নিষিদ্ধ সেগুলিই নায়কের সামনে তাঁকে দেখিয়ে আচরণ করবেন যাতে এটুকু বুঝতে পারেন,তাঁর উপস্থিতি এখন আর কাম্য নয়।

নায়ককে দেখামাত্র নিজের ওষ্ঠ দংশন, মাটিতে সজোরে পদাঘাত করবেন। শারীরিক অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবেন যে নায়ক আর কাঙ্ক্ষিত নন। যে বিষয়ে নায়ক অজ্ঞ সেই বিষয় নিয়ে সর্বসমক্ষে আলাপ আলোচনা করে তাঁকে বিব্রত করার চেষ্টা করবেন। উপরন্তু যে সমস্ত বিষয়ে নায়কের জ্ঞান রয়েছে সেগুলি নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছল্য করে তাঁর পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের বিষয়ে কুৎসা করবেন। নায়কের থেকে যাঁরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে উন্নত তাঁদের সাহচর্যে থাকবেন। অর্থাৎ যতরকম ভাবে সম্ভব তাঁকে অসম্মানিত করাই হবে গণিকার পরিকল্পনা আর যে কোন আত্মসম্মানসম্পন্ন ব্যক্তিই অপমানিত হলে সেই সঙ্গ ত্যাগ করবেন।

রত্নির প্রসঙ্গে একই কথা প্রযোজ্য। সহায়ক উপচার গ্রহণ না করা, চুম্বনে প্রত্যাঘাত না দেওয়া,শারীরিক স্থিরতা বজায় রাখা অর্থাৎ যতরকমভাবে সম্ভব নায়কের সাহায্যে অসহযোগিতা করা, তাঁর রমণক্ষমতা নিয়ে পরিহাস করা এগুলি একজন গণিকা করবেন। অন্যদিকে কথা বলেই ছল করা, নায়কের বক্তব্যের মধ্যে সামান্য হলেও খুঁত খোঁজা, সেই সময়ে ভৃত্যদের প্রহার করা, নায়কের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা এমনকি তাঁর গোপনীয় বিষয়াদি প্রকাশ্যে নিয়ে আসা ইত্যাদি কাজের দ্বারা সচেতনভাবে একজন গণিকা সেই নায়ককে নানাভাবে লজ্জিত, বিড়ম্বিত করবেন।

নানা উপায় অবলম্বন করে রমণে ব্যাঘাত করা, নিজেকে নায়কের সামনে অনুপস্থিত রাখা, দুর্মূল্য বিষয় প্রার্থনা করা- এইগুলি করে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। নায়ক ত্যাগ না করলে; বেশ্যাই তাঁকে ত্যাগ করবেন।

আচার্য দত্তক এই উপায়গুলি ব্যক্ত করলেও বাৎস্যায়ন যে মতের অনুসারী সেটি অনুযায়ী, বিচার করে গম্যের সঙ্গে সম্প্রয়োগ ও মনোরঞ্জন করে অর্থোপার্জন করবেন একজন বেশ্যা। অর্থ শেষ হলে তাঁকে ত্যাগ করবেন। এইভাবে সংক্ষেপে যদি এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় তবে বিপুল পরিমাণ অর্থলাভ করা সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায় “বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানম্”। এই অধ্যায়ে নায়ক-নায়িকার সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে। একজন বেশ্যা এবং তাঁর নায়কের মধ্যবর্তী সম্পর্ক মূলতঃ অর্থনির্ভর হয়।

কোনো গণিকা যখন তাঁর বর্তমান নায়ককে একান্ত কপর্দক শূন্য অবস্থায় পরিত্যাগ করেন তখন তিনি তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকপ্রবরের সাথে নতুন করে সংযোগ স্থাপন করতে শুরু করেন। কিন্তু যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সেটি হল সেই পুরুষটিকে অর্থবান হতে। অন্ততঃ সেটিই প্রাথমিক শর্ত – “But she should return to him only if he has acquired fresh wealth, or is still wealthy, and if he is still attached to her.” কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাঁর (গণিকা) একটি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে - “And if this man be living at the time with some other woman she should consider well before she acts.”* (The Kamasutra of Vatsyayan, p.146)

প্রথম অধ্যায়েই “গম্য” পুরুষের তালিকা দেওয়া রয়েছে। সেখানে অর্থবান পুরুষের কথা, যাঁর অর্থ-সম্পদ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে তিনি এই প্রকারের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু সেই সম্পর্ক খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়না। তার কিছু কারণ রয়েছে যেগুলি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা রয়েছে।

যে পুরুষের ধন সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়েছে তাঁর সাথে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে কোন এমন ব্যক্তির সাথে নতুন করে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে যিনি ধনবান। তবে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, শুধুমাত্র অর্থবান হলেই কিন্তু উভয়ের সম্পর্ক হবেনা সেই ব্যক্তিকে নায়িকার প্রতি

সানুরাগ হতে হবে। এখানে ষড়্‌বিধ কার্যযোগ এর কথা বলা হয়েছে-“ ইতঃ স্বয়মপসৃতস্ততোহপি স্বয়মেবাপসৃতঃ। ইতস্ততশ্চ নিক্সাসিতাপসৃতঃ। ইতঃ স্বয়মপসৃতস্তত্র স্থিতঃ। ইতো নিক্সাসিতাপসৃতস্ততঃ স্বয়মপসৃতঃ। ইতো নিক্সাসিতাপসৃতস্তত্র স্থিতঃ”।(কা।সূ.) এই ষড়্‌বিধ পুরুষের মধ্যে সন্ধেয় এবং অসন্ধেয় পুরুষের একটি তালিকা রয়েছে। সেই সম্বন্ধে বিশদ পর্যালোচনা করার আগে আরও একটি বিষয় আলোকপাত করা প্রয়োজন সেটি হল, এই অধ্যায়টি মূলতঃ বেশ্যাদের জীবিকা বিষয়ক। কোন ধরনের পুরুষের সাহচর্য, সঙ্গ তাঁদের জন্য লাভজনক সেটি দেখা অবশ্যকর্তব্য। পদ্ধতি অনুযায়ী সেটি ঠিক নাকি ভুল, ন্যায় নাকি অন্যায় ইত্যাদি তর্কের অবকাশ থেকেই যায়। কিন্তু সত্যি বলতে কী, যে সমস্ত মেয়েদের জীবিকার মাধ্যম হিসেবে দেহকে বেছে নিতে হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে উচ্চ-অনুচিতের প্রশ্ন কোনমতেই জীবন ও জীবিকার থেকে বড় নয়। আর সেকারণেই কোন ধরনের পুরুষের সংসর্গ তাঁরা করবেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা নিয়ে বাৎসর্যায়ন এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

নায়িকা প্রথমে এমন পুরুষের সম্বন্ধে বিচার করবেন যিনি উভয়দিক থেকে নিজেই অপসৃত হয়ে আবার নায়িকার যাঁরা সহায় (পীঠমর্দাদি) তাঁদের সাহায্যে পুনরায় সন্ধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু কারোর গুণগ্রাহী না হওয়ার কারণে অস্থিরমতি সেই পুরুষ অসন্ধেয়। কোন স্থিরমতি, অপসৃত নায়ক যদি অন্য কোন বহুলাভকারিণীর দ্বারা নিক্সাসিত হয়ে থাকেন তবে কোনভাবে বিরাগ উৎপাদন করলে পুনরায় নায়িকার সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে যা নায়িকার জন্য লাভজনক-“...If the other woman got rid of him, even though he has money, because she could get a lot of money from another man, the courtesan may take him back, thinking, ‘Since that woman insulted him, he will give me a lot of money out of spite.’ (w.d p148) কিন্তু একেবারেই অর্থহীন ও কুরূপ ব্যক্তি কোনমতেই কাম্য নন।

এক নায়িকার কাছ থেকে নিজেই দূর হয়েছেন কিন্তু অন্য নায়িকার কাছ থেকে দূরীকৃত হয়েছেন যদি এরকম হয়; তবে বহু দান করলে সেই ব্যক্তি গ্রহণীয়। কিন্তু অন্যত্র অবস্থান করলেও পূর্ব নায়িকার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী ব্যক্তি গ্রহণীয় কিনা সেটা বিবেচনার বিষয়।

এবার খুব সংক্ষেপে সন্ধেয় ও অসন্ধেয় পক্ষদ্বয় নিয়ে কামসূত্রে বর্ণিত বক্তব্য দেখে নেওয়া যাক। কারা সন্ধেয় আর কারা তদবিপরীত সেই নিয়ে সুস্পষ্ট মতামত আছে। এক নায়িকার কাছ থেকে অন্য নায়িকার কাছে যাওয়ার অন্যতম কারণ হল গুণ। কোন বিশেষ গুণসমন্বিতা ভেবে অন্য নায়িকার সান্নিধ্য পাওয়া যেতে পারে এরকম চিন্তা করে যিনি অপসৃত হয়ে যান তিনিই আবার বিশেষ গুণের ইঙ্গিত না পেয়ে আবার পূর্বতন নায়িকার কাছে ফিরে আসতে চান এমনকি বহুদান করতে ইচ্ছুক থাকেন। দ্বিতীয়া যাঁর কাছে তিনি গেছিলেন কার্যগতিকে তাঁর বহুদোষ দেখা গেলেও তিনি প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হন। অন্যপক্ষে বালকধর্মী, বহুমুখী, অস্থিরমতি এবং যাঁর রাগ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী নয় সেইরকম ব্যক্তি অসন্ধেয়।

এই প্রসঙ্গে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিশেষ কিছু সন্ধান প্রথমাকে ত্যাগ করে দ্বিতীয়ার কাছে গেলেও একজন পুরুষ যখন আবার প্রথমার কাছেই ফিরে আসতে ইচ্ছুক হন তখন তার কিছু কারণ থাকে।

প্রথমতঃ যে বিশেষ গুণ অথবা গুণাবলীর সন্ধানে তিনি প্রথমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন সেগুলি দ্বিতীয়ার মধ্যেও নেই।

দ্বিতীয়তঃ প্রথমার প্রতি প্রেম, ভালোবাসার কারণে চলে গিয়েও প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা।

তৃতীয়তঃ কিছু সময় অতিবাহিত করে উপলব্ধি করা যে, প্রকৃতপক্ষে প্রথমা নানাবিধ গুণের আধার ও দ্বিতীয়া নানা দোষে দোষী। তাই গুণের প্রতি আকর্ষিত হয়ে আর প্রথমার কাছে আসার জন্য তিনি প্রভূত অর্থ দেবেন। অনুরাগের বশে কেউ সম্বন্ধ স্থাপনে ইচ্ছুক হলে তিনি সন্ধেয়।

“He desires to return to me because of his passion for me; he is likely to give great wealth to me, since he is now impressed by my qualities; he is enamoured of me, and shuns the company of the other woman.”(S.c p219) .

যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম তিনি গ্রাহ্য নন।

যে ব্যক্তিকে আগে প্রতারণা করা হয়েছে, তাঁকে অপমান করে বা অন্যায়ভাবে অর্থ অপহরণ করে কিংবা যে পরিমান অর্থের বিনিময়ে সম্প্রয়োগ কথা ছিল তা না করা ইত্যাদি। পুনরায় যদি সেই

ব্যক্তি স্বয়ং আসতে আগ্রহী হয়ে থাকে তবে সে অসঙ্কেয় কারণ তার উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নেওয়া হতে পারে। কোনো অন্যথাবুদ্ধি কোনমতেই সঙ্কেয় হবেনা-“ অন্যথাবুদ্ধিঃ কালেন লভ্যিতব্যঃ।” কারণ অন্যথাবুদ্ধি ব্যক্তি স্থিরচিত্ত না হওয়ার কারণে তিনি তাঁর অনুরাগ থাকা অথবা না থাকা অনুযায়ী গণিকাকে ধন দান করে থাকেন। এতখানি অনিশ্চয়তার কারণেই এই প্রকৃতির পুরুষ অসঙ্কেয়।

এগুলি ব্যতীত আরও বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে যেগুলি নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

এমন বেশ কিছু অবস্থার কথা বলা হয়েছে যেমন- “In the case of the man who may have been driven away by one woman, and be living with another, if the man makes overtures to return to the first one, the courtesan should consider well before she acts, and while the other woman is engaged in attracting him to herself, she should try in her turn (though keeping herself behind the scenes) ...”(The Kamasutra of Vatsyayan, p.147)

নায়িকা নায়ককে দুঃখ দেওয়ার জন্য সচেতনভাবে নিক্সাসন করায় তিনি অন্য স্থানে গেছেন কিন্তু নায়িকার প্রতি তাঁর অনুরাগ বিন্দুমাত্র কমেনি সেই কারণে তিনি সঙ্কেয়। নায়িকার প্রেরিত ব্যক্তির সাথে কথোপকথনের ফলে নায়ক সেইসময়ে যেখানে বাস করছিলেন সেখানে যদি আর শান্তি না পান তবে তিনিও সঙ্কেয় তালিকাভুক্ত। অপর সেই নায়িকার দ্বারা তাঁর ধননাশের সম্ভাবনা দেখা গেলে তাহলে সম্পূর্ণ বিনষ্টির আগে তাঁর স্থান পরিবর্তন দরকার তাই তিনি সঙ্কেয়, কারো আকস্মিক ধনাগমের সম্ভাবনা দেখা গেলে তাঁকে নিজের অধিকারে আনা প্রয়োজন, অধ্যক্ষস্থানীয় পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে অথবা যাঁর স্ত্রীবিয়োগের কারণে ধনব্যয়ে অসুবিধা নেই, পিতা-ভাইয়ের থেকে পৃথক হওয়ার জন্য স্বাধীন ফলে তাঁকে শাসন করার বা শুভবুদ্ধি দেওয়ার কেউ নেই, কেউ নিজ পত্নী দ্বারা অপমানিত হয়েছেন বা কারোর বন্ধুর থেকে তাঁকে আলাদা করা জন্য, কারো স্বভাবগতঃ চাপল্যবুদ্ধির হেতু তাঁকে নিজের বশবর্তী করার জন্য-এইধরনের পুরুষেরা গ্রহণীয় হয়ে থাকেন।

নায়িকার যারা সহায় বা পীঠমর্দ তাঁরা বিশীর্ণ নায়ককে নায়িকার মাতার দুর্ব্যবহার, নায়িকার তার প্রতি প্রেম কিন্তু মায়ের কাছে পরাধীনতা ও সেইকারণেই ত্যাগ বা নিক্সাসন এই কথা জানাবেন।

বর্তমান নায়কের সাথে তাঁর সংসর্গ তথা বিদ্বেষের বর্ণনা দেবেন। নায়কের মনে নায়িকার স্থান নির্মাণের জন্য কোন প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞান দেখাবেন যা তাঁদের পূর্বে অতিবাহিত সময়ের কথা স্মরণ করাবেন এবং নায়ক পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। এই বৃত্তিগ্রহণকারিনীদের উদ্দেশ্যে আচার্যগণ বলেছেন, কারণ অদৃষ্টপূর্ব ব্যক্তি ও পূর্বপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে পূর্বপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন যুক্তিযুক্ত কারণ সেই ব্যক্তির শীল-ক্রোধ-ব্যবহার আগে থেকেই জানা আছে। কিন্তু বাৎস্যায়ন এই মতের সমর্থক নন; তাঁর মতে আগে থেকে যাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই সেই ব্যক্তি নিজে অনুরাগী হলে সেই সন্ধেয় হিসেবে যোগ্যতর হবেন কারণ পূর্বপরিচিত ব্যক্তি পূর্বপরিচিত বলেই অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে একজন অপরিচিত, নতুন ব্যক্তির মত উদার হবেন না। কিন্তু নতুন ব্যক্তির নতুন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক বেশি দানশীল ও ব্যয়কারী প্রকৃতির হয়ে থাকেন আর সে কারণে তিনিই যোগ্যতর। তবে একথা সত্যি যে, প্রকৃতি ভেদে পুরুষ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকেন তাই পরিস্থিতি ও স্বভাব বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই যথাযথ।

সমস্ত প্রক্রিয়াটির এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হল অর্থসংগ্রহ। তার জন্য নায়িকাকে যতরকম পস্থা অনুসরণ করতে হয় সেগুলি কোনোটিই দোষযুক্ত নয়। নায়িকা আগে পরিণাম বুঝে সেই মতো আচরণ করবেন। কখনও সত্তের তুলনায় অসত্তের গুণাদিকীর্তন ইত্যাদি। নিজের বশবর্তী নায়ককে ছলে ভুলিয়ে অন্যত্র গিয়ে অর্থ উপার্জন করে ফিরে আসবেন অর্থাৎ তিনি একেবারেই একমুখী নন।

এই অধ্যায়টি থেকে তাঁদের পেশার অনেকগুলি দিকের নির্দেশ পাওয়া যায় যা পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের গবেষণা কাজের অনেক সহায়তা করবে।

পঞ্চম তথা পরবর্তী ‘লাভবিশেষ’ শীর্ষক অধ্যায়ে গণিকাদের আয়, তাঁদের উপার্জনের পদ্ধতি ও মাধ্যম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। অগ্রজ পণ্ডিতদের সঙ্গে এই অধ্যায়ে বাৎস্যায়নের বহু মতানৈক্য দেখা যায়। একপরিগ্রহা-অনেকপরিগ্রহা-অপরিগ্রহা এই তিন ধরনের বেশ্যাদের

মধ্যে অপরিগ্রহের কোনো একজন নির্দিষ্ট পরিগ্রহ না থাকার কারণে তিনি অন্যান্য উৎস থেকে অর্থ উপার্জন করে থাকেন আর সেই বিশেষ লাভের বিশদ বর্ণনা রয়েছে এই অধ্যায়ে।

নায়িকার কাছে যদি প্রতিদিন অসংখ্য গম্য নায়কের আগমন ঘটে এবং তাঁদের সকলেই যদি যথাযথ অর্থ-উপহারাদি প্রদানে সক্ষম হয় তবে নায়িকা কোনো একজনের প্রতি কোনভাবেই বিশেষরূপে আকর্ষিত হবেননা। অন্য বেশ্যার সাথে তুলনা করে তারপর নিজের প্রতি রাত্রের অর্থমূল্য নির্দিষ্ট করবেন- “She should fix her rates every night considering the place, the time, the position, her qualities and outstanding merits, her excellence or otherwise, as compared to the others.” (s.c p222) হয় দূত পাঠিয়ে কিংবা নিজের আত্মীয়-পরিজন স্থানীয় ব্যক্তিকে গম্য নায়কের কাছে পাঠিয়ে প্রস্তুতি নেবেন। বলা হয়েছে- “দ্বিজিয়শ্চতুরিতি লাভাতিশয়গ্রহার্থমেকস্যপি গচ্ছেৎ। পরিগ্রহঞ্চ চরেৎ”।(কা.সূ. ২২৮)

এইখানে একটু আলোচনার প্রয়োজন। অপরিগ্রহ গণিকা যদি একজন গম্যের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে আর্থিক লাভ করে থাকেন তাহলে সেই এক ব্যক্তির সাথে একাধিক দিন সম্প্রয়োগ করবেন এমনকি তিনি তখন সেই বিশেষ পুরুষটির জন্য ‘একপরিগ্রহ’ রূপেও দিনযাপন করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে পূর্বাচার্য ও বাৎস্যায়নের মতপার্থক্য লক্ষিত হয়। পূর্ব পূর্ব আচার্যদের মতে একই সময়ে বহু নায়ক যদি উপস্থিত থাকে, তাঁরা সকলেই যদি গম্য হন এবং সোনা বা তুল্য দ্রব্য দিতে ইচ্ছুক হলে নায়িকার কাছে যেটি বেশি কাঙ্ক্ষিত সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর যিনি দাতা তাঁর সাথে গমন করা কর্তব্য। কিন্তু বাৎস্যায়ন বলছেন, একই মূল্যসম্পন্ন হলেও সোনা দান করেন যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শয়ন করা অবশ্যকর্তব্য কেননা নানাবিধ উপকরনের মধ্যে দান হিসেবে প্রথমে কথিত স্বর্ণই প্রবল –“ since gold coins once given are never taken back, and also since gold coins are the basis of all commercial transactions.” (S.c p 223)

এই প্রসঙ্গে কি কি দেয় বস্তুর উল্লেখ রয়েছে সেই তালিকাটি একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে- “সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য, লৌহ ও তদনির্মিত ভাণ্ডোপকর, আস্তরন, প্রাবরণ, বস্ত্রবিশেষ, গন্ধদ্রব্য, কটুক, ভাণ্ড, ঘৃত, তৈল, ধান্য ও পশুজাতি ইত্যাদি।

তবে তারও ব্যতিক্রম রয়েছে, “যত্তত্র সাম্যাং দ্রব্যসাম্যে মিত্রবাক্যাদতিপাতিত্বাদায়তীতো গম্যগুণতঃ প্রীতিতশ্চ বিশেষঃ”।^(কা.সূ.২২৮/৭)

যদি একের বেশি সংখ্যক ব্যক্তি একধরনের দ্রব্য দানে অভিলাষী হন তাহলে তাঁদের মধ্যে যে কোন একজনকে বেছে নিতে হবে এবং সেই নির্বাচনের পদ্ধতি বিষয়ে বেশ কিছু বক্তব্য রয়েছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথম যিনি তিনি গণিকার নিজের মাতৃভূমির অধিবাসী হবেন, এরপর নির্বাচন করা হবে সেই ব্যক্তিকে যাকে গণিকার বান্ধবী দেবেন, যাঁর গুণ বেশি, যিনি অধিক দয়াবান ও সম্মানীয় এবং সৌভাগ্যশালী তাঁকে গম্য রূপে নির্বাচন করবেন গণিকা।

এরপরে মতদ্বৈধের কারণ হল, পূর্বাচার্যদের মতে দানশীল, দয়াবান ব্যক্তি ও অনুরাগী ব্যক্তির মধ্যে যিনি সর্বদা দান করেন বলে তিনিই মান্য। কিন্তু বাৎসর্যায়নের মতে, যে ব্যক্তি দাতা তাঁকে অনুরাগপ্রবণ করে তোলা যায়না কিন্তু অনুরক্ত ব্যক্তি মিতব্যয়ী হলেও গণিকার প্রতি আকর্ষণের কারণে তাঁর দেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই দানের বিচারে অনুরক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ।

আসলে এই বিচারে শ্রেষ্ঠত্বলাভের মানটি হল নায়িকার প্রয়োজনসাধন। কার দানে নায়িকার উন্নতি সম্পাদন হচ্ছে সেই নিরিখে এই নির্বাচন হতো বলে মনে হয়। আমাদের এইরকম মনে হওয়ার সমর্থনে এই অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি- “তত্রাপি ধনযদধনবতোর্ধনবতি বিশেষঃ”।^(কা.সূ.২২৯) গম্য পুরুষদের মধ্যে ত্যাগীর উল্লেখ না থাকলেও এই অধ্যায়ে বারবার ত্যাগী পুরুষের প্রসঙ্গ এসেছে কারণ ত্যাগীপুরুষ স্বাভাবিকভাবে দান করা দ্রব্যের কথা মনে রাখেননা। কিন্তু তারও কিছু বিপরীত দিক রয়েছে। যেমন তেজস্বী হওয়ায় সাধারণ দোষ মেনে নিতে অসমর্থ হন, স্পষ্টবাদী, সরল বলে মিথ্যাভাষণ ঘোরতর অপছন্দ আবার যেহেতু তাঁরা খুব সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত সেই কারণে তাঁদের জন্য গণিকারা যে সমস্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন সেগুলির খুব গুরুত্ব দিয়ে গ্রাহ্য করেননা আর সেই কারণেই সমাদরপূর্ণ আচরণ ফিরিয়ে দিতে

পারেননা যেহেতু সেটি তাঁদের স্বভাবধর্ম নয়। আবার ত্যাগী ও কৃতজ্ঞ পুরুষের মধ্যে কৃতজ্ঞ পুরুষই শ্রেষ্ঠ তেমনি অর্থলাভ ও মিত্রবাক্যের মধ্যে পূর্ববর্তী বিদ্বানেরা অর্থাগমকে প্রাধান্য দিতে বললেও বাৎস্যায়নের মতে মিত্রবাক্য অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ তবে এইমত তখনই কার্যকরী করা যাবে যখন পরে হলে অর্থলাভের সম্ভাবনা তৈরী হয় অন্যথায় অর্থাগমের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

অনর্থপ্রতিঘাত ও অর্থপ্রাপ্তির মধ্যে পূর্বে অর্থপ্রাপ্তিকে তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিলেও বাৎস্যায়নের মত হল যেহেতু অনর্থের কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই তাই তার প্রতিবিধান করাই আগে জরুরী কিন্তু সেক্ষেত্রেও গুরুলঘুর বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বুদ্ধিমত্তার উদাহরণ। যদি অর্থ প্রধান হিসেবে প্রতিপন্ন হয় তবে তার প্রাধান্য হবে; তদবিপরীতে অনর্থের নিরসনের গুরুত্ব আরোপিত হয়ে থাকে। পূর্বাচার্যরা এরকমও বলেছেন যে, বন্ধুর প্রসঙ্গ এলে আর সেইসঙ্গে অর্থাগমের প্রসঙ্গ এলে অর্থলাভের বিষয়টিই বিবেচনা যোগ্য। কিন্তু বাৎস্যায়ন এক্ষেত্রেও বিরুদ্ধমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে যেহেতু অর্থাগম পরেও হতে পারে কিন্তু মিত্র অসম্ভব হলে সেইমুহূর্তেই উপেক্ষা করতে পারেন তাই সেটিই বাৎস্যায়নের মতে এই দুটি বিষয়ের মধ্যে গ্রহণীয় হবে- “সোহপি হ্যর্থাগমো ভবিতা। মিত্রং তু সন্ধাক্যে প্রতিহতে কলুষিতাং স্যাদিতি বাৎস্যায়নঃ।”*

(কা।সূ.২৩১)

প্রথমে যে ত্রিবিধ গণিকার কথা বলা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকে উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে তিন প্রকার অর্থাৎ সাকুল্যে নয় প্রকার(৩X৩=০৯)। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উত্তমা তাঁরা দানশীলা হবেন। মন্দির-দেবগৃহ-পুষ্করিণী-বিশ্রামাগার-সেতু-পথ ইত্যাদি নির্মাণে দান করবেন। গ্রামের বাইরে মাটির ঘরে ধান-রত্ন-পানীয় প্রভৃতির সুব্যবস্থা রাখায় সচেষ্টিত হবেন। অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে ব্রাহ্মণকে বহু সংখ্যক গো দান করবেন(কারণ কোনো ব্রাহ্মণ গণিকার হাত থেকে দান গ্রহণ করতেন না তা নিষিদ্ধ), দেব-বিগ্রহ স্থাপন করে পূজার প্রচলন করবেন। এই ধরনের ব্যয় কিন্তু সমাজের সর্বসাধারণের জন্য; এমন কারোর থেকে উত্তম গণিকা এগুলি সংগ্রহের চেষ্টা করবেন যাঁর পক্ষে এইসব ব্যয়ের ভার বহন করা সম্ভব হবে।

বিশাল অট্টালিকার নির্মাণ,সর্বাপেক্ষে অলঙ্কার নির্মাণ,ভূত্যাতির সাহায্যে সেই গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা এসমস্তই তাঁর লাভাতিশয়। তার মধ্যেও যাঁর গুণ ও কলানৈপুণ্য তুলনায় বেশি সেইই উত্তমা,তাঁর এই ধরনের লাভাতিশয় হয়ে থাকে।মধ্যমা লাভ করেন অর্ধেক এবং অধমা কেবলমাত্র একচতুর্থাংশ লাভ করেন।

শ্বেতবস্ত্র,অন্ন-সুগন্ধি পান প্রভৃতি ও সোনার লেশযুক্ত গহনা এগুলি কুম্ভদাসীদের মধ্যে যিনি উত্তমা তাঁর লাভাতিশয় প্রাপ্তি।কর্মকরী বেশ্যার লাভাতিশয়ও উত্তমা-মধ্যমা-অধমা ভেদে ত্রিবিধ।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি অস্তিমে বলেছেন বাৎসর্যায়ন।তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তিনি যা উপলব্ধি করেছিলেন সেটি অত্যন্ত বাস্তব। দেশ-কাল-বিভব-ক্ষমতা-অনুরাগ-লোকবৃত্তি অনুসারে স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্তির কোন নির্দিষ্ট মাত্রা নেই;তা কম বা বেশি হতেই পারে।তা পরিবর্তনশীল।

বেশ্যামাত্রেরই সবসময় যে তুলনায় বেশি বা অর্থলাভই একমাত্র লক্ষ্য তা নয়। ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয় কিন্তু সেই ব্যতিক্রম কতোখানি স্বাভাবিক ও কতোখানি কৃত্রিম তা বিচারসাপেক্ষ। অন্য নায়িকার কাছে যেতে না দিতে চাওয়া, অন্যাসক্তকে নিজের অধীনস্থ করা, গম্য নায়কের সাহচর্য লাভের ইচ্ছা-এইসব কারণে অল্পলাভের গ্রহণ তাঁরা করবেন কারণ এইক্ষেত্রে সাময়িক লাভটুকুর প্রাপ্তি তাঁদের মুখ্য নয়। গৌরবাকাজিক্ষণী বেশ্যা কোনো দান নেবেন না। অন্যদিকে যে পুরুষ নিজের স্ত্রীর সঙ্গ চায়,যাকে ত্যাগ করা মনস্থ করেছে,চঞ্চলবুদ্ধি কারো থেকে ন্যূনতম হলেও কিছু অর্থ গ্রহণ করেন। গম্য পুরুষের নিজের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা তৈরী হলে সেই সুযোগটি কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন,তাঁর স্ত্রীর মতো ব্যবহার করবেন। এই অধ্যায়টি পাঠে গণিকারা তাঁদের দানগ্রহণ এবং অর্থলাভের নানা দিকগুলি সহজেই বুঝে নিতে পারবেন ঠিক সেরকমই সাধারণ ব্যক্তিবর্গ এটি পাঠে সচেতনতা অবলম্বন করতে সক্ষম হবে।

“বৈশিকাদিকরণম্” এর ষষ্ঠ তথা অন্তিম অধ্যায় “অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়বিচারাঃ ও বেশ্যাবিশেষাঃ”।

এই অধ্যায়ে ‘অপরিগ্রহা’ বেশ্যা ও তাঁর পেশা সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। এই পেশাটি স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রকৃতির বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে; যার মধ্যে অনর্থ-অনুবন্ধ-সংশয় এই তিনটি বিদ্যমান। এই তিনপ্রকার পরিস্থিতি সংঘটনের পেছনে বেশ কিছু কারণ দেখা যায়- “তে

বুদ্ধিদৌৰ্বল্যাদতিরাগাদত্যভিমানাদতিদদ্ভাদত্যরজ্জবাদতিবিশ্বাসাদতিক্রোধাৎপ্রমাদাৎ

সাহসাদ্বেবযোগাচ্চ স্যুঃ”।^(কা।সূ.২৩৮) এই কারণগুলির ফলশ্রুতিতে সঞ্চিত ধনের ব্যয়, প্রভাবহানি, ধনপ্রাপ্তিতে বাধা অর্থাৎ ধনের আগমন না হওয়া বা নিজস্ব অর্থের অনর্থক ব্যয় ইত্যাদি যেমন ঘটে থাকে তেমনি আবার কোনো ব্যক্তির গম্যতা, শারীরিক আঘাত-কেশবিনাশ-বন্ধ-তাড়ন-কর্ণনাসিকাদির ছেদনে অঙ্গবৈকল্য ইত্যাদিও হয়ে থাকে। এগুলি একজন গণিকার জীবিকা ও উপার্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকারকও।

এরপরে নিরনুবন্ধের আলোচনা করা প্রয়োজন। ত্রিবর্গ অর্থ-অনর্থ ভেদে দ্বিবিধ। অর্থ-ধর্ম-কাম এই তিনটি বর্গের পাশাপাশি অনর্থ-অধর্ম-দ্বেষ এগুলি হল অনর্থত্রয়। আর কোন একটি বিষয়ের আচরণ করার সময় যে অন্য একটি বিষয়ের উৎপত্তি হয়ে থাকে তাকে বলে অনুবন্ধ।

বাৎস্যায়ন বলেছেন, “সন্দিগ্ধায়াং তু ফলপ্রাপ্তৌ স্যাদ্ভা ন বেতি শুদ্ধসংশয়ঃ। ইদং বা স্যাদিদং বেতি সংকীর্ণঃ। একস্মিন্ ক্রিয়মাণে কার্যে কার্যদ্বয়স্যোৎপত্তিরুভয়তোযোগঃ। সমন্তাদুৎপত্তিঃ সমন্ততোযোগ ইতি তানুদাহরিষ্যামঃ।^(কা।সূ.২৩৯)

গণিকা নিজের পেশাগত কারণে উত্তম নায়কের অভিগমন করলে কিছু প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় যেমন যথেষ্ট পরিমাণ অর্থলাভ, গৌরববৃদ্ধি, অনুরূপ কয়েকজন গম্যের সংসর্গলাভ-এগুলির প্রভাব অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী ও অনুবন্ধ।

কেবলমাত্র মুহূর্তকালীন অর্থসিদ্ধিহেতু যেকোনও গম্যের সাথে পূর্বাপর বিচার না করে সংসর্গ নিরনুবন্ধ। কোনো পরিস্থিতিতেই সমাজস্বীকৃত নীচশ্রেণীয় ব্যক্তির গমন শ্রেয় নয় অথবা কোনোসময়ে যে ব্যক্তির ক্ষমতা ছিল সে যদি বর্তমানে সহায়সম্বলহীন হয়ে তস্করবৃত্তি করে তবে সেই ধন গ্রহণীয় নয়; তা অনর্থানুবন্ধ।

নিজের ব্যয়ে প্রভাবশালী মন্ত্রী,স্বনামধন্য যোদ্ধা,লোভী ব্যক্তি,কুরূপ,কপট,ত্বুর কিংবা রাজার প্রিয়ব্যক্তি দেব সাথে অভিগমনের কোন ফল নেই, তা নিষ্ফল। তাই এইগুলি সব অনর্থানুবন্ধ।

ধর্ম এবং কামের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। সংশয়ের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করা হয়। অজ্ঞাতপরিচয় কোনো ব্যক্তি সে শ্রোত্রিয়-ব্রতী ইত্যাদি যেই হোন পূর্বপরিচিত নন বলেই তাঁর অভিগমন সংশয়াকুল। ধর্ম তথা কামের অনুবন্ধ নিরূপণের ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। বিরুদ্ধতা ব্যতিরেকে একে অন্যের সাথে অনুবন্ধযোগের কথা উল্লেখ রয়েছে এই অধ্যায়ে ফলতঃ সাকুল্যে চব্বিশ প্রকার সংকীর্ণানুবন্ধ হবে।

অধ্যায়ের শিরোনামে যে সংশয়ের উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল শুদ্ধ সংশয়। কোন ব্যক্তি পরিতোষিত হলেও নির্ধারিত অর্থ দেবেন কিনা অথবা অর্থ দেবেন কিনা তা অন্যতম প্রশ্ন হয়ে ওঠে। অর্থশোধন নিষ্পন্ন হয়নি তাই সেই ব্যক্তির গমন বিরাগকর হবে কিনা এই ধরনের সন্দেহকে বিদ্বৈষসংশয় বলা যেতেই পারে।

স্বাভাবিকভাবেই শুদ্ধ সংশয়ের পরেই আসে সংকীর্ণ সংশয়ের প্রসঙ্গ। বলা হচ্ছে, যখন দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি বাস্তবায়িত হবে সেই সংশয় দেখা যায় তখন এই প্রকার সংশয় হয়ে থাকে। যেমন- আগন্তুক ব্যক্তি অজ্ঞাতকুলশীল কিন্তু তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তির আশ্রিত নাকি নিজেই ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তা নিয়ে যেমন সংশয় হয় ঠিক সেরকমই তাঁর অভিগমন অর্থকর নাকি অনর্থকর তাও সংশয়ের বিষয় হয়ে থাকে।

শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মচারী-দীক্ষিত-ব্রতী বা সন্ন্যাসী একজন গণিকাকে দেখে কামভাবাপন্ন হলে অথবা বন্ধুর অনুরোধে মুমূর্ষু ব্যক্তির সাথে অভিগমন আদতেও ধর্মানুকুল নাকি অধর্ম তা নিয়ে সংশয়। একইভাবে ব্যক্তি প্রকৃতই গুণসম্পন্ন অথবা পুরোটাই লোকপ্রবাদ তাই সেরকম ব্যক্তির সাথে সম্প্রয়োগও সংকীর্ণ সংশয়ের উদাহরণ।

এরপরে বলা হয়েছে অন্যের অভিগমন অর্থকরী হলে ও অনুরক্ত যে সত্ত্ব তাঁর থেকেও অর্থ পাওয়া গেলে সেটি উভয়তো অর্থ আবার যখন নিজের ব্যয়ে অনুষ্ঠিত অভিগমন নিষ্ফল হয় এবং অনুরক্ত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন সেই সময়ে কোনো ধনলাভ হলেও তা উভয়তো অনর্থ। উভয়তো অর্থসংশয় হয়ে থাকে যখন পরিকল্পিত অভিগমন থেকে অর্থপ্রাপ্তি হবে কিনা এবং সত্ত্ব ব্যক্তিও অর্থ দেবেন কিনা এরকম সংশয় দেখা দেয়। ব্যয় করে অভিগমন করলে প্রাক্তন নায়ক

ক্রোধবশতঃ অপকার করবেন কিনা, সত্ত্ব ব্যক্তি দেয় ধন প্রত্যাহার করবেন কিনা ইত্যাদি সংশয় দেখা দেয় তখন উভয়তো অনর্থ সংশয় দেখা যায়।

পরবর্তীতে ঔদালকি এবং বাভ্রবের মতের উল্লেখ করে তিনি উভয়তোযোগের সম্পর্কে দুজনের মতই ব্যক্ত করেছেন আর সেই অনুযায়ী তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন কখনো অর্থ আবার বিপরীতে অনর্থ;একদিকে অর্থ আর অনর্থসংশয় আবার কোনসময় অর্থ-অনর্থসংশয়।এইভাবে ছয়টি সন্ধীর্ণভাবে কথা বলা হয়েছে। ধর্ম ও কামের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তিনি এরপরে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন শুদ্ধ সংশয় ও সংকীর্ণ সংশয়দ্বয়ের মধ্যে উল্লিখিত সহায়ের সঙ্গে পরামর্শ করার ফলে যেখানে প্রভূত পরিমাণে অর্থপ্রাপ্তি হবে, অর্থ সংশয় ও গুরুতর অনর্থ প্রশম হবে একজন গণিকার সেইধরনের স্থানে অভিগমন করা উচিত।

ধর্ম ও কামের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য। পরস্পর সংকীর্ণ ও ব্যতিষক্ত(মিলিত) হতে সর্বমোট ৯৬ প্রকার হয়ে থাকে।

এই অধ্যায়ে গোষ্ঠীপরিগ্রহের উল্লেখ রয়েছে। সেই সমস্ততোযোগের উদাহরণ। যেখানে কোন একজন বেশ্যাকে অনেক সংখ্যক বিট অভিগমন হেতু ঘিরে থাকে,সেই নায়িকাও একইসাথে অনেককে স্পর্ধিত করিয়ে থাকেন যাতে সকলের থেকেই অর্থলাভ করা যায়।সেক্ষেত্রে গণিকার মাতা কিছু শর্ত দিয়ে থাকেন এবং বলেন,যিনি এই শর্তসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন তাঁর সাথে অভিগমন হবে।এছাড়াও কোনরকম মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে আগে লাভ বিবেচনা করা প্রয়োজন। সমস্ত ধরনের অর্থ, অনর্থের প্রকারভেদ ও যাবতীয় পূর্বাপর বিবেচনা করে অধিক যে বিষয়টি হবে হয় তা ত্যাগ করবে আর সম্পূর্ণ গ্রহণ করবে।

এই বিভাগেরই অন্তে কুম্ভদাসী, পরিচায়িকা, কুলটা, স্বৈরিণী, নটী, শিল্পকারিকা, প্রকাশবিনষ্টা, রপাজীবা, গণিকা-বেশ্যা ইত্যাদি কয়েকটি বিভাগ উল্লিখিত আছে।

‘কুম্ভদাসী’ অর্থে সামান্যকর্মকরী,

প্রভুর সেবাকারিণী হল‘পরিচারিকা’ ,

‘কুলটা’অর্থে যে অন্যের সাথে প্রচ্ছন্নভাবে মিলিত হয়,

নিজ স্বামীকে তিরস্কার করে নিজের গৃহে বা অন্যত্র অন্যপুরুষের সাথে মিলিত হয় যে ‘স্বৈরিনী’,

নটী অর্থাৎ অভিনয়ের পেশা ব্যতীত যার দেহব্যবসাও রয়েছে,

যারা ‘শিল্পকারিকা’ রজক-তন্তুবায়াদি পেশায় যুক্ত,

যে নারীর কামভাব প্রবল বলে সেই প্রবৃত্তিবশতঃ স্বামীর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে এই পেশা অবলম্বন করে থাকে।

এই ছটি প্রকার রূপাজীবীর ভেদ। এছাড়াও কুম্ভদাসী ও গণিকা-বেশ্যার দুই প্রকার রয়েছে।

বৈশিকপ্রকরণের সামগ্রিক আলোচনার শেষে বাৎস্যায়ন বলেছেন-

“রত্যাঃ পুরুষা যেন রত্যাশ্চৈব যোষিতঃ।

শাস্ত্রস্যার্থপ্রধানত্বাভেন যোগোহত্র যোষিতাম্ ।।”^{৪১}

বাৎস্যায়ন এই সম্পূর্ণ অধিকরণটি বেশ্যাদের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন একথা সত্যি কিন্তু পাশাপাশি একথাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে এই অধিকরণটি পাঠ করলে সাধারণ মানুষের পক্ষে গণিকাদের কথাবার্তা, আচারব্যবহার, কৌশল প্রভৃতি বিষয় অনুধাবন করা আরও সহজ হয়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের এই বৈশিকাধিকরণটি সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ কবিকেই গণিকাচরিত্র নির্মাণের বিষয়ে একটি দিকনির্দেশিকা দিয়েছিল একথা বলা যেতেই পারে। প্রথম অধ্যায়ে একজন বেশ্যা ও তাঁর জীবিকা ও সম্বন্ধস্থাপন ইত্যাদি বিষয় সাধারণ আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ‘পত্নী’-র মত আচরণকারিণী বেশ্যাদের কথা। অপরাপর পরবর্তী চারটি অধ্যায়ে অর্থোপার্জন, দরিদ্র-নিঃসম্বল পুরুষের সংশ্রব মুক্তি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে, আর রয়েছে গণিকাদের বিবিধ স্তরবিন্যাস। সংস্কৃত সাহিত্যের কবিরা তাঁদের রচনায় এই অধ্যায়ের বর্ণিত এক বা একাধিক বিষয়গুলি অনুসরণ করেছেন। Sir Richard F. Burton স্পষ্টি বলেছেন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বর্ণনা গণিকাদের উল্লেখ ব্যতীত অসম্পূর্ণ।^{৪২}

সম্পূর্ণ ‘বৈশিকাধিকরণ’ ব্যতীত সাধারণমধিকরণে ‘বেশ্যা’দের উল্লেখ আছে। চতুঃষষ্টি কলার বিশদ পাঠ ও অভ্যাসের প্রসঙ্গে তাঁদের উল্লেখ আছে। সেগুলি তাঁদের অবশ্য শিক্ষণীয়।^{৪৪} বাৎস্যায়ন বেশ্যাগৃহে গোষ্ঠীসমবায়ের কথা বলেছেন। পানক গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন। ‘ভার্যাধিকরণ’ এ বলা হয়েছে একচারিণী বেশ্যা নায়কের হিত কামনা করে সৎকাজ করবেন। রাজার পরিণীতা ও পূর্নভু স্ত্রীর পরেই গণিকা, বেশ্যাদের নিয়োগ ও পুজার উল্লেখ আছে। এই ক্রমেই তাঁদের আবাসভূমির ব্যবস্থা করার কথা বলা আছে। ‘সাম্প্রয়োগিকাধিকরণ’ এ বলা হয়েছে বেশ্যাদের দ্বারা মুখমেহন করা দোষের নয়-“কুলটাঃ স্বেরিন্যঃ পরিচারিকাঃ সম্বাহিকাশ্চাপ্যেতৎ প্রযোজয়ন্তি”(কা। সূ.পৃ.৪১৮)। অন্তিম অধিকরণ ‘ঔপনিষদিকাধিকরণ’ এ গণিকার বিবাহবিধি ও সৌভাগ্যবর্ধনযোগ বলেছেন-“গণিকা প্রাপ্তযৌবনাং স্বাং দুহিতরং তস্যা বিজ্ঞানশীলরূপানুরূপ্যেণ ত্যনভিনিমন্ত্য সারেণ যোহস্যৈ ইদমিদং চ দদ্যাৎ, স পাণিং গৃহ্নায়াদিতি সংসাধ্য রক্ষয়েদিতি।”(কা।সূ.৪৪০)। তাঁদের বিবাহসংক্রান্ত আরও বিশদ আলোচনার পড়ে বাৎস্যায়ন বলেছেন-“সথৈব তু দাস্যা বা মোচিতকন্যাভাবামুপগৃহীতকামসূত্রামাভ্যাসিকেষু যোগেষু প্রতিষ্ঠিতং প্রতিষ্ঠিতে বয়সি সৌভাগ্যে চ দুহিতরমবসৃজন্তি গণিকা ইতি প্রাপ্যোপচারাঃ।”(পৃ.৪৪১)

এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল সংস্কৃত শাস্ত্র; যার মধ্যে প্রথমে আমরা কামশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ কামসূত্র-কে নির্বাচন করেছিলাম। পরবর্তী অধ্যায়ে ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থাদির(নির্বাচিত)আলোচনাবসরে আমরা শাস্ত্রের তত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্যের রচনাকে মিলিয়ে দেখবো। দেখবো শাস্ত্র কীভাবে সাহিত্যের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

এই অধ্যায়ের নির্বাচিত দ্বিতীয় শাস্ত্রগ্রন্থটি হল আচার্য কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র।

কৌটিল্যের সময়কাল:

প্রাচীন ভারতীয় মনীষার এক অনন্য নিদর্শন অর্থশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্র একাধারে রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি, ‘ধর্ম-অর্থ-কাম’ ত্রিবর্গ পুরুষার্থাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। বিষয়ের ব্যাপকতায়, বর্ণনার গভীরতায়, গ্রহণযোগ্যতায় যুগোপযোগী অর্থশাস্ত্র একইরকমভাবে প্রাসঙ্গিক বর্তমানেও। অর্থশাস্ত্র এই গ্রন্থটির নামোচ্চারণের সময় কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।

‘কৌটিলীয়’ অর্থাৎ কৌটিল্য বিরচিত নাকি কৌটিল্যের অনুসারী শিষ্যগণ কর্তৃক বিরচিত সে প্রসঙ্গে আলোচনার অবকাশ রয়েছে এবং সেই প্রাসঙ্গিক আলোচনা পরবর্তী অংশে করা হয়েছে।

কোনো গ্রন্থ পাঠের পূর্বে কৌতুহলী পাঠকের কিছু সাধারণ অনুসন্ধিৎসা থাকা স্বাভাবিক। যেমন রচনাকারের জীবনী, তাঁর সময়কাল, বাসস্থান এককথায় পূর্ণ জীবনযাপনের বিবরণ। শুধুমাত্র নিছক কৌতুহলই যে এর কারণ তা নয়; আগ্রহী পাঠক জানেন এই তথ্যসমূহই নির্দিষ্ট গ্রন্থরচনার প্রেক্ষিত তুলে ধরবে তাঁদের সামনে। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন গ্রন্থটি রচনার প্রকৃত কার্যকারণ, যা জানা না থাকলে গ্রন্থের পাঠ সার্থকতা লাভ করতে পারে না। ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থপাঠের ক্ষেত্রে তাই সেভাবে কাল বা সময়ের বিচার এবং নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক বা ইতিহাস সম্বন্ধিত নয়। কিন্তু গ্রন্থটির রচনাকার তথা রচনার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির আলোচনা অবসরে যে তথ্যসমূহ পাওয়া যায় সেগুলির ভিত্তিতে বলা যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম সার্বভৌম রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁর শিক্ষাগুরু তথা পথপ্রদর্শক ছিলেন; কিংবদন্তি অনুযায়ী সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিজের প্রতি হওয়া অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তিত্ব অন্বেষণকালে চন্দ্রগুপ্তের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনলাভে সমর্থ হন। সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হলেন ‘কৌটিল্য-চাণক্য’। যিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রধানতম উপদেষ্টা ছিলেন, মনে করা হয় বয়সজনিত কারণে তিনি শেষজীবন অরণ্যে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তিনি ও তাঁর শিষ্যগণ রচনা করেন অর্থশাস্ত্র যা মূলতঃ কৌটিল্যের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, রাজ্য পরিচালন-প্রজ্ঞা প্রভৃতির পরীক্ষিত ও প্রায়োগিকরূপে সফল যাবতীয় কর্মকাণ্ডের গ্রন্থরূপ।

সুতরাং কিংবদন্তি অনুসারে কৌটিল্য মৌর্যসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বমুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন অতএব স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বয়সের হিসেবে তিনি চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা বেশ প্রবীণ ছিলেন। কারণ ধননন্দের রাজসভায় তাঁর উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছি। সময়ের নিরিখে তাঁর আবির্ভাবকাল নিয়ে বিবিধ মতপার্থক্য রয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস ভারতে আসেন এবং ভারতে আগমন তথা মৌর্য সাম্রাজ্যের বিবরণী *ইন্ডিকা* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রাখেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় চন্দ্রগুপ্তের অমাত্য রূপে কৌটিল্যের নামের উল্লেখ নেই। 'ত্রিমুনিব্যাকরণম্'-খ্যাত মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির গ্রন্থেও চন্দ্রগুপ্ত ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গের নাম থাকলেও অদ্ভুতভাবে কৌটিল্যের নামোল্লেখ নেই। আবার কামন্দকের নীতিসার গ্রন্থে তিনি কৌটিল্যকে পূর্বসূরী বলে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রায় সমসাময়িক বা কিছুটা বয়োঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন তাহলে বলা যায় *অর্থশাস্ত্র* খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। আচার্য দণ্ডীও তাঁর 'দশকুমারচিতম্'গ্রন্থের বিবিধ প্রসঙ্গে আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত প্রণীত অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। নানা উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র গ্রন্থে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো দণ্ডী রচয়িতা হিসেবে বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্যের নাম উল্লেখ করেছেন,কৌটিল্য নামক কোন ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেননি। Mark Meclish ও Patrick Oliveile সম্পাদিত *অর্থশাস্ত্রে* এই গ্রন্থটির রচনার কাল আলোচনা করার জন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রথমতঃ বলা হয়েছে কৌটিল্য সমুদ্র তীরবর্তী তথা সামুদ্রিক বাণিজ্যপোতের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। সমুদ্রতীরস্থিত দক্ষিণ এশিয়া কোন ক্ষুদ্র রাজ্যে তাঁর জীবনের বেশ কিছুটা অংশ অতিবাহিত করেছিলেন।এ প্রসঙ্গে বলা যায়, অর্থশাস্ত্রের লেখক এমন রাজার বারংবার উল্লেখ করেছেন যিনি 'বিজিগীষু' অর্থাৎ জয়লাভেচ্ছু - এই শব্দটি যেন বুঝিয়ে দেয় যার বা যে রাজার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ নিবদ্ধ হলো তাঁর রাজত্বের ভৌগোলিক পরিধি সুবিশাল নয়।'লাভ-রক্ষণ-পালন ও পরিবর্ধন' এই নিয়মের পুনরাবৃত্তি রয়েছে *অর্থশাস্ত্রে*।* অশ্বক-অবন্তী-অপরান্ত প্রাচীন ভারতের এই তিনটি প্রদেশের উল্লেখ রয়েছে।কারোও মতে কৌটিল্য বর্তমান ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন, মতের সপক্ষে তাঁরা ওই অঞ্চলের 'কৌটিল্য' উপাধিধারী ব্রাহ্মণদের কথা বলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ অর্থশাস্ত্রে বহু প্রসঙ্গে বহুবার তামা ও রূপার মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ নেই। প্রথম খ্রিস্টাব্দে কুষাণযুগে সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রা তৈরি হয়, অতএব অর্থশাস্ত্র এই সময়ের পূর্বে রচিত হয়। এর ফলে অর্থশাস্ত্র রচনার সময়সীমা কিছুটা হলেও সীমাবদ্ধ করা সম্ভব হল।*

অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রচনাকাল এর শুরুর সময়সীমা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়, সেটি হল গ্রীস দেশের প্রবাল। বিশদে বলা যায় যে আলেকজান্ডারিয়ান প্রবালের কথা যা- দুর্মূল্য ছিল, মধ্যপ্রাচ্যের দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিশদে জানা যায়, এই স্থান থেকে রক্তপ্রবাল আমদানি করা হত, সময়কাল মূলত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। এই তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে অর্থশাস্ত্র প্রণয়নের যে সময়সীমা পাওয়া যায় সেটি হল খ্রিস্টপূর্ব ১০০ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দ। তবুও নিশ্চিত মতামত পোষণ করা সম্ভবপর নয়।

অন্যদিকে মুদ্রারাক্ষস নাটকের প্রণেতা বিশাখদত্ত(আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী) তাঁর নাটকে মৌর্য সাম্রাজ্যের সাথে কৌটিল্যের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন।* যেভাবে তিনি চরিত্রটি এঁকেছেন; তাতে মনে হয় আসলে কৌটিল্যই রাজ্যপরিচালন করতেন। কিন্তু সাহিত্যে উল্লেখ থাকলেও সমতুল ঐতিহাসিক তথ্য অপ্রতুল। এর মতে ‘অধ্যক্ষপ্রচার’ অর্থশাস্ত্রের প্রাচীনতম লিখিত অংশ যা আনুমানিক তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত এবং এটি কোনো একজন ব্যক্তির রচনা নয়।

কৌটিল্যের বংশপরিচয়:

অর্থশাস্ত্র প্রণেতা রূপে কৌটিল্যের উল্লেখ গ্রন্থমধ্যেই বিদ্যমান, কিন্তু রচনাশৈলী এবং রচনাকারের নিজস্ব বক্তব্যানুসারে তিনি পূর্বসূরিদের মতামত, তাঁদের বক্তব্য ইত্যাদিকে সংকলন করেছেন, একত্রিত করেছেন, পরিশেষে তিনি নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের বেশ কিছু জায়গায় ‘ইতি কৌটিলীয়ার্থশাস্ত্রে’ উদ্ধৃত রয়েছে। ভারতীয় সনাতন প্রথানুযায়ী রচনাকার আত্ম-পরিচয়, বংশপরিচয় ইত্যাদি কিছুই পরিষ্কার উল্লেখ করে যাননি। ভারতীয় পন্ডিতবর্গ ‘অহং’-কে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠা করাকে আপন উদ্দেশ্য মনে করতেন। ফলস্বরূপ কেবলমাত্র অর্থশাস্ত্র-ই নয় প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে রচয়িতা আপন অথবা বংশ পরিচয়, তাঁর বসবাসের স্থান ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চুপ হয়ে রয়েছেন।

এই কারণবশতঃ পরবর্তীকালের পন্ডিতবর্গ, পাঠক, গবেষক প্রত্যেকেই তুলনামূলক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কেননা কোন নির্ধারিত সময়কাল,নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বাসস্থান,বংশলতিকা ইত্যাদির অনুপস্থিতির কারণে সেই রচয়িতা সম্বন্ধে কোন একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে আর সে কারণে সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ কাব্য-শাস্ত্র ইত্যাদি আলোচনায় সময়কাল,রচনাকারের পরিচিতি সমস্যা অন্যতম আলোচ্য বিষয় রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। কৌটিল্য ও অর্থশাস্ত্র কোনটিই এর ব্যতিক্রম নয়।

সমগ্র অর্থশাস্ত্রে কিছু কিছু স্থানে কৌটিল্যের উল্লেখ রয়েছে, তেমনি ‘চাণক্য’ ‘বিষ্ণুগুপ্ত’ ইত্যাদি নামের উল্লেখ রয়েছে। নামের ক্ষেত্রেও সমস্যা বর্তমান,একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম নাকি পৃথক ব্যক্তিত্ব? প্রশ্ন বহু স্বাভাবিকভাবেই মতামতও বহু,তাঁর ব্যক্তিপরিচয় সম্বন্ধে বিবিধ উৎস থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলিকে একত্রিত করলে যে চিত্রটি পরিস্ফুট হয় যে, কৌটিল্য চাণক্যের পিতৃদত্ত নাম বিষ্ণুগুপ্ত। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন,তাঁর বাস ছিল তক্ষশীলা নগরীতে।

প্রথমে আসা যাক তাঁর নামের প্রসঙ্গে, বিষ্ণুগুপ্ত তাঁর পিতৃদত্ত নাম। মনে করা হয় তিনি ছিলেন ঋষি চনকের পুত্র অথবা তিনি চনক ঋষির গোত্রভুক্ত কিংবা চনক নামক স্থানে তাঁর বাস, তাই-ই তাঁর নাম চাণক্য ; এই মতও পাওয়া যায় আবার তাঁর নাম ‘কৌটিল্য’ কিন্তু নাম না বলে এটিকে প্রাপ্ত উপাধি রূপেই তুলনা করা যায়। এই কৌটিল্য উপাধি কেন্দ্রিক প্রাপ্ত বিবিধ মতামত থেকে বোঝা যায়, কোনো কোনো পন্ডিতের মতে অত্যন্ত কুটিল বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন বলেই এরূপ সম্বোধন, বিশেষ করে রাজনীতির জ্ঞান এবং তার প্রয়োগিক ক্ষেত্রকে বিচার করলেতো অতি অবশ্যই - এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বিশাখদত্তের ‘মুদ্রারাক্ষসম্’ নাটক যেখানে কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্তের হাত ধরে চন্দ্রগুপ্তের উত্থান,নন্দবংশের ধ্বংস বর্ণিত হয়েছে।নাটকের ঘটনাক্রম পাঠককে বুঝিয়ে দেয় ঠিক কতখানি ক্ষুরধারবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন মানুষটি এবং শুধু তাই ই নয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি যে কোন ক্রুর পদ্ধতি অবলম্বনে পিছপা ছিলেন না,যার মধ্যে বিষপ্রয়োগ,গুপ্তহত্যা সবই রয়েছে অতএব কুটিলমতি কৌটিল্য ভাবা অসম্ভব নয়। আবার কোন মতে কৌটিল্য নয়,

প্রকৃতপক্ষে পদটি হল ‘কৌটল্য’। এই মতের প্রবক্তা মহামহাপাধ্যায় গনপতি শাস্ত্রী মহোদয়ের মতে কৌটল্য পদটি ‘কুন্টল’ গোত্রভুক্ত যদিও প্রমান স্বরূপ বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না।

চাণক্যের বংশপরিচয় বৃত্তান্ত যে সকল তথ্য সমূহ পাওয়া যায় তাঁর উৎসগুলিকে মূলত; জৈন কথা বৌদ্ধ কিংবদন্তি সমূহ থেকে, কামন্দের ‘নীতিসার’ গ্রন্থটিও অন্যতম সহায়তা করে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে।

‘চাণক্য-কৌটল্য’ সম্পর্কিত যতটুকু ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস তথা সাহিত্যগত তথ্যসূত্রের বাইরে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে যা যা তথ্য সমূহ প্রাপ্ত হয়, সেগুলিকে একত্রিত করলে একটি মূল কাহিনীর ছায়া পরিলক্ষিত হয় সেই কাহিনীর নানান রূপান্তর হয়েছে, পরীক্ষিত ঘটনাক্রম পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু চরিত্র সমূহ, কারণ এবং অন্তিম উদ্দেশ্য সাধন- এক, ভিন্ন ভিন্ন কিংবদন্তিতে বর্ণিত বহুলচর্চিত সেই কাহিনীর মূল নির্যাসটুকু আমরা একবার খুব সংক্ষেপে আলোচনা করি কারণ তাঁর কৌটিল্যের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে সহায়তা করবে এবং গবেষণার নির্বাচিত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তৎকালীন ভারতবর্ষের এমন এক ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ- ইত্যাদি বিষয়গুলির চর্চা গবেষণার ক্ষেত্রটিকে/বিষয়টিকে আরও দৃঢ় করবে।

পাটলিপুত্রের রাজা নন্দ বা ধননন্দ, তাঁর রাজ্যসভায় চাণক্যের আগমন (আগমনের কারণ বিবিধ কিংবদন্তি অনুসারে বিবিধ) নন্দ কতর্ক চাণক্যের অপমান প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি সমূলে নন্দ বংশ ধ্বংস করবেন তা যথাযোগ্য উত্তরসূরিকে সিংহাসনে আসীন করবেন তাঁর নিরন্তর অশেষনের ফলে তিনি চন্দ্রগুপ্তের সন্ধান পান এবং যথাযথ মাধ্যমে তিনি চন্দ্রগুপ্তকে প্রস্তুত করে মৌর্যবংশের সূচনা করেন, ভারতের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই মৌর্যযুগ।

চাণক্য সম্পর্কিত যাবতীয় প্রাপ্ত তথ্যাবলীর মূল বক্তব্য কাহিনী এটি কেবলমাত্র উৎসগুলির বিবিধ।

বৌদ্ধ উৎসসমূহের মধ্যে বুদ্ধঘোষ মহা নামক প্রমুখ বৌদ্ধাচার্য রচিত পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলি বিবেচিত হয়েছে, চাণক্যের বংশ পরিচয় সম্পর্কে জৈন সাহিত্যেও কিছু তথ্য পাওয়া যায় শ্বেতাম্বর

সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনদের ‘উত্তরজন্মায়ণ’ নামক গ্রন্থের উপর দেবেন্দ্রগণিনকৃত ‘সুখবোধা’ নামক টিকা অনুযায়ী তিনি ‘গোল্ল’ বা ‘গোল’ জেলায় চন্য নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, যা তক্ষশিলার অংশ। এই কিংবদন্তী অনুসারে জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও চাণক্যের পিতা কনক জৈন ধর্মাস্তরিত হওয়ায় “শ্রাবক” নামে অভিহিত হয়েছেন। উৎসরূপে ‘বৃহৎ কথাকোশ’ নামক জৈন গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। তাঁর পিতার নাম চন্ম বা চনক ও মাতার নাম কনে কবরী এরূপও শ্রুত হয়। জৈন লেখক হেমচন্দ্র চানক্যকে ‘দ্রমিল’ বলেছেন কারণ দক্ষিণ ভারতের তাঁর বাস ছিল।

কামন্দক তাঁর ‘নীতিসার’ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে চাণক্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং চাণক্যকে নিজের গুরুর আসনে বসিয়েছেন। এই গ্রন্থের ‘উপাধ্যায় নিরপেক্ষ’ নামক টিকায় ‘কৌটিল্য’ নামের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ‘কুট’ শব্দটি অবলম্বনে যার অর্থ ‘ধান্যপূর্ণকুম্ভ’—এই কুম্ভসঞ্চয়কারী ব্রাহ্মণদের ‘কুটল’ বলে কারণ প্রাতঃকালের ঘুমের জন্য প্রয়োজনীয় ধান গ্রহণ করেন, ধান ব্রাহ্মণদের বিতরণ করেন বা এক বছরের জীবিকার উপযোগী ধান্যাদি সঞ্চয় করেন বলেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণদের ‘কুটল’ বা ‘কুম্ভীধান্য’ সম্বোধন করা হয়। সম্ভবতঃ চানক্য এরকম গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই কৌটিল্য নাম।

কৌটিল্যের বংশ পরিচয় সম্বলিত তথ্যসূত্রের মধ্যে উল্লেখ্য হলো ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত ‘চাণক্যকথা’ যার রচয়িতা হলেন ‘রবিনর্তক’। কাহিনীর মূল সুরের পার্থক্য সেভাবে চোখে পড়ে না তবে কিছু ব্যতিক্রমী বক্তব্য রয়েছে যদিও সমসাময়িক নয় বলেই এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মান্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বলা যেতেই পারে ‘রবি নর্তক’ ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চাণক্যের চরিত্রগাথা তাঁর কীর্তির পুনর্নির্মান করতে চেয়েছিলেন।

এছাড়া কাশ্মীরি কিংবদন্তিতেও কৌটিল্যের উল্লেখ রয়েছে যদিও তাঁর কাহিনী বিন্যাস অনেক অংশে ভিন্ন এবং সেখানে শকটাল নামক একটি চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যাবলী আলোচনার ফলে যে চরিত্রটি পরিস্ফুট হয় তাতে মনে হতে পারে চাণক্য কৌটিল্য অথবা বিষ্ণুগুপ্ত একই ব্যক্তিত্ব হন বা ভিন্ন ব্যক্তিসত্তারই অধিকারী হন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন লাভ তথা মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির প্রতিহিংসাপরায়ণতা ফলাফল

একথা খুব যুক্তিগ্রাহ্য নয়, আর যদি সেটি সত্য বলে ধরে নিতে হয় তাহলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কৌটিল্য - মৌর্য সাম্রাজ্য তথা অর্থশাস্ত্রের প্রণয়ন নতুন যুগের সূচনা চিহ্নবাহী। অর্থশাস্ত্রের বক্তব্য বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই বুঝিয়ে দেয় যে, ব্রাহ্মণ হলেও রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়ক তথা আদর্শ সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনীতির জ্ঞানই সর্বাধিক প্রয়োজন। আশ্চর্য হলেও একথা ভীষণভাবে সত্যি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রূপে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নাম উল্লেখিত হলেও আদত কারিগর কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। যিনি কেবল পুঁথিগত ভাবে নয়, হাতে-কলমে নিজের শিষ্যের সঙ্গে থেকে তাকে যোগ্য রূপে সিংহাসনের অধিকারী করেছিলেন। মনে করা হয় কৌটিল্য বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণের পর যাবতীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অর্থশাস্ত্র রচনা করেছিলেন।

কৌটিল্য কেবলমাত্র রাজাদের জন্যই এই গ্রন্থটি রচনা করেননি। তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন মন্ত্রী তথা অমাত্যদের জন্যেও। কেননা রাজতন্ত্রের একেবারে শীর্ষবিন্দু যদি রাজা হন, তাহলেও একা তাঁর পক্ষে রাজ্য পরিচালনা সম্ভব নয়। মন্ত্রীর মন্ত্রণা কিংবা অমাত্যগণের দূরদৃষ্টি ব্যতীত কোন রাজ্য সাফল্য লাভ করতে পারে না। প্রাপ্ত যেসব তথ্য সমূহ রয়েছে তাতে এ কথা পরিষ্কার কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী অতএব চাণক্য - কৌটিল্য বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাঁর প্রজ্ঞা এবং চিন্তাশক্তির সম্মেলনে রচনা করেছিলেন অর্থশাস্ত্রের মত গ্রন্থ।

সর্বোপরি কৌটিল্যের নিজস্ব শব্দচয়ন ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয় যে, কৌটিল্যের ক্ষুরধার মস্তিষ্কের অত্যন্ত সুস্পষ্ট চিন্তা ভাবনার ফসল হলো এই গ্রন্থটি। প্রারম্ভ অংশেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় পূর্বসূরীগণের কাছে ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। প্রতিটি বিষয়ে আলোচনায় কৌটিল্য বিভিন্ন আচার্যগণের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আচার্যগণের মতামত বর্ণনার পরেই তিনি নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পূর্বাচার্যগণের অভিমতও খন্ডনও করেছেন, কখনও পরিবর্তন করে স্বতন্ত্র মতামত প্রকাশ করেছেন আবার কখনো বা তাঁদের অভিমতের সাথে একাত্ম হয়েছেন। যে সকল পূর্বাচার্যগণের নামোল্লেখ করেছেন তিনি, তাঁরা হলেন - ভারদ্বাজ,

বিশালাক্ষ, পরাশর, পিশুন, কৌনপদন্ত, বাতব্যাধি এবং বাহুদন্তীপুত্র, মানব, বাহস্পত্য, উশনস্ - প্রমুখেরা উল্লেখ্য।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, এটি কি তাহলে সংকলন গ্রন্থ নাকি নিজস্ব, স্বতন্ত্র রচনা? কৌটিল্য রচনায় ‘ইতি কৌটিল্যঃ’, ‘নেতি কৌটিল্যঃ’ আবার প্রতিটি প্রকরনের শেষে “ইতি কৌটিলীয়ার্থশাস্ত্রে” এরকম উক্তি করেছেন এবং এগুলির দ্বারা কৌটিল্যের রচনা কৃতিত্বই প্রামাণ্য পায়।

সমগ্র অর্থশাস্ত্র রচনার পদ্ধতি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত কারণ বর্তমান যুগেও এর প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম। বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা - উভয়ক্ষেত্রেই অত্যন্ত আধুনিকতার পরিচয়বাহী এই গ্রন্থটি। মূলতঃ দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা রূপে চাণক্যকে মান্যতা দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক তথা গবেষকদের মতে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ দ্বারা অস্বীকৃত না পর্যন্ত অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা কৌটিল্য এই মতটিকেই সত্য বলে গ্রহণ করে নিতে হবে। কেননা ‘চাণক্যের কিংবদন্তী’ আর ‘কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র’ দুটি ভিন্ন মত যদি মুদ্রারাক্ষস রচয়িতা বিশাখদত্ত সচেতনভাবেই তাঁর নাটকে এই দুই ব্যক্তিত্বকে এক করে দেখিয়েছেন।

অর্থশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত, মূলতঃ গদ্যানিবন্ধ হলেও গুরুত্বপূর্ণ স্থলে এবং অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি শ্লোক লক্ষ্যনীয় - এর দ্বারা রচনায় দক্ষতার পরিচয় বিদ্যমান। সংস্কৃত প্রাচীন দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের মূল কথ্য ভাষা ছিল এবং কৌটিল্য সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন তা জানা যায়।

কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র ও ‘পরিচয় সমস্যা’:

আচার্য্য কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটিকে বিষয়বস্তুর নিরিখে রাজনীতি বিষয়ক আবার সমাজনীতি, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। রাজ্য পরিচালনা, রাজার প্রয়োজনীয় শিক্ষা সমূহ, প্রজাপালন পদ্ধতি, রাষ্ট্রযন্ত্রের অগ্রগতি - বিষয়বৈচিত্র্যে অসাধারণ

সমাহার এই গ্রন্থ। ‘অর্থ’ পদটির দ্বারা অর্থনীতি বিষয়ক শাস্ত্র বোঝাতে যাওয়া হয়নি। ভারতীয় সমাজ চেতনের মূল আধার যে চতুর্বর্গ তাঁর তৃতীয় বর্গ ‘অর্থ’ এর কথা প্রধানরূপে ধারণা করা হয়েছে। মনে করা হয় প্রথম বর্গদ্বয় অর্থাৎ ‘ধর্ম’ এবং ‘কাম’ - এই দুটি পুরুষার্থে সাধন হয় অর্থের মাধ্যমে। যদিও কৌটিল্য আরও গভীরে, আরও বিশদে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর দৃষ্টিতে যাবতীয় সম্পদ এবং সম্পদের প্রয়োগকারী মনুষ্যগণের আধারভূত ভূমিকে অর্থ রূপে গ্রহণ করেছেন। সেই ভূমি গ্রহণ, রক্ষণ, পালন ও পরিবর্ধনের বর্ণনা রয়েছে বলেই এই শাস্ত্রটি ‘অর্থশাস্ত্র’ নামে পরিচিত।

কৌটিল্য রাজতন্ত্র বা আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করলে রাজ্য পরিচালনতন্ত্রকে, রাষ্ট্রনীতিকে আদর্শগত পরিকাঠামো দিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন প্রকৃত সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তুলতে। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ বিষয় ও শিক্ষা দিয়েছিলেন।

অর্থশাস্ত্রকে ‘সংকলন গ্রন্থ’ বলা হবে নাকি সম্পূর্ণরূপে চাণক্যের নিজের সৃষ্টি এ বিষয়টিও আলোচনাসাপেক্ষ তবে গ্রন্থটির অধ্যায়বিন্যাস, রচনার পদ্ধতি, ভাষাগত প্রয়োগ

কৌটিল্য প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ:

পন্ডিত সমাজ এখনও আচার্য কৌটিল্যের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে নিঃসংশয় হয়ে উঠতে পারেননি। সেই বিষয়ক মতামত সমূহ ও লব্ধ আলোচনা আগেই বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে। অসাধারণ মনীষা সম্পন্ন এই মানুষটির অনন্যসাধারণ প্রকার সমুজ্জ্বল প্রজ্ঞা অর্থশাস্ত্র যার লেখন পদ্ধতি সংকলন পন্থা বিষয়বস্তু ও বিন্যাস অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবে গ্রন্থিত। স্বাভাবিকভাবেই এটি রচয়িতার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। অর্থশাস্ত্র এমন প্রধান এক গ্রন্থ যা আজও প্রাসঙ্গিক। একনায়ক প্রধান রাজতান্ত্রিক সমাজ থেকে বর্তমানের গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা - সর্বকালীন এর প্রয়োগ কৌশল এবং সেখানেই এর সাফল্য।

যদি কৌটিল্যকে একজন ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য করা হয় তবে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে এই একটি কেবল এই একটিমাত্র গ্রন্থটিই কি রচনা করেছিলেন? নাকি আরো কোন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন

তিনি? অর্থশাস্ত্র- সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্র। কিন্তু কৌটিল্যের অন্য কোন গ্রন্থের কথা সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত হয়নি।

কৌটিল্য ও চাণক্য উভয়ই একই ব্যক্তি যদি একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে বলা যায় সংস্কৃত সাহিত্যে বেশ কিছু সংখ্যক শ্লোক পাওয়া যায়, যেগুলি চাণক্যের রচনারূপে পরিচিত। প্রকৃতই চাণক্য বা কৌটিল্য শ্লোকগুলির রচয়িতা কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায় কেননা, রচয়িতার নাম ব্যতীত রচনাকাল, সংকলন গ্রন্থ, রচনার উদ্দেশ্য বা প্রেক্ষিত কিংবা শ্লোক সংখ্যা, শ্লোকের ভাষা- ইত্যাদি প্রায় সবকটি বিষয় নিয়েই তর্কের পরিসর তৈরি হয়েছে। যদি কৌটিল্য বা চাণক্য এই শ্লোকসমূহ রচনা করতেন তাহলে অন্তত একবারের জন্য হলেও তিনি অর্থশাস্ত্রের সংকলিত গ্রন্থের বা রচিত শ্লোকসমূহের উল্লেখ করতেন। অবশ্য সে প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষিতে অর্থশাস্ত্রের রচনাকারের পরিচিতি ও প্রশ্নের মুখে রয়েছে। এই আলোচনার অবতারণা বা প্রাসঙ্গিকতা কি তবে চাণক্য শ্লোক, বা চাণক্য নীতি শীর্ষক এর বিভিন্ন শ্লোক সংকলন গুলি পাওয়া যায় সে গুলির মূল বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মূলত সামাজিক বিষয়, রাজতন্ত্র, নাগরিক কর্তব্য কর্ম ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। আচার্য চাণক্য অর্থশাস্ত্রে যে রাষ্ট্রের কথা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর সাথে বর্ণিত বিষয়সমূহের মিল বর্তমান। চাণক্য রচিত না হলেও এটি তাঁরই কোন অনুগামী শিষ্য কর্তৃক রচিত হতে পারে। যিনি কৌটিল্যের মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন কারণ রাজতন্ত্রের যে পাঠ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁরা তাঁর ছায়া এই চাণক্যনীতির সাথে এক বলা যায়।

অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত গণিকা বিষয়ক যাবতীয় তথ্যাবলী ও তৎসম্পর্কে কৌটিল্যের অভিমত:

গণিকাবৃত্তি পৃথিবীর ইতিহাসে সুপ্রাচীন বৃত্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম। যদিও (স্বাভাবিকভাবে) এই বৃত্তির কথা উচ্চারিত হলেই সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে কিছু অভিব্যক্তির প্রকাশ লক্ষিত হয়- কখনো তীব্র বিবমিষা, কখনো ঘৃণা, ক্রোধ আবার কখনও বা অপরিসীম এক কৌতুহল কিংবা নিছক আকর্ষণ, অবশ্যই তা যৌনতাকেন্দ্রিক।

যৌনতা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়। যৌন সম্পর্ক লিঙ্গভেদে বিবিধ রকম এবং প্রকৃতির নিয়মের স্বাভাবিক বিষয়কে সমাজের নিয়ম নিয়ন্ত্রকরা সম, বিষম, উভ - ইত্যাদি নানা নামের নিগড়ে বেঁধেছেন। যদিও এই আলোচনার বিষয়বস্তু সেটি নয়। উল্লেখ্য বিষয় হলো যৌনসম্পর্ক (আলোচ্য বিষয় গণিকাবৃত্তি, অতএব নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কই আলোচিত হবে।) এই যৌন সম্পর্কও বিভিন্নভাবে স্থাপিত হতে পারে-

- প্রেম সম্পর্কিত,
- আর্থিক বিনিময়ের মাধ্যমে,
- বলপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন,

যদিও প্রেম সম্পর্কিত যৌনসম্পর্কে যে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে তা স্বাভাবিক ভাবেই আর্থিক বিনিময়ের মাধ্যমে স্থাপিত যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়,সেক্ষেত্রে জীবন-জীবিকা ও পেশাদারিত্বের প্রশ্ন দেখা যায়।

মহামতি আচার্য কৌটিল্য রাষ্ট্রপরিচালনার প্রতিটি বিষয় সূক্ষ্মতিসূক্ষ্মভাবে তাঁর অর্থশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন।সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি স্তরের এবং প্রায় সবধরনের পেশার মানুষের কথা উল্লেখিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থে এবং সেইসূত্রে নানাবিধ পেশাবলম্বনকারিণী নারীদের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই গণিকাবৃত্তি অবলম্বনকারিণীদের কথাও আলোচিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে যেটি বিশেষ করে বলার অবকাশ রাখে,তা হলো কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে ‘গণিকাধ্যক্ষ’- নামক একটি বিশেষ পদের উল্লেখ করেছেন এবং গণিকাবিষয়ক বিষয়গুলি যথেষ্ট বিশদে আলোচনা করেছেন -যার থেকে একথা মনে করা খুব অসঙ্গত হবে না যে, আচার্য কৌটিল্য ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থা গণিকাদের মান্যতা দিয়েছিল। অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এই মানুষটি উপলব্ধি করেছিলেন এই প্রথাকে সমাজের সর্বস্তরের থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা সম্ভবপর হবে না কারণ সর্বসমক্ষে স্বীকৃতি দিতে না চাইলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কোনভাবেই এই প্রথাকে অবসান করতে সম্মত হবে না।তাই তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে একদিকে যেমন গণিকাবৃত্তি অবলম্বনকারিণীদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন,তেমনভাবেই এই বৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত

অর্থকে রাজস্বরূপে গ্রহণ করার নিয়ম চালু করেছিলেন। এই ব্যবস্থা দ্বারা গণিকাদের স্থান সমাজে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছিল কারণ তাঁরা নির্ধারিত রাজকর প্রদান করতেন এবং তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও রাজা তথা শাসকশ্রেণীর উপর ছিল। P.C. Sahoo তাঁর *The Arthasastra on Prostitution* শীর্ষক গবেষণাপত্রে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন-“Even he never hesitated to deal with an ignoble social affair called prostitution and laid down administrative provisions in this regard for yielding maximum benefit to the state and simultaneously keeping his view on the overall welfare of the practitioners.”^{৪৫}

অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণ ‘অধ্যক্ষপ্রচার’- এর সপ্তবিংশ অধ্যায় হলো গণিকাধ্যক্ষ (The Superintendent of Courtesans) যিনি রাজা বা রাষ্ট্রকর্তৃক নিযুক্ত হতেন। রাষ্ট্রনির্দিষ্ট এই গণিকাধ্যক্ষের দায়িত্ব ছিল দেহবৃত্তির সাথে যুক্ত সকল গণিকাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা। পদাধিকারবলে তিনি গণিকাদের নিযুক্ত করা, তাঁদের আচরণ বিধি লক্ষ্য করা, বৃত্তির নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুসরণ করা, সময় মতো নির্দিষ্ট কর প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন। এ ব্যতীত তাঁদের আয়-ব্যয় এবং কোন রকম অপরাধ সংঘটিত হলে সেই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করতেন।

সমগ্র অর্থশাস্ত্র পাঠ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা যায় আচার্য কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন গণিকাধ্যক্ষের দায়িত্ব। তিনি এই বৃত্তি-অবলম্বনকারীনিদের মূলতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং বিভাগটি করা হত সাধারণতঃ তাঁদের রূপ-বয়স ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে।

এই প্রসঙ্গে P.C. Sahoo বলেছেন- “This officer of the State heads an independent department dealing with all the sex-workers working inside the State. It appears from the text that there were two types of such workers, one working under State’s service being fully controlled and protected by the administration and the other type of practitioners running their business privately by paying timely taxes to the State.”^{৪৬}

তবে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা প্রয়োজন যে তিনটি শ্রেণীই কিন্তু রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনটি শ্রেণী হল যথাক্রমে-

ক) রাজ পরিবারের জন্য নির্ধারিত গণিকা,

খ) নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট গণিকা এবং

গ) কোন একজন ব্যক্তির অধীনস্থ এক বা একাধিক গণিকা।

কৌটিল্য ‘গণিকা’ ব্যতীত আরো বেশ কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন, যথা ‘প্রতিগণিকা’, ‘রূপাজীবা’, ‘বেশ্যা’, ‘দাসী’, ‘দেবদাসী’, ‘পুংশ্চলী’, ‘শিল্পকারিকা’ ‘রূপাদাসী’- প্রত্যেকটি(শব্দ), তার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি উপবিভাগে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের গণিকা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যসমূহ বিভক্ত করতে পারি।

অর্থশাস্ত্র বিশদে পাঠ করলে বোঝা যায় যে গণিকাবংশে উৎপন্ন অথবা অগণিকা বংশজাতা, উচ্চকুলোদ্ভবা কোনো নারী কোনো কারণহেতু ভ্রষ্ট হয়ে গেলে তাঁকে এই বৃত্তিতে নিযুক্ত করা হতো। কৌটিল্য ‘অগণিকাস্বয়াম্’ পদটি প্রয়োগ করেছেন।^{৪৭} এই সমস্ত নারীদের অতি অবশ্যই রূপযৌবনবতী এবং বিবিধ কলানিপুণা হতে হবে। তাঁদের বাৎসরিক বেতন বা এককালীন অর্থরূপে সহস্র মুদ্রা (১০০০) পণরূপে রাজকোষ থেকে দান করা হতো, যার দ্বারা তিনি বৃত্তির উপযোগী বেশভূষা, অলংকারাদি ক্রয় করে আগত গণিকাসত্তাকে মুগ্ধ করতে পারেন। গণিকা ব্যতীত প্রতিগণিকা নিযুক্তিকরণের কথা বলা হয়েছে। ডেপুটি প্রস্টিটিউট (Deputy Prostitute) বা Rival Prostitute. যিনি রাজপরিবারের সেবা ইত্যাদি কার্যাবলী করবেন, তাঁর বেতনও হবে ৫০০ পণ অর্থাৎ গণিকার বেতনের অর্ধেক।^{৪৮}

কোনো কারণবশতঃ যদি কোন গণিকা তাঁর বৃত্তি পরিত্যাগ করেন বা মারা যান তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর কন্যা অথবা ভগিনী কিংবা অবর্তমানে পারিবারিক গণিকাতন্ত্রের অন্তর্গত কেউ গণিকার নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পন্ন করবেন। এখানে কৌটিল্য “কুটুস্বার্ধেন প্রতিগণিকাম্”-এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন।^{৪৯} যার ব্যাখ্যা বেশ গভীর অর্থাৎ কর্মত্যাগিনী বা মৃত গণিকার মাতা

সেই শূন্যস্থানে যাকে প্রতিগণিকা রূপে নিযুক্ত করেছেন। তাঁর প্রাপ্ত অর্থের অর্ধাংশ তিনি স্বয়ং পাবেন এবং অপর অর্ধাংশ তাঁর পরিবারের (প্রথমা গণিকা) হাতে দেওয়া হবে এই দুই এর অবর্তমানে সম্পত্তি রাজা অধিগ্রহণ করবেন।

গণিকাধ্যক্ষ পুরুষ আকর্ষণে দক্ষতা ও অলংকার বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমানসারে উত্তমা-মধ্যমা ও কনিষ্ঠা এই তিনটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই তিন শ্রেণীর গণিকাদের কার্যবিধির বিভিন্ন প্রকার -

- কনিষ্ঠা গণিকার প্রভুর পা ধুইয়ে দেওয়া, ছত্র - ভূঙ্গার- শিবিকা প্রভৃতি বহন করা ইত্যাদি কাজ। যার জন্য তাঁর বেতন হল ১০০০ পণ।
- মধ্যম গণিকার প্রভুকে বাতাস করা, কাপড় গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি কাজ। তাঁর বেতন ২০০০ পণ।
- উত্তমা প্রভুর বেশি ঘনিষ্ঠ। প্রভুর সাথে পাশাখেলা, পান সেজে দেওয়া ইত্যাদি তাঁর কার্যতালিকা; বেতন তিন হাজার পণ।
- আবার রূপযৌবন, বয়সের উৎকর্ষতা অনুসারে আরও বিভিন্ন প্রকার কার্যে গণিকাদের নিয়োগ করা হতো -

কনিষ্ঠা - রাজকীয় ছাত্র ও ভূঙ্গারবহনকারীনি

মধ্যমা - ব্যজন ও শিবিকাবহনকারীনি।

উত্তমা - পাটিকা ও রথবহনকারীনি।

যদি কোনো গণিকার বার্ষিক্য হেতু রূপ-যৌবন অপগত হয়, সেই সৌভাগ্যভঙ্গ গণিকাকে তাঁর পরবর্তী গণিকার মাতৃকারূপে অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া বা গণিকাতন্ত্রের শিক্ষাদাত্রীরূপে নিযুক্ত করা হতো। এছাড়াও তিনি পাকশালার কাজে নিযুক্ত হতেন।^{৫০} এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মনোরঞ্জনকারিনী গণিকা বৃদ্ধা হলেই তিনি পরিত্যক্ত হবেন না, রাজার অনুগ্রহেই তিনি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবেন।

মুক্তির ব্যাপারে গণিকা রাজাকে ২৪০০০ পণ নিষ্ক্রয় বা মুক্তি মূল্য (Ransom price) দিতে হবে। গণিকার পুত্র যদি মুক্তি পেতে ইচ্ছুক হয় তবে সেক্ষেত্রে ১২০০০ পণ মুক্তি মূল্য দিতে হবে। সেই সামর্থ্য না থাকলে আট বছর রাজার কুশীলবের কাজ করতে হবে^{৫১}। (লংঘন প্লাবনাদির দ্বারা খেলক বা চরণের কাজ)

গণিকাগৃহের পরিচারিকা সেই বৃত্তি ব্যতীতও নিজে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। যদিও ‘ভগ্নভোগা’ শব্দটির প্রয়োগে এর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বৃদ্ধা হওয়ায় ভোগের অনুপযুক্ত তাই গণিকাধ্যক্ষ তাঁকে কোষাগারে বা মহানসে নিযুক্ত করে দেবেন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, গণিকা স্বয়ং “ভগ্নভোগা” এবং তিনি নিজে বয়স্কা হলে দাসীরূপে পাকশালায় কাজ করবেন।

গণিকার দাসী যদি আগে থেকেই কোনো পুরুষের সহগামিনী হয়ে থাকে, তাঁরই ভোগের জন্য রক্ষিতা রূপে অবস্থান করে তাহলে সেই গণিকাদাসী রাজাকে অথবা প্রভু গণিকাকে মাসিক $১^{১/৪}$ পণ বেতন রূপে দিতে বাধ্য থাকবেন।

গণিকাধ্যক্ষ ভোগ দায় আয়-ব্যয় আয়াতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সমূহ তিনি লিখে রাখেন অর্থাৎ একজন গণিকাধ্যক্ষের কাছে গণিকার দৈনন্দিন ও মাসিক তথা বার্ষিক যাবতীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ তথ্যাবলী থাকতে হবে^{৫২}। বিস্ময়কর বিষয় হলো গণিকাধ্যক্ষের একার পক্ষে যাবতীয় তথ্য সংকলন করা সম্ভব ছিল নাকি তাঁর কোনো গোষ্ঠী ছিল তথ্যসংকলনহেতু, এছাড়াও আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ধরে নেওয়া হচ্ছে গণিকাগণ সত্য তথ্য অধ্যক্ষকে জানানো, কোনোরকম ভ্রান্তি তথ্য তাঁরা করতেন না, অন্যথায় পরিণামে নির্ধারিত শাস্তির ভয় তাঁদের ছিল।

গণিকাকে ভোগ করে যে পুরুষ, তাঁর দ্বারা প্রদত্ত ধন হলো ভোগ।

রাজা বা অন্য পুরুষের নিকট থেকে প্রাপ্ত দান বা মাতৃকুল আগত ধন – দায়।

ভোগের অতিরিক্ত প্রকার ধনাগম হলে তাকে বলে আয়।

গণিকার প্রভাব বা কার্যক্ষমতা বা উত্তরকালের সংস্থান বা অতিরিক্ত অর্থগম – ব্যয় ও আয়াতি।^{৫৩}

গণিকার অত্যাধিক ব্যয়জনিত কার্যগুলি তিনি নিবারণ করবেন। যদি কোনো গণিকা তাঁর আভরণ অলংকারাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মায়ের পরিবর্তে অন্য কোন প্রিয় ব্যক্তির হাতে দেয় তাকে সপাদ চতুষ্পণ দন্ড দিতে হবে। (৪^{১/৪})। যদি তিনি তাঁর স্বাপতেয় (ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ভাজনাদি) বিক্রয় করেন বা আধান বন্ধন করেন তাহলে তাকে ৫০^{১/৪} পণ দন্ড দিতে হবে। সম্ভবত এই দুটি জরিমানা স্বয়ং রাজা গ্রহণ করবেন।

বাকপারুষ্যজনিত অপরাধ ঘটলে [যদি গণিকা তাঁর কাছে আগত উপভোক্তার প্রতি কঠোর বা কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ] তাকে ২৪ পণ জরিমানা দিতে বাধ্য হবে। দন্ডপারুষ্যজনিত অপরাধ ঘটার ফলে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪ পণ দণ্ড দিতে হবে অর্থাৎ যদি গণিকা কাউকে শারীরিক নিগ্রহ করে বা লাঠি দিয়ে তাড়না ইত্যাদি করেন।

যদি গণিকা কোপবশতঃ কোন ব্যক্তির কর্ণছেদন করে তবে তাকে ৫০^{১/২} পণ তাঁরপর ১ পণ তারপর ^{১/২} অর্থাৎ ৫১^{১/৪} পণ দিতে হবে। উল্লেখ্য বিষয়, বাকপারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যজনিত জরিমানা সম্ভবত গণিকাধ্যক্ষ গ্রহণ করতেন।

গণিকা বা অগণিকা কোন কুমারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পুরুষ তাঁর উপর বলাৎকার করলে তাকে উত্তম সাহস দণ্ড দিতে হবে অর্থাৎ ১০০০ পণ জরিমানা দিতে হবে।

যদি সম্মত হওয়া সত্ত্বেও কুমারীর উপর বলাৎকার করা হয় তবে তাঁর জন্য পূর্ব সাহস দণ্ড ২৫০ পণ জরিমানা দিতে হবে।

অকামা বা অনিচ্ছুক কোনও গণিকাকে কোনো পুরুষ যদি নিজ গৃহে অবরুদ্ধ করে রাখে বা নিষ্পতন করে, পরে তাকে নিয়ে অন্যত্র পলায়ন বা মতান্তরে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি দেয় কিংবা দন্ত-নখাদি ক্ষতের দ্বারা গণিকার রূপ বিকৃত করা হয় তবে ১০০০ পণ দণ্ড দিতে হবে।

গণিকার শরীরের বিশেষ স্থানে নখ দন্ত ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতের সৃষ্টি করলে দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। গুরুত্ব অনুসারে নিষ্ক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে (৪৮০০০ পণ)।

ছত্র ভূঙ্গার বহনকারীনিরূপে নিযুক্ত পারদর্শিনী গণিকাকে কোন ব্যক্তি হত্যা করলে,হত্যাকারীকে নিষ্কর মূল্যের (২৪০০০) তিনগুণ পণ দিতে হবে(৭২০০০) ।

গণিকার মাতা,গণিকাবৃত্তিতে অনিযুক্ত কন্যা,রূপদাসী - এই তিনজনকে হত্যা বা আঘাত করা হলে উত্তম সাহস দণ্ড ১০০০০০ পণ ভোগ করতে হয়।

উপরিউক্ত জরিমানা তথা দণ্ডবিধান কেবলমাত্র প্রথমবারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য পরবর্তীতে এগুলি দ্বিগুণ-তিনগুণ ভাবে বৃদ্ধি পাবে কিন্তু চতুর্থবার পুনরাবৃত্তিতে বিচার কর্তার ইচ্ছানুরূপ দণ্ড হবে। তা নির্দিষ্ট আর্থিক দণ্ডের চারগুণ, অপরাধীর সর্বস্বহরণ, নির্বাসন ও হতে পারে।

তাঁরা রাজাদেশ মান্য করতে বাধ্য ছিলেন। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে পরিষ্কার জানিয়েছেন যে, যদি গণিকা রাজাদেশের অবাধ্য হয়ে পুরুষের কাছে ভোগের জন্যে না যান তবে হাজার শিফা করাঘাত বা ৫০০০ পণ জরিমানাও দিতে হতে পারে। ভোগ গ্রহণ করার পরেও যদি গণিকা সেই পুরুষের সেবা করতে অস্বীকার করে বা অনিচ্ছা প্রকাশ করে তবে তাকে দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে। যদি তিনি বসতি ভোগ অর্থাৎ সম্ভোগমূল্য গ্রহণ করেও সশরীর ভোগ করতে না দিয়ে অপহার করেন তবে তাকে ৪ গুণ জরিমানা দিতে হবে।^{৫৪}

কৌটিল্য একথাও উল্লেখ করেছেন সম্ভোগেচ্ছুক পুরুষের কোনো সংক্রামক ব্যাধি থাকলে গণিকাকে কোনো পণ দিতে হবে না।

রূপাজীবাদের দৈনিক দুদিনের বেতন প্রতিমাসে কররূপে প্রদানের কথা কৌটিল্য বলেছেন অর্থাৎ মাসিক আয়ের ১/১৫ ভাগ।

অর্থশাস্ত্র থেকে গণিকাচার্যের নিয়োগ, বৃত্তি ও কার্যাবলীর কিছু তথ্য প্রাপ্ত হয়। কৌটিল্যের মতে অনুযায়ী গণিকাপুত্র ও রঙ্গোপোজীবী ব্যক্তিগণ এছাড়া তালাবচর ব্যক্তিদের আচার্য বা আচার্য স্থানীয়রূপে নিয়োগ করা যায়, তাঁদের বৃত্তিপ্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে রাজা, রাজমন্ডল থেকে অর্থাৎ নগর ও গ্রাম সমূহ থেকে সংগৃহীত অর্থ থেকে আচার্যের বৃত্তির (আজিব এর) ব্যবস্থা করবেন। আচার্যের নানাবিধ কার্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

- গণিকা - দাসী রঙ্গোপজীবিনী নারীদের গীত, বাদ্য, পাঠ্য আখ্যায়িকা পাঠ প্রভৃতির পাঠ কৌশল শেখানো।
- নৃত্য শিক্ষণ - পদার্থ অভিনয় বা ভাব বিহীন নাচ।
- চিত্রকর্ম, বীণা-বেণু- মৃদঙ্গ, পরচিত্ত জ্ঞান, লিপিবিদ্যা শিক্ষণ
- গন্ধযুক্তি, গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতিকরণ শিক্ষণ।
- মাল্য সম্পাদন
- সংবাহন অর্থাৎ অঙ্গমর্দন
- সংবাদন অর্থাৎ কথাবার্তার মাধ্যমে লোককে আনন্দ দেওয়ার বিদ্যা, বাকচাতুর্যের দ্বারা মুগ্ধ করার কৌশল।
- বৈশিক কলা - শিক্ষা দান।

সংকেত বা ইশারায় ও বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী এমন তালাবাচর স্ত্রীদের রাজা অর্থ দানাদির দ্বারা বশীভূত করে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত করবেন।

গুপ্তচরবৃত্তি গণিকাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৃত্তি। অজিতেন্দ্রিয়, অসংযত কর্মকর্তাদের ইন্দ্রিয়দোষের সুযোগে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত করা হয়। যাবতীয় রাজনৈতিক তথ্যাবলী, গুপ্ত চক্রান্তের বিবরণ সংগ্রহের কাজে গণিকাদের নিযুক্ত করা হতো -তাদের কলাকৌশল, ক্ষুরধার বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান এবং অনুকূল পরিস্থিতি পূর্ণ সহায়তা করত এ বিষয়ে। কৌটিল্য গুপ্তচরবৃত্তি প্রসঙ্গে আরো আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধিকরণে বিশদ না হলেও বারংবার নানা প্রসঙ্গে গণিকাদের গুপ্তচরবৃত্তির অবতারণা হয়েছে। কখনোও বসবাস করার প্রসঙ্গে কখনো বা অন্য কোন প্রসঙ্গে।

অনাশংসনীয় অর্থাৎ অনুপযুক্ত স্ত্রী কোথায় বাস করবে সে ক্ষেত্রে নর্তকী, গণিকা এঁদের বাসের কথা বলেছেন।

দ্বিতীয় অধিকরণে ‘নাগরিকপ্রণিধিঃ’ আলোচনাবসরে নাগরিক নিয়ম-নীতি ইত্যাদি বলেছেন। শৌণ্ডিক, পাশবমাংশিক, ঔদনিক, রূপাজীবা -এরা নিজেদের পরিচিত এলাকায় বাস করতে

পারবেন আবার গণিকা প্রভৃতি অদাসী স্ত্রীলোককে বলাৎকার পূর্বক সম্ভোগ করলে রক্ষিপুরুষকে মধ্যমসাহস দণ্ড ৫০০ পণ দিতে হবে।^{৫৫}

পুনরায় তৃতীয় অধিকরণ‘ধর্মস্বীয়ম্’-এ ব্যবহারস্থাপনা ও বিশদ পদনিবন্ধ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে সেখানে আরও নানাবিধ বিষয়ের সাথে কথা বলা হয়েছে যে বেশ্যা,শৌণ্ডিক আদি দ্বারা রাত্রির প্রথম ভাগের ব্যবহার ক্ষেত্র বিশেষে অনিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিবাহিত স্বামী স্ত্রী সম্পর্কিত ‘বিবাহসংযুক্তম্’ নামক অধ্যায়ে বলা হয়েছে যদি স্বামী বাহ্যবিহারে, গণিকাদিতে ও বাকপারুষ্য প্রয়োগে আসক্ত হয়,তবে পতিব্রতা, দোষরহিতা স্ত্রী ঈর্ষায়ুক্ত হয়ে বেণুদলাদি দ্বারা প্রহার করতে পারেন।

তৃতীয় অধিকরণ এর পঞ্চাষষ্ঠীতম প্রকরণের ত্রয়োদশ ‘দাস কর্মকারকল্প’ অধ্যায়ে কুলটা সম্ভোগ ও বেতন ব্যবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কোনো পুংচলীর সাথে সঙ্গম করা হয়েছে একথা চিহ্নাদির দ্বারা প্রমাণিত হয় তবে তিনি উপভোগকারীর কাছ থেকে ভোগ ধন বা মৈথুনভূতি লাভ করবে।কিন্তু অভিনয় বা দুর্মতিবশতঃ অত্যধিক অর্থ দাবী করলে অর্থপ্রাপ্তির পরিবর্তে তাঁর দণ্ডপ্রাপ্তি হবে।

আচার্য কৌটিল্য উপলব্ধি করেছিলেন রাষ্ট্র তথা সমাজ কোনোমতেই গণিকাবৃত্তিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে দেবে না আর তা দেবে না নিজের স্বার্থেই। তাই তিনি গণিকাদের মান্যতা দিলেন, মান্যতা দিলেন তাঁদের পেশাকে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে করে তুললেন তাঁদের অনুকূল অন্ততঃ আইনী সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে তো অবশ্যই। কৌটিল্য যেমন গণিকাদের সুরক্ষিত করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করেছিলেন; সেরকমই তিনি তাঁদের থেকে নির্ধারিত কর সংগ্রহের ব্যবস্থাও করেছিলেন। যদিও সেদিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পর্ক দাতা-গ্রহীতার মতই। এইখানে উল্লেখ করতেই হবে আচার্য কৌটিল্য নিজের গ্রন্থে গণিকাদের সেই ‘সমাজস্বীকৃত জনগণ’-এর মর্যাদা দিয়েছিলেন। P.C.SAHOO স্পষ্টই বলছেন-“The intention behind the discussion in the text is to face such an inevitable social problem with a strong political will power in order to promote and protect the overall welfare of the unfortunate practitioners as far as possible and simultaneously ensure some financial gain for the State. Simply blaming the practice or

keeping a safe distance from the same and there by leaving the practitioners to face their own fate are not supposed to be the characteristics of a benevolent State.” ৫৬

কিন্তু কৌটিল্য নির্দেশিত ব্যবস্থা কি সকল দেহবৃত্তিধারিণীদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল? নাকি রূপ-অর্থ-খ্যাতি ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই পিছিয়ে থাকা, অনামী সাধারণীদের জন্য এসব সুযোগ-সুবিধা ব্যবহৃত হতোনা? যদি কোনো কারণে কোনো গণিকা সময়ের মধ্যে কর দিতে অসমর্থ হতেন কি ব্যবস্থা হতো তাঁর? তারপরেও কি তিনি নির্দিষ্ট আইনী সহায়তাগুলি পেতেন? একেবারেই আক্ষরিক অর্থেই ‘সাধারণী’ যাঁরা তাঁদের অবস্থান কেমন ছিল সেই সময়ে- ইত্যাদি বেশ কিছু প্রশ্ন কিন্তু রয়েই যায়। আসলে কোনো ব্যবস্থাই তো একবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত হয়না; তা সম্ভবও নয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়।

আলোচনা:

এই অধ্যায়ে যে দুটি সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচিত হয়েছে সেই *কামসূত্র* ও *অর্থশাস্ত্র* থেকে আমরা প্রাচীন ভারতীয় সমাজে গণিকাদের অবস্থানের একটি বিশদ চিত্র পাই; যদিও চিত্রটি পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চিত্র না পেলেও এই দুটি গ্রন্থে গণিকাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তৎকালীন যুগে গণিকাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থান সম্বন্ধে আমরা একটি স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারি।

কামসূত্র ও *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থ দুটি যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের, ভিন্ন বিষয়বস্তুর এবং ভিন্ন সময়ের রচনা তবুও শাস্ত্রকারের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে গণিকা ও গণিকাবৃত্তিকে যতখানি অনুপুঞ্জভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে মান্যতা দিয়েই আমরা এই দুটি গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

অর্থশাস্ত্র এবং *কামসূত্র*-এই দুটি সম্পূর্ণ পৃথক আধারের শাস্ত্র। অবশ্যম্ভাবীভাবে বিষয়গত অনেক পার্থক্য রয়েছে কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই দুটি গ্রন্থের তুল্যমূল্য সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতিগতভাবে একটি কামশাস্ত্রবিষয়ক এবং আরেকটি মূলতঃ রাজ্য-রাজনীতিমূলক গ্রন্থ। দুটি গ্রন্থের রচনামূল্যের একটি বিশেষ মিল রয়েছে। আচার্য কৌটিল্য এবং আচার্য বাৎস্যায়ন

উভয়েই তাঁদের পূর্বাচার্যগণের মত উল্লেখ করেছেন সসম্মানে। তাঁদের পূর্বপক্ষের মান্যতা দিয়ে নিজেরা উত্তরপক্ষরূপে অবস্থান করেছেন। যে যে বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন সেই প্রত্যেকটি বিষয়ে অগ্রজ পণ্ডিতদের মতগুলি উপস্থাপিত করে তাঁরা অধ্যায়ের অন্তিমে নিজেদের মত ব্যক্ত করেছেন। সবক্ষেত্রেই যে সহাবস্থান দেখা গেছে তা নয়; মতানৈক্যই বেশি। তবে তা হওয়াই স্বাভাবিক কারণ প্রথমতঃ একাধিক অগ্রজের প্রত্যেকের মতামত স্বাভাবিক নিয়মেই এক নয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের সময়কাল ভিন্ন, তাই ভিন্ন সময়কাল এবং ভিন্ন সামাজিক নিয়মের কারণে তাঁদের বক্তব্যে নিজস্বতার পাশাপাশি সমকালীনতার ছাপ রয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে সমাজ বদলায়, পরিবর্তন ঘটে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে আর সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী ধরা থাকে সমসাময়িক শাস্ত্রে তথা কাব্যে। আমাদের আলোচনার বিষয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ‘গণিকাবৃত্তি’, আরও বিশদে বললে গণিকাবৃত্তির অভিব্যাপ্তি। এই অভিব্যাপ্তির ধারা অনুসন্ধানের জন্য আমাদের খুঁজতে হয়েছে সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যের বিপুলায়ন ভাণ্ডারের অগণিত গ্রন্থাদি। তার মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে উপরিউক্ত দুটি শাস্ত্র। এই অধ্যায়ে আমরা শাস্ত্রদ্বয়ের সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে এই শাস্ত্রে উল্লিখিত গণিকাবৃত্তি বিষয়ে পাঠ করেছি। একই বিষয়ের উপর আধারিত দুটি ভিন্ন গ্রন্থ পাঠের পরে স্বাভাবিকভাবেই দুটির মধ্যে একটি পারস্পরিক তুলনা আসে; অন্ততঃ আসা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রেও তাই কামসূত্র এবং অর্থশাস্ত্রের গণিকাবিষয়ক বক্তব্য একটি তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ তৈরি করেছে। বলাই বাহুল্য আমাদের মনে হয়, যেটি আমাদের গবেষণাকাজের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমরা এই দুটি গ্রন্থে বর্ণিত এই বৃত্তিকে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ইত্যাদি বিবিধ দৃষ্টিকোণ বিচার করার প্রয়াস করবো।

সামাজিক অবস্থান: কামসূত্রে বাৎসর্যায়ন যে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে গণিকাবৃত্তি অন্যতম। সেই বিষয়ে বিশদ পাঠ আমরা আগে করেছি। এই বৃত্তি সমাজের এমন একটি দিক তুলে ধরে যাতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সমাজের সবকিছু সর্বজনমান্য নয় এবং

সেটা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন অনেকদিক রয়ে যায়, যার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়না। সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষ বেশ্যালে যায়, বেশ্যাসঙ্গ করে। সেই সময়ে এটি সমাজস্বীকৃত একটি পেশা ছিল এবং সেটি বোঝা যায় কৌটিল্য তাঁর *অর্থশাস্ত্রে* গণিকাধ্যক্ষ' নামক একটি পদের উল্লেখ করেছেন। এই পদটি রাজা কর্তৃক সৃষ্ট অতএব এই পেশা রাজমান্য-সমাজমান্য। শুধু তাই নয় এমন একটি পদের সৃষ্টি একথাও বুঝিয়ে দেয় যে পেশাটির বিস্তার কতোখানি। স্বল্প সংখ্যক মানুষ যদি এই বৃত্তিধারী হতেন তাহলে হয়তো তাকে তত্ত্বাবধান করার জন্য কোন পদ সৃষ্টি করার প্রয়োজন পড়তো না। কিন্তু কোন পেশা ও সেই পেশা অবলম্বনকারীদের যখন তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে হবে এই পেশা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

কামসূত্রে নাগরক' পদটির উল্লেখ রয়েছে, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। রয়েছে তাদের বেশ্যাসক্তির উল্লেখ। বেশ্যাগমন সেকালে অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয় ছিল এবং বর্তমানকালের মত নিন্দনীয় ছিলোনা। বাৎসর্যয়ন যেভাবে নাগরিক জীবনের চিত্র এঁকেছেন সেখানে বেশ্যাদের স্থান অনেকখানি। যেহেতু তাঁদের বিবিধ প্রকার কলা শিক্ষা দেওয়া হতো ও নিরন্তর সেইসকল কলার চর্চা করতে হতো ফলে তাঁদের সাথে মেলামেশার ফলে একধরনের বৌদ্ধিক উন্নতির অবকাশ থাকতো। তাঁদের মতে সেই সময়ের শিল্পকলার প্রবল উন্নতি হয়েছিল, ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্য ছিল ঈর্ষণীয়। কারণস্বরূপ তাঁরা জাভা-সুমাত্রা-কম্বোডিয়া ও চীনের সাথে বাণিজ্যের কথা বলেছেন। স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তি অনুযায়ী অর্থসংস্থানের চিন্তা দূর হলে তবে তার পক্ষে শিল্প-কলাদি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়; যা সেই সময় ঘটেছিল। এই মতের সপক্ষে *কামসূত্রে* নাগরকদের উদাহরণই যথেষ্ট। তাঁদের যাপন যেন বহুত নদীর স্রোতের মত ধীর, স্থির। তাঁরা যেন অর্থ-কামের চর্চায় নিবেদিত হয়েছিলেন কিন্তু ধর্মের অভ্যাস ক্রমশঃ এই লীলাবিলাসের মধ্যে কোথাও গুরুত্ব হারাচ্ছিল তাই বাৎসর্যয়ন এই তিনটি বর্গের মধ্যে যথার্থ সমন্বয়সাধন এবং তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মোক্ষপ্রাপ্তি সহজ করার জন্য কামসূত্র রচনা করেন।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উত্থাপন করা এখানে একান্ত প্রয়োজন। গণিকাদের শিক্ষা, তাঁদের বাস্তবজ্ঞান, রুচিবোধ, শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিবিধ কলায় পটুত্ব এইসব কিছু কোথাও যেন তাঁদেরকে পুরুষের প্রেয়সী করে তোলার জন্যই ব্যবহৃত হত। নারীকে পণ্যরূপে, সজ্জিত দ্রব্যরূপে ভাবার মানসিকতা অতি প্রাচীন। বাৎস্যায়ন নিজেই বলেছেন- ‘পণ্যসধর্মত্বাৎ’ সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরুষই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে এমন কন্যা পছন্দ করে যিনি ব্রীড়াবনতা, গৃহকর্মনিপুণা এবং সন্তানধারণ ও পালনে সক্ষম অর্থাৎ যার সাহায্যে বংশরক্ষা করা যায় এবং দাম্পত্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যে শারীরিক সম্পর্ক তাও যেন অনেকখানি সন্তানধারণের জন্যই হতো। ফলতঃ বহির্মুখী পুরুষ তাঁদের শাস্ত্রচর্চা, কাব্যসমালোচনার জন্যও অনেকসময় গণিকাসঙ্গ করতেন। শারীরিক মিলনের নতুনত্বও বেশ্যাসক্তির অন্যতম কারণ।

নানারকম সামাজিক, ধর্মীয় সমাবেশে গণিকাদের আহ্বান করা হত। নৃত্য-গীতাদির দ্বারা তাঁরা সকলের মনোরঞ্জন করতেন। দেবস্থানে, মন্দির-প্রাঙ্গণে গণিকারাই একটি দীর্ঘ সময় এই ধরনের অনুষ্ঠান প্রদর্শন করতেন। শুধুমাত্র রাজাই নন, উচ্চপদাধিকারী অমাত্য, সেনাপতি, বণিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের কারোর ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে তাঁরা সসম্মানে আমন্ত্রিত হতেন। তাঁদের বিদ্যা-শিক্ষা-ললিতকলা পটুত্ব অনুযায়ী একটি গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ করা হত, তাঁদের কাজ ছিল অতিথিদের মনোরঞ্জন করা।

কখনো কখনো এই ধরনের সমাগম কোনো প্রসিদ্ধ গণিকার গৃহেও আয়োজিত হতো। তবে সাধারণ বেশ্যার তুলনায় ‘গণিকা’ অনেক বেশি সম্মানীয় ছিলেন। সুতরাং এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বাৎস্যায়ন এবং কৌটিল্যের সমাজে এই পেশাবলম্বনকারিণীদের অনস্বীকার্য স্থান ছিল, প্রতিটি সামাজিক স্তরের পুরুষ সে রাজা থেকে একেবারেই সাধারণ জনতা গণিকাসক্ত ছিলেন কিন্তু এই পেশা সর্বজনমান্য ছিলনা। এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়না কিন্তু কোথাও যেন এঁদের প্রতি শীতল উপেক্ষা ছাড়া অন্য কোনো উপহার বা স্বীকৃতি সমাজ সাজিয়ে রাখেনা।

‘কামসূত্র’বেশ্যা এবং যারা বেশ্যাগমন করেন উভয়ের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।এই গ্রন্থে এমন বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে যা কখনো কখনো উভয়ের একত্রে মান্য আবার কখনো তা পৃথক পৃথক ভাবে মান্য।এমন অনেক অংশ রয়েছে যেখানে বাৎসর্যায়ন পুরুষদের সচেতন করে দিয়েছেন। তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্য অনুসারে গণিকাবৃত্তি একটি প্রতারণামূলক বৃত্তি,এখানে প্রায় প্রতিটি পর্যায়েই গম্য পুরুষের প্রতি যে আচরণ করার কথা রয়েছে তা কৃত্রিম। এমনকি বিশেষ পরিস্থিতিতে বাৎসর্যায়ন কৃত্রিম অভিনয় করার কথা বলেছেন তাঁদের, যাতে তাঁরা অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হন।কিছু সময় তাঁকে সহানুভূতিশীল মনে হয়,মনে হয় তিনি বেশ্যাদের সমস্যার বাস্তব দিকটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।তাই তিনি তাঁদের এই ভাবে অর্থসংস্থানের উপদেশ দিয়েছেন।যে চৌষট্টিকলার চর্চায় তাঁদের কুশলী হয়ে উঠতে হতো সেগুলিকে অবলম্বন করে তাঁরা বেশ্যাবৃত্তি ব্যতীত অন্যান্য পেশা গ্রহণ করতে পারতেন কিন্তু সমাজ নির্ধারিত নিয়মে তাঁরা এই পেশাই বেছে নিয়েছিলেন।বাৎসর্যায়ন বারবার বলেছেন গণিকাকে রূপযৌবনবতী হতে হবে এবং একই কথা কৌটিল্যও বলেছেন ফলে কোথাও গিয়ে যেন মনে হয় রূপ এবং যৌবনসম্পন্ন হওয়া গণিকাদের সৌভাগ্যের প্রতীক কারণ তাঁরা ততদিনই উপার্জনক্ষম থাকেন।

আচার্য কৌটিল্য *অর্থশাস্ত্রে* গণিকাদের অন্যান্যবৃত্তির কথা জানিয়েছেন যেমন অন্য গণিকার মাতাস্থানীয়া হয়ে তাঁকে এই পেশার যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া।আবার কখনো তিনি পাকশালায় দাসী হয়ে জীবিকানির্বাহ করতেন তবে প্রত্যেকক্ষেত্রেই যখন সেই গণিকা বয়স্কা ও আর ভোগযোগ্যা থাকেন না তখন এই পেশা গ্রহণ করেন। এই নিয়োগ করতেন গণিকাধ্যক্ষ।

রাজনৈতিক ও আইনগত অবস্থান: গণিকাদের রাজনৈতিক অবস্থানের সাথে তাঁদের অর্থনৈতিক ও আইনগত অবস্থান অনেকাংশে সম্পর্কিত।

এই পর্যায়ে আইনগত অবস্থান বলতে সমাজ তথা রাষ্ট্রযন্ত্রে তাঁদের জন্য কী ধরনের আইনি ব্যবস্থা,সুযোগসুবিধা প্রচলিত ছিল সেই বিষয়ক আলোচনা।কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* এই বিষয়ে যথেষ্ট গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে তুলনায় কামসূত্রে এর উল্লেখ থাকলেও তুলনায় অতখানি

বিস্তারিত আলোচনা নেই।এর কারণ হতে পারে আচার্য কৌটিল্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থশাস্ত্র রচনা করেছিলেন তাতে তিনি রাজ্যের অর্থনীতি ও আইনীব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন।তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখায় সেই দিকগুলি উঠে এসেছে।বাৎসর্যায়ন অনেক বেশি আগ্রহী এবং কৌতূহলী ছিলেন বেশ্যাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা,তাঁদের পেশাগত কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি আলোচনায়।পেশার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় আইনী নিয়মের কথা এসেছে কিন্তু সংক্ষিপ্তরূপে।

আরও একটি পার্থক্য হল বাৎসর্যায়ন ও কৌটিল্য উভয়ে যথাক্রমে ‘বৈশিকাধিকরণম্’ ও ‘গণিকাধ্যক্ষ’(অধ্যক্ষপ্রচারঃ) এই দুটি অংশে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, শীর্ষক থেকেই পার্থক্য বোঝা যায়।রাজা এবং তাঁর রাজতন্ত্র একটি সময় গণিকা নিযুক্ত করতেন।তাঁদের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় সাহায্য রাজকোষ থেকেই করা হতো তবে এই নিয়ম হাতে গোণা কয়েকজন মাত্র গণিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।যে কোন সাধারণ বেশ্যার জন্য নয়।রাজার প্রয়োজনে তাঁরা সর্বপ্রথমে রাজা-রাজার পরিবার-রাজঅভ্যাগতদের সেবা করতে বাধ্য থাকবেন।রাজপ্রয়োজনেই গণিকারা কখনো কখনো গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত হতেন।তবে তা একান্তই রাষ্ট্রের দরকারে।যে যে বিষয়গুলি তাঁদের শিখতে হতো তার মধ্যে রাজনীতির জ্ঞান ছিল অন্যতম। রাজা,বিবিধ উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তির সাথে রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব চর্চা,গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ এগুলিও তাঁদের কাজের অন্তর্গত ছিল।অর্থশাস্ত্রেই কৌটিল্য‘দূতপ্রনিধিঃ’-তে বলেছেন দূত যেন শত্রু রাজার রাজ্যে গিয়ে মদ্যপান,নারীসঙ্গ না করেন।একাকী শয়ন করেন।*অর্থাৎ রাজপুরুষের বেশ্যাসক্তি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ।

এরপরে আসা যাক আইনী ব্যবস্থায়।এই বিষয় নিয়ে দুটি গ্রন্থেই বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এবং সেগুলি আমরা পাঠ করেছি।খুব সংক্ষেপে যদি পর্যালোচনা করি,তাহলে আমরা দেখতে পাব অর্থশাস্ত্রে গণিকাদের জন্য বর্ণিত আইনীব্যবস্থা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।গণিকাদের উপর কোনরকম অত্যাচার হলে প্রয়োজনীয় শাস্তির উল্লেখ রয়েছে।ক্ষতি কতোখানি গুরুতর তার উপর নির্ভর করে

আর্থিক শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হতো এবং সেইরকম গুরুতর অপরাধের জন্য শারীরিক শাস্তির নিদানও ছিল। অপরদিকে গণিকা কোনরকম অপরাধ করলে, চুক্তিভঙ্গ করলে তার সুনির্দিষ্ট আইনব্যবস্থা ছিল।

কামসূত্রেও বাৎস্যায়ন অধ্যায়গুলি আলোচনাবসরে সমাজপ্রচলিত আইনপদ্ধতি, তার প্রয়োগ অন্যথায় শাস্তিবিধানের উল্লেখ করেছেন। অপরাধীর ছাড় পাওয়ার মত কোনো ঘটনার উল্লেখ বা সেই প্রসঙ্গ উল্লিখিত না থাকায় ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আইনব্যবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছ ও নিয়মানুসারী ছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থান: গণিকা-বেশ্যা মূলতঃ এঁদের বৃত্তির কারণেই এঁরা সমাজে প্রান্তিক শ্রেণীভুক্ত হয়ে আছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে হয়তো তাঁরা স্বাবলম্বী কিন্তু সেই স্বাবলম্বন তাঁদের সামাজিক মর্যাদা দেয়নি। তবে সম্প্রয়োগ ব্যতীত নৃত্য-গীতাদি পরিবেশনের মাধ্যমেও তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠা বেশ্যা যিনি জরাগ্রস্তা, বার্ধক্যপীড়িতা তিনি যৌবনে যতবেশি পরিমাণে অর্থের সঞ্চয় করতে সমর্থ হবেন সেটি তাঁর ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর। তবে সেই সময়েও তিনি কোনো কমবয়সী বেশ্যার মাতৃস্থানীয়া হয়ে পেশার যাবতীয় তথ্যাদি শিক্ষা দেবেন। কখনো আবার দাসীবৃত্তি করে অর্থ উপার্জন করবেন অথবা কোন পাকশালায় কাজ করবেন। তবে একথা বোঝা যাচ্ছে, কোন পেশাই সেই অর্থে খুব সম্মানজনক ছিলোনা। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল; অর্থশাস্ত্র আমাদের জানাচ্ছে কিছু কিছু গণিকা রাজানুগ্রহেই তাঁদের বৃদ্ধবয়স অতিবাহিত করতেন।

কৌটিল্য কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে গণিকার শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী তাঁদের বেতন নির্দিষ্ট ছিল আর বাৎস্যায়ন তো বেশ্যাদের অর্থ উপার্জন বিষয়ক একটি অধ্যায়ের নিরূপণ করেছেন। কৌটিল্য শুধু বেতনের পরিমাণ উল্লেখ করেছেন অন্যদিকে বাৎস্যায়ন গণিকাদের কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করে অর্থ সংস্থান করা যায় সেই বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব দুজনের মধ্যে উপস্থাপনগত পার্থক্য থাকলেও মূল বিষয় এক। এমনকি অর্থ উপার্জনের জন্য বাৎস্যায়ন কৃত্রিম অভিনয় ইত্যাদিকেও মান্যতা দিয়েছেন।

এই দুটি শাস্ত্রের ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রাচীনযুগের গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে একটি চিত্র আমাদের সামনে পরিষ্কার ফুটে ওঠে। যে চিত্র অনুযায়ী, গণিকাদের উপস্থিতি সর্বজনস্বীকৃত এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজমান্যও। তাঁদের সাথে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি সমন্বিত বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করা যায়, শাস্ত্র-কাব্য চর্চার সঙ্গী করা যায় এমনকি মূল্যের বিনিময়ে দেহভোগ করা যায় কিন্তু বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া যায়না অন্ততঃ এই দুটি গ্রন্থে কোন উল্লেখ নেই তার।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি নির্বাচিত কাব্যপাঠ এবং তার আলোচনা করে গণিকা চরিত্রের অনুসন্ধান করবো। কবিদের দৃষ্টির আলোকে খুঁজে দেখবো তাঁদের চরিত্রের নানা নতুন দিক, যা আমাদের গবেষণার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

অন্ত্যটীকা ও তথ্যসূচি

১। S.K.De, *Ancient Indian Erotics*, pp.90-91.

২। S.N. SINHA N.K. BASU, *History of Prostitution in India*, p.217:

“Though Vātsyāyana, in a extreme courtesy, has in more than one place of his book subscribed himself as a humble compiler, yet from the internal evidence one is amply convinced that he was not only an able complier, but a very intelligent editor and highly discriminating commentator and a most erudite scholar on the subject he handled.”

৩। *Ibid*, pp.235-236.

৪। M. Krishnamachariar, *History of Classical Sanskrit Literature*, p.888.

৫। A.B. Keith, *History of Sanskrit Literature*, p.461.।

৬। H.C. Chakladar, *Social Life in Ancient India: Studies in Vātsyāyana's Kāmasūtra*, p.24.

৭। Winternitz, *A History of Indian Literature*, p.24.

৮। ত্রিদিবনাথ রায়, *বাৎসায়ন কামসূত্র* (অনু. শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর), পৃ.৪৫০।

৯। *তদেব*, পৃ.১১৬।

১০। H.C. Chakladar, *op.cit.* p. 41 .

১১। ত্রিদিবনাথ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২।

১২। *তদেব*, পৃ.৩।

১৩। Havelock Elis, *Studies in the Psychology of Sex*, Vol.II. p.538.

১৪। Sir Richard F. Burton, p.84.

১৫। ত্রিদিবনাথ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১।

১৬। *তদেব*, পৃ.১৭।

১৭। *তদেব*, পৃ.১৮৮।

১৮। *তত্রৈব*।

১৯। *তত্রৈব*।

২০। *তত্রৈব*

২১। S.C. Upadhyay, *Kamasutra of Vatsayana*, p.205.

২২। *loc.cit.*

২৩। ত্রিদিবনাথ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮৮।

২৪। *তদেব*, পৃ.১৮৯।

২৫। S.C. Upadhyay, *op.cit.*, p.259.

২৬। ত্রিদিবনাথ রায়, *প্রাণভূক্ত*, পৃ.১৯০-১৯১।

২৭। *তদেব*, পৃ.১৯১।

২৮। *তদেব*, পৃ.১৯২।

২৯। *তদেব*, পৃ.১৯৩।

৩০। The Hindoo Kama Society(trans.), *The Kamasutra of Vatsayayna*, p135.

৩১। loc.cit.

৩২। *Ibid*, p.137: When a courtesan is living as a wife with her lover, she should behave like a chaste woman, and do everything to his satisfaction. Her duty in this respect, in short, is, that she should give him pleasure, but should not become attached to him, though behaving as if she were really attached.”^{p137}

৩৩। S.C. Upadhyay, *op.cit.* p.209: “when a courtesan is finally united with her lover she should conduct herself like the one and only wife. She should so arrange it that he feels attracted to her, but not absolutely tied to her; she should however show by her actions that she, on her part, is in fact attached to him.

৩৪। Wendy doniger and Sudhir Kakar(trans.), *Vatsyayana Kamasutra.*, p137: “when she wants to make love with another lover, she uses her disease as her excuse.

৩৫। The Hindoo Kama Society(trans.), *op.cit.*, p.138: “.... If she did not show her shyness, he would imagine that she was cunning, for he would think, ‘Her affection is artificial, since she looks right me all the time.’

৩৬। loc.cit.

৩৭। ত্রিদিবনাথ রায়, *প্রাণভূক্ত*, পৃ.২০২।

৩৮। তদেব, পৃ.২০৬।

৩৯। Wendy doniger and Sudhir Kakar(trans.), *op.cit.*, p. 144.

৪০। The Hindoo Kama Society(trans.), *op.cit.*, p.143: “Now, when a courtesan finds that her lover’s disposition toward her changing, she should get possession of all his best things before he becomes aware of her intentions, and allow a supposed creditor to take them away forcibly from her satisfaction of some pretended debt. After this, if the lover is rich, and has always behaved well towards her, she should ever treat him with respect; but if he as if she had never been acquainted with him in any way before.” B.P144

৪১। ত্রিদিবনাথ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৪।

৪২। তদেব, পৃ.২৪৮।

৪৩। Richard F. Burton and F.F. Arbuthnot (Trans.), *Kāmāsūtra*, “The details of the domestic and social life of the early Hindoos would not be complete without mention of the courtesan...”

৪৪। ত্রিদিবনাথ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬-

“আভিরভূচ্ছিতা বেশ্যা শীলরূপগুণাশ্রিতা।

লভতে গণিকাশব্দং স্থানঞ্চ জনসংসদি।।”

৪৫। P.C. SAHOO, *The Arthasastra on Prostitution*, p.351.

৪৬। *Ibid*, p.359

৪৭। R.P. Kangle, *The Kauṭīliya Arthaśāstra*, Part II. p.158.

৪৮। *Ibid*, p.159.

৪৯। *Ibid*, p.158.

৫০। *Ibid*, p.159.

୫୧ । loc.cit.

୫୨ । loc.cit.

୫୩ । R.P. Kangle, *The Kauṭīliya Arthaśāstra*, Part I, p.81

୫୪ । *Ibid*, pp. 81-82.

୫୫ । *Ibid*, p.94.

୫୬ । P.C. SAHOO, *op.cit.*, p.361.

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত সংস্কৃত কাব্যসমূহে চিত্রিত গণিকাচরিত্রের বিশ্লেষণ ও সামাজিক- অর্থনৈতিক
তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন: মাতা, বধূ, কন্যা।

ভূমিকা:

সংস্কৃত সাহিত্যে সাহিত্যের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য বিপুল। কাব্য এবং শাস্ত্র; উভয়ক্ষেত্রেই সংস্কৃত-সাহিত্য
বহুবিধ অমূল্য রত্নসমন্বিত বারিধিতুল্য। এই বিশাল সমুদ্রে অবগাহন করতে করতে কখনো কখনো
মনে হয়, শাস্ত্র নাকি কাব্য- উৎপত্তির নিরিখে কোনটি আগে? ভাষা এবং ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বিষয়টি
সহজে পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে শাস্ত্র এবং কাব্য এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব পূর্বাপর বিচারের বিষয়টি একটু
জটিল এবং গভীর। একটি তত্ত্ব এবং অপরটি তার প্রায়োগিক রূপ। কিন্তু কাব্য কী? আলংকারিক
বলেছেন, ‘বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্’, কবি নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে কাব্যরচনা করেন, রসাত্মক
বাক্যই যার আত্মা। রচনা করার সময়ে অলঙ্কারশাস্ত্র বা তত্ত্ব কতোখানি স্মরণ করে নিয়মানুসারী
থাকতে পারেন সেটি অবশ্যই লক্ষ্য করার মতো বিষয়। শাস্ত্র নির্ধারিত নিয়মাবলি (অবশ্যই তা ভিন্ন-
ভিন্ন শাস্ত্রকারের নিরিখে বিবিধ) অনুযায়ী কাব্য রচিত হতো আবার কাব্য থেকেই গৃহীত উদাহরণ
ব্যবহৃত হয় অলঙ্কারশাস্ত্রে ফলতঃ তত্ত্ব ও তথ্য উভয়ই মান্যতা পেয়ে থাকে।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিধি বিশাল। বরেণ্য মনীষীদের মনীষার ফলাফল লিপিবদ্ধ রয়েছে
অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতে। সংস্কৃত কাব্যকে তাঁরা বহুভাগে বিভক্ত করেছেন এবং বিভাগ করার
কারণও অবশ্যই বিভিন্ন প্রকৃতির। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ হল-

ক) শব্যকাব্য,

খ) দৃশ্যকাব্য।

আমরা খুব সংক্ষেপে এই দুটি কাব্যপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করবো। অল্প পরিসরে এই আলোচনা করার কারণ দুটি -

১) যেহেতু আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু অলঙ্কারশাস্ত্র নয়; তাই বিশদ আলোচনার সুযোগ আমাদের কম,

২) অধ্যায়ের নামকরণ থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, সংস্কৃত কাব্য (গণিকাচরিত্র বিদ্যমান এমন কাব্য) এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় অতএব যথাযথ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু আলোচনার কারণে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও আলঙ্কারিকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শ্রব্য-দৃশ্যকাব্য সংক্রান্ত আলোচনা আবশ্যিক।

তারও আগে আরেকটি বিষয়, কেন শ্রব্যকাব্য এবং দৃশ্যকাব্য -এই দুটি সাহিত্যকৃতিকে বিশেষ করে বেছে নেওয়া হয়েছে; সেই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে আমাদের গবেষণার মূল বিষয় গণিকা চরিত্র। আলঙ্কারিকদের প্রদত্ত সংস্কৃত কাব্যসমূহের লক্ষণ আলোচনা করলে দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে গণিকা চরিত্রকে অন্যতম প্রধান বা মুখ্য চরিত্ররূপে (নায়িকারূপে) উপস্থাপিত করে বহু কাব্য (শ্রব্য ও দৃশ্য) রচিত হয়েছে। যদিও দৃশ্যকাব্যের সংখ্যা তুলনায় বেশি তাই গবেষণা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগও বেশি। সেইকারণেই কাব্যের এই দুটি ধরনকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থনির্বাচনের কারন:

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের বৈচিত্রের কারণে এই অধ্যায়টিতে গবেষণাকাজের জন্য গ্রন্থনির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাই কাব্যের গঠনগত প্রকৃতি, বিচিত্র নির্মাণকৌশল ও বিবিধবিন্যাস এই দিকগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং তা রাখা হয়েছে সচেতনভাবেই। প্রত্যেক প্রকারের সাহিত্যকৃতি থেকে নির্বাচন করলে কলেবরবৃদ্ধি এবং পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় ফলে মূলতঃ বহুল প্রচলিত সাহিত্যকৃতি থেকেই একটি বা দুটি করে গ্রন্থ নির্বাচন করা হয়েছে।

কেবলমাত্র রচনাশৈলীর গঠনগত পার্থক্য এই নির্বাচনের একমাত্র কারণ তা নয়, পাশাপাশি রচনার সময়কালটিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং সেই কারণেই বিভিন্ন রচয়িতার কাব্যসমূহ গৃহীত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় আলোচনা শুরুর প্রথমেই পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র ভিন্ন সময়ের প্রতিভা বলে অথবা স্টাইলের দিক থেকে পৃথক বলেই নয়, নিজ নিজ কাব্যের মধ্যে গণিকাবৃত্তি এবং গণিকা এই প্রসঙ্গে তাঁদের অনেকের অভিজ্ঞতা, জীবনবোধ, উপলব্ধি অনেকক্ষেত্রেই এক। গবেষণাকাজের জন্য গ্রন্থপাঠ এবং গ্রন্থনির্বাচন করার সময় সেই মিলগুলি আমাদের দৃষ্টিতে আসায় আরও গভীর অন্বেষণে নিরত হই আমরা।

সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষ করে ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য মূলতঃ রাজতন্ত্র এবং রাজাকেন্দ্রিক। রাজানুগ্রহ যার অন্যতম কারণ। তবে সবক্ষেত্রেই একই কারণ প্রযোজ্য নয়। সরাসরি রাজার কৃপাপ্রার্থী, রাজকবি, রাজার সভাসদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে রচয়িতার সীমাবদ্ধতা অবশ্য লক্ষণীয় একটি বিষয়। সাধারণ মানুষ ও তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সংস্কৃতসাহিত্যে বর্ণিত হলেও একমাত্র তাকেই উপজীব্য করে লিখিত রচনার বিশেষ চর্চা অন্ততঃ সেই যুগে ছিলো না বললেই চলে। সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে তারা একটি উপাদানমাত্র; একমাত্র উপাদান নয়।

আমাদের গবেষণাকাজের এই অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হল সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্যে গণিকাদের সার্বিক অবস্থান নির্ণয় করা। আদিমতম এই পেশাবলম্বনকারিণীরা সমাজের সর্বস্তরেই বাস করেন; বৃত্তির কারণেই সর্বস্তরে তাঁদের নিত্য যাতায়াত। সমাজে তাঁদের উপস্থিতি এক অন্যতম চিরন্তন সত্য। সেকারণেই নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের নিরিখে তাঁদের অবস্থান-বিচারের প্রসঙ্গে যত বেশি সম্ভব বৈচিত্র্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থনির্বাচনের ক্ষেত্রে এটিও অন্যতম একটি কারণ।

এই অধ্যায়ে আমরা মোট চারটি সংস্কৃত সৃজনশীল কাব্যকে নির্বাচন করেছি-

- মৃচ্ছকটিকম্
- কুটনিমিতম্
- চতুর্ভাগী

• গুরুসংগতি

মৃচ্ছকটিক:

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের রূপক বিভাগের অন্যতম উপবিভাগ প্রকরণ। শূদ্রক বিরচিত *মৃচ্ছকটিক* এই প্রকরণ শ্রেণীর অন্তর্গত। *মৃচ্ছকটিক* সমগ্র সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত একটি দৃশ্যকাব্য। অসামান্য এর রচনাশৈলী, কাহিনী বিন্যাস এবং বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য। কাব্যরসিকদের কাছে *মৃচ্ছকটিক*-এর আবেদন চিরকালীন।

বসন্তসেনা – বসন্তের শোভা। তিনি নগরবধূ, উজ্জয়িনী নগরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই নগরনটী। ‘বসন্তের শোভার’ মত শোভাময়ী যিনি; নামের সাথে ‘সেনা’ এই পদটির যোগে বোঝা যাচ্ছে তিনি গণিকা। *সাহিত্যদর্পণে* রয়েছে, “দত্তাং সিদ্ধাং চ সেনাং চ বেশ্যানাং নাম দর্শয়েৎ।।”^২ এই প্রকরণের অন্যতম নায়িকা তিনি। প্রকরণের নামকরণের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। *সাহিত্যদর্পণ*কার আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রকরণের লক্ষণে বলেছেন-

“ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্।।২২৪

শৃঙ্গারোহঙ্গী নায়কস্ত বিপ্রোহমাত্যোহথবা বণিক্।

সাপায়ধর্মকামার্থপরো ধীর-প্রশান্তকঃ।।২২৫

নায়িকা কুলজা ক্বাপি বেশ্যা ক্বাপি দ্বয়ং ক্বচিৎ।

তেন ভেদাস্ত্রয়স্তস্য তত্র ভেদস্তৃতীয়কঃ।।

কিতবদ্যুতকারাদিবিটচেটকসংকুলঃ।।২২৬”^৩

তিনি প্রকরণের প্রকারভেদ করেছেন- কোনো প্রকরণের নায়িকা হবেন কুলস্ত্রী, কোনো প্রকরণের নায়িকা হবেন বেশ্যা। আর তৃতীয় যে প্রকারভেদটি তিনি দিয়েছেন সেটি মিশ্র প্রকরণ কারণ তাতে গণিকা এবং কুলস্ত্রী উভয়েই নায়িকারূপে থাকবেন। শুধু তাই ই নয়, কিতব, বিট-চেটাদি চরিত্রে পূর্ণ থাকবে এই মিশ্র শ্রেণীর প্রকরণটি। লক্ষণ অনুযায়ী বোঝা যায় *মৃচ্ছকটিক* মিশ্র শ্রেণীর প্রকরণ। এই

প্রকরণে দুটি নারী চরিত্র রয়েছে - গণিকা বসন্তসেনা এবং নায়ক চারুদত্তের বিবাহিতা পত্নী ধূতা এছাড়াও জুয়াড়ী, বিট, ভূত্য, চোট ইত্যাদি উল্লিখিত সবধরনের চরিত্রের উপস্থিতিও রয়েছে।

ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* নানা প্রসঙ্গে গণিকা, নটীদের উল্লেখ করেছেন

“কলাপ্রয়োগে চাচার্যশুশ্রূষাভিরতা সদা

লীলয়া হাবভাবাভ্যাং সত্ত্বেন বিনয়েন চ।।৮১।।^৪

তিনি নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন গণিকার বৈশিষ্ট্য, তাঁর গুণাবলী-

মাধুর্যেণ চ সংযুক্তা চতুষ্টিকলাস্বিতা।

রাজোপচারকুশলা স্ত্রীদৌষৈশ্চ বিবর্জিতা।। ৮২।।

প্রিয়বাদী প্রিয়কথা স্ফুটা দক্ষা জিতশ্রমা।

এভিগুণৈস্তু সংযুক্তা গণিকা পরিকীর্তিতা।।৮৩।।^৫

কাহিনীবিশ্লেষণ এবং গণিকাচরিত্রের সার্বিক অবস্থান নির্ণয়:

মূচ্ছকটিক প্রকরণে মূলতঃ দুটি কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথমটি হল নায়ক চারুদত্ত ও গণিকা বসন্তসেনার প্রেম এবং দ্বিতীয়টি হল অত্যাচারী, ক্ষমতালিপ্সু রাজা পালককে সিংহাসনচ্যুত করে তার পরিবর্তে জনগণের প্রতিনিধিস্বরূপ গোপালক আর্যক রাজার স্থলাভিষিক্ত করা। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রকরণের কাহিনীবিন্যাসের মাধ্যমেই বোধহয় সর্বপ্রথম রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে, রয়েছে গণ-অভ্যুত্থানের কথা। কিন্তু শুধুমাত্র এই একটি কারণেই *মূচ্ছকটিক* স্বতন্ত্র সাহিত্যকীর্তি নয়; এটি স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে চারুদত্ত এবং বসন্তসেনার প্রেমকাহিনীর ক্ষেত্রেও। কেবলমাত্র নায়ক-নায়িকার প্রেমবর্ণনা করাই রচয়িতা শূদ্রকের উদ্দেশ্য ছিলনা। সেই প্রেমকাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত কিছু তথাকথিত নিয়ম, কিছু অভ্যাস যা একরকম চিরাচরিত বলেই জনসাধারণের ধারণা, সেইধরনের প্রথার পরিবর্তন দেখানো। তবে এ প্রসঙ্গে

আমাদের মনে হয়েছে, রাজা শূদ্রক তাঁর রচনায় যে পরিবর্তনগুলি দেখিয়েছেন সেগুলি যে একান্তই তাঁর কল্পনাপ্রসূত তা নয়।

শূদ্রক একজন ব্রাহ্মণ বণিকের সাথে একজন গণিকার প্রেমকাহিনী বর্ণনা করেছেন। এটি কোনো বিশেষ ব্যতিক্রম নয়। তাহলে *মৃচ্ছকটিক* ব্যতিক্রম কীসে? ব্যতিক্রম সেই ব্রাহ্মণ, বণিক চারুদত্তের সাথে গণিকা বসন্তসেনার প্রেম বিবাহে পরিণতি পাওয়ায়। একজন নগরনটীর ‘কল্যাণীবধূ’ আখ্যা পাওয়ায় ব্যতিক্রমী এই প্রকরণ।

আমাদের গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিষয়ের মূল আধার হল গণিকা-চরিত্র। সংস্কৃত সাহিত্য (শাস্ত্র এবং কাব্য) থেকে বাংলা সাহিত্যে তার অভিব্যক্তি ও প্রভাবনিরূপণ। অভিব্যক্তি অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্তনির্মাণেরও আগে উৎস এবং তার গতিপ্রকৃতির বিবর্তন যথাযথ অনুধাবন প্রয়োজন। সেই ধারা অনুসন্ধানের নিরিখে বলা যেতে পারে, সংস্কৃত সাহিত্যে বোধহয় *মৃচ্ছকটিক*ই প্রথম কাব্য যেখানে গণিকা-বিবাহের কথা বলা হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া যায় আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম থেকে তৃতীয় শতকেই এই কাব্যটি রচিত হয়েছিল তাহলে বলতে হয় সেই সময়ে দাঁড়িয়ে শূদ্রকের এই ধরনের ভাবনা যথেষ্ট যুগান্তকারী। যদিও কামসূত্রে গণিকা বিবাহের প্রসঙ্গ আছে তবু অনেকে মনে করেন শূদ্রক পূর্বসূরী নাট্যকার ভাস্কর চারুদত্ত নাটকের কাহিনী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন তবে যেহেতু সেটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়না তাই এমত সর্বাঙ্গীণ সত্য নয়। নাট্যকার ও অভিনব বিষয়ের উপস্থাপকরূপে তার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। হয়তো তৎকালীন সমাজে তিনি এই ধরনের পরিবর্তন সূচিত হওয়ার কোনোরকম ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে তিনি গণিকাদের সমাজের চোখে একটি সম্মানজনক আসনে বসাতে চেয়েছিলেন তাই নিজের রচিত কাব্যে এই ধরনের ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর এই প্রয়াস নাগরিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কিনা তা জানার কোনো উপায় নেই।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণের প্রথম থেকে শেষ দশটি অঙ্কের কাহিনী জুড়েই বসন্তসেনার উপস্থিতি রয়েছে। কাহিনীর সূত্রপাত থেকে পরিসমাপ্তি সবটাই তাঁকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সাধারণ গণিকাচরিত্রের মালিন্য তাঁকে কোথাও, কোনোভাবেই স্পর্শ করেনি। আপন চরিত্রগুণে এতোটাই উজ্জ্বল তিনি।

এই প্রকরণে গণিকাদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য রয়েছে। তাঁদের জীবনযাত্রা, তাঁদের বাসস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে। একমাত্র বসন্তসেনাই নন। তাঁর মা, দাসী মদনিকা এঁদের কথাও রয়েছে। সামগ্রিকভাবে আলোচনার পরিবর্তে প্রতিটি অঙ্ক অনুযায়ী আলোচনা করা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে কারণ সেইভাবে আলোচনা করলে ঘটনাক্রমের পারস্পর্য এবং তার সাথে সাযুজ্য রেখে কীভাবে প্রতিটি চরিত্র যথাযথ হয়ে উঠেছে তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। তাই খুব সংক্ষেপে হলেও প্রতিটি অঙ্ক অনুসারী আলোচনা করেই এই প্রকরণে বর্ণিত গণিকাচরিত্রগুলি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

দশটি অঙ্কের পৃথক নাম রয়েছে-

প্রথম অঙ্ক	অলংকারন্যাস
দ্বিতীয় অঙ্ক	দ্যুতকরসংবাহক
তৃতীয় অঙ্ক	সন্ধিচ্ছেদ
চতুর্থ অঙ্ক	মদনিকাশর্বিলক
পঞ্চম অঙ্ক	দুর্দিন
ষষ্ঠ অঙ্ক	প্রবহণবিপর্যয়ম্
সপ্তম অঙ্ক	আর্য্যকাপহরণম্
অষ্টম অঙ্ক	বসন্তসেনামোটন
নবম অঙ্ক	ব্যবহার
দশম অঙ্ক	সংহার

উজ্জয়িনী নগরীর একটি সন্ধ্যাবেলার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই প্রথম অঙ্কটিতে এবং ঘটনাক্রম একটু বিস্তৃত এবং জটিল। নায়ক চারুদত্ত ও নায়িকা বসন্তসেনার প্রথম আলাপ এই অঙ্কেই হয়। নগরীর রাজপথে সুসজ্জিতা বসন্তসেনার পশ্চাদ্ধাবনরত রাজা পালকের শ্যালক শকার, যার প্রকৃত

নাম সংস্থানক এবং একজন বিট ও ভৃত্য -এই তিনজন পুরুষ। বলাই বাহুল্য যে, উদ্দেশ্য তাদের সাধু নয় মোটেই। শকার একেবারেই চরিত্রহীন যার মধ্যে নৈতিকতার লেশমাত্র নেই, নেই কোনো সূক্ষ্ম রুচিবোধ। তার কাছে নারী কেবল শরীরমাত্র; উপভোগের বিষয় এবং সেই নারী যদি গণিকা হয় তাহলে সে যেন একান্তই তার সম্পত্তি। তাকে ভোগ করা যেন শকারেরই অধিকার। সেই কাজে তাকে সঙ্গ দেয় বিট এবং তারই ভৃত্য। ভীতা, সন্ত্রস্তা বসন্তসেনা আশ্রয় গ্রহণ করেন বণিক চারুদত্তের বাড়িতে। যদিও তিনি চারুদত্তের প্রতি পূর্বানুরক্তা ছিলেন তাই তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়ে নিশ্চিতবোধ করেন। কিন্তু রাত্রিবাস না করে তিনি তাঁর বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখেন। এই গচ্ছিত অলঙ্কারগুলিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী ঘটনাগুলি আবর্তিত হয়ে থাকে।

প্রথম অঙ্কেই গণিকা বসন্তসেনা সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা আমরা পেতে পারি এবং এই ধারণা নির্মাণে আমাদের সহায়তা করে অন্যান্য চরিত্রদের সাথে তাঁর কথোপকথন এবং আচরণ। তাঁর নিজস্ব স্বগতোক্তি কিংবা অন্যান্যদের সাথে উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়েই আস্তে আস্তে পাঠকদের সামনে তাঁর চরিত্র নির্মিত হয়েছে। তিনি কোনো সাধারণ বেশ্যা নন। তিনি শিক্ষিতা, বিদুষী, রূপবতী একজন নগরনটী। শূদ্রক প্রকরণের শুরুতেই বলেছেন-

“অবস্তীপুৰ্যাংদ্বিজসার্থবাহো যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।

গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য বসন্তশোভেব বসন্তসেনা।।৩।।”^৬

এই একটি শ্লোকে নায়ক চারুদত্তের কথা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বসন্তসেনার কথাও। কয়েকটি শব্দের সচেতন ব্যবহারে তিনি বসন্তসেনাকে অন্যান্য সাধারণ বেশ্যার থেকে স্বতন্ত্র করে এঁকেছেন। ‘গুণানুরক্তা গণিকা’ যিনি এমন একজন পুরুষের প্রতি আকর্ষিতা হয়েছেন যিনি পেশাগতভাবে বণিকসম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু বর্তমানে তাঁর আর্থিক অবস্থা উন্নত নয়, তিনি দরিদ্র হয়ে পড়েছেন তৎসত্ত্বেও বসন্তসেনা তাঁর প্রেমে মুগ্ধ কারণ চারুদত্তের গুণ। যে গুণের কথা স্বয়ং শকারের সঙ্গী বিট উচ্চারণ করেছেন-

“দীনানাং কল্পবৃক্ষঃ স্বগুণফলনতঃ কুটুম্বী

আদর্শঃ শিক্ষিতানাং সুচরিতনিকষঃ শীলবেলাসমুদ্রঃ।

সৎকর্তা নাবমন্তা পুরুষগুণ নিধির্দক্ষিণোদারসত্ত্বো

হোকঃ শ্লাঘ্যঃ স জীবত্যাধিকগুণতয়া চোচ্ছসন্তীবচান্যে।।৪৮।।^৭

পেশার কারণে স্বভাবগতভাবে কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের পেশা কিংবা আর্থিক সম্ভতি যাঁদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে; সেই শ্রেণীর একজন দেহপেশারিনি কেবলমাত্র গুণের বশীভূত হয়ে পড়েছেন-ব্যতিক্রম বইকী! কামসূত্রে বাৎস্যায়ন বলেছিলেন-

‘কামপরাসু হি পুংসাং বিশ্বাসযোগাৎ।’^৮

কিন্তু বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রেমে বিভোর হয়েছিলেন।

চারুদত্ত ধনহীন হয়েছেন কিন্তু তিনি একজন গৃহস্থের পক্ষে করণীয় এবং কল্যাণকর যাবতীয় পূজার্চনা, দান ইত্যাদি কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করতেন। সেইরকমই একটি সন্ধ্যাবেলার ঘটনা উল্লিখিত রয়েছে প্রথম অঙ্কে। নায়িকা বসন্তসেনার প্রবেশের ঘটনাটি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবেই দেখিয়েছেন শূদ্রক। যে সময়ে চারুদত্তের সখা বিদূষক মৈত্রেয় চারুদত্তের অনুরোধ অস্বীকার করেন এবং কারণস্বরূপ উজ্জয়িনীর নগরীর রাজপথের সান্ধ্যকালীন পরিস্থিতির কথা বলেন; ঠিক সেই সময়েই বসন্তসেনার পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ‘বিট-শকার-চেট’ উপস্থিত হয়। এই পরিস্থিতি যেন কতকটা ইচ্ছে করেই তৈরি করেছেন শূদ্রক। মৈত্রেয়ের উক্তি-

“এতস্যাং প্রদোষবেলায়াম্ ইহ রাজমার্গে গণিকা বিটাশেটাঃ রাজবল্লভাশ্চ পুরুষাঃ সঞ্চরন্তি।”^৯

আর সেই কথাটিকে মান্যতা দিতেই, সহমত বজায় রাখতেই যেন মঞ্চে বসন্তসেনা এবং বাকিদের প্রবেশ ঘটে। বসন্তসেনার পশ্চাত্ধাবনের এই দৃশ্যটি গভীর অর্থবাহী। বেশ কিছু বিষয় এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়- প্রথমতঃ তৎকালীন সময়ে উজ্জয়িনীর রাজপথ সূর্যাস্তের পরে কোনো সাধারণ নাগরিকের জন্য সুরক্ষিত নয়। দ্বিতীয়তঃ নগরীর পথে প্রকাশ্যে গণিকা, দুশ্চরিত্র পুরুষ যেমন স্বচ্ছন্দে

ঘুরে বেড়ায় ঠিক সেইরকম রাজপুরুষেরাও থাকেন। তৃতীয়তঃ গণিকা-বেশ্যা এঁরা না হয় পেশাগত কারণেই স্বেচ্ছা-বিহারিণী কিন্তু উজ্জয়িনীর রাজপথ কি সাধারণ গৃহস্থবাড়ির কুলাঙ্গনাদের জন্য সুরক্ষিত ছিল? এর উত্তর না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। চতুর্থতঃ আমরা বসন্তসেনাকে ভীতা-সন্ত্রস্তা, পলায়নপরা অবস্থায় দেখি; তাঁকে অনুগমনকারীদের মধ্যে অন্যতম হল রাজা পালকের শ্যালক ‘শকার’ যে নাকি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ। এখন গণিকা বলেই সেই চরিত্রহীন বসন্তসেনাকে ব্যতিবস্ত করছিল নাকি উজ্জয়িনীর রাজপথ যে কোনো নারীর জন্যই অসুরক্ষিত, এমনকী রাজপুরুষদের থেকেও সে প্রশ্ন রয়েই যায়। আর এই প্রশ্নটিকে কিছু হলেও মান্যতা দেয় চারুদত্তের দাসী রদনিকাকে বসন্তসেনাভ্রমে শকারের উৎপীড়নের ঘটনাটি।^{১০}

চারুদত্তকে কামদেবের মন্দিরে একবারমাত্র দেখেই তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন বসন্তসেনা। তাঁর এই অনুরাগ কিন্তু গণিকাচরিত্রের সাধারণ স্বভাবগুলির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তার আরও বেশ কিছু উদাহরণ আমরা পরে পেয়েছি। এর থেকে মনে হতে পারে হয়তো বসন্তসেনা এর আগে কোনো পুরুষসংসর্গ করেননি। এই প্রকরণে তাঁর মায়ের কথা জানতে পেরেছি, যে বিষয়টি ইঙ্গিত দেয় তাঁরা বংশানুক্রমেই এই পেশার সাথে যুক্ত কিন্তু বসন্তসেনার মন সম্পূর্ণরূপে হয়তো পেশাকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারেনি তাই নির্ধন কিন্তু গুণী একজন পুরুষের প্রেমাসক্ত হয়েছেন তিনি। শকারের অত্যাচার থেকে বাঁচতে তিনি অজান্তেই প্রবেশ করেন চারুদত্তের গৃহে; এই সমাপতন নাটকীয় অবশ্যই।

প্রথম অঙ্কে বসন্তসেনার সঙ্গে শকার-বিট-ভৃত্য এই তিনজনের বাদানুবাদ লক্ষণীয়। যদিও ঐ তিনজনের তুলনায় বসন্তসেনার প্রত্যুত্তর খুবই কম। বসন্তসেনার প্রথম পরিচয় আমরা পাই বিটের উক্তিতে-

“কিং ত্বং ভয়েন পরিবর্তিত সৌকুমার্যা

নৃত্যপ্রয়োগবিশদৌ চরণৌ ক্ষিপন্তী।

উদ্বিগ্ন-চঞ্চল-কটাক্ষ-বিসৃষ্ট-দৃষ্টি-

ব্যাখ্যানুসারচকিতা হরিণীব যাসি।।১৩।।^{১১}

গণিকা বসন্তসেনা নৃত্যে নিপুণা তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চলন-পাদবিক্ষেপ ছন্দবদ্ধ হবে কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি হরিণীর মত দ্রুতপাদবিক্ষেপ করছেন। তিনি ভীতা, উদ্ভিগ্না। নিজেকে লম্পট, দুরাচারী ব্যক্তিদের থেকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর তাই যত দ্রুতসম্ভব তাদের সাথে দূরত্বের সৃষ্টি করছেন। এখানেই তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে আরেকটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়ে পরে। যদি কোনো সাধারণ বারম্বার মত তাঁর আচরণ হতো তবে যে ব্যক্তি তাঁকে অর্থ-ধন-অলংকার ইত্যাদি দিতে ইচ্ছুক এমন পুরুষের চিত্তাকর্ষণের জন্য তিনি তাঁর গমনে নিয়ে আসতেন মরালগতি, বিলোল কটাক্ষে শকারের মনোরঞ্জন করতে প্রয়াসী হতেন যা পেশার কারণেই তাঁদের স্বভাবধর্ম কিন্তু তা তিনি করেন নি। তিনি নিজেকে রক্ষা করার সর্বতোভাবে প্রয়াস করেছেন এবং প্রয়োজনমত বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন।

শকারের ভূত্য তাঁকে ‘অজ্জুকা’ সম্বোধন করেছে, যদিও বেশ্যার পরিজন তাঁকে এইরূপ সম্বোধন করে থাকে।^{১২} কিন্তু ভূত্য হয়তো প্রভুর সাথে সম্বন্ধস্থাপনের জন্যই এইরকম সম্বোধন করেছেন। বসন্তসেনাকে ময়ূরী বলার কারণ হয়তো তাঁর লাজুক স্বভাব এবং দ্রুত পলায়নদক্ষতা। আবার কখনো বর্ণনা দিয়েছেন, “রক্ষোৎপলপ্রকরকু”^{১৩}। এই বিটের উক্তি থেকেই আমরা বসন্তসেনার অঙ্গসৌষ্ঠব, তাঁর বেশভূষা, সাজসজ্জা ইত্যাদি জানতে পারি। নবীন, কোমল কদলীর মত অর্থাৎ কোমল, ঈষৎ বর্তুলাকার তাঁর গঠন। এটি বসন্তসেনার নতুন যৌবনের ইঙ্গিতবাহী। কখনো কখনো আবার নারীদেহের উরুকে উপমায় ‘রম্ভোরু’ বলা হয়ে থাকে। বসন্তসেনা কামদেবায়তন থেকে ফিরে আসছিলেন, রক্তবর্ণের রেশমের বস্ত্র পরিধান করেছিলেন তিনি। স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ হেন রূপবতী নারী সম্বন্ধে শকারের বক্তব্য-

“এষা নাগকমোষি কামকাশিকা মৎস্যশিকা লাসিকা

নিনাংসা কুলনাশিকা অবশিকা কামস্য মঞ্জুষিকা।

এষা বেশবধূঃ সুবেশনিলয়া বেশাঙ্গনা বেশিকা

এতান্যসা দশনামকানি ময়া কৃতান্যদ্যপি মাং নেচ্ছতি।।২৩।।^{১৪}

যে যে বিশেষণে বসন্তসেনাকে শকার বিশেষিত করেছে কোনোটিই প্রশংসাসূচক তো নয়ই উপরন্তু তা বসন্তসেনার মতো কোনো বিশেষমর্যাদা গণিকা সম্বন্ধে প্রযোজ্যও নয়। তস্করদের কামেচ্ছা সম্পন্ন করেন যিনি, যিনি মৎস্য ভক্ষণ করেন অর্থাৎ আমিষ আহার করেন, নৃত্যরতা, ‘নির্নাশা’ পাঠে নির্লজ্জা অথবা যে নারীর নাক নীচু আর ‘নির্নাশা’ এরকম পাঠে নিশ্চিতভাবে যে নারী নরকগামিনী, প্রেমিক বা কাঙ্ক্ষিত পুরুষের বংশলোপ করে যে নারী, কামের মঞ্জুষা, অপূর্ব বেশভূষার আধার, বেশ্যালয়বাসকারিণী। এইখানে শ্রদ্ধেয় M.R.Kale ‘Concubine’ শব্দটির প্রয়োগ করেছেন।^{১৫} কোনোভাবেই সে বসন্তসেনাকে নিজের বশীভূত করতে সমর্থ হচ্ছেনা।

বসন্তসেনার পরিধানে রক্তাংগকের বস্ত্র, তাঁর কর্ণে রয়েছে কুণ্ডল, নানাবিধ অলংকারে বিভূষিত। তাঁর অঙ্গে রয়েছে মনোহর মেখলা ‘তারাবিচিত্ররুচিরং রশনাকলাপম্’ হতে পারে এটি মুক্তাখচিত আবার তিনি মনঃশিলার চূর্ণ মুখে লেপন করেছেন। এই টুকরো টুকরো উল্লেখে বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে বসন্তসেনার আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত। ভীতা অবস্থায় তিনি ‘পল্লবক’, ‘পরভৃতিকা’ নামের নিজের দাসদাসীদের আহ্বান করেন। নামগুলি শুনেই বোঝা যায় যথেষ্ট শিক্ষিত, রুচিশীল তিনি।

শকার-বিট-ভৃত্য এই তিনজনের মধ্যে বিট শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন এবং কিছুটা হলেও হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন সেটি তাঁর শব্দচয়ন, ভাষাপ্রয়োগ ইত্যাদি থেকে উপলব্ধি করা যায়। তুলনায় শকার একেবারেই নিম্নস্তরের। তার অর্থসম্পদ, সামাজিক প্রতিপত্তি থাকলেও শিক্ষা বা সুস্থরুচি কোনোটাই নেই, ভৃত্যও প্রভুর অনুরূপ। সেই কারণে বসন্তসেনাকে হত্যা করার হুমকি দেয় সে, বলে তাকেই ভজনা করতে হবে। ঠিক এই মুহূর্তেই বসন্তসেনা বলে ওঠেন-

“শান্তং শান্তম্। অপেহি, অনার্যং মন্ত্রয়সি।”^{১৬}

একজন গণিকার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিবাদ। যে ব্যক্তি তাঁকে ধন-সম্পদ, বিলাসবহুল জীবন দিতে চাইছেন তাকে রাজপথে দাঁড়িয়ে তারই সহচর, অনুগামীদের সম্মুখে নিরস্ত করতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন। আর এই সাহস তিনি পেয়েছিলেন তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা থেকে। আমাদের মনে হয়েছে এই চারিত্রিক দৃঢ়তা বসন্তসেনা অর্জন করেছিলেন প্রেম থেকে। চারুদত্তের প্রতি ঐকান্তিক একমুখী

প্রেম তাঁকে সামান্য এক গণিকা থেকে উন্নীত করেছিল প্রেমিকার আসনে। বসন্তসেনার এই প্রেমিকা হৃদয়ের পরিচয় আমরা পরেও বহুবার পাবো। কিন্তু কোনো গণিকার এহেন প্রতিবাদ কিংবা স্বতন্ত্র হওয়া কোনোটাই খুব সহজে সমাজ মেনে নিতে পারে না। এই পেশাকে অবলম্বন করে যাঁদের জীবননির্বাহ হয় তাঁরা সবসময় তাঁদের জন্য নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলেন। এ যেন অনেকটা অলিখিত আইনের মতো; যদি কোনো বেশ্যা ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছুক হয়েও থাকেন তাহলেও এই সমাজ বাধ্য করে তাঁকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে যেতে। এ যেন এক সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান। সমাজের সেই দৃষ্টিভঙ্গিই যেন উচ্চারিত হয় বিটের কণ্ঠে-

“তরুণজনসহায়শ্চিন্ত্যতাং বেশবাসঃ

বিগণয় গণিকা ত্বং মার্গজাতা লতেব।

বহসি হি ধনহার্যং পণ্যভূতং শরীরং

সমমুপচর ভদ্রে! সুপ্রিয়ং চাপ্রিয়ঞ্চ।।”৩১।।^{১৭}

এখানেই শেষ নয়, বিট তাঁর তুলনা করেছে দীঘি, লতা ও নৌকার সাথে^{১৮}। কারণ তিনি বেশ্যা তাঁর উপর সকলের সমান অধিকার রয়েছে। বলা ভালো তাঁর দেহভোগের অধিকার সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের রয়েছে সেই কারণেই কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের প্রশ্নই নেই। ‘ধনহার্যং’ পদটি বিশেষ লক্ষণীয়, অর্থের বিনিময়ে যে শরীর উপভোগ করা যায়; কোথাও যেন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে বেশ্যাদের কাছে অর্থই সব তাই সে বিষয়ে কার্পণ্য না হলে আর কোনো বিষয়ে আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু আবারো বসন্তসেনার স্পষ্ট মত শোনা যায়-

“গুণঃ খলু অনুরাগস্য কারণম্, ন পুনর্বলাৎকারঃ।।”^{১৯}

এই একটি উক্তি বসন্তসেনাকে অন্যান্য গণিকা চরিত্রের থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র করেছে। একজন গণিকা বলপ্রয়োগে আপত্তি জানাতেই পারেন, সে অধিকার তাঁর রয়েছে। কিন্তু অর্থ এবং গুণ এই দুইয়ের মধ্যে যখন তিনি গুণকে প্রাধান্য দেন তখন তাঁর রুচি এবং শিক্ষা তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধিতে দেয় আমাদের। ‘গুণ’ শব্দটির ব্যাপ্তি বিশাল। এর দ্বারা মানবমন ও আত্মার কিছু ধর্মকে বোঝায়-প্রেম, দয়া, দান,

বিনয়, উদারতা, পরোপকারিতা, বিদ্যা, বিবেক, সৌজন্য, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি। আর এই গুণাবলির
আধারস্বরূপ চারুদত্তের প্রেমাসক্তা তিনি। চারুদত্তের প্রতি আসক্তি রয়েছে যার তাঁর পক্ষে শকারের
মতো কাউকে সহ্য করা বা তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করার কথা কল্পনা করাও স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব
হয়ে পরে। তাঁর শকারের নিষ্ফল আক্রোশের প্রেক্ষিতে বিট বলেন-“রত্নং রত্নেন সংগচ্ছতে।”^{২০}

শকারের সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও বিট আদতে বসন্তসেনাকে সাহায্য করেছেন, তিনি চারুদত্তের বাড়ির
পথনির্দেশ করেছেন। তাঁকে সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন মাল্য-অলংকারাদি থেকে উৎপন্ন শব্দ এবং
গন্ধের কারণে ঘন অন্ধকারেও তাঁকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এইখানে পরিচয় পাওয়া যায় বসন্তসেনার
উপস্থিত বুদ্ধি এবং স্থিরমস্তিস্কের। তিনি অত্যন্ত দক্ষতায় মালা দূরে ফেলে দেন আর অলংকারগুলিকে
হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখেন যাতে কোনোরকম শব্দ উৎপন্ন না হয়। এখানে নিজের উপস্থিত বুদ্ধির
পরিচয় রেখেছেন তিনি। শুধু এই একটিবার নয়, চারুদত্তের বাড়িতে প্রবেশের সময় আঁচল দিয়ে
প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছেন তিনি, ফলস্বরূপ সামান্যসময়ের জন্য যে অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে তাতেই গৃহে
প্রবেশ করেছেন তিনি অর্থাৎ সুযোগ তৈরী এবং তার সদ্ব্যবহার সবেতেই সিদ্ধহস্ত তিনি। এখানে
প্রসঙ্গান্তরের প্রয়োজন। শকার বসন্তসেনা ভ্রমে চারুদত্তের দাসী রদনিকাকে আটক করে, তাঁর কণ্ঠ
শুনে অন্য মানুষ বোঝা গেলেই সেই প্রেক্ষিতে করা বিটের উক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়-রঙ্গালয়ে
প্রবেশ, নৃত্য-গীতশিক্ষার কারণে এবং অভিনয়, স্বরপ্রক্ষেপন ইত্যাদির কারণে স্বরপরিবর্তনে নৈপুণ্য
লাভ করেছেন অর্থাৎ গণিকামাত্রেরই উল্লিখিত বিষয়গুলিতে পটু। তাই তাঁরা বিশ্বাসভাজন নন।^{২১}

বসন্তসেনাকে ‘স্বাধীনযৌবনা’ বলা হয়েছে। যার অর্থ বেশ্যা কারণ নিজের যৌবন নিজের ইচ্ছামত
উপভোগ করার স্বাধীনতা তাঁর আছে। কিন্তু তিনি গুণের আধারভূত চারুদত্তের অনুরক্তা। কোনো
নারীকে বশীভূত করার উপায় হল তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করা অথবা বলা যেতে পারে সেই নারীর
হৃদয়ে স্থানলাভ করা অর্থাৎ প্রেম হল একমাত্র উপায়।

প্রথমাক্ষের শেষাংশের ঘটনাক্রম একটু দ্রুত দেখে নেওয়া প্রয়োজন। চারুদত্তের গাত্রসংলগ্ন
জাতিপুষ্পসুরভিত চাদরটি দেখে বসন্তসেনা স্থিরসিদ্ধান্তে আসেন যে, চারুদত্ত যৌবন ভোগে উদাসীন
নন। এই উপলব্ধির ফলে নিজেকে তিনি যথেষ্টই ধন্য মনে করেছেন। বিদূষকের উক্তি চারুদত্ত

নিজের প্রতি বসন্তসেনার প্রেমের কথা অবগত হন। বিদূষক চারুদত্তকে জানান শকারের আশ্ফালনের কথা, বসন্তসেনাকে প্রত্যাশা না করলে শকার চারুদত্তের সাথে চিরশত্রুতার প্রতিজ্ঞার কথা জানান।

দুজন গুণী,বিনয়ী,স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীপুরুষ উভয়ের প্রেমে আসক্ত। উভয়ে উভয়কে মান্যতা দিয়েছেন, প্রেম স্বীকার করেছেন সেই অধিকারেই বসন্তসেনা নিজের বহুমূল্য অলংকার অনায়াসে নির্ধন চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখলেন যদিও পাঠ করার সময়ে আমাদের মনে হয়েছে এটি দয়িতের সাথে দ্বিতীয়বার দেখা করার সুযোগের প্রস্তুতি।

প্রথমক্ষে বসন্তসেনা প্রধান হলেও আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ বেশ্যার উল্লেখ এসেছে। যেমন বিট শকারকে ‘কাণেলীর পুত্র’ সম্ভাষণ করেছেন। একেবারে শেষে যখন চারুদত্তের ভূত্য বর্দ্ধমানক তেলবিহীন প্রদীপের কথা বলেছে তখন বিদূষক “অপমানিত-নির্ধন কামুকা ইব গণিকাঃ” এই বাক্য উচ্চারণ করেছেন যার অর্থ খুব গভীর। নিঃস্ব ব্যক্তিকে দেখলে বেশ্যারা যেভাবে অপমান করে,স্নেহহীন হয় সেই কথাই বলেছেন। কিন্তু গণিকা বসন্তসেনা এইরকম নন, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি।

এই প্রসঙ্গক্রমে যেটি লক্ষণীয় সেটি হল, ‘বেশ্যাপুত্র’ ইত্যাদি শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ।^{২২} অপছন্দের ব্যক্তিকে বা কোনো কারণে মনান্তর হলে বেশ্যার সন্তান অথবা মাতা-স্ত্রী সম্বন্ধীয় অপমানকর শব্দের ব্যবহার করা যেন অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়াক্ষে গণিকা বসন্তসেনার এক অপূর্ব প্রেমময় রূপ আমরা দেখতে পাই।সাধারণতঃ দেহ যাঁদের বৃত্তির মাধ্যম, তাঁরা বহুমুখী হয়ে থাকেন। প্রেম-সম্পর্ক তাও আবার কোনো একজন বিশেষ পুরুষের সাথে তাঁদের গড়ে ওঠেনা। সেজন্য যতটা দোষারোপ বা নিন্দা তাঁদের করা যায় তার থেকে অনেক বেশি দোষ এই সমাজব্যবস্থাকে দেওয়া যায়। গণিকা মানেই যেন তাঁরা বহুভোগ্যা। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি বাৎসর্যায়ন তাঁর কামসূত্রে সেই একই কথা বলেছেন^{২৩}। বসন্তসেনার রুচিবোধ,তাঁর সংযম লক্ষণীয়। গণিকা হলেও তিনি নিজের দেহবল্লরী সাধারণ বারাজ্ঞানাদের মত সজ্জিত করে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেননা আর এই কারণেই বসন্তসেনা ব্যতিক্রমী।

এক সন্ধ্যার ঘটনা দিয়ে প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি। দ্বিতীয় অঙ্কের সূত্রপাত ঠিক তার পরের দিন সকালে। চারুদত্তের চিন্তায় মগ্ন বসন্তসেনা নিজের স্নান-পূজা ইত্যাদি দৈনন্দিন কর্তব্যকর্মে অবহেলা করেছেন। তাঁর দাসী মদনিকার সাথে পূর্বরাত্রি বিষয়ে আলাপে রত কিন্তু ক্ষণে ক্ষণেই বাক্যের পারস্পর্য হারিয়ে ফেলছেন। আবেগের বশবর্তী হয়ে তাঁর চিত্ত যেন বিকল, জাগতিক বোধশূণ্য হয়ে পড়েছেন। এ হেন অবস্থা লক্ষ্য করে মদনিকা আগ্রহভরে জানতে চান কোন রাজা বা রাজপুরুষকে বসন্তসেনা অনুগৃহীত করবেন? মুহূর্তে বসন্তসেনার তীব্র উত্তর-

“...রক্তমিচ্ছামি, ন সেবিতুম্।”^{২৪}

আরও একবার বসন্তসেনা নিজের স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি সাধারণ দেহপশারিনির মত অর্থাদির বিনিময়ে যে কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হবেননা। তিনি তাঁর প্রণয়ীর সাথে সমানভাবে প্রণয় সম্পর্ক উপভোগ করতে চান অর্থাৎ দেহবিনিময় নয়, প্রেমিকার অধিকার, প্রণয়িনীর সম্মান তাঁর কাম্যবস্তু।

এখানে দুটি পৃথক পৃথক বিষয় ব্যাখ্যা করে নিতে হবে। প্রথমটি হল বসন্তসেনা নিজের পেশা এবং সেই পেশার কারণেই নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়ে যথেষ্ট সচেতন কিন্তু তাঁর প্রেম বা দয়িত চারুদত্তকে নিয়ে কিন্তু তাঁর মনে কোনোরকম সন্দেহ বা অবস্থানগত দ্বিমত নেই। তিনি জানেন এই প্রেম তাঁকে আত্মিকভাবে শুদ্ধ করে তুলেছে। দ্বিতীয়টি হল মদনিকার সঙ্গে তাঁর সংলাপ। নাট্যশাস্ত্রে আছে ‘হঞ্জে’ এই সম্বোধনে বিশ্বস্ত দাসী যিনি কিনা সখীতুল্য তাঁকে সম্বোধন করা যায়। তাই দুজনের সম্পর্ক কতোখানি গভীর তা বোঝা যায় আর হয়ত সেইকারণেই বসন্তসেনা এতো উচ্চকিতভাবে নিজের প্রেমসম্বন্ধীয় কামনার কথা প্রকাশ করতে পেরেছেন। যদিও একজন গণিকা সাধারণ রমণীর থেকে কম লজ্জাশীলা হয়ে থাকেন তবুও মনে রাখতে হবে এটি প্রকরণ, যা নাকি দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত। মঞ্চে সব কিছু অভিনয়ের অনুমতি নেই তবে হতে পারে এই গণিকা চরিত্রটিকে সবার থেকে আলাদা করে বোঝানোর উদ্দেশ্যে শূদ্রক এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। মদনিকার বারংবার প্রশ্নেও অবিচল স্বরে তিনি তাঁর পছন্দের পুরুষের নাম জানিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত যখন চারুদত্ত সম্বন্ধীয় সর্বাপেক্ষা প্রতিকূল বিষয়টি অর্থাৎ তাঁর দারিদ্র্যের কথা মদনিকা নিবেদন করেন তা যেন বসন্তসেনার

প্রেমকে কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়ার মতো। উত্তরে বসন্তসেনা বলেছেন দরিদ্র পুরুষে আসক্তি একজন গণিকার জন্য সম্মানের-

“দরিদ্রপুরুষসংক্রান্তমনাঃ খলু গণিকা লোকেহবচনীয়া ভবতি।”^{২৫}

মদনিকা নানাভাবে তাঁকে প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নে ব্যস্ত করে দিয়েছেন কিন্তু তাঁর উত্তরের অন্যথা হয়নি এমনকি তিনি চেয়েছেন আগে চারুদত্ত স্বয়ং উপলব্ধি করুন যে, বসন্তসেনা কেবলমাত্র তাঁকে ভালবাসেন, তাঁর প্রতি আগ্রহী। চারুদত্তের অর্থহীনতা, দারিদ্র্য কোনটিই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই সময়টুকু তিনি চেয়েছেন চারুদত্তকে দিতে আর সেইকারনেই তিনি অভিসারের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে আহ্বান করেননি উপরন্তু নিজের বহুমূল্য অলংকার তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছেন।

এই অঙ্কের অন্যতম চরিত্র সংবাহক যে কিনা পূর্বে চারুদত্তের গাত্রসংবাহক ছিল কিন্তু বর্তমানে তাঁর নির্ধনতাহেতু বাধ্য হয়েই সে দূতে আসক্ত হয়ে পড়ে। বাজি হেরে অন্যান্য দূতকরদের কাছ থেকে পালানোর সময়ে ঘটনাচক্রে বসন্তসেনা যাবতীয় বিষয় অনুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে নেন। শুধু তাই নয় তিনি চারুদত্তের এক সময়ের ভৃত্য হওয়ার সুবাদে তিনি তাকে পরিজন জ্ঞান করে নিজের হাতের বহুমূল্য আভরণটি দিয়ে মদনিকাকে পাঠান যাতে সংবাহকের ঋণমুক্তি হতে পারে। এই কাজটি কেবলমাত্র দয়াহেতু নয়, নিজের দয়িতের সাথে সম্পর্কযুক্ত সবাই, সবকিছু নিজের বলে বোধ হওয়াই তিনি এই ধরনের কাজ অনায়াসে করেছিলেন। প্রেম মানুষকে উদার করে। আবার কর্ণপূরকও তাঁকে চারুদত্তের ব্যবহৃত, তাঁর নামাক্ষিত জাতীপুষ্পবাসিত চাদরটি দিলে তাঁকেও তিনি অলঙ্কার দিয়েছিলেন পারিতোষিক রূপে। বসন্তসেনার বিপুল অর্থ রয়েছে তাই তিনি ইচ্ছানুসারে দান করেছিলেন কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি চারুদত্তের সাথে কোনো না কোনো সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছিলেন যা তাঁর হৃদয়বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল। প্রতিটি ঘটনায় বসন্তসেনার প্রেমিকারূপটিকে আমাদের সামনে নতুন করে প্রকাশ পেয়েছে।

তৃতীয়াঙ্কে ঘটনার গতি এক অদ্ভুত দিকে বাঁক নেয়। শর্বিলক নামক এক ব্রাহ্মণ সন্তান পরিস্থিতির প্রয়োজনে চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করে এবং চারুদত্তের বাড়িতে সন্ধিচ্ছেদ করে প্রবেশ করে। শুধু তাইই

নয়, বসন্তসেনার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি তিনি নিদ্রিত বিদূষকের হাত থেকে গ্রহণ করেন। নিজের এই অধঃপতনের কারণস্বরূপ মদনিকার উল্লেখ করেছেন। এই মদনিকার উল্লেখ আমরা আগের অধ্যায়ে পেয়েছি, তিনি গণিকা বসন্তসেনার দাসী ছিলেন। তবে তিনি শুধুই দাসী ছিলেন নাকি তিনিও বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন তার পরিষ্কার ইঙ্গিত না থাকলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি একই পেশাবলম্বিনী ছিলেন। মনে করার কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে প্রথমতঃ শর্বিলক মদনিকার নামোচ্চারনের সময় প্রতিবার ‘গণিকা’ শব্দটির উল্লেখ করেছেন। এখানে এই শব্দটির প্রয়োগে মনস্তত্ত্বের গভীর দ্বন্দ্ব আছে বলেই আমাদের মনে হয়েছে। একজন প্রেমিকার পরিচয় সে সেই পুরুষটির প্রেমিকাই, সে বেশ্যা কিনা তা তাঁর পরিচয় হতে পারেনা যেহেতু পুরুষটি তাঁর পরিচয় জেনেই প্রেমে আবদ্ধ হয়েছে। আবার ব্রাহ্মণ হয়ে গণিকার সাথে প্রেম বা সম্পর্ক এই বিষয়টিও পুরুষটির মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে; হতে পারে সেটি সামাজিক অবস্থানগত অস্বস্তি তবে তিনি নিজের প্রেমাস্পদাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন তাঁর সঙ্গে হয়ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন এরকম মনোবাসনার কারণে। দ্বিতীয়তঃ মদনিকার মুক্তির জন্য তিনি চুরির মত দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। মদনিকার মুক্তির জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন কিন্তু সেই পরিমাণ অর্থের সংস্থান তাঁর নিজের না থাকায় তিনি এই উপায় গ্রহণ করেছেন। আচার্য কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে গণিকামুক্তির বিষয়টি আলোচনা করেছেন। সেই প্রসঙ্গে বিশদ নিয়মাবলী আছে যা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।^{২৬}

অঙ্কের শেষে দেখা যায়, বসন্তসেনার গচ্ছিত অলংকার চুরি যাওয়ার কারণে চারুদত্ত এবং বিদূষক অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়েন। চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা নিজের বহুমূল্য রত্নহার স্বামীর সম্মানরক্ষার্থে অনায়াসে বিদূষককে দিয়ে দেন বসন্তসেনার হত অলংকারগুলির পরিবর্ত হিসেবে তাঁকে দেওয়ার জন্য। চারুদত্তের অভিন্নহৃদয়সখা মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার কাছে গিয়ে সেই রত্নহারটি দিতে অনুরোধ করেন।

এই অঙ্কে একটি বিশেষ বিষয় আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে, বসন্তসেনার আভূষণগুলি একটি বস্ত্রখণ্ডে জড়ানো অবস্থায় ছিল। মৈত্রেয় সেটিকে যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য ‘চতুঃশালা’-তে প্রবেশ করাতে

চেয়েছেন কিন্তু চারুদত্ত বারণ করেছেন এবং কারণ হিসেবে বলেছেন যেহেতু সেগুলি ‘প্রকাশ্য-নারী’ অর্থাৎ একজন বেশ্যা স্পর্শ করেছেন তাই সেটির চতুঃশালায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ^{২৭}। এইখানে আমাদের মনে হয়েছে বসন্তসেনার গণিকা পরিচয় জেনেই চারুদত্ত তাঁর প্রেমে আকুল কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে সেই নারীর ব্যবহৃত গহনার প্রবেশ নিষিদ্ধ। আসলে দীর্ঘকালীন শুচিতার বোধ, আজন্মলালিত সংস্কার চারুদত্ত ত্যাগ করতে পারেননি বলেই এইরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কোথাও গিয়ে আমাদের মনে হয় মনের প্রবৃত্তির থেকে এই সংস্কার কোথাও যেন বড় হয়ে উঠেছে।

গণিকাদের জীবন, তাঁদের যাপন, তাঁদের বাসস্থানের যাবতীয় তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাত্যহিক বিষয়ও চতুর্থাঙ্কে বর্ণিত রয়েছে। এই অঙ্কটির নাম ‘মদনিকা-শর্বিলক’। এই নামকরণ থেকে মনে হতে পারে এই দুজনই এই অঙ্কের মূল চরিত্র এবং তা কিছুটা হলেও ঠিক। তবে এই অঙ্কে বসন্তসেনা তাঁর যথাযোগ্য সম্ভ্রম এবং মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত রয়েছেন। রয়েছেন চারুদত্তসখা, বিদূষক মৈত্রেয়। রয়েছে আরও বেশকিছু চরিত্রের উপস্থিতি। খুব সংক্ষেপে এই অঙ্কের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত হিসেবে ন্যস্ত বসন্তসেনার অলঙ্কারসমূহ গভীর রাত্রিতে চুরি হয়ে যায়। চুরি করেন যিনি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রেমিকার মুক্তি কারণ প্রেমিকা ছিলেন গণিকার দাসী ফলে সেইসময়ের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঐভাবেই সংগ্রহ করেছিলেন। উদ্দেশ্য সৎ হলেও পদ্ধতিটি সঠিক ছিলোনা। এরপরে বসন্তসেনা প্রকৃত তথ্য জানার পরে দাসী মদনিকাকে মুক্তি দান করেন। অন্যদিকে চারুদত্তের পত্নী ধূতা স্বামীর সম্মানরক্ষার্থে নিজের বহুমূল্য রত্নহার বসন্তসেনাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রত্যর্পণের জন্য মৈত্রেয়কে অনুরোধ করেন। মৈত্রেয় বসন্তসেনার গৃহে উপস্থিত হয়ে সেই রত্নহার প্রদান করেন এবং চারুদত্তের অভিসারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন।

বসন্তসেনার চরিত্রের প্রেমিকারূপটি এই অঙ্কে আরও একটু পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যেন ধীরে ধীরে একটি পুষ্পের পূর্ণরূপে প্রস্ফুটন।

অঙ্কের প্রথমেই দেখা যায়, চারুদত্তের একটি চিত্রফলক সম্পর্কে বসন্তসেনা মদনিকার সাথে আলাপরত। তাঁদের কথোপকথন থেকে বেশ্যাচরিত্র সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। মদনিকা বসন্তসেনার প্রেমে সহমত পোষণ করলে বসন্তসেনা কিছুটা সন্দিগ্ধ হয়েই জানতে চেয়েছেন

বেশ্যালে বাস করার কারণবশতঃ মদনিকা নিজের সখীর প্রতি বিশেষ উদারতা প্রদর্শন করছেন কিনা। প্রত্যুত্তরে মদনিকা জানান-

“ কিং য এব জনো বেশে প্রতিবসতি,স এব অলীকদক্ষিণো ভবতি”।^{২৮}

আবারও আচার্য বাৎস্যায়নের বক্তব্য স্মর্তব্য, তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রচলিত দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন গণিকামাত্রেই অভিনয়, ছল তাঁদের অবশ্য অভ্যাসযোগ্য বিষয়। এমনকি তাঁদের কামও প্রকৃত না হতে পারে।^{২৯} এখানে লক্ষ্য করতে হবে, বসন্তসেনা যেন স্বয়ং নিজের মনের গতিপ্রকৃতির প্রতি কিছুটা হলেও সন্দেহ করেছেন তাই মদনিকার সম্মতিদানের পরেও তাঁর মনের দ্বিধা দূর হয়নি। এ যেন এক চিরন্তন প্রশ্ন, মন যা অনুভব করছে সেটা কি সত্যি ভালবাসা? নাকি ক্ষণিকের আকর্ষণ? আর এই জিজ্ঞাসা আসা খুব স্বাভাবিক কারণ একজন গণিকা কোনো একজন পুরুষের সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে আবদ্ধ হন না। তাঁদের পেশাই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেখানে বসন্তসেনা এমন একজন পুরুষের প্রেমে পড়েছেন যিনি দরিদ্র। গণিকারা অর্থসম্পদ অনুযায়ী তাঁদের ‘গম্য’ নির্বাচন করে থাকেন। এছাড়া চারুদত্ত বিবাহিত তাঁর পত্নী-সংসারাদি রয়েছে। সাধারণ বেশ্যাদের মত শুধুমাত্র অর্থের লোভে বসন্তসেনা চারুদত্তের সঙ্গ কামনা করেননি, প্রেমই তাঁর আকর্ষিত হওয়ার একমাত্র কারণ। তাই বারবার প্রশ্ন করে নিজের মন বুঝে নিতে চেয়েছেন। এছাড়াও চারুদত্তের যে চিত্রফলকটি এঁকেছেন, সেটি যথাযথ কিনা তা নিয়ে মনের মধ্যে যেটুকু দ্বিধা রয়েছে তাও তিনি দূর করে নিতে চেয়েছেন প্রিয় সখীর সাথে আলোচনায়। মদনিকা নিশ্চিন্তে নিজের মত জানিয়েছেন, “সখীজনচিন্তানুবর্তী...”। কোনো একজন গণিকাও যদি এই নরক থেকে মুক্ত হন তবে বাকিরাও তাতে আনন্দিত হবেন তারই বহিঃপ্রকাশ এই উক্তিটি।

এরপরে দাসীর বক্তব্য থেকে জানা যায়,রাজশ্যালক শকার বসন্তসেনার সাথে বিহারের জন্য প্রবহণ পাঠিয়েছেন; সেইসঙ্গে দশ হাজার মোহর।কিন্তু কথাটি শোনামাত্র বসন্তসেনা তীব্র বিতৃষ্ণায় তা প্রত্যাখান করেন।দৃষ্ট ভঙ্গীতে মাকে জানিয়ে দেন-

“যদি মাং জীবন্তিমিচ্ছসি,তদা এবং ন পুনরহং মাত্রা আজ্ঞ্যপয়িতব্য”।^{৩০}

চারুদত্তের প্রতি তাঁর একান্ত একমুখী প্রেমের বহিঃপ্রকাশ এটি। তিনি বহুবল্লভা নন, যে কারোর মনোরঞ্জন রুচি নেই তাঁর এবং অর্থ কিংবা প্রতিপত্তি কিছুর মূল্যেই নিজের শুদ্ধ প্রেমের অপমান তিনি হতে দেবেন না পরিবর্তে মৃত্যু শ্রেয় তাঁর। সাধারণ নিয়ম অনুসারে বেশ্যাবৃত্তির ক্ষেত্রে বয়স্কা মাতা বা মাতাস্থানীয়া কারোর আদেশ লঙ্ঘন করা যায়না। ‘কুটনী’রা সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত কিন্তু বসন্তসেনাকে বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখি আমরা। তার দুটি যুক্তি থাকতে পারে। প্রথমতঃ তাঁর প্রেম তাঁকে মাতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়েছে আর দ্বিতীয়তঃ বসন্তসেনা স্বয়ং নিজের গৃহের কত্রী ছিলেন তাই মাতৃ-আদেশ পালন তাঁর কাছে অতটাও গুরুত্বপূর্ণ ছিলোনা।

এর পরবর্তী অংশে আমরা দেখেছি মদনিকা-শর্বিলকের দীর্ঘ কথোপকথন। পূর্বরাত্রে চুরি করা অলঙ্কারাদি নিয়ে বসন্তসেনার গৃহে প্রবেশ করেন শর্বিলক; উদ্দেশ্য মদনিকার মুক্তি। মদনিকা তাঁর স্বামীণীর আভূষণ চিনতে পেরে এবং সমস্ত বৃত্তান্ত জানার পরে আলোচনার মাধ্যমে অলংকারগুলি বসন্তসেনার হাতেই প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত করেন যাতে চারুদত্ত মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই সম্পূর্ণ বিষয়টি গবাক্ষের আড়াল থেকে লক্ষ্য করে বসন্তসেনা পরিশেষে মদনিকাকে মুক্তি দিয়ে শর্বিলকের হাতে অর্পণ করেন। একটি বিশেষ শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় ‘অভুজিষস্যাং’-যার অর্থ হল পরিচারিকা, দাসী বা কারো অধীনস্থ বেশ্যাবৃত্তি থেকে মুক্ত হওয়া। স্বাধীন বেশ্যা হলেও মুক্তিলাভ করতে হলে অথবা অন্য কারো অধীনে থাকলে পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট মূল্য দিলে তবে তাঁকে মুক্ত করা হয়ে থাকে এটাই রাষ্ট্রের নিয়ম। বসন্তসেনার স্বগতোক্তি থেকে বোঝা যায় তিনি আগে থেকেই এই বিষয়টি জানতেন; হতে পারে মদনিকা নিজেই জানিয়ে রেখেছিলেন। আবার মদনিকার উক্তি থেকে বসন্তসেনার উদারচিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় যিনি বলেছেন তাঁর ইচ্ছা হলে বিনা অর্থমূল্যে তিনি তাঁর সব দাসদাসীদের মুক্তি দেবেন। এতখানি উদারতা সামান্য নয়। পাশাপাশি এও মনে হতে পারে বসন্তসেনার মাতা পূর্ব জীবনে গণিকা ছিলেন সেইসূত্রেই তাঁর এই পেশা অবলম্বন। কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি কোনোদিনই এই জীবিকা নিয়ে খুশি ছিলেন না। অবশ্য স্বেচ্ছায় না এলে কোনো সুস্থমানসিকতার নারীর পক্ষেই এই পেশাটিকে মেনে নেওয়া অসম্ভব। আর সেই কারণেই ‘চতুঃষষ্টিকলা’-য় নিজেকে প্রস্তুত করে তুললেও তাঁর আসল সত্ত্বাটি ছিল প্রেমিকার, যার মনের মধ্যে

কোথাও যেন শুধুমাত্র একজন পুরুষের বিবাহিতা ‘বধূ’হওয়ার স্বপ্ন আঁকা ছিল। নিজের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নটিকে তাই মদনিকা-শর্বিলকের মাধ্যমে পূর্ণ করতে চেয়েছেন। তিনি তো রাষ্ট্র নন কিন্তু মদনিকার প্রভুত্ব তাঁর, তিনি তাই মদনিকাকে বিনা অর্থে মুক্তি দেন, তাঁকে ‘বধূ’র সম্মানে শর্বিলকের হাতে অর্পণ করেন। ভবিষ্যতের শুভকামনা জানিয়েছেন যেহেতু মদনিকা বর্তমানে একজন স্ত্রী; গৃহীতজীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন তাই কুলস্ত্রীর স্বাভাবিক আচরণের মত তাঁর অবগুণ্ঠিতা হওয়াই কর্তব্য।

বসন্তসেনা এবং মদনিকা, শূদ্রক তাঁর মৃচ্ছকটিকে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত এমন দুটি গণিকা চরিত্রের কথা লিখেছেন যাঁরা কোনো অংশেই সাধারণ গণিকার মত নন। তাঁদের কথা-আচরণ-ব্যবহার সবদিক থেকে স্বতন্ত্র। কোনো তুচ্ছ মালিন্য স্পর্শ করতে পারেনি তাঁদের।

চতুর্থাঙ্কের ঘটনাবলী ক্রমশঃ জটিলরূপে আবর্তিত হয়েছে। আমাদের গবেষণার নির্ধারিত বিষয়টি বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই অঙ্কে বর্ণিত হয়েছে। মদনিকা প্রকৃত তথ্য জানার পরে ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কিন্তু শর্বিলক বসন্তসেনা-চারুদত্তের প্রেমের বিষয়ে অজ্ঞ হওয়ার কারণে ঈর্ষাবশতঃ মদনিকাকে মিথ্যা সন্দেহ করেন। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত অপমানজনক মন্তব্য করেন। প্রেমিক-প্রেমিকার সাধারণ মান-অভিমান সংক্রান্ত বাদানুবাদ এটি নয়; এখানে শর্বিলক নিজের প্রেয়সীকে অত্যন্ত রূঢ়ভাষায় অপমান করেন এবং সেই অপমানের মূল বক্তব্য ছিল যেহেতু তিনি পেশায় গণিকা তাই তিনি স্বভাবতই দুশ্চরিত্র। মদনিকা চারুদত্তকে কামনা করেন এরকম একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর বলা কথাগুলি পর্যালোচনা করে দেখি-

“ইহ সর্বস্বফলিনঃ কুলপুত্রমহাদ্রুমাঃ।

নিষ্ফলত্বমলং যান্তি বেশ্যাবিহগভক্ষিতাঃ।।”১০।।^{৩১}

তিনি ত্রুদ্ধ হয়ে প্রকৃতিগতভাবে নারীর কুটিল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন, বলেন যে নারী অনুরক্তা নয় তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা উচিত নয়। এরপরে বেশ কয়েকটি শ্লোকে শর্বিলক বেশ্যাদের সাধারণ চরিত্রের বর্ণনা করেছেন-

এতা হসন্তি চ রুদন্তি চ বিভহতোঃ

বিশ্বাসয়ন্তি পুরুষং ন তু বিশ্বসন্তি ।

তস্মান্নরেণ কুল শীলসমম্বিতেন

বেশ্যাঃ শ্মশানসুমনা ইব বর্জনীয়াঃ ॥১৪॥^{৩২}

আরও বলেছেন-

“সমুদ্রবীচীব চলস্বভাবাঃ

সন্ধ্যাভলেখেব মুহূর্তরাগাঃ

স্ত্রিয়ো হতার্থাঃ পুরুষং নিরর্থং

নিপীড়িতালঙ্কবত্ ত্যজন্তি ॥”১৫॥^{৩৩}

আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন-

“অন্যং মনুষ্যং হৃদয়েন কৃত্বা অন্যং ততো দৃষ্টিভিরাহসয়ন্তি ।

অন্যত্র মুঞ্চন্তি মদপ্রসেকমন্যং শরীরেণ চ কাময়ন্তে ॥”১৬॥^{৩৪}

আরো রয়েছে-

“ন পর্বতাগ্রে নলিনী প্ররোহতি

ন গর্দভা বাজিধুরং বহন্তি ।

যবাঃ প্রকীর্ণা ন ভবন্তি শালয়ো

ন বেশজাতাঃ সুচয়ন্তথাঙ্গনাঃ ॥”১৭॥^{৩৫}

এই শ্লোকগুলির মূল বক্তব্যগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রথমতঃ স্ত্রীলোক এবং দ্বিতীয়তঃ বেশ্যা বলে কোথাও যেন শর্বিলকের প্রেমিক-সত্ত্বার থেকেও পুরুষ-সত্ত্বা এবং সমাজে বসবাসকারী

বাকি সাধারণ সামাজিকদের মতোই তাঁর চিন্তা সেই একটি জায়গা থেকেই আটকে রয়েছে। ‘গণিকা’- এই পরিচয়টিই যেন আর সবকিছু ছাপিয়ে প্রধান হয়ে ওঠে। সত্যাসত্য বিচার করার আগেই মদনিকাকে কেবলমাত্র সন্দেহের বশে তাঁর পেশার কারণে এইভাবে অবমাননা করেছেন তিনি। আশ্চর্য লাগে মদনিকা নিশ্চুপে বিনা অপরাধে এই অপমান শুনেছেন, সহ্য করেছেন কিন্তু কোনোরকম প্রতিবাদ করেননি। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, মদনিকার মনেও নিজের পেশাজনিত লজ্জা ছিল নাকি তিনি কথাগুলি কেবলমাত্র নিজের প্রেমিকপুরুষের ঈর্ষাজনিত বাক্য বলেই ভেবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন? আবার পাশাপাশি এও মনে হয়, ‘গণিকা’ এই পরিচয়টি জানার পরেও তিনি মদনিকার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন কেন? আবার এই তিনি অলংকারচুরির মত দুঃসাহসিক কাজ করেন কেবলমাত্র মদনিকাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য। আসলে মানবমনের বিবিধ জটিল দিকগুলি ঘুরেফিরে এসেছে এইসমস্ত পর্বে। একই মানুষের ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন, এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিক অবস্থাও লক্ষ্য করা যায়। আরেকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বন্ধু আর্যক বিপদগ্রস্ত হয়েছেন জানামাত্র তিনি মুহূর্তমধ্যে স্ত্রীকে বন্ধু রেভিলের কাছে রেখে বন্ধুর বিপদে এগিয়ে যান। প্রেম রয়েছে কিন্তু কর্তব্য তার থেকেও জরুরী।

পরের অংশে আমরা দেখি চারুদত্ত সখা মৈত্রেয় রত্নহার নিয়ে বসন্তসেনার বাড়িতে এসেছেন। তাঁকে ‘বন্ধুল’ এর সাথে সম্মানের সাথে বাড়িতে প্রবেশ করাতে বলেছেন তিনি। এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে মৈত্রেয় বুঝতে পারেন তিনি বসন্তসেনার কাছে যথেষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব তাই এভাবে আপ্যায়ন করা হয়েছে। বিদূষকের দীর্ঘ উক্তি মধ্য দিয়ে আমরা গণিকা বসন্তসেনার আর্থিক অবস্থানের চিত্র বুঝতে পারব। সেই যুগে একজন নগরনটীর অর্থনৈতিক অবস্থান, তাঁর বিলাস-বৈভবের বিস্তৃত চিত্রের বর্ণনা রয়েছে। শুধু আর্থিক নয়, এর থেকে তাঁর সামাজিক অবস্থানও বোঝা যায়।

কারো বাড়িতে প্রথম প্রবেশ করার সময়ে অতিথি পারিপার্শ্বিক সবকিছুই লক্ষ্য করেন। প্রথম লক্ষ্য করেন ভবনের দ্বার। বসন্তসেনার বাড়ি প্রাসাদের মত এবং স্বাভাবিকভাবেই দ্বার সিংহদুয়ারের সাথে তুলনীয়। এইরকম দ্বারের বর্ণনা অনেককিছুর ইঙ্গিতবাহী যেমন বসন্তসেনার গৃহে যেকোনো সময়ে যেকোনো পুরুষের প্রবেশের বোধহয় খুব সহজ ছিলোনা। যেন নগরীর মধ্যে এটি একটি বিচ্ছিন্ন

দ্বীপ যেখানে দিবারাত্র শুধুমাত্র কাম-কলা-ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার খেলা চলে। এ যেন মায়ানগরী এখানে প্রবেশকারী প্রত্যেক পুরুষের চোখের ভোগবিলাসের অঞ্জন আঁকা হয়। মৈত্রেয় অবাক বিস্ময়ে সবকিছুর অনুপুঞ্জ বর্ণনা করেছেন। বাড়ির দ্বারটি হাতির দাঁত নির্মিত, বহুমূল্য রত্নে শোভিত। মঙ্গল সূচকপতাকায় সজ্জিত দরজাটিকে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে তাতে উজ্জ্বল পীতরং করা হয়েছে, প্রাঙ্গনটি ও নানাধরনের রঙিন ফুল দিয়ে সাজানো, দরজার দুপাশে বেদিতে মঙ্গলকলসে আম্রপল্লব রাখা হয়েছে। দরজার কপাটদুটি বিশাল এবং স্বর্ণনির্মিত। সংক্ষিপ্ত এই বর্ণনাটি থেকে বোঝাই যাচ্ছে প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও যথেষ্ট ইতিবাচক।

বসন্তসেনার প্রাসাদের কতগুলি মহল রয়েছে এবং সেই মহলগুলির প্রতিটির ব্যবহার, সাজ-সজ্জা পৃথক। প্রথম মহলে প্রবেশের পরে মৈত্রেয় দেখেছেন সম্পূর্ণ মহলটি চাঁদ-শঙ্খের মত শ্বেতশুভ্র। নানারকম রত্ন দিয়ে সোনার সিঁড়িগুলি সাজানো, মুক্তাখচিত স্ফটিকের জানালা। দারোয়ানেরা ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে মনে হতে পারে হয়তো দিনের বেলা বলে তাঁরা নিজেদের কর্তব্য থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছেন। কারণ রাত্রিতে সমগ্র প্রাসাদ এবং প্রাসাদে বাসকারিণীদের সুরক্ষার দায় তাঁদেরই।

দ্বিতীয় মহলটিতে নানাধরনের পশুর বাস। তাদের পালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনমত সেবা(পালনীয় পশুর শারীরিক যত্ন) ইত্যাদি কাজের জন্য দ্বিতীয় মহলটি নির্দিষ্ট। সেখানে বলদ-মহিষ-ভেড়া রয়েছে, তাছাড়াও বানর-অশ্ব-হাতীও রয়েছে। একই সাথে এতোধরনের এতোগুলি পশুকে পালন করা এবং তাদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা করা-এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটির জন্য যথেষ্ট অর্থবল দরকার। বসন্তসেনার আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্টই ভালো ছিল।

তৃতীয় মহলের পরিস্থিতি অন্যরকম। আগত অতিথিদের মনোরঞ্জনের আয়োজন ছিল এই মহলে। নানা উচ্চতা বিশিষ্ট বসার আসন, পুস্তক ইত্যাদি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ‘পাশকপীঠ’ বা ‘পার্শ্বকপীঠ’ অর্থাৎ ছোটমাপের কোনো বিশ্রামের আসন অথবা পাশা খেলার আসন ইত্যাদি রাখা। এখানেই শেষ নয়, পাশার অক্ষগুলি মণিময়। বেশ্যালায়ে নারীপুরুষের কামসম্পর্কিত মিলন বা দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার জন্য কুড়িনী বা বৃদ্ধ নাগর শ্রেণীর লোকের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে; যারা বিভিন্ন রঙ্গীন চিত্রফলক নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

চতুর্থ প্রকোষ্ঠে গণিকাকন্যাদের নৃত্য-গীত এবং বাদ্যাদি শিক্ষা দান করা হচ্ছে এবং তাঁরা সেই কলাগুলিকে নিরন্তর অভ্যাস করে চলেছেন এছাড়াও শৃঙ্গাররসপ্রধান পুস্তকাদি পাঠ করা ও সেগুলির অভিনয় করাও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

পঞ্চম মহলটিকে মূলতঃ রন্ধনকাজের জন্য নির্দিষ্ট বলেই মনে হয়। আমরা জানি সংস্কৃত সাহিত্যে বিদূষক চরিত্রটি খাদ্যপ্রিয় একজন ব্রাহ্মণ হবেন তাই প্রাসাদের এই মহলটি মৈত্রেয়কে অধিক আকর্ষণ করেছে। হিঙ্গুতেলের সুবাস, নানাবিধ সুখাদ্যের প্রাণকাড়া সুগন্ধ তাঁকে উৎসুক করে তুলেছে। একাধারে ডিম-মাংস ইত্যাদি রন্ধনকাজের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে আবার অন্যদিকে বহুধরনের মিষ্টি-পীঠে প্রস্তুত করা হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে একত্রে বহুসংখ্যক মানুষের অন্নসংস্থান হয় বসন্তসেনার আবাসে।

এরপরের মহলে নীলমণি খচিত দরজা শোভা পাচ্ছে। নানাধরনের বহুমূল্য বৈদূর্য- মুক্তা-প্রবাল-পদ্মরাগ-মরকত প্রভৃতি রত্ন দিয়ে অলংকার নির্মাণ করা হচ্ছে। এই মহলটিতে সোনা-মুক্তা ইত্যাদির গয়না নির্মাণ, শঙ্খ কেটে প্রবালগুলি শানযন্ত্রে ঘষে সেগুলিকে আরও নিখুঁত করা হচ্ছে। অন্যদিকে সিঁজি কুঙ্কুম শোকানো, কস্তুরী-চন্দন ইত্যাদি সুগন্ধী দ্রব্য একত্র করা হল। গণিকারা কামুক পুরুষদের কর্পূর দেওয়া পান দিচ্ছে, তাঁদের দিকে বিলোল কতাক্ষে তাকাচ্ছে। যৌনসঙ্গমের তৃপ্তিব্যঞ্জক শীৎকার শোনা যাচ্ছে। যদিও বর্ণনার এই পর্বটি আমাদের যেন স্বর্গের পরিবেশ থেকে তীব্র অভিঘাতের বাস্তবে এনে ফেলে দেয়। যেখানে বোঝা যায়, বাস্তব প্রকৃতপক্ষে বড় কঠিন এবং নিষ্ঠুর, যারা এখানে সাময়িক সুখভোগে আসে নিজের দারা-পুত্রকে ত্যাগ করে সম্পদাদি গণিকাদের পায়ে বিসর্জন দেয়। সেই হতভাগ্যরা জানেনা এই সমাদর তাদের নয়, তাদের অর্থের।

সপ্তমকক্ষে রয়েছে নানাপ্রকার পাখি। তার মধ্যে কপোতদম্পতী রয়েছে, শুক-সারি আছে। রয়েছে মেয়ে কোকিল। এছাড়াও রয়েছে লড়াই এর উপযুক্ত পাখি তাদের প্রস্তুতি চলছে। গৃহপালিত ময়ূরটি যে রীতিমত সযত্নলালিত তা তার সাজ-সজ্জা, চলনের গতি থেকেই বোঝা যায়। তিতির-রাজহাঁস-সারস ইত্যাদিও রয়েছে। মৈত্রেয়র দৃষ্টিভঙ্গিতে বসন্তসেনার প্রাসাদ নন্দনকানন যেন। প্রচুর মানুষ-জীব-জন্তু

যেন এক বিরাট কর্মশালা। প্রভূত ঐশ্বর্য-বিলাস-বিত্ত সবকিছু যেন একটি স্থানে মিলিত হয়ে চূড়ান্তরূপ ধারণ করেছে।

এরপরে মহলটিতে প্রবেশের সাথে রেশমি চাদর পরিহিত,বহুবিধ অলংকার শোভিত বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও পাদবিক্ষেপকারী এক ব্যক্তির উপস্থিতি দেখা যায়,জানা যায় তিনি গণিকা বসন্তসেনার ভাই। একজন নিষ্কর্মা ব্যক্তির এহেন জীবনযাত্রা দেখে মৈত্রেয়ের মনে সাময়িক আকাজক্ষার জন্ম হয় যে বোধহয় জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে বসন্তসেনার মত ধনবতীর ভাই হওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সেই ভ্রম ক্ষণিক। মুহূর্তমধ্যে তিনি স্থিরসিদ্ধান্তে এসেছেন শ্মশানজাত গাছের ফুল সতেজ, উজ্জ্বল,সুগন্ধী হলেও তা সাধারণের ব্যবহার্য নয়। সেরকমই বিলাসের এই জীবন মরীচিকার মত, গণিকালয়ে জন্মে সুখভোগের থেকে দারিদ্র্য শ্রেয়তর। এখানে বসন্তসেনার মায়ের কথাও রয়েছে। তিনি স্ফীতোদরা যদিও দাসী বলেছেন তিনি জ্বরে অসুস্থ কিন্তু বিদূষকের মনে হয়েছে সীধু-সুরাসব পান করার জন্য এই দশা প্রাপ্ত হয়েছেন। বোঝায় যায় দিবারাত্র নানাবিধ মদ্যপানের অভ্যাস ছিল গণিকালয়ের প্রায় সকলেরই।

এরপরে আসে বসন্তসেনার উদ্যানের প্রসঙ্গ। স্বর্ণযুথী-মালতী-মল্লিকা-কুরুবক-শেফালিকা-অশোক ইত্যাদি বৃক্ষ যেমন রয়েছে, সেইরকম রয়েছে পদ্মে পূর্ণ একটি দীঘি। নয়নমনোহর, ক্লান্তি অপনোদনকারী এই উদ্যানের বাতাস।

শুধুমাত্র অর্থ কোনো মানুষের পরিচয়ের নির্ণায়ক হতে পারেনা। সেই অর্থ দিয়ে মানুষটি কী ধরনের ব্যবহার করেছে তার থেকেও তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তসেনার রুচির প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। যেভাবে নিজের প্রাসাদের আটটি মহলকে তিনি আলাদা আলাদা করে সাজিয়েছিলেন, প্রতিটি মহল ভিন্ন কাজের জন্য নির্ধারিত এমনকি পশু ও পাখিদের জন্য দুটি সম্পূর্ণ আলাদা মহলের ব্যবস্থা- বলতেই হয় তিনি যথেষ্ট পরিকল্পনার সাথে নিজের প্রাসাদটির রূপদান করেছিলেন। যদিও বেশ কিছু অংশে বাৎসর্যায়নের কামসূত্রের বর্ণনার সাথে মিল লক্ষ্য করা যায়।তাতে বিশেষ বিস্ময়ের কিছু নেই।

পঞ্চমাঙ্কে চারুদত্ত-বসন্তসেনা আরও কাছে এসেছেন। ‘দুর্দিন’ অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন দিন। মৈত্রেয় এসে জানিয়েছেন বসন্তসেনা রত্নহার তো গ্রহণ করেইছেন উপরন্তু তিনি স্বতঃউদ্যোগে চারুদত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক তাই নিজের আগমনের সংবাদ জানিয়েছেন। মৈত্রেয়ের কোনোরকম বেশ্যাসক্তি নেই। শুধু তাইই নয় তিনি চান না কোনোরকম ভাবে চারুদত্ত-বসন্তসেনার প্রেম পরিণতি পাক। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বসন্তসেনাকে অলংকারলিপ্সু লোভী একজন সাধারণ বেশ্যার মতোই ভেবেছেন। এছাড়াও তাঁর মনে এই ক্ষোভও রয়েছে যে, যথেষ্ট অর্থ- বিত্তশালিনী হওয়া সত্ত্বেও বসন্তসেনা তাঁর মত ব্রাহ্মণকে যথোপযুক্ত সেবাপ্রদর্শন করেননি এবং বিনা আপত্তিতে রত্নহার গ্রহণ করেছেন। মৈত্রেয়ের কথায় বেশ্যারা হলেন “পাদুকান্তপ্রবিষ্টা ইব লেষ্টকা...” অথবা তাঁরা হাতি-কায়স্থ-ভিক্ষুক-শঠ - গর্দভতুল্য এবং কোনো দূষিত ব্যক্তির থেকেও সমাজে তাঁদের উপস্থিতি ঘৃণ্য। সমাজে গণিকাদের ন্যূনতম সম্মান নিয়ে সাধারণ, শিক্ষিতজনদের মানসিকতা দেখলে বিস্ময় জাগে।

মনে হতে পারে সত্যি বসন্তসেনার মত একজন উদারহৃদয় নারীর পক্ষে এটি একেবারেই অনুচিত কাজ কিন্তু যে সময়ের কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে শুধু সেইটুকু দিয়ে বসন্তসেনার বিচার করা যথেষ্ট নয়। তিনি তখন একান্তই প্রেমে বিভোর, চেয়েছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চারুদত্তকে নিশ্চিত করতে। তিনি স্বয়ং তাঁর অভিসারিকা তা জানিয়ে দিতে তাই কর্তব্যকর্মে ত্রুটি হয়ে গেছে তাঁর।

একজন প্রেমিকার বেশ কিছু অবস্থা বা দশা থাকে। এই অঙ্কে বসন্তসেনার অভিসারিকা দশা লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রথমে মৈত্রেয়, তারপরে নিজের ভৃত্য কুস্তীলককে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছেন যাতে চারুদত্ত পূর্ব প্রস্তুত থাকতে পারেন।

আমরা তাঁর অর্থ, বিলাস-বৈভব ইত্যাদির বর্ণনা দেখেছি। সেই তিনি অভিসারিকার বেশে চারুদত্তের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। বিটের প্রশংসাসূচক বাক্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য। তিনি যেন পদ্মবিহীন লক্ষ্মীতুল্যা, কামদেবের তীক্ষ্ণ বাণের মত। আবার তিনি কূলবধূদের শোক উৎপাদনকারিণী। সম্পূর্ণ সজ্জিত হয়েই তিনি নিজ দয়িতের সাথে অভিসারে এসেছেন এরকম অত্যন্ত ঘন দুর্যোগের দিনেও। এরকম অকাল বর্ষণের কাল আসলে প্রেমিক-প্রেমিকার অভিসারের জন্য প্রকৃষ্ট। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, চারুদত্ত-বসন্তসেনার প্রেম কিন্তু কেবলমাত্র শরীরের

মোহে আবদ্ধ নেই। উভয়ে উভয়ের গুণে আসক্ত দৈহিক আকর্ষণ অনস্বীকার্য কিন্তু তা যখন মনের আকর্ষণে উন্নীত হয় তখনই প্রকৃত প্রেমের সূচনা হয়।

বসন্তসেনা এবং বিটের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বর্ষারাত্রির বর্ণনায় যে শ্লোকগুলি রয়েছে সেইগুলি পাঠে বোঝা যায় শূদ্রকের বসন্তসেনা রীতিমত বিদুষী ছিলেন, তাঁর বাক-বৈদগ্ধ্য অনবদ্য। তৎকালীনযুগের গণিকা চতুষ্টিকলানিপুনা ছিলেন। শাস্ত্রপাঠ, কাব্যরচনা ইত্যাদি তার মধ্যে অন্যতম। সুতরাং এটি ততটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বিশেষ লক্ষ্যনীয় হল পরিস্থিতি অনুসারী মৌখিক শ্লোক রচনা এবং তাও মুহূর্তমধ্যে, সেই ব্যাপারে বসন্তসেনার দক্ষতা প্রশ্নাতীত। মেঘাচ্ছন্ন, বর্ষণমুখরিত দুর্দিনের বর্ণনায় বসন্তসেনা যথাযথ মনীষার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং যেভাবে তিনি শ্লোকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন তাতে বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি বোঝা যায়।^{৩৬}

চারুদত্ত এবং বসন্তসেনা দুটি চরিত্র এই অঙ্কে কোথাও গিয়ে যেন একে অপরের পরিপূরক। বিট এবং দাসীর সহায়তায় হাস্যরসের মাধ্যমে তাঁদের মিলনের মুহূর্ত উপস্থিত হল। বসন্তসেনার অঙ্গসৌষ্ঠবের, তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন চারুদত্ত। প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমিকার রূপবর্ণনা স্বাভাবিকভাবেই অপূর্ব।

কথোপকথন থেকে জানা যায়, বিদূষক যে রত্নমালাটি বসন্তসেনার গচ্ছিত অলংকার পেটিকা অপহৃত হওয়ায় পরিবর্তনস্বরূপ দিয়ে এসেছিলেন সেই রত্নমালাটি দ্যুতক্রীড়ায় বাজি হিসেবে পরাজিত হয়েছেন বসন্তসেনা। ফলে তিনি আবার নিজের একটি অলংকারপেটিকা মূল্যরূপে চারুদত্তকে অর্পণ করতে ইচ্ছুক এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর আগমন। এই সংক্ষিপ্ত অংশটি থেকে বসন্তসেনার রসবোধ, অভিনয়দক্ষতা এবং সর্বোপরি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। নিপুণ দক্ষতায় তিনি প্রিয়তম পুরুষের মনোবেদনা, তাঁর লজ্জা মুছিয়ে দিয়েছেন অথচ তাঁকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করার কোনোরকম প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়না। তিনি প্রেমিকের উদারতায় মুগ্ধ, নিজের পছন্দে গর্বিত। অঙ্কের একেবারে শেষে উভয়ে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দৃশ্যমান হয়ে থাকেন।

পঞ্চম অঙ্কের শেষদৃশ্যটি একটু আলোচনার অবসর রাখে। চারুদত্তের স্ত্রী ধূতার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি, তাঁর উদারতা, পতিপ্রেম, ত্যাগ আমরা দেখেছি। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে ঠিক কতোখানি উদারতা থাকলে নিজের গৃহে পতির অন্য রমণীসঙ্গ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকা যায়? তাও যে রমণী সমগ্র উজ্জয়িনীর পুরুষের কামনার বস্তু গণিকা বসন্তসেনা? প্রকরণের লক্ষণ অনুযায়ী একজন কুলস্রী থাকবেন, ধূতা সেই কুলস্রীর ভূমিকায় রয়েছেন। অনায়াসে তিনি স্বামীর অন্য নারীসঙ্গ (শারীরিক-মানসিক উভয়ই) মেনে নিয়েছেন। তাঁর বিশেষ উপস্থিতি এই প্রকরণে নেই। কেবলমাত্র চারুদত্তের বিপদে তাঁকে সাহায্য করার সময়ে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আবার তাঁকে দেখা যায় এই প্রকরণের শেষ অঙ্কে যেখানে স্বামীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে তিনি আত্মহুতি দিয়ে উদ্যত হয়েছেন। প্রকৃত বধূর উদাহরণ যেন।

আমরা আমাদের গবেষণাকাজের মাধ্যমে একজন গণিকার মধ্যে নিহিত সুপ্ত মাতৃত্বের বোধটি খুঁজে পেতে চেয়েছি। একজন নারী যে কেবলমাত্র শারীরিক ভাবেই মা হতে পারেন তা নয় কিন্তু মাতৃত্বের বোধ থাকে মননেও। তাই জন্মদাত্রী না হলেও কেউ কেউ নিজের স্বভাবগুণে মায়ের মত হয়ে থাকেন। আমরা এর আগে বসন্তসেনার মায়ের উল্লেখ পেয়েছি যিনি কন্যাকে বলেছেন অর্থ-অলংকার-ক্ষমতার কারণে রাজশ্যালকের সংসর্গ করতে। *মৃচ্ছকটিকে* বসন্তসেনার চরিত্রের এই অনন্য দিকটি আমরা লক্ষ্য করতে পারবো। একজন গণিকা যিনি মাতৃত্বের স্বাদ পাননি এবং সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মে হয়তো যখন তিনি মা হবেন তাঁর সন্তান সমাজে স্বীকৃতি পাবেনা। কোনো এক পূর্বনির্ধারিত অমোঘ নিয়মে কন্যাসন্তান হলে এই পেশা অবলম্বন করতে হবে আর পুত্রসন্তান হলে তাকে হয়তো ‘বান্ধুলী’^{৩৭} হতে হবে। সেইকারণেই হয়তো গণিকাসমাজে কন্যাসন্তানের জন্ম বিশেষ সৌভাগ্যের সূচক।

পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা শেষ হয় একটি রাত্রিতে চারুদত্ত-বসন্তসেনার মিলনের মাধ্যমে। পরের দিন সকালে দাসীর কাছ থেকে বসন্তসেনা জানতে পারেন তাঁর সাথে পুনর্মিলনে উৎসুক চারুদত্ত পুষ্পকরগুপ্ত উদ্যানে সময় মত উপস্থিতির জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এও জানতে পারেন তাঁদের সম্পর্কে সম্মতি রয়েছে চারুদত্তপত্নী ধূতার। ঠিক এই সময়ে তাঁর সাথে পরিচয় হয় চারুদত্তপুত্র রোহসেনের। বালক রোহসেন তখন প্রতিবেশী বালকের স্বর্ণশকটের জন্য ক্রন্দনরত; দাসী রদনিকার

মাটির গাড়ির নিয়ে এসে তাকে বারবার প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় সর্বাপেক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা বসন্তসেনাকে দেখে রোহসেনের প্রশ্নের উত্তরে রদনিকা তাঁকে তার মাতার পরিচয় দেয়। অবোধ শিশু নিজের দ্রাবিড়্যজনিত অবস্থান বুঝতে সক্ষম না হলেও এটুকু বুঝতে পারে তার মায়ের এতো অলংকার নেই, তিনি প্রায় নিরাভরণা (রত্নহারটি যে তাঁর একমাত্র সম্বল তাও আমরা জেনেছি) তাই বালকের অনায়াস উত্তর ইনি তার মাতা নন, কারন ইনি সর্বাভরণভূষিতা। বসন্তসেনা নিমেষমধ্যে সমস্ত অলংকার মাটির খেলনা ছোট গাড়িটিকে পূর্ণ করে দেন এবং রোহসেনকে বলেন সুবর্ণনির্মিত শকট নির্মাণ করানোর জন্য^{৩৮}।

বসন্তসেনা যে স্বভাবগতভাবেই কোমল মনোবৃত্তির অধিকারিণী তার প্রমাণ এই অংশটি। হতেই পারে তিনি নিজের প্রেমিকের ঔরসজাত সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহবশতঃ তিনি সব অলংকার তাকে দিয়ে দিয়েছেন আর এই দেওয়ার মধ্যে কিন্তু দানের অহংকার বা গর্ব ছিলোনা; ছিলো একান্তই বাৎসল্যরস। তাঁর প্রার্থিত পুরুষ যিনি কিনা এককালে উজ্জয়িনীর অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, গুণনিধি সেই ব্যক্তির পুত্র আজ একটি ছোট খেলনা স্বর্ণশকটের জন্য রোরুদ্যমান। তাঁর এরকম ধনহীন অবস্থা হওয়ার কারণ তাঁর দানশীলতা। যে গুণের জন্য, যে উদারতার জন্য বসন্তসেনা তাঁর প্রেমপ্রার্থিনী হয়েছিলেন তাই তাঁর দয়িতের শিশুপুত্রের বর্তমান অবস্থান্তর দেখে তিনি আরও দুঃখিত হয়েছেন। প্রেমিকের সন্তানকে আপন সন্তানের স্নেহে সিক্ত করেছেন তিনি। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দূর করতে চেয়েছেন ছোট শিশুর সামান্য আদার তার মধ্যে শুধুই রয়েছে মাতার পুত্রের প্রতি স্নেহ।

ষষ্ঠাঙ্কে কাহিনীর অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই কীভাবে বসন্তসেনা চারুদত্তের পাঠানো প্রবহণের পরিবর্তে রাজশ্যালক শকারের প্রবহণটিতে ওঠেন। সেইসময়ে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট প্রবহণটিতে ওঠেন আর্যক। যাকে রাজা পালক নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী আশঙ্কায় কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর অনুসন্ধান ব্যস্ত রাজরক্ষীদের অন্যতম চন্দনক তল্লাশি করার সময়ে কেবলমাত্র চারুদত্ত-বসন্তসেনার নাম শুনেই নিশ্চিত ভরসায় গাড়িটি যেতে দিতে চেয়েছেন, সন্দেহ করেননি। তাইই নয়,সহকর্মীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন-

“যদি আর্যচারুদত্তং বসন্তসেনিকাং বা ন জানাসি, তদগমনে জ্যোৎস্নাসহিতং চন্দ্রমপি ত্বং ন জানাসি।”^{৩৯}

অর্থাৎ উভয়েই নিজের নিজের গুণাবলীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু তাঁদের প্রেমোপাখ্যানও সেই সময়ে উজ্জয়িনী নগরীতে যথেষ্ট চর্চিত ছিল বোঝা যায়।

সপ্তমাস্কে চারুদত্ত বসন্তসেনার জন্য অপেক্ষমান কিন্তু প্রবহণ-বিপর্যয়ের কারণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় শৃঙ্খলিত আর্য়কের। এই অস্কে বসন্তসেনার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই কিন্তু চারুদত্তের উৎকণ্ঠা থেকে বোঝা যায় তাঁদের দুজনের প্রেমের গভীরতা রয়েছে।

অষ্টম অস্কের কাহিনী বেশ দীর্ঘ এবং জটিল। এই অস্কের কাহিনীর বেশ কিছু স্তর থাকলেও আমাদের প্রয়োজনীয় অংশটি নিয়ে আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। রাজশ্যালক শকারের গাড়িতে ভ্রান্তিবশতঃ চেপে উদ্যানে প্রবেশ করেছেন, হৃদয়ে প্রিয়মিলনের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু চালকের কণ্ঠস্বর শোনামাত্র তিনি বুঝতে পারেন যে এই স্বর চারুদত্তের ভৃত্য বর্ধমানকের নয়। তাই তিনি ভীতা এবং অমঙ্গল আশঙ্কা করছেন। এখানে খুব ছোট একটি তথ্য আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, বসন্তসেনার সাথে চারুদত্ত এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের আলাপ মাত্র এক রাত্রির ঘটনা কিন্তু সেই স্বপ্নসময়ের আলাপেই তিনি চারুদত্তের ভৃত্যের কণ্ঠস্বর যথাযথভাবে স্মরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ঠিক কতোখানি তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারিণী ছিলেন তিনি সহজেই অনুমেয়।

শকার গাড়িতে প্রবেশ করতে গিয়ে উপবিষ্টা বসন্তসেনাকে দেখে রাক্ষসী অথবা প্রেতিনী বলে ভুল করে কারণ সেইমুহূর্তে ঐস্থানে বসন্তসেনার আকস্মিক উপস্থিতি। বিহ্বল বসন্তসেনা সত্য উপলব্ধি করেছেন। শকারের সঙ্গী বিট তাঁকে দেখে একান্তই বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন এবং তিনি মনে করেছেন বসন্তসেনার আগমন হয়েছে অর্থাতির কারণে। তাই তিনি তাঁর প্রথমাস্কে বলা কথাটি বসন্তসেনাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, বেশ্যামাত্রেরই সমানভাবে সবাইকে সেবা করা কর্তব্য। একজন বেশ্যার কাছে প্রিয়-অপ্রিয় বলে পার্থক্য থাকতে নেই কারণ এই পেশা গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অর্থ উপার্জন^{৪০}। তাই বসন্তসেনা তাঁর পেশার নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন বলেই বিটের মনে হয়েছিল। গর্বভরে শকারকে অবহেলা এবং তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের পরেও কেবলমাত্র অর্থসম্পদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এখন আবার সেই পুরুষটিকেই ভজনা করতে আসা এতে যেন স্বয়ং বসন্তসেনারই সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বসন্তসেনা বিটের কাছে নিজের ভ্রান্তির কথা বলে তাঁর শরনাগত হয়েছেন। কিন্তু শকারের মত দুশ্চরিত্র, দুর্বিনীত ব্যক্তিকে পরিবর্তন করতে অসমর্থ হয়ে বিট বসন্তসেনাকে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়েছেন। এই সময় বসন্তসেনা এবং শকারের একটি তপ্ত বাদানুবাদ ঘটে। রাজশ্যালক বসন্তসেনাকে তাঁর দেহসৌষ্ঠবের প্রশংসা করে তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ত্রুদ্ধা বসন্তসেনা শকারের ভাষাপ্রয়োগে এবং তার উদ্দেশ্য বোঝামাত্রই মাথায় পদাঘাত করেছেন কারণ সেই মুহূর্তে চারুদত্ত ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের কথা শোনা অথবা শুধুমাত্র পেশাগত কারণে ভজনা করা তাঁর কাছে পাপতুল্য বলে মনে করেছেন। তাই যেন তীব্র বিবমিষায় অগ্রপশ্চাৎ ফলাফল বিচার না করেই তিনি রাজার শ্যালকের মাথায় পদাঘাত করার মত কাজ করেন। শকার যখন প্রকৃত সত্য বুঝতে পারে তখনই তার ভাষা-শব্দপ্রয়োগ এবং বসন্তসেনার প্রতি ব্যবহার সম্পূর্ণ বদলে যায়। মুহূর্ত মধ্যে কেশাকর্ষণ করে গাড়ি থেকে নামাতে উদ্যত হলে বিট বারণ করেন। কিন্তু দুষ্ট শকার বসন্তসেনাকে হত্যার পরিকল্পনা করে বিটকে নির্দেশ দেন সেইকাজ সম্পাদন করতে। এইরকম জটিল একটি সময়েও বিট বসন্তসেনার গুণাবলী স্মরণ করে যে মন্তব্যটি করেছেন সেটি এখানে আমরা একবার দেখে নেব-

“বালাং স্ত্রিয়ঞ্চ নগরস্য বিভূষণঞ্চ

বেশ্যামবেশ-সদৃশ-প্রণয়োপচারাম্।

এনামনাগসমহং যদি মারয়ামি

কেনোড়ুপেন পরলোকনদীং তরিয়ে।।”২৩।।^{৪১}

অর্থাৎ নানা যুক্তি-শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যে বিট এহেন কাজে নিজের অপারগতা জানিয়েছেন। শকারের ভৃত্যও প্রভুর এই আদেশটি মানতে সক্ষম নন। শকার বিটকে ছলনা করে বসন্তসেনার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতে শুরু করেন ফলে বিটের বিশ্বাস জন্মায়। এইখানে শকার ও বসন্তসেনা উভয়ের কিছু কথোপকথন রয়েছে সেগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন বিশেষ করে শকারের উক্তিগুলি

কারণ সাধারণ সমাজে গণিকাদের কি চোখে দেখা হতো সেই সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে। বসন্তসেনা শকারকে বলেন-

“যত্নেন সেবিতব্যঃ পুরুষঃ কুলশীলবান্ দরিদ্রোহপি।

শোভা হি পণ্ডিত্যাং সদৃশজন সমাশ্রয়ঃ কামঃ।।” ৩৩।।^{৪২}

তিনি তাঁর পচ্ছন্দের ক্ষেত্রে চারুদত্তকে আমগাছ এবং শকারকে পলাশবৃক্ষের থেকে নিকৃষ্ট হিসেবে করেছেন। নানারূপে শকার তাঁকে ভয় দেখাতে শুরু করেন কিন্তু বসন্তসেনা তাঁর প্রেম এবং প্রেমাস্পদের প্রতি সৎ তাই তিনি নির্ভীকভাবে চারুদত্তের গুণগান করেছেন, তাঁর নামকীর্তন করেছেন। একজন আদর্শ প্রেমিকার ঠিক যেমন হওয়া উচিত তিনি ঠিক সেইভাবে তাঁকে স্মরণ করেছেন। সোচ্চারে নামঘোষণা করেছেন। কোনোভাবেই যেন বসন্তসেনাকে তাঁর গণিকা পরিচয়ে আবদ্ধ রাখা যায় না। প্রেমের বলিষ্ঠতায় তিনি নিজেকে সাধারণী বেশ্যা থেকে এক অপূর্ব প্রেমময়ী নারীতে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন। যিনি নিজের প্রেমের প্রতি অবিচল বিশ্বাস থেকে বলতে পারেন যে, চারুদত্ত উপস্থিত থাকলে তাঁর এধরণের লাঞ্ছনা হতোনা, তিনিই বসন্তসেনাকে মুক্ত করে দিতেন। শকার ‘গর্ভদাসী’ বলে বারবার তাঁকে অপমান করেছে, শেষে নিষ্ফল আক্রোশে গলা টিপে বসন্তসেনাকে হত্যায় উদ্যত হয়েছে। বিট এই সংবাদ পেয়ে শঙ্কর সঙ্গে বসন্তসেনাকে স্মরণ করেছেন; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন যাতে তাঁর মত গুণান্বিতার পরবর্তী জন্ম কোনো সদ্বংশে হয়। শকার তার দুষ্কর্মের দায় চারুদত্তের উপরে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে আর অন্যদিকে বৌদ্ধভিক্ষু (চারুদত্তের প্রাক্তন ভৃত্য সংবাহক) দৈবানুগ্রহে সেইখানে উপস্থিত হয়ে সংজ্ঞাহীনা বসন্তসেনার জলসিঞ্চনের দ্বারা জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়ে আশ্বস্ত করেন এবং তাঁকে নিকটবর্তী বৌদ্ধাশ্রমে নিয়ে যান।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য সেই যুগে একজন গণিকার বৌদ্ধাশ্রমে প্রবেশের যে তথ্যটি শূদ্রক লিখেছেন সেটি কতোটা সত্য তা বিচারের অবকাশ রয়েছে।

বিট, ভূত, বৌদ্ধভিক্ষু সংবাহক -এই চরিত্রগুলি, তাঁদের বক্তব্য, কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে বসন্তসেনার প্রতি তাঁদের মনোভাব, শ্রদ্ধা পরিষ্কার বোঝা যায়। গণিকা বসন্তসেনা নিজের রূপ, গুণ, কলা ইত্যাদি কারণের জন্য প্রথমে থেকেই সম্মাননীয় ছিলেন; তিনি উজ্জয়িনীর নগরনটী ছিলেন। কিন্তু চারুদত্তের সাথে এই প্রেম যেন তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। প্রথমতঃ নির্দিষ্ট একজন পুরুষের প্রতি একমুখী প্রেম, দ্বিতীয়তঃ এমন একজন পুরুষ বর্তমানে যাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই ভালো নয় এমনকি তাঁকে দরিদ্রই বলা চলে। এরকম একজন পুরুষের প্রতি একনিষ্ঠ গণিকাকূলশিরোমণি বসন্তসেনা নিজেকে তাঁর ‘গুণনির্জিত দাসী’-রূপেই ভেবেছেন। এখানেই প্রেমিকারূপে তিনি সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন।

‘ব্যবহার’ নামক নবমাস্কের কাহিনী বিশদে পর্যালোচনা করে দেখবো আমরা। বসন্তসেনার উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্য শকার তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয় কিন্তু তিনি মারা যাননি কেবলমাত্র সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। শকারের ক্রোধ বসন্তসেনাকে হত্যা করেই শান্ত হয়নি, তার দুষ্টবুদ্ধির কারণে সে চারুদত্তের উপরে নিজের অপরাধের দায় চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিচারালয়ে উপস্থিত হয়। তার বক্তব্যবিষয় শুনে বিচারালয় থেকে বসন্তসেনার মাতাকে সত্যাসত্য বিচার করার জন্য আহ্বান করা হয়। এই পর্যায়ে আমরা একজন গণিকার মাতা সম্বন্ধে জানতে পারবো। বসন্তসেনার মাতা নিজের যৌবনকালে একজন গণিকা ছিলেন,তিনি শকারের কাছে নিজ কন্যাকে প্রেরণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তার একমাত্র কারণ তাঁদের পেশা।যে পেশার প্রধান শিক্ষা হল যৌবনকাল গণিকাদের আদর্শ সময়, সেই সময়ে ভবিষ্যতের জন্য অর্থসঞ্চয় করে নিতে হবে তাই তিনি চেয়েছিলেন নিজের কন্যাকে রাজশ্যালকের মত ক্ষমতাবান একজন পুরুষের সংশ্রবে রাখতে। যদিও বসন্তসেনা সেই প্রস্তাব শোনামাত্রই নাকচ করে দেন।

শকার বসন্তসেনার মাকে ‘বৃদ্ধকুটিনী’ সম্বোধন করেছে। এই সম্বোধনের হেতু কেবলমাত্র নিষ্ফল ক্রোধ নাকি সত্যি তিনি কুটিনীপেশার সাথে যুক্ত ছিলেন সে তথ্য এখানে নেই। সাধারণতঃ এই পেশা ও পেশাবলম্বিনী রমণী সমাজের চোখে সম্মাননীয় ছিলেননা কিন্তু বসন্তসেনার মা এই পণ্ডতিভুক ছিলেননা। তাঁর আচার-আচরণ-ব্যবহার কথাবার্তা ইত্যাদি যথেষ্ট মার্জিত এবং রুচিশীল।

অধিকরণিক বসন্তসেনার মাতার কাছ থেকে অভিযোগ সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। বসন্তসেনার মাতা প্রশ্নের উত্তরে জানান, তাঁর কন্যা প্রণয়ী চারুদত্তের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। নিয়মানুসারে চারুদত্তকে নিয়ে আসা হয়। এরপরে অধিকরণিক-বিচারকাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ-শকার-বসন্তসেনার মাতা-চারুদত্ত-বীরক-মৈত্রেয় প্রমুখের দীর্ঘ বাদানুবাদ এবং আলোচনার ফলে দুর্দৈববশতঃ চারুদত্তকে হত্যাকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। রাজা পালকও তাতে সম্মতি প্রদান করে তাঁকে শূলে চাপিয়ে হত্যার নির্দেশ দেন। নবম অঙ্কের ঘটনা এখানেই সমাপ্ত।

বসন্তসেনার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও এই অঙ্কের ঘটনাবলী মূলতঃ তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একটি না হওয়া অপরাধের দায়ভার নিতে হয়েছে চারুদত্তকে। শকার অনেকক্ষেত্রেই বিচারব্যবস্থাকে প্ররোচিত করেছে। ‘ব্যবহার’ অঙ্কটি বসন্তসেনার কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে তুলে ধরে না কিন্তু একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, জনসমক্ষে গণিকার সাথে প্রেমের সম্পর্কের উল্লেখ চারুদত্তে অস্বস্তি লক্ষিত হয়। তিনি বিবাহিত বলে এই আপত্তি নাকি তাঁর মত গুণবান, সম্মানীয় পরিবারের বংশপ্রদীপের প্রেমিকা একজন প্রসিদ্ধ গণিকা এইটি সর্বসমক্ষে স্বীকারে তাঁর অনীহা তা অমীমাংসিত প্রশ্ন হিসেবে রয়ে যায়। তিনি স্বগতোক্তি করেছেন-

“ন চ মে বসন্তসেনাবিরহিতস্য জীবিতেন কৃত্যম্”^{৪৩}।

কিন্তু প্রকাশ্যে স্বীকার করেন নি। যখন সকলে বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করেছেন তখন তাঁর এহেন আচরণ প্রশ্নের সৃষ্টি করে তবে কি চারুদত্ত ততটাও উদার হতে হতে পারেননি? কারণ কোনো কূলনারী হলে তাঁর পরিচয় প্রকাশ্যে এলে কলঙ্কিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় কিন্তু একজন গণিকার ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই কারণ তিনি এমনই ‘প্রকাশ্যনারী’ তাই তাঁর পরিচয় প্রকাশিত হলে কোনোরকম অসুবিধে অন্ততঃ বসন্তসেনার দিক থেকে হবে না। তাহলে কি অসুবিধে, অস্বস্তি চারুদত্তের দিক থেকে ছিল? তিনি কি সম্পূর্ণভাবে মন তৈরী করতে পারেন নি? আবার সেই তিনিই প্রিয়ানু মৃত্যুসংবাদে জীবনত্যাগ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবশ্য প্রেয়সীকে হত্যার মিথ্যা কলঙ্ক তার অন্যতম কারণ।

দশম তথা অন্তিম অঙ্ক ‘সংহার’। এই অঙ্কে নায়িকা বসন্তসেনার উপস্থিতি খুব স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। চারুদত্ত-বসন্তসেনার মিলনের মাধ্যমে প্রকরণটির পরিসমাপ্তি হয়। খুব সংক্ষেপে হলেও এই অঙ্কটির কাহিনী আলোচনা অবশ্যকর্তব্য।

বেশ্যা বসন্তসেনাকে তাঁরই অলংকারের জন্য পুষ্পকরগুপ্ত উদ্যানে নিয়ে বলপূর্বক হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত চারুদত্ত রাজাদেশে মৃত্যুদণ্ড পেয়েছেন। তাঁকে শ্মশানে আনা হয়েছে। মৃত্যু যখন একেবারে নিকটে ঠিক সেই সময় লোকমুখে সমস্ত কিছু জানামাত্র সেখানে সশরীরে উপস্থিত হন গণিকা বসন্তসেনা এবং তাঁর প্রাণরক্ষাকারী বৌদ্ধভিক্ষু। যাকে হত্যা করার অভিযোগে চারুদত্তকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তিনি জীবিত থাকায় স্বাভাবিক নিয়মেই আগের সিদ্ধান্ত রদ করতে হয় এছাড়াও উজ্জয়িনীতে সেইসময় যে রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছিল, যে গণবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তার চূড়ান্ত পটপরিবর্তন ঘটে। পালকের পরিবর্তে সিংহাসনে বসেন গোপবালক আর্যক এবং তাঁর সিদ্ধান্তে চারুদত্ত মুক্ত হন এবং হৃতসম্মান ফিরে পান। পতির শোকে ধূতা আত্মহুতি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন কিন্তু সঠিক সময়ে চারুদত্ত উপস্থিত হয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। সকলের সাথে মিলনের মধ্যে দিয়ে সুখ-সমাপ্তি ঘটে।

এই অঙ্কের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল রাজাদেশে বসন্তসেনার ‘বধু’ আখ্যা লাভ-

“আর্যো! বসন্তসেনে! পরিতুষ্টো রাজা ভবতীং বধূশব্দেনানুগৃহ্ণতি।”^{৪৪}

এই সম্বোধনে তাঁকে ভূষিত করেন রাজসখা শর্বিলক। বসন্তসেনার আগমনে যা কিছু অশুভ ছিল সব কিছু যেন শুভ বলে প্রতিপন্ন হল। বধের জন্য নির্দিষ্ট বস্ত্র বিবাহের বস্ত্রে পরিণত হল; বধের দুঃসহ বাদ্য বিবাহবাদ্যে পরিবর্তিত হল। আকস্মিক ভাবেই সবকিছু শুভ হল। বসন্তসেনা সপত্নী ধূতার প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীলা, তাঁর সর্বঙ্গীণ কুশল কামনা করতে দেখেছি আমরা তাঁকে। কোনো দ্বেষ বা ঈর্ষা নেই উপরন্তু অগ্রজার মত ভক্তি এবং ভালোবাসা রয়েছে।

একজন গণিকা তিনি নিজ গুণে যথার্থ প্রেমিকা হতে পারেন, হতে পারেন একজন সন্তানের মা কিন্তু স্ত্রী অথবা বধু? সমাজে বিশেষ করে কি সত্যি সমাজ এতোটা উদার ছিল? আমরা কিন্তু একজন

গণিকাকে প্রথম ‘বধূ’ আখ্যা পেতে দেখি চতুর্থ অঙ্কে। সেখানে বসন্তসেনা নিজের সখীতুল্য প্রিয় দাসী মদনিকাকে বিনামূল্যে মুক্তি দিয়ে ‘বধূ’ আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রেমিকের হাতে অর্পণ করেছিলেন। ঘটনাটি একেবারেই বসন্তসেনার গৃহে ঘটেছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। কিন্তু বসন্তসেনার ক্ষেত্রে বিষয়টি যথেষ্ট গভীর এবং ব্যতিক্রম। রাজা স্বয়ং তাঁর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ গণিকাকে অর্থাৎ যাঁকে ভোগ করার অধিকার নগরীর প্রায় সকল পুরুষের এমন একজন নটীকে, বেশ্যাকে তিনি ‘বধূ’ সম্বোধনে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। এ যেন প্রথম অঙ্কের বিটের উজ্জ্বল সমর্থন করা হল, –“রত্নং রত্নেন সংগচ্ছতে”। বসন্তসেনার যে প্রকৃতি, তাঁর যা গুণাবলী সেই ধরনের রমণীদের ‘জনপদবধূ’ বা ‘জনপদকল্যাণী’ রূপে স্থান দেওয়া হত। ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-অর্থ-বিশ্বে তাঁরা প্রায় রাজার তুল্য বা কখনো অধিক ক্ষমতাশালিনী হতেন। কিন্তু শূদ্রক দেখিয়েছেন প্রেমের মহিমা; যার স্পর্শে একজন গণিকার প্রেমিকা থেকে বধূরূপে রূপান্তর ঘটেছে। শুধু তাই নয় যে অলঙ্কার তাঁর পেশার জন্য প্রয়োজন বা বলা ভালো যে, অলংকার এবং গণিকাবৃত্তি পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িত সেখানে প্রেমিকের সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য, তাকে আশ্বস্ত করার জন্য এবং বালকের দৃষ্টিতে নিজেকে তার নিরাভরণা মায়ের সমতুল্য করে তোলার জন্য এক লহমায় নিজের সমস্ত অলংকার খুলে দিতে পেরেছিলেন তিনি। ঠিক কতোখানি প্রেমবিভোর হলে নিজের আজন্মলালিত পেশাসম্বন্ধীয় যাবতীয় শিক্ষা-বিদ্যা সব এইভাবে তুচ্ছ করে ফেলা সম্ভব? এবং আমাদের আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে আচার্য বাৎসর্যায়ন যেমন নির্দেশ করে গেছেন অভিনয় কিংবা ভান করার জন্য পেশারক্ষা ও বৃদ্ধিই যার উদ্দেশ্য। আর এখানেই শূদ্রকের বসন্তসেনা অনন্যা; তিনি হৃদয়বৃত্তির অনুসারী। শুধুমাত্র প্রেমের পথ ধরে এগিয়ে তিনি সমাজে সকলের চোখে সম্মাননীয় বধূর মর্যাদায় অলংকৃত হয়েছিলেন।

কুটনীমত

সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় কাব্য হল দামোদর গুপ্তের কুটনীমত। শাস্ত্র নয় কিন্তু শাস্ত্র অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নয় এই কাব্যটি। এটিকে ‘শাস্ত্রকাব্য’, ‘নিদর্শনকাব্য’^{৪৫} ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কুটনীমতম্ সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্রলীমতম্ বা শস্ত্রলীমতম্ নামেও পরিচিত। যদিও এই কাব্যটি পূর্বোক্ত নামেই বেশি পরিচিত। দামোদর গুপ্ত

তাঁর কামশাস্ত্র বিষয়ক যাবতীয় জ্ঞান এই কাব্যে সন্নিবেশিত করেছিলেন বলা চলে। গ্রন্থটি পাঠ করার সময়ে যে বিষয়টি আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি সেটি হল আচার্য বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে কামকলা সম্বন্ধীয় যে সকল তথ্যাদি দিয়েছিলেন এবং যে ক্রমে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন দামোদর গুপ্ত তাঁর *কুটনীমতে* যেন তার সুযোগ্য অনুসরণ করেছেন। বাৎস্যায়নের *কামসূত্রের* 'বৈশিক অধিকরণ'-টি অবলম্বন করে এই কাব্যটি রচিত বা আরও পরিষ্কার করে বললে বলা যায় সম্পূর্ণ অধিকরণটিকে দামোদর গুপ্ত তাঁর কাব্যে নিজের মত করে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। কামসূত্র যেন তত্ত্ব আর তার প্রায়োগিক রূপ হল '*কুটনীমত*'।

দামোদর গুপ্ত কাশ্মীরনিবাসী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র যথাযথ ঐতিহাসিক কাব্যের মর্যাদাপ্রাপ্ত কলহনের *রাজতরঙ্গিনী* কাব্যে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। তিনি কাশ্মীররাজ জয়্যাপীড়ের ধী-সচিব ছিলেন। ঐতিহাসিকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং কাশ্মীরের ইতিহাস, *রাজতরঙ্গিনী* গ্রন্থ ইত্যাদি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় দামোদর গুপ্ত খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন যেহেতু জয়্যাপীড় সেইসময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই *কুটনীমত* এর রচনাকাল হিসেবে অষ্টম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়টিকে মান্যতা দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের গবেষণাকাজের জন্য এই গ্রন্থটির নির্বাচন অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। নির্বাচনের দুটি কারণ রয়েছে- প্রথমতঃ বাৎস্যায়ন তাঁর *কামসূত্রে* স্বাভাবিকভাবেই কোনো বিশেষ গণিকা চরিত্রের উল্লেখ করেননি। তিনি তাঁর গ্রন্থে গণিকা এবং গণিকাবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সমস্তপ্রকার প্রায় সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই *কামসূত্রের* পাঠ আমাদের গণিকাবৃত্তি সম্পর্কে বিশদে অবগত করে অন্যদিকে দামোদর গুপ্ত তাঁর *কুটনীমত*-এ কয়েকজন বিশেষ গণিকাচরিত্রের উল্লেখ করেছেন (যাঁদের মধ্যে মালতী, হারলতা অন্যতম)। হতেই পারে এঁরা কবির কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু এই কাব্যের মূল চরিত্র এঁরাই। এই গ্রন্থে অসংখ্য গণিকা চরিত্র রয়েছে। পেশাগত দিক থেকে তাঁরা বিভিন্ন স্তরের সেইসমস্ত চরিত্রগুলি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন কবি। এছাড়া দ্বিতীয় কারণটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। *কুটনীমত*-কাব্যের এই নামকরণ থেকে স্পষ্ট যে এই কাব্য শুধু গণিকাদের কথা বলেনা, কুটনীদেব কথ্যও রয়েছে এই কাব্যে। আসলে এই বৃত্তির সঙ্গে শুধুমাত্র গণিকারাই যুক্ত ছিলেন না; তাঁদের সঙ্গে

আরও বহুসংখ্যক মানুষও এই পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। হ্যাঁ তাঁরা অবশ্যই গণিকাদের মতো সরাসরি এই পেশায় যুক্ত ছিলেননা কিন্তু এই পেশার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা কোনো অংশেই কম নয়। ‘কুটনী’^{৪৬} বা যাঁদের চলতি কথায় ‘কুটনি’ বলা হয়ে থাকে তাঁরা এই পেশার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যৌবনকালের প্রসিদ্ধ গণিকা প্রৌড়হে ‘কুটনীবৃত্তি’ বেছে নিয়েছেন। আচার্য কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের ‘গণিকাধ্যক্ষ’ প্রকরণে এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন যা আমরা অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।^{৪৭} এছাড়া বাৎসর্যয়নও এই বয়স্কা, রূপ-যৌবনহীনা প্রাক্তন গণিকার আর্থিক অবস্থা এবং জীবিকার প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন।^{৪৮}

আমাদের গবেষণার বিষয় গণিকাচরিত্রের অভিব্যাপ্তি অনুসন্ধান। অভিব্যাপ্তি অনুসন্ধানের আগে তার উৎস এবং ক্রম পরিবর্তনের ধারাটি জানা প্রয়োজন। সেই অনুসন্ধান যথাযথ হওয়ার জন্য এই পেশার সাথে যুক্ত সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ এবং বিচার করা প্রয়োজন কেননা তার ফলে গণিকা এবং তাঁদের বৃত্তি সম্পর্কিত একটি সামগ্রিক দৃষ্টি পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে। এই গ্রন্থটি সেই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেতে আমাদের অনেকাংশে সাহায্য করেছে।

আগেই বলা হয়েছে দামোদর গুপ্ত এই কাব্যটিতে অসংখ্য গণিকাচরিত্রের সন্নিবেশ করেছেন কিন্তু কাব্যের মূল আকর্ষণ কোনো যৌবনশালিনী গণিকা নন, একজন বিগতযৌবনা কুটনী। মূলতঃ তাঁরই কথনে কাহিনীবিন্যাস হয়েছে। মোট তিনটি কাহিনী রয়েছে এই কাব্যটিতে। প্রতিটি কাহিনীই গণিকাবৃত্তিকে অবলম্বন করে রচিত। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য। আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে সমগ্র গ্রন্থটি তিনটি কাহিনীতে বিভক্ত। এই কাহিনিত্রয় স্বতন্ত্র হলেও তারা একটি মূল সূত্রের সাথে সম্পর্কিত এবং সেই সূত্রটি হল প্রথম কাহিনীটি। তিনটি কাহিনীতেই অসংখ্য বেশ্যা চরিত্র রয়েছে এবং তাঁদের আচারব্যবহার, কথাবার্তা, পেশা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। আমাদের গবেষণার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই তথ্যগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করার আগে তিনটি কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করে দরকার। পৃথক পৃথক ভাবে তিনটি কাহিনীর পাঠ আমাদের এই গণিকাচরিত্রগুলির বৈচিত্র্য অনুধাবনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে; একটি সামগ্রিক চিত্র দিতে সমর্থ হয়েছে। কুটনীমত এর প্রারম্ভিক কাহিনীতে বর্ণিত রয়েছে বারাণসী নগরীর স্বনামধন্যা গণিকা

মালতীর কথা। বারাণসী নগরীর বেশ্যাগোষ্ঠীর শিরোমণিস্বরূপা গণিকা মালতী, অসামান্য তাঁর রূপ।
তাঁর প্রশংসা করেছেন দামোদর গুপ্ত-

“সংসজ্জভোগিনেত্রা মন্দরধরনীভূতো যথা মূর্তিঃ।

উপরিগতা শূলানামঙ্কাসুরাগাত্রলেখব।।১৯।।

সমুভাসবাররামা মানসবসতেঃ শরীরিণী শক্তিঃ।

নিঃশেষবেশযোষিদ্ভিভূষণং মালতী নাম।।২০।।

পেশলবচসাং বসতিরলীলানামালয়ঃ স্থিতিঃ প্রেমঃ।

ভূমিঃ পরিহাসানামাবসথো বক্রকথিতানাম্।।২১।।”^{৪৯}

কিন্তু এতো রূপবতী, যৌবনশালিনী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তুষ্ট নন। নিজের মনের অপ্রাপ্তি এবং অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁর মনে হয় সাফল্যলাভ করতে হলে তাঁকে বারাণসীর প্রসিদ্ধ কুটনী বৃদ্ধা বিকরালার শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য। এই গ্রন্থের মূল চরিত্র কুটনী বিকরালার-

“অথ বিরলোন্নতদশনাং নিম্নহনুং স্থূলচিপিতিনাসাগ্রাম্।

উল্লগচুচুকলক্ষিত শুক্ককুচস্থান শিথিলকৃতিতনুম্।।২৭।।

গম্ভীরারক্তদৃশং নিরভূষণলম্বকপালীং চ।

কতিপয়পাণ্ডুরচিকুরাং প্রকটশিরাং সন্ততায়তগ্রীবাম্।।২৮।।”^{৫০}

গণিকামহলেই শুধু নয়, কামিব্যক্তিদের কাছেও তিনি সমভাবে প্রসিদ্ধ। মালতী সখীদের সাথে তাঁর কাছে এসে প্রণাম করে গুণগান করে নিজের প্রার্থনা জানানো। এতো রূপ-যৌবন, শারীরিক সৌন্দর্য, আকর্ষণী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র ভাগ্যদোষে তিনি হীনকুলজাত, গুণহীন, রোগী এবং কুৎসিত পুরুষদের সেবা করেন। অন্যান্য কয়েকজন বেশ্যার নামোল্লেখ করেছেন তিনি যাঁরা নিজেদের বৃত্তিতে উন্নতি লাভ করেছিলেন। মালতী নিজের অবস্থায় অত্যন্ত হতাশা প্রকাশ করে তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছেন।

বিকরলা মালতীর সৌন্দর্যের, প্রতিটি অঙ্গের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে তাঁর কর্তব্যকর্ম বলেছিলেন। নিজের জ্ঞান- বুদ্ধি এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি ‘গম্যনির্ণয়’ করে মালতীকে জানিয়েছেন রাজকর্মচারী ভট্টের পুত্র চিন্তামণি ভট্টের কথা। বাৎস্যায়ন তাঁর *কামসূত্রে* ‘গম্য’ নির্বাচন প্রসঙ্গে বিশদে বলেছেন, যে পুরুষ অভিভাবকহীন অথবা অভিভাবকের থেকে দূরে বাস করেন এবং প্রভূত সম্পদশালী সেই ব্যক্তি গমনীয়।^{৫১} ঠিক এই কারণগুলির জন্য চিন্তামণি ‘গম্য’ হিসেবে একেবারে আদর্শ কারণ তিনি নিজের পিতার থেকে দূরে থাকেন ফলে তিনি স্বয়ং অভিভাবক আবার পিতা রাজকর্মচারী হওয়ায় বিপুল সম্পদের অধিকারী। সাজসজ্জাপ্রিয়, বিলাসী এই যুবকটি শ্রেষ্ঠী-বিট-বণিক-কিতব এই সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে মেলামেশা করতেন, স্তাবকতাপ্রিয় অনুচরদের সাথে বিলাসে-ব্যসনে তাঁর দিন কাটে। *নাট্যশাস্ত্র*দির জ্ঞান ব্যতীত বিশেষ কোনো গুণ বা কাজে দক্ষতা না থাকলেও কেবলমাত্র আর্থিক অবস্থানের কারণে সমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি রয়েছে।

বিকরলা মালতীকে সর্বপ্রথমে একজন দূতী প্রেরণ করতে বলেছিলেন যিনি চতুরা, বাকপটু এবং বুদ্ধিমতী হবেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাম্বুল ও পুষ্পদান করে করজোড়ে মালতীর কথা তাঁকে জানাবেন। কিন্তু কী জানাবেন তিনি? সেটাই শিখিয়ে দিয়েছেন বিকরলা। তিনি উপদেশ দিয়েছেন দূতী যেন চিন্তামণি ভট্টকে জানায় বেশ্যামাত্রেরই প্রতারক, প্রবঞ্চক এরকম ধারণা বিদ্যমান। তাঁরা পুরুষদের মধ্যে কোনোরকম বিচার বিবেচনা করেনা, শুধুমাত্র অর্থই তাঁদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু আমার সখী অর্থাৎ মালতী এইসব সাধারণ বিষয়ের উর্ধ্বে। মালতীর হৃদয় চিন্তামণির প্রেমে ব্যাকুল এবং নিতান্তই অপারগ হয়ে তাঁর এই প্রেমাকুলতার কথা জানাতেই দূতী উপস্থিত হয়েছেন একথাও জানাবেন।

যদি কোনো কারণবশতঃ ভট্টপুত্র প্রতিকূল আচরণ করেন তবে দূতী নানাবিধ রুঢ় বাক্য বলে তাঁর পৌরুষ-উদ্দীপনের চেষ্টা করবেন। মালতীর প্রতি চিন্তামণির কামোদ্বেগ হলে তিনি তাঁর গৃহে উপস্থিত হবেন। সেই মুহূর্তে মালতীর কী করণীয় তা বলেছেন অভিজ্ঞা কুটনী। দয়িতকে দেখে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে ক্ষণমাত্র তাঁর সামনে উপস্থিত থেকে তিনি অন্দরে প্রবেশ করবেন। তখন অভ্যর্থনার দায়িত্ব পালন করবেন গণিকামাতা। যথাযথ সম্মান দিয়ে, নানারকম অনুকূল ও শ্রুতিমধুর

বাক্য বলে নিজের এবং নিজকন্যার (গণিকা) ভাগ্যকে নমস্কার জানিয়ে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবেন।
মাতা ও অন্যান্য সখীরা বাসকগৃহ ত্যাগ করে গেলে তাঁদের মধ্যে নিয়মানুসারী যৌনসম্পর্ক স্থাপিত
হবে। যথাযথ সন্তুষ্টিবিধানের পরে ব্রীড়াবনতা মালতী যেন চিন্তামণির কাছে তাঁর স্ত্রী-সংসার ইত্যাদির
প্রশংসা করেন।

এটি হল প্রথম কাহিনী। অত্যন্ত সংক্ষেপে আমরা এক এক করে তিনটি কাহিনী আলোচনা করে
নেব কারণ গল্পের মূল বক্তব্যেই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য নিহিত রয়েছে।

আলোচনার শুরুতেই আমরা বলেছি যে দামোদর গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে আচার্য বাৎসর্যায়নের *কামসূত্রের*
'বৈশিক অধিকরণ'-এ বর্ণিত অধ্যায়গুলিকে যেন উদাহরণসহ বিবিধ চরিত্রের সাহায্যে প্রায়োগিকভাবে
ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। বাৎসর্যায়নের তত্ত্বের এ যেন প্রকৃষ্ট প্রয়োগ। বারাণসী নগরীর প্রখ্যাত
গণিকা, যিনি অপরূপা, যৌবনসম্পন্না কিন্তু তিনিও মনোমত সফলতা লাভ করতে পারেননি। তাই
যাবতীয় অহংকার ইত্যাদি ত্যাগ করে তিনি উপস্থিত হয়েছেন এক বৃদ্ধা, লোলচর্মসার, কুরূপা কুটুণীর
কাছে। কারণ কী? মালতী বুঝেছিলেন শুধু রূপ দিয়ে দীর্ঘকাল কার্যসিদ্ধি অসম্ভব আর সেইজন্যই
চাই অভিজ্ঞজনের সুপরামর্শ। আদত বাস্তবও তাই কেননা গণিকাবৃত্তির মতো পেশায় যেখানে তুলনায়
অনেক কমবয়সী মেয়েদের আসাযাওয়া প্রায় নিত্যকার বিষয় সেখানে টিকে থাকতে হলে চাই ক্ষুরধার
বুদ্ধি, বাস্তবজ্ঞান, অভিনয় দক্ষতা, বাক্পটুতা এবং সম্মুখ উপস্থিত পুরুষটিকে বোঝার অসামান্য
ক্ষমতা। অন্যথায় পরাজয় অনিবার্য। বিকরাল্লা একরকম প্রায় হাতে ধরেই মালতীকে প্রতিটি পদক্ষেপ
শিখিয়ে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র বলে দিয়েই নয়; প্রতিটি ক্ষেত্রে একেবারে বিশদে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা
দিয়েছেন তিনি। মালতী, দূতী-মালতীর মাতা(জন্মদাত্রী অথবা পেশাগত) এঁদের প্রত্যেকের কাজ
আলাদা, আচরণ আলাদা, বাক্যপ্রয়োগ কিংবা ব্যবহার একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কাহিনীটি
পাঠ করতে গিয়ে যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়েছে সেটি হল এঁদের সকলেই কিন্তু একপ্রকার
অভিনয় করছেন পুরুষটির সাথে। পুরুষটি একজন গণিকার কাছ থেকে দৈহিক সুখ লাভ করছেন
ঠিকই কিন্তু প্রেম? নাহ্, এই সম্পর্কে প্রেমের কোনো অস্তিত্ব নেই।

মালতী বিকরালাকে গুরুত্ব সম্মান দিয়েছিলেন। সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে একেবারে প্রকৃত শিক্ষার্থীর মত নিজের আকুতি প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তাঁর এই সমর্পণের ভঙ্গীটি হয়তো বিকরালার মন ছুঁয়ে গেছিল আর তাই তিনি নিজের গণিকা জীবনের এবং কুটনী জীবনের সমস্ত জ্ঞান উজাড় করে দিয়েছিলেন মালতীকে।

করণীয় বিষয়ের উপদেশাবলী দেওয়ার প্রসঙ্গেই বিকরালার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কাহিনীটি মালতীকে বলেছিলেন। সেই কাহিনীদুটির বিষয়বস্তু জানার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা প্রয়োজন। বিকরালার মালতীর কাহিনীটি এই গ্রন্থের প্রাথমিক গল্প বা বলা যায় এটি ধারক গল্প। মালতীর আগামী কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় এবং শেষ কাহিনীটি সেই প্রসঙ্গ অনুসারে এসেছে। দ্বিতীয় কাহিনীটি (হারলতা-সুন্দরসেনের প্রেমকাহিনী) বিকরালার মালতীকে বলেছেন যাতে মালতী তাঁর ‘গম্য’ চিন্তামণিকে সেই কাহিনীটি শুনিয়ে তাঁর প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা জানিয়ে চিন্তামণির বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হন। আর মঞ্জুরী-সমর ভট্টের অন্তিম কাহিনীটি তিনি বলেছিলেন যাতে মালতী নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য, নিজের লক্ষ্য স্থির রাখতে পারেন। অতএব আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না দ্বিতীয় কাহিনীটি চিন্তামণিকে নিজের জালে আকর্ষিত করে রাখার জন্য, তাঁকেই শোনানোর জন্য এবং তৃতীয়টি একান্তই মালতীর জন্য কথিত হয়েছে।

দ্বিতীয় কাহিনীতে প্রবেশ করার আগে *কুটনীমত* গ্রন্থটির অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু তারও আগে এই গ্রন্থটির কয়েকটি অধ্যায়ের নামকরণ দেখে নেওয়া প্রয়োজন। সমগ্র গ্রন্থটিকে দামোদর গুপ্ত মোট এগারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন। যথা-

- কথামুখম্,
- মালতী-বিকরালার সংবাদঃ,
- গম্যচিন্তা,
- গম্যোপাবর্তনম্,
- প্রীতিযোগবিধিঃ,
- হারলতাখ্যানম্ (১),

- হারলতাখ্যানম্ (২),
- হারলতাখ্যানম্ (৩),
- হারলতাখ্যানম্ (৪),
- হারলতাখ্যানম্ (৫),
- কান্তানুবৃত্তম্ ।

এর আগের অধ্যায়েই আমরা বাৎসর্যায়নের কামসূত্র বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। এই গ্রন্থে উল্লিখিত ‘গম্যচিন্তা-গম্যোপাবর্তনম্-প্রীতিযোগবিধিঃ’ এই তিনটি অধ্যায়ে কথিত বিষয়গুলির সাথে কামসূত্রে বর্ণিত বিষয়ের সাদৃশ্য বিস্ময়কর। যদিও এই সাদৃশ্য থাকাটাই স্বাভাবিক কারণ দামোদর গুপ্ত যেহেতু পরবর্তী সময়ের কবি তাই তিনি নিজের কিংবদন্তী পূর্বসূরিকে অনুসরণ করবেন সেটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় কাহিনীটি হারলতা নাম্নী গণিকা এবং সুন্দরসেন নামক এক যুবা পুরুষের। পাটলিপুত্র মহানগরে পুরন্দর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন; তাঁরই পুত্র এই সুন্দর সেন। সুন্দর সেন এবং তাঁর অভিন্ন হৃদয়বন্ধু গুণপালিত। সুন্দরসেন দেশভ্রমণে আগ্রহী হলে গুণপালিত তাঁকে দেশভ্রমণের বেশ কিছু নেতিবাচক দিকের কথা বলেন কিন্তু সুন্দরসেনের প্রবল ইচ্ছার কাছে একরকম অপারগ হয়েই তিনি বন্ধুর সাথে বিশ্ব পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। নানা স্থান ঘুরে বহুবিধ শাস্ত্র-অস্ত্রাদির জ্ঞানলাভ করলেন, জানলেন পত্রচ্ছেদ্য-আলেখ্য-মোমের বস্ত্রনির্মাণ, বিট-কূলটা গণের বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হলেন, তৌর্যত্রিকাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে তাঁরা অর্বুদ পর্বতে উপস্থিত হলেন।

অর্বুদ পর্বতের শিখর দর্শনের জন্য চূড়ায় পৌঁছালে সেখানে সুন্দরসেন একটি অনিন্দ্যসুন্দরী নারীকে দেখতে পেলেন, অলোকসামান্য তাঁর রূপ। তাঁকে দেখেই মনে প্রেম অনুভব করলেন তিনি অন্যদিকে সেই সুন্দরী রমণীও তাঁকে দেখে বিবশ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অবস্থান্তর বুঝতে পেরে সখীরা তাঁকে জানান যে গণিকাদের জগতে প্রেম নিষিদ্ধ। তাঁদের উক্তি থেকেই জানা যায় মেয়েটির পরিচয়, তিনি গণিকাশ্রেষ্ঠা হারলতা যিনি ক্ষণিকের দর্শনে সুন্দরসেনের প্রতি প্রেমাকুলা হয়েছেন। সখীদের বারবার বারণ না শুনে তিনি নিজের হৃদয়বৃত্তি অনুসরণ করতে ইচ্ছুক। এইখানে তাঁর সখীর একটি বাক্য

লক্ষণীয় তিনি বলেছেন রূপবান অথবা যুবক পুরুষ গণিকাদের কাম্য নন, তিনিই কাম্য যিনি অর্থবান। তাই রূপ দেখে যেন হারলতা ভুল না করেন। কিন্তু হারলতা নিজ সিদ্ধান্তে অটল। তাই তাঁর হয়ে দৌত্য করতে সুন্দরসেনের কাছে উপস্থিত হলেন তাঁর সখী। হারলতার ‘গণিকা’ পরিচয় জানিয়ে তাঁর মনোকামনা নিবেদন করলেন। প্রকৃত তথ্য জেনে উপকারী বন্ধুর মত গুণপালিত রূঢ় ভাষায় নানাভাবে বেশ্যাসক্তির নিন্দা করেছেন। সুন্দরসেন বন্ধুর ‘সখাসম্মিত উপদেশ’ না শুনে উপস্থিত হলেন হারলতার আবাসে যা আদতে একটি বেশ্যাপল্লী। তাঁদের যাত্রাপথে তাঁরা বেশ্যাপল্লীর প্রাত্যহিক দৃশ্যাবলী দেখতে পেয়েছিলেন। বারাজনা-বিট-কিতব-কামী পুরুষ-কুড়িনী সব ধরনের চরিত্রের উপস্থিতি এবং কথোপকথন তাঁদের গোচরে আসে। দামোদর গুপ্ত অত্যন্ত নিপুণ ভাবে গণিকাপল্লীর চিত্রাঙ্কন করেছিলেন এই অংশটিকে।

হারলতা এবং সুন্দরসেন পরস্পরের প্রেমে বিভোর হয়ে দেড় বছর অতিবাহিত করলে একদিন তাঁর পিতা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পুরন্দরের কাছ থেকে পত্রবাহক এলে পিতার পত্র পাঠ করে সুন্দরসেনের মনে হল তিনি নিজের বংশকে কালিমালিষ্ট করছেন বেশ্যাসঙ্গ করে। তাই তিনি দুঃখিত হয়ে হারলতাকে ত্যাগ করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে হারলতা তীব্র কষ্ট পেলেও নিজের ভবিতব্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রিয়তমকে বিদায় জানানোর মুহূর্তে সুন্দরসেন তাঁর দৃষ্টিপথের দূরে গেলেই তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করেন। পথে আগত এক ব্যক্তির কাছ থেকে এই সংবাদ পাওয়ামাত্র সুন্দরসেন ফিরে এসে হারলতার প্রাণহীন দেহ দেখে শোকে মূহমান হয়ে বিলাপ করতে থাকেন। গুণপালিত সখার এহেন অবস্থা দেখে হারলতার দেহের অন্তিম সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। রূপসী প্রেয়সীর এই করুণ পরিণতি দেখে সুন্দরসেন সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে অরণ্যে প্রবেশ করার মনস্থ করেন; গুণপালিতও তাঁর সঙ্গ নেন।

এরকম একটি কাহিনী মালতীকে বলার পেছনে বিকরালার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে আবার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন মালতী যেন কাহিনীটি আপন দয়িত (গম্য পুরুষ)চিন্তামণিকে বলেন। কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রেমের কথা। একজন গণিকা ও একজন ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রেম। সেই প্রেমের এতখানি

তীব্রতা যে প্রিয়তমের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে গণিকাটি মৃত্যুবরণ করেন। অতএব গণিকামাত্রেই প্রতারক বা প্রবঞ্চক নন, তাঁরা প্রকৃত প্রেমিকাও হতে পারেন।

কিন্তু দ্বিতীয় কাহিনীর যে বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে সেটি হল সুন্দরসেনের মানসিক অবস্থা, তাঁর চিন্তনপ্রক্রিয়া। অবাক লাগে এক মুহূর্তের দর্শনে যাঁর প্রতি সুতীর আকাঙ্ক্ষা বোধ করলেন তিনি, সেই মেয়েটি গণিকা জানার পরেও তাঁর কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং সেই সময়ে নিজের কূলমর্যাদার কথা তাঁর মনে জাগেনি। কিন্তু আকস্মিক ভাবে পিতার প্রেরিত পত্র পাঠের পরে যেন তাঁর চৈতন্যোদয় হয়, তিনি সিদ্ধান্ত নেন ফিরে যাওয়ার মেয়েটিকে সেখানেই ত্যাগ করে। মনে প্রশ্ন জাগে, হারলতা গণিকা বলেই কি তাঁর প্রতি এহেন আচরণ? কোনো উচ্চকূলকন্যা হলে কি সুন্দরসেন এতো সহজে দায় এড়াতে পারতেন? হারলতার ভালবাসাকে মর্যাদা দেওয়ার বা ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়ার উল্লেখ নেই অথচ দাবী আছে তিনি যেন অন্য কোনো পুরুষকে নিজের হৃদয়ে স্থান না দেন। কিন্তু অধিকারবোধ কয়েম করতে হলে তো দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয় সেই বিষয়ে রচনাকার নিশ্চুপ। তবে কি ধরে নিতে হবে হারলতা তথাকথিত ‘স্বাধীনা’ বলেই এই সিদ্ধান্ত বা তাঁর এই পরিণতি? ভালোবাসার স্বীকৃতি দূর অস্ত পালনের দায় যখন প্রেমিক নেবেন না তাহলে তো সত্যি তাঁদের প্রেমিকা হওয়ার দরকার নেই। জীবনধারণের থেকে আরও বড় কোনো সত্যি আছে কি?

আরও বিস্ময় জাগে যখন দেখি, পিতার কথা শুনে প্রেমিকাকে ত্যাগ করতে দুবার ভাবেননা যিনি, সেই তিনি প্রেমিকার মৃত্যুতে শোকাবুল হয়ে বিলাপ করেন। স্থান-কাল ভুলে হাহাকার করে আবার চিতার আগুনে মেয়েটির দেহ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেখে হঠাৎ যেন বৈরাগ্যদশা প্রাপ্ত হন, সংসারের অনিত্যতা বুঝতে পারেন। কখনো মনে হয়েছে সুন্দরসেনের মতো পুরুষেরা কোনোভাবেই আদর্শ প্রেমিক নয় এবং তাঁদের প্রেম আসলে অনেকাংশেই দৈহিক অর্থাৎ কামজ আকর্ষণের ফল।

এরপরের কাহিনীর ঘটনাস্থল আবার বারাণসী। এই কাহিনীর নায়িকা গণিকা মঞ্জুরী এবং নায়ক দেবরাজের রাজা সিংহভটের পুত্র সমর ভট। কাহিনী আরম্ভের আগে মনে রাখতে হবে বৃদ্ধা কুড়িনী মালতীকে বলেছেন এই বৃত্তান্তটি। কেন? যাতে বয়সে অনভিজ্ঞা মালতী হারলতার মত সত্যি সত্যি কোনো পুরুষের প্রেমে আসক্ত হয়ে না পড়েন। তিনি যেন স্মরণে রাখেন তাঁর পেশার মূলমন্ত্র।

প্রেম তাঁদের জন্য নয়, তাঁরা প্রেমের অভিনয় করেন মাত্র। মালতীর লক্ষ্য স্থির ও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে বিকরলা এই কাহিনীটি বলেছেন।

সমর ভট্ট সপারিসদ বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য বারাণসীতে এসেছেন। মন্দিরের দিকে যাওয়ার সময়ে তাঁরা যে পথ দিতে যাচ্ছিলেন সেটি বেশ্যা-বিট-চেটিকা সমাকুল। এইখানে আবার আমরা বেশ্যাদের নিত্যকার জীবনের কথা পাবো। যদিও এখানে বেশ্যাপল্লীর বর্ণনা নেই তবু কিছু ছোট ছোট দৃশ্য মিলেমিশে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র তৈরী করেছে। অভিবাদন ইত্যাদি সম্পন্ন হলে রাজপুত্র বারাণসীর নৃত্য-কলা চর্চার বিষয়ে জানতে আগ্রহ দেখালে নাট্যাচার্য হতাশাব্যঞ্জক স্বরে জানান-

“বণিজ্য নেতারো যত্র, যত্র পাত্রাণি।

শাঠ্যায়তনং দাস্যস্তত্র কুতঃ সৌষ্ঠবং নাট্যে।। ৭৯৪”^{৫২}

জানা যায় হর্ষবর্ধনের মৃত্যুতে নাট্যচর্চার কোনো পৃষ্ঠপোষক না থাকায় তাঁরা একরকম বাধ্য হয়েই স্থানান্তরে এসেছেন। এখানে বেশ্যারা নাটকে অভিনয় করেন কিন্তু তাঁরা নিজস্ব পেশায় মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করেন বলেই মঞ্চের নাট্যশাস্ত্রোক্ত অভিনয় তাঁরা যথাযথ করতে পারছেন না। এছাড়াও নিজস্ব পেশাগত প্রয়োজনে তাঁরা নিত্য অভ্যাস করেননা। কেবলমাত্র কয়েকজন বেশ্যাবৃত্তি লোপের ভয়ে অভিনয় করেন তাও একরকম বাধ্য হয়ে। কিন্তু সকলের মধ্যে মঞ্জরী নামী জনৈকা গণিকা যিনি কিনা রত্নাবলীর চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি যথেষ্ট ভালো অভিনয় করেন। গণিকা মঞ্জরী সমর ভট্টের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তাঁর অভিনয়েই সেকথা প্রকাশ পেল অপরদিকে সমরভট্টও মঞ্জরীর প্রতি আকর্ষণবোধ করছেন বুঝে তাঁর সচিব তাঁকে বেশ্যাসঙ্গ থেকে নিরত করার জন্য বহুভাবে চেষ্টা করলেন। তিনি বেশ্যাসক্তির থেকে পরদারগমনের ইতিবাচক দিকের কথা জানালেন। আর অন্যদিকে মঞ্জরীর মাতা তাঁকে নিরস্ত করে স্বাভাবিক ভাবেই গণিকাসঙ্গের পক্ষে মন্তব্য করেন। উভয়ের এই তীব্র বাদানুবাদ বন্ধের উদ্দেশ্যে নাট্যাচার্য সমর ভট্টের উপস্থিতিতে তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য অনুরোধ করেন এক অন্ধ অভিনয় দেখবার জন্য।

সমর ভট অনুমতি অনুসারে রত্নাবলীর প্রথম অঙ্ক অভিনীত হল। কিন্তু সেই মঞ্চাভিনয়ের মধ্যেই মঞ্জরীর রূপ-শারীরিক সৌন্দর্যে সমর ভট তাঁকে কামনা করতে আরম্ভ করেন। অভিনয় শেষে দক্ষ গণিকার মতো মঞ্জরী নিজের সখীদের দূত রূপে প্রেরণ করেন যাতে তাঁর অবস্থার কথা সমর ভট জানতে পারেন। দীর্ঘ আবেদন- নিবেদনের পর্ব সমাপ্তির পরে সমর ভটের সম্মতি পাওয়ামাত্র সামান্য অথচ উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিতা মঞ্জরী দূতীসহ রাজপুত্রের আবাসে স্বয়ং উপস্থিত হলেন। আলাপচারিতা, কুশল বিনিময়ের পরে দূতী স্থানত্যাগ করলে উভয়ে সুরতে লিপ্ত হলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমর ভটের যাবতীয় অর্থ-সম্পদ নিঃশেষে সমাপ্ত করে মঞ্জরী তাঁকে পরিত্যাগ করলেন।

তৃতীয় কাহিনীটি সমাপ্ত হল। *কুটনীমতম্*-এর প্রতিটি কাহিনী স্বতন্ত্র। বিষয়বস্তুগত পার্থক্য এর অন্যতম কারণ। মালতী বিকরালার কাছে উপদেশ নিতে এসেছিলেন নিজের পেশায় উন্নত হওয়ার জন্য, গণিকা হিসেবে নিজের স্থান আরও দৃঢ় করবার জন্য। তাঁকে কামশাস্ত্রানুসারে জ্ঞান দেওয়ার পরে এই তৃতীয় কাহিনীটিতে গণিকাবৃত্তি বাস্তবতা বলেছেন বিকরাল। পুরুষ যেমন গণিকার শরীরভোগের উদ্দেশ্যে আসে ঠিক তেমনি একজন গণিকার এটাই পেশা আর তাই প্রেমের মোহে জড়িয়ে শিকার ধরার মতো করে ফাঁদ পেতে পুরুষটিকে আকর্ষণ করতে হবে তাঁদের। দৈহিক সুখ দেওয়ার পরিবর্তে সেই পুরুষটির যাবতীয় অর্থ-ধন-সম্পদ গ্রাস করে তাঁকে নিঃস্ব করে ফেলতে হবে। তারপর নিজেকে পরবর্তী পুরুষটিকে আকর্ষণ করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। সত্যি বলতে এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিকরালার মতো একজন কুটিনী চরিত্রকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় সেই সময়েও ঠিক কতোখানি পেশাদারিত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি। নিজের সবটুকু জ্ঞান- অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি। আসলে তিনি জানতেন আজকের গণিকাই ভবিষ্যতে কুটিনী হবেন তাই পেশা বাঁচিয়ে রাখার একটা তাগিদও তাঁর মধ্যে ছিল।

এই গ্রন্থটি আলোচনার প্রসঙ্গে বারবার একটি কথা উঠে এসেছে সেটি হল এই গ্রন্থে বর্ণিত গণিকা চরিত্রের বৈচিত্র্য। তিনটি কাহিনীতে তিনজন প্রধান গণিকার উল্লেখ থাকলেও বহুসংখ্যক অন্যান্য বেশ্যাদের উল্লেখ রয়েছে এবং পেশাগত স্তর তথা বিভিন্নতার কারণে তাঁরা সকলেই যে গণিকা বা

বেশ্যা তা কিন্তু নন। নানা নামে তাঁদের উল্লেখ করেছেন দামোদর গুপ্ত আদতে তাঁরা সেই সেই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বলে। ভারতের নাট্যশাস্ত্র থেকে শুরু করে কামসূত্র, অর্থশাস্ত্র সর্বত্রই কিন্তু তাঁদের এই স্তরভেদ বা শ্রেণীগতবিভাগের বিশদ উল্লেখ রয়েছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত তিনটি কাহিনীর আলোচনা এবং সেই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। কিন্তু বিশেষ থেকে সাধারণের ধারণা নির্ণয় সম্ভব নয় সেই কারণে এবার আমরা সেই ‘সাধারণ্য’-দের কথা জানবো; যাঁদের কথা দামোদর গুপ্ত তাঁর কুটনীমতম্ -এ বলেছেন। যেহেতু স্থান ভিন্ন তাই স্বাভাবিকভাবেই চরিত্রাও বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে অনেকাংশেই ভিন্ন। আচার-ব্যবহারজনিত বেশ কিছু পার্থক্য আমাদের চোখে পড়েছে। এই অংশটিতে তাই আমরা কাহিনী অনুযায়ী ক্রমানুসারে নয় একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার পক্ষপাতী।

কাশ্মীররাজের ধী-সচিব হওয়ার কারণে রাজা, রাজপরিবার এবং রাজতন্ত্র অর্থাৎ সম্পূর্ণ শাসনযন্ত্রটিকে খুব কাছ থেকে দেখতে পাওয়ার যে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল; তা দিয়েই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। সমাজের ‘তথাকথিত’ উচ্চস্তরের অথবা আরও স্পষ্ট করে বললে উচ্চবিত্ত শ্রেণী এবং সেই শ্রেণীর জীবনযাপন অত্যন্ত গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। লক্ষ্য করেছিলেন গণিকাবৃত্তি অবলম্বনকারিণীদের সাথে এই উচ্চবিত্তদের নিত্যনৈমিত্তিক সংশ্রব। তিনি এতো নিপুণভাবে বিশদাকারে এই পেশাসম্বন্ধীয় সূক্ষ্মতাসূক্ষ্ম তথ্য নিজের গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন যা অবশ্যই বিস্ময়োদ্বেককারী। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করা সহজ হবে। এই গ্রন্থের তিনটি কাহিনীতে উল্লিখিত তিনটি গণিকা চরিত্র – মালতী, হারলতা এবং মঞ্জরী। এঁদের সঙ্গে যে তিনজন পুরুষের সংশ্রব হয়েছে তাঁরা হলেন-

মালতী- চিন্তামণি ভট্ট (রাজকর্মচারী পুত্র)

হারলতা -সুন্দর সেন (ব্রাহ্মণপণ্ডিত পুরন্দরপুত্র)

মঞ্জরী – রাজপুত্র সমর ভট্ট। (রাজপুত্র)

এখানে যে ‘গম্যত্রয়’-এর উল্লেখ রয়েছে তাঁদের মধ্যে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যটির পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়, সেটি হল তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থান। তাঁদের প্রত্যেকের অর্থনৈতিক অবস্থান প্রায় একইরকম এবং সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয় অবশ্য উল্লেখযোগ্য হল এঁরা প্রত্যেকে অভিভাবকদের সান্নিধ্য থেকে দূরে বাস করেন। বাৎস্যায়ন তাঁর *কামসূত্রম্* এই কথারই উল্লেখ করেছিলেন।

বারাণসী- অরুদ পর্বত- পাটলিপুত্র এবং পুনরায় বারাণসী এই নগরীগুলির উল্লেখ করেছেন দামোদর গুপ্ত। প্রতিটি নগরীর গণিকাদের আচার-ব্যবহার ইত্যাদি আলাদা এবং সেই বৈচিত্র্যও তিনি যতটা সম্ভব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সেই চেষ্টা সর্বাঙ্গীণভাবে সফলও হয়েছে বলা যায়।

গণিকাবৃত্তি সমাজের অন্যতম আদিম বৃত্তি অথচ অন্য কোনো পেশা বোধহয় সমাজের চোখে এতখানি ঘৃণ্য নয়। এই পেশা এবং পেশা অবলম্বনকারিণীদের প্রতি সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণা দেখতে পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি, একটি মেয়ে যখন বেঁচে থাকার জন্য নিজের দেহকে পণ্য করে তখন একান্ত নিরুপায় হয়েই সে এই পন্থা নিয়ে থাকে। কিন্তু তখন সমাজের তথাকথিত ধ্বজাধারীদের অনেকেই তার সমালোচনা করেন অর্থাৎ একজন মানুষের বেঁচে থাকার থেকেও বড় হয়ে দাঁড়ায় তার বেঁচে থাকার, প্রাণধারণের পদ্ধতিটি। সমাজের কাছে একটি মেয়ের প্রাণে বেঁচে থাকার থেকেও তার শারীরিক শুদ্ধি অনেকবেশি জরুরী হয়ে ওঠে।

ভাবতে সত্যি অবাক লাগে যখন দেখি বাৎস্যায়ন সেই প্রাচীন যুগে তৎকালীন দেহপেশারিণীদের শিক্ষা দিয়েছেন নিজেদের শরীর সম্বন্ধে কোনোরকম ছুঁমার্গ বা আরও বলা ভালো কোনরকম ‘সোশ্যাল ট্যাবু’ না রাখতে। একেবারেই একজন আদর্শ শিক্ষাগুরুর মতো অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে দেহকে ‘পণ্য’ হিসেবে গ্রহণ এবং তাকে সেইভাবেই প্রদর্শন করতে বলেছেন একান্তই পেশাগত কারণে।^{৩৩} তবে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে বাৎস্যায়ন যে সময়ে এইমত পোষণ করছেন সেইসময়ে সামাজিক বা নাগরিকদের মধ্যে নিত্য গণিকাসঙ্গের একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই ঠিকই কিন্তু সমাজের একটি বড় অংশের চোখেই কিন্তু এটি অত্যন্ত ঘৃণ্য একটি পেশা।

ফিরে আসি কুটনীমত এর যুগে। দামোদর গুপ্ত তাঁর রচনায় যে সমাজের কথা তুলে ধরেছেন সেই সমাজে গণিকাসঙ্গ হল পূর্বজন্মের পাপের ফল।^{৫৪} যদিও এরকম চিন্তাভাবনার জন্য জনসাধারণকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায়না। গণিকাদের হীন, প্রতারণামূলক পেশাই এরকম ধারণার কারণ। স্বয়ং রচয়িতা দামোদর গুপ্ত গ্রন্থের সূচনা ও সমাপ্তির সময়েই গ্রন্থরচনার যে কারণ উল্লেখ করেছেন তা এই ধারণাটির সঙ্গে সহমত-

“কাব্যমিদং যঃ শৃণুতে সম্যক্ কাব্যার্থপালনেনাসৌ।

নো বধগ্যতে কদাচিদ্ধিটবেশ্যাধূর্তকুটনীভিরিতি।।”^{১০৫৯}।।^{৫৫}

শুধু তাইই নয়, গুণপালিত এবং পুরন্দর নামক দুটি চরিত্রই নিজেদের বন্ধুকে গণিকাসঙ্গকে মুক্ত করার জন্য, সেই মোহ দূর করার জন্য দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন।^{৫৬} হ্যাঁ, অনেকক্ষেত্রেই দুজনের বক্তব্যে মিল দেখতে পাওয়া যায় এবং সেটাই স্বাভাবিক যদিও তাকে আমরা পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট বলতে পারবোনা কারণ পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে, একের অধিক চরিত্রের মুখ দিয়ে আসলে দামোদর গুপ্তই কথাগুলি বলিয়েছেন যাতে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং পাঠক কুটনীমত পাঠ করে গণিকাসঙ্গের মত দুর্গ্রহ থেকে বিরত থাকে।

এই পেশার বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল যেগুলি একাধারে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী ছিল। এই বৃত্তি অবলম্বনকারিণীদের এমনভাবে শিক্ষাদান করা হতো যাতে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়কে মনোগ্রাহী করে উপস্থাপন করতে পারেন। সামান্য থেকে সামান্যতম বিষয়ের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হতো যাতে সেগুলিও সমমর্যাদায় পরিবেশিত হয়। এখানে একটি দিক উল্লেখ করতেই হবে, আমরা আগেও বলেছি সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে রচয়িতারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নগরকেন্দ্রিক পরিপার্শ্ব থেকে এসেছেন এবং তাঁরা সাধারণতঃ রাজা অথবা নগরের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সাথে মেলামেশা করতেন তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের লেখায় সেই সমাজের ছাপ বারবার ফিরে এসেছে। একই বিষয় লক্ষ্য করা যায় তাঁদের রচনায় বর্ণিত গণিকা এবং সেই বৃত্তির প্রসঙ্গে। সম্পূর্ণ নাগরিক-জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে সেখানেও। যে গ্রন্থগুলি আমরা বেছে নিয়েছি তার সবকটিতেই কিন্তু

নগরের গণিকা-জীবনের কথা রয়েছে (গুরুসংগতি গ্রন্থটি গ্রামীণ জীবনের কথা থাকলেও তাঁরা কেউই কিন্তু পেশাদার বেশ্যা নন)।

এই ‘নাগরিকা’ গণিকাদের জীবন-যাপন স্বাভাবিকভাবেই অন্যরকম। সাধারণ গৃহী-নারীদের জীবন-যাপন (শহর,গ্রাম উভয়ই) খুব সাধারণ ছিল। বিপরীতদিকে গণিকারা ছিলেন বিদুষী, তাঁদের অসাধারণ বাক্-চাতুর্য,সূক্ষ্ম রসবোধ-বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পকলার জ্ঞান ও নিরন্তর অভ্যাস তাঁদেরকে অনন্য করে তুলেছিল। পুরুষেরা এইসব কারণগুলির জন্যও গণিকাসঙ্গ করতে পছন্দ করতেন। ভাবতে অবাক লাগে একদিকে সমাজ তাঁদের সম্মানের চোখে দেখতো বিবিধ বিষয়ে পারঙ্গমতার জন্য আবার ঠিক তার উলটো পিঠে এঁদের প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি পোষণ করতো। তাঁদের শুধুমাত্র একজন দেহপেশারিনি ব্যতীত আর কিছুই ভাবা হতোনা। একে একরকম ভাবনার সীমাবদ্ধতা বলা যেতে পারে।

গণিকাদের আচারব্যবহার যথেষ্ট রুচিশীল ছিল। ভদ্র-সভ্য এবং মার্জিত কথাবার্তা এবং সহজ, সরল স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ছিল তাঁদের পেশার অন্যতম শর্ত। নানা বয়সের, নানা আর্থসামাজিক শ্রেণীর পুরুষদের মনোরঞ্জন করতে হতো তাঁদের আর সেকারণেই নানা বিষয়ে কথা বলা, আলোচনা করা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের অনায়াস দক্ষতা ছিল একরকম অবিসংবাদিত। শুধুমাত্র শাস্ত্রাদি আলোচনা অথবা নানা ধরনের শিল্পচর্চা করাতেই তাঁদের দক্ষতা সীমাবদ্ধ থাকতো না তাঁরা বহুরকম ক্রীড়ায় পারদর্শী হতেন। সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্যাদি চর্চা, নাট্যাভিনয় সব বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকতেন। নিত্যচর্চার ফলে চৌষটি কলাবিদ্যায় দক্ষ হতেন তাঁরা। বিভিন্ন শাস্ত্রের পাঠ-চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি তাঁদের অভ্যাসের বিষয়বস্তু ছিল। কাব্যপাঠ-কাব্যচর্চা-কাব্যরচনা তথা কাব্যসমালোচনা সব বিষয়ে তাঁদের পাণ্ডিত্যের বর্ণনা রয়েছে গ্রন্থগুলিতে। তবে যে দিকটি বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল গণিকাদের মনস্তত্ত্ব অনুধাবনের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। যে কোনো মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করা বা আরও বিশদে বললে সামনে উপস্থিত ব্যক্তির মানসিক পরিস্থিতি বোঝা এবং সেই অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা এও তাঁদের শিক্ষার বিষয় ছিল। যে পেশাকে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন সেই

পেশায় তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টি বা স্বজ্ঞা (Intution) যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ছিল পেশাগত সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য।

এই অংশে *কুটনীমতম্* গ্রন্থে যে অসংখ্য নামহীন বেশ্যাচরিত্রগুলি রয়েছে তাঁদের বিষয়ে একটি সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। ‘নামহীন’ বলার কারণ মালতী-হারলতা-মঞ্জরীর মত চরিত্রের পাশে এঁদের শুধু নামোল্লেখ করলেও বিস্তারিত পরিচয় দামোদর গুপ্ত দেননি। কেবলমাত্র ‘গণিকা’ বা ‘বেশ্যা’ নয় সমগ্র গ্রন্থটিতে আরও অসংখ্য নামের ব্যবহার রয়েছে। আমরা কাহিনীতে প্রয়োগের ক্রমানুযায়ী তার একটি তালিকা নির্মাণ করেছি- বাররামা, শূলা, বারবনিতা, গণিকা, বাররমণী, পণ্যবধূ, বেশবিলাসবতী, স্বাধীনা, কুলটা, ক্ষুদ্রা, পণ্যনারী, বারাগ্গনা, বারযোষিতা, বারঙ্গী, নকুলসমুৎপল্লা, বেশ্যা, বারবধূ ইত্যাদি।

গণিকাবৃত্তি ব্যতীত আর অন্য কোন পেশা অবলম্বন করে তাঁরা জীবন অতিবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে মঞ্জরী-সমর ভট্টের কাহিনীতে উল্লিখিত নাট্যাভিনয়ের কথা এসেছে। বলা হয়েছে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে অবস্থার অবনমন হওয়ায় তাঁরা একরকম বাধ্য হয়ে বারাণসীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানেও তাঁরা নাটক-অভিনয়ের চর্চা ইত্যাদি করতেন কিন্তু অধিকাংশ নটীর অভিনয় দক্ষতা উন্নত ছিলোনা। যেমন ঐ কাহিনীতে একমাত্র মঞ্জরীর অভিনয়দক্ষতার প্রশংসা করা হয়েছে।

গণিকাদের সম্বন্ধে যে সকল প্রচলিত নেতিবাচক কথা প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল গণিকামাত্রেই অত্যন্ত দক্ষ অভিনেত্রী। নানারকম ছলা-কলা, কথাবার্তা সব দিক দিয়েই তাঁরা পুরুষটির মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অভিনয় করতেন এবং তা তাঁদের পেশার অন্যতম শর্ত। কিন্তু একজন দেহপশারিনি নিজের পেশার জন্য, জীবন ও জীবিকারক্ষার তাগিদে যে অভিনয় করেন আর মঞ্চের নাটকের চরিত্র হয়ে যে অভিনয় করেন তার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি কখন যেন তাঁর অঙ্গ হয়ে গেছে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একজন মঞ্চাভিনেত্রীর যোগ্য অভিনয় করার জন্য তাঁকে নতুন করে প্রস্তুত হতে হয়। একেকবার একেকরকম চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রত্যেকবার সম্পূর্ণ নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হয়। অলংকারশাস্ত্রোক্ত আঙ্গিক-বাচিক-সাত্ত্বিক-আহার্য এই চারধরনের অভিনয়ে

তাদের নিপুণ হতে হত;যা সবাই পারতেন না। কিন্তু নিজেদের আদত বৃত্তির ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতারণা করার জন্য মনোরঞ্জনহেতু সেইভাবে অভিনয় শিক্ষা করতে হত যার একমাত্র উদ্দেশ্য আগত পুরুষটির সাথে প্রেমের অভিনয় করে ধনাদি লাভ।

কুটনীমতে এমন তিনজন গণিকা চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে যাঁরা একটি দীর্ঘ সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট পুরুষের সংসর্গ করেছেন। কিন্তু এমন অনেক গণিকা চরিত্র রয়েছে যাঁরা কোনো নির্দিষ্ট পুরুষের সঙ্গ করতেন না। প্রতিদিন তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের সাথে নতুন করে সম্পর্ক করতেন। যাঁরা একজন পুরুষের সাথে বেশি সময় ধরে সম্পর্কে থাকতেন তাঁরা সাধারণতঃ এমন পুরুষের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হতেন যাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনায় অনেকখানি উন্নত। ফলে একটা দীর্ঘ সময় ধরে একজন পুরুষের মাধ্যমে তাঁদের অভীষ্ট পূর্ণ হতো বলেই অন্য পুরুষদের সঙ্গ করার বিশেষ দরকার তাঁদের হতোনা। মালতী এবং মঞ্জরী প্রথম শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত যাঁরা ,তাঁদের আবাসস্থলে সমাজের প্রায় সর্বস্তরের পুরুষের অবাধ আনাগোনা। যিনি মূল্য চোকাতে পারবেন তাঁর সাথেই সম্পর্ক করেন তাঁরা।

সুন্দরসেন এবং সমর ভট্ট এই শ্রেণীর গণিকাদের কথোপকথন শুনেছিলেন। যেনতেন প্রকারেণ ‘অর্থলাভ’ অর্থাৎ উপার্জন করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ‘প্রেমের অভিনয়’ তাঁদের পেশার একমাত্র সত্য আর সেই কারণেই বোধহয় ‘রতিশিল্প’ বলা হয় কারণ সব অর্থেই তাঁরা রতিকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষটি গণিকাপত্নীতে কোনো একজন বেশ্যার গৃহে গমন করলেও অবস্থা অনুযায়ী গণিকা স্বয়ং গম্যের আবাসস্থলে উপস্থিত হতেন যেমনটি দেখা গেছে সমর ভট্ট এবং মঞ্জরীর ক্ষেত্রে। ন্যূনতম সময় যেন ব্যর্থ না হয় সেইদিকে গণিকা এবং তাঁর দূতী, বিট প্রমুখের তীক্ষ্ণ লক্ষ্য থাকতো।

একজন গণিকাকে অনেকক্ষেত্রেই দূতী এবং বিটের উপর নির্ভর করতে হতো। এই দূতী চরিত্রটি আবার একজন গণিকার সখীও হতে পারেন কিন্তু তিনি সবসময়ই গণিকার থেকে অধঃস্তন হবেন। বাৎসর্যায়ন তাঁর কামসূত্রে গণিকার ‘সহায়’ রূপে যাঁদের কথা বলেছিলেন; তাঁদের যে যে বৈশিষ্ট্যের

কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার সাথে সম্পূর্ণ না হলেও দূতী এবং বিট উভয়ের কিছু কিছু মিল বিদ্যমান। সেই মিলগুলির প্রেক্ষিতে দূতী এবং বিট সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ তৈরি হয়েছে।

প্রথমে আমরা দূতী চরিত্রটি সম্বন্ধে আলোচনা করে নেবো। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, যথোচিত বার্তাপ্রেরণে দক্ষ এবং রসবোধ রয়েছে এমন একটি যুবতী দূতীর ভূমিকা পালন করে। তাঁদের প্রধান কাজ হল গণিকার পছন্দের পাত্রকে পরিকল্পিতভাবে সুন্দর এবং মনোগ্রাহী বাক্যে সেই মেয়েটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করানো। মিথ্যে প্রেমের কাতরতার কথা জানানো। তবে সবার আগে প্রচলিত রীতি অনুসারে তাম্বুল(পান) ও ফুল উপহার দিয়ে নির্বাচিত পুরুষটিকে নিজের পরিচয় জানাতেন। তারপরে ধীরে ধীরে নিজের স্বামিনীর দৈহিক সৌন্দর্য- যৌবনের কাব্যগুণমণ্ডিত, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সেই দয়িতের মনের মধ্যে কামাগ্নি জ্বালিয়ে দেওয়ায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সেই পুরুষটিকে এও জানাতেন যে সেই গণিকা তাঁকে প্রতি প্রেমানুরক্তা, মিলনেচ্ছু। উদাহরণ হিসেবে মঞ্জরীর দূতীর কথা উল্লেখ করা যায় যিনি সমর ভটের কাছে উপস্থিত হয়ে মঞ্জরীর মুখপাত্র হয়ে তাঁকে বিশদ বর্ণনা করেন। তবে যদি দূতী পুরুষটির কাছ থেকে বিপরীত কিংবা নিরাশাজনক ব্যবহার পান তাহলে বিদ্রোপোক্তি তাঁদের সম্বল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে অপমানকর বাক্যসমূহ প্রয়োগ করা তাঁদের দস্তুর।

এরপরেই আসে বিটের প্রসঙ্গ। সংস্কৃত সাহিত্যে ‘বিট’ চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। বিশেষ করে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য এবং শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যে বিটের উপস্থিতি একপ্রকার অবধারিত এবং অনস্বীকার্য তাঁদের উপস্থিতি। আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিটের লক্ষণ দিয়েছেন-

“সম্ভোগহীনসম্পদ্বিটস্তু ধূর্তঃ কলৈকদেশজঃ।

বেশোপচারকুশলো বাগ্মী মধুরোহথ বহুমতো গোষ্ঠয়াম্।।৫০।।^{৫৭}

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় পথিকৃৎ এই দুটি প্রকরণগ্রন্থ থেকে বিট সম্বন্ধে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেগুলি হল- একজন গণিকা এবং তাঁর কাক্ষিত পুরুষটির মধ্যের সম্পর্কের সমীকরণের বিটের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু বিট ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত, অভিজ্ঞ সেই কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা

যেত উভয়পক্ষই তাঁর কথা ও পরামর্শ অনুসারে নিজের কর্তব্যকর্ম ঠিক করেছে। অধিকাংশ সময়েই হয় গণিকা অথবা গম্য বিট কোনো একটি পক্ষ অবলম্বন করলেও বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁকে পক্ষপাতহীন হতে দেখারও উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন *মুচ্ছকটিকে* বিটের চরিত্রটি। তিনি প্রথমে শকারের(রাজশ্যালক সংস্থানক) সহায়ক হলেও পরবর্তীতে তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে বসন্তসেনাকে সরাসরি না হলেও সাহায্য করেছেন। তিনি নিজের প্রভুর কার্যসিদ্ধির পরিবর্তে একজন গণিকাকে তাঁর নিজের সম্বলসম্পদের সুযোগ করে দিয়েছেন। যদিও পরে আমরা আবার তাঁকে শকারের সঙ্গী হিসেবেই দেখতে পাই কিন্তু তখনও তিনি যথাসাধ্য বসন্তসেনাকে সাহায্য করতে, মুক্ত করতে চেয়েছেন।

কুটনীমতমে যেসব বিট চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে তাঁদের অবস্থান নগরীর বিভিন্ন বেশ্যাপল্লীতে। কোনো ধনী ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন করে দেওয়ার পারিশ্রমিক হিসেবে তাঁরা বিনামূল্যে সেই গণিকার সঙ্গ লাভ করতেন। আবার গম্যের সাথে গণিকার অর্থসংক্রান্ত বিবাদের সময় বেশ্যাপল্লীর বয়স্ক, অভিজ্ঞ বিটকে মধ্যস্থতা করতেও দেখা যেত। এই বয়স্ক, অভিজ্ঞ বিটদের নিয়ে ‘বিট-মণ্ডপ’ অথবা এইধরনের অন্য কোন সংস্থা বা গোষ্ঠী গণিকাপল্লীগুলিতে থাকতো যার সাহায্যে তাঁরা নিজেদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি মিটিয়ে নিত। প্রতিটি পেশারই কিছু একান্ত নিজস্ব পেশাগত সমস্যা থাকে, যেগুলির সমাধান সাধারণতঃ ঐ পেশার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরাই করে থাকেন। এক্ষেত্রে বিটেরা যেহেতু ঐ পেশার অঙ্গ তাই তাঁরাও অনেকসময় নিজেদের সাধ্যমত এবং নির্দিষ্ট নিয়মমত কাজ করতেন।

দামোদর গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে গণিকা-বেশ্যা-বিট-দূতী এবং সর্বোপরি কুটনী চরিত্রগুলিকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হিসেবে এতখানি প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থাপন করেছেন, অতুলনীয় তাঁর বর্ণনাশক্তি। চরিত্রগুলির বাস্তবতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এতো বিস্তারিত বর্ণনা পাঠ করলে মনে হয় তিনি স্বয়ং যেন এই চরিত্রগুলিকে নিজের চোখের সামনে দেখেছেন। দীর্ঘসময় ধরে রীতিমত গবেষণা না করলে কারো পক্ষে এতো বাস্তব রচনা সম্ভবপর নয়।

কুটনীমতম্-এ বেশ্যাপল্লীর বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। সেই বর্ণনা থেকে সাধারণ বেশ্যাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানা যায়। দামোদর গুপ্ত ‘বেশ্যা-সন্নিবেশ’ এই শব্দবন্ধটির প্রয়োগ করেছিলেন।

হারলতা এবং মঞ্জরী এই দুটি কাহিনীতেই এর উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটিতে অর্বুদ পর্বতের কাছে এবং পরেরটিতে বৃষধ্বজের মন্দিরের কাছে এই পল্লীর অবস্থান ছিল। সুন্দরসেন এবং সমর ভট্টের যাত্রাপথে এই পল্লীগুলি দেখতে পান, সেখানকার বাসিন্দাদের কথাবার্তা, চালচলন সবকিছুই লক্ষ্য করেন তাঁরা। গণিকাপল্লী সবসময় কলরবমুখর। বিট-বেশ্যা-নাগরের কথোপকথন, নানা ধরনের অভিজ্ঞতা যার মধ্যে পূর্বরাত্রির আনন্দময়তার কথা আছে আবার শারীরিক নিগ্রহ অথবা অসন্তোষের কথাও আছে। এইসব ঘটনাগুলি যেন ঐ দুই যুবককে আগে থেকে সচেতন করার জন্য বলা হয়েছিল এমনকি গুণপালিত ও সচিব বারণ করলেও তাঁরা শিক্ষা নেননি, সচেতন ও হননি। ফলে পরিণাম যা হওয়ার তাইই হয়েছিল। এই পল্লীগুলিতে নানাস্থানের বেশ্যারা বাস করতেন।

এখানে উল্লেখ রয়েছে বারাণসী, পাটলিপুত্র নগরীর আবার *মৃচ্ছকটিকে* রয়েছে উজ্জয়িনীর কথা। তবে সেখানে একটি মাত্র গণিকা চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে কাহিনী নির্মাণ করা হয়েছে বলে কোনো গণিকাপল্লীর কথা নেই ঠিকই কিন্তু একজন বিত্তশালিনী গণিকার গৃহে যে আরও বহু সংখ্যক গণিকার বাস ছিল তার উল্লেখ শূদ্রক করেছিলেন। এককথায় বলতে গেলে এই পল্লীগুলি সমগ্র ভারতের নানা বয়স-ভাষা-সংস্কৃতির গণিকাদের আবাসস্থল। তাঁদের নিজস্বতার বৈচিত্র্যগুলি একটিমাত্র বিন্দুতে এসে এক হয়ে যায় আর সেটি হল তাঁদের পেশা। সবকিছুর উর্দে তাঁদের পেশাগত পরিচয়টাই একমাত্র সত্যি হয়ে থাকে।

দেহকে পণ্যকে করে জীবনধারণ করেন তাঁরা বিনিময়ে অর্থলাভ করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের অর্থমূল্য নির্দিষ্ট থাকে। স্থানভেদে সেই মূল্যের বিভিন্ন নাম থাকে—মূল্য, ভাটী, গ্রহণক ইত্যাদি। অর্থের পরিবর্তে যদি স্বর্ণমূল্য দেওয়া হয়,তাকে কনক-ভাটী বলা হয়। তবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিনিময় মূল্য আগে দিতে হতো। কোনো কোনো সময়ে পছন্দের নারীটির সঙ্গলাভের জন্য কামী পুরুষদের মধ্যে রেষারেষির জন্য অনেক সময়ে দেখা যেত যে, নির্ধারিত অর্থমূল্যটি বর্ধিত হয়ে যেত অর্থাৎ পছন্দের নারীসঙ্গ লাভ করার জন্য বেশি অর্থ দেওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। বেশ্যাপল্লির দিনলিপিতে কিছু ঘটনা প্রায়শই দেখা যেত। তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করেছি আমরা। যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যেত তাঁরা একইসময়ে একাধিক পুরুষের থেকে অর্থ নিলেও একজন পুরুষের

সঙ্গে সম্পর্ক করতেন আবার কখনো দেখা যেত একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ নিলেও অন্য কোনো পুরুষের সংসর্গ করতেন তাঁরা। এই ঘটনাগুলি আদতে তাঁদের প্রতারণার উদাহরণ। তবে একথাও ঠিক যে, শুধুমাত্র গণিকারাই যে প্রতারণা করতেন তা নয়, তাঁদের কাছে আগত পুরুষেরাও নানাভাবে তাঁদের প্রতারিত করতেন। যেমন- কখনো কোনো ব্যক্তি তার বিকৃত কামনা চরিতার্থ করতেন অথবা সেই বেশ্যাটিকে শারীরিক নিগ্রহ করতেন আবার কখনো দেখা যেত তাঁরা সম্পর্ক করলেও আর্থিকভাবে প্রতারণা করছেন।

এবার যে বিষয়টি লক্ষ্য করার মত সেটি হল গণিকাদের তরফ থেকে কোনোরকম প্রতারণা জাতীয় ঘটনা ঘটলে রাষ্ট্রযন্ত্র অথবা কোনো সামাজিক সংগঠন যথাবিধি শাস্তি দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতেন কিন্তু বিপরীতভাবে সেই ব্যক্তিটির অপরাধের শাস্তিবিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়না। এই প্রসঙ্গে আচার্য কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* বা বাৎসর্যায়নের *কামসূত্রের* সাথে এই অংশটি নিয়ে একটি স্বাভাবিক তুলনা আসবে কারণ ঐ দুটি গ্রন্থেই কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে উভয়ক্ষেত্রেই শাস্তিবিধানের কথা বলা হয়েছে এমনকি শাস্তির তালিকাও রয়েছে। তাহলে আমরা এটা ধরে নিতেই পারি, *কামসূত্র-অর্থশাস্ত্র* থেকে *কুটনীমতম্* পর্যন্ত সময়ের যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে তাল মিলিয়ে গণিকাদের অবস্থার ক্রমশঃ অবনমন হয়েছে।

মূল কাহিনিগুলি আলোচনার অবসরে আমরা *কুটনীমতম্*-এর কুটনীচরিত্র বিকরাল্লা সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছি। কাহিনী উপস্থাপনার প্রসঙ্গে যেটুকু সুযোগ তৈরি হয়েছে তাতে করে ঐ সামান্য তথ্যের ভিত্তিতে এতো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করা প্রায় অসম্ভব বলা চলে এবং যদি বা কোনো ধারণা করাও যায় তবে তা থেকে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবেনা। আমরা এই গ্রন্থের কুটনী বিকরালার সম্বন্ধে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অন্যান্য কুটনীচরিত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে নিতে পারবো।

গণিকাবৃত্তি বংশানুক্রমিক হতে পারে অথবা কোনো কারনবশতঃ একটি মেয়ে বাধ্য হতে পারে এই পেশা বেছে নিতে। আবার কেউ কেউ স্বেচ্ছায় এই পেশাগ্রহণ করে। যে কোন কারণেই এসে থাকলেও বেশিরভাগজনের ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ বিষয় লক্ষ্য করা যায় সেটি হল একজন অভিভাবকতুল্য মহিলার উপস্থিতি যিনি বয়সে প্রৌঢ়া অথবা বৃদ্ধা হবেন। নিজের যৌবনে প্রসিদ্ধ

বেশ্যারূপে পরিচিত সেই মহিলা সময়ের সাথে ঐ পেশা ত্যাগ করেন ঠিকই কিন্তু তিনি বেশ্যাবৃত্তি সম্বন্ধীয় আরেকটি পেশাকে বেছে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে এবং সেটিই হল ‘কুটনি’বৃত্তি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি পেশা বংশানুসারী হয় তবে বর্তমান গণিকার মা সেই কুটনির স্থান গ্রহণ করেন আবার যদি বাইরে থেকে নতুন মেয়ে এই পেশায় এসে পরে তাহলে অন্য কোনো বয়স্কা তার কুটনির ভূমিকা পালন করেন। অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া এই চরিত্রটি যে সবসময় রক্তসম্পর্কের হবে তা নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের এই চরিত্রটির উল্লেখ গণিকাবৃত্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত প্রায় অধিকাংশ রচনাতেই পাওয়া যায় কারণ এই চরিত্রটির উপস্থিতি ব্যতীত কোনো গণিকাচরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হতে পারেনা।

‘অভিভাবক’ এই শব্দটির ব্যবহার আমরা করেছি ঠিকই কিন্তু তা করেছি পেশাটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। আসলে সাধারণ ধারণা অনুযায়ী অভিভাবক অর্থে সেইসব ব্যক্তিদের কথা বলা হয় যাঁরা স্নেহ করেন, অন্যায় করলে বা জীবনে চলার পথে ভুল পদক্ষেপ নিলে শাসন করেন। ঠিক ও ভুলের মধ্যে তফাৎ করতে শিখিয়ে সঠিকটা বেছে নিতে সাহায্য করেন। তাই মনে হতেই পারে, যাঁরা একটি মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তির মত পেশাকে নির্বাচন করলে শাসন করেন না, বোঝান না তাঁরা আসলে কেমন অভিভাবক? বাস্তব হল এঁরা সেইসমস্ত মেয়েদের সাহায্য করেন নানাভাবে যাতে তাঁরা এই পেশায় টিকে থাকতে পারে; সত্যিই তো ঘৃণ্যই হোক আর নিন্দনীয়ই হোক আদতে এটা অসংখ্য মেয়ের জীবনসংগ্রামের লড়াই। যেখানে বেঁচে থাকার জন্য, টিকে থাকার সেই ‘অতিপ্রাচীন’ নিয়ম চলে— “যোগ্যতমের উদ্বর্তন” (Survival of the fittest) আর লড়াইটা যখন অনেকের মধ্যে হয় তখন বেঁচে থাকার জন্য সবরকম কৌশল শিখতে হয় মানুষকে; বেশ্যারাও তার ব্যতিক্রম নন।

অভিজ্ঞ গুরুর মত, কখনো বা সমবয়সী সখীর মত এই কুটিনীরা গণিকারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করতেন। পেশা সংক্রান্ত নানাধরনের উপদেশ দিতেন বা কার্যপদ্ধতি বলতেন। কী কী উপায় অবলম্বন করলে একজন গণিকা সাফল্যলাভ করতে সক্ষম হবেন সেই বিষয়ে নিজের মূল্যবান মতামত দিতেন তাঁরা। যেমন আমরা লক্ষ্য করেছি মালতীর ক্ষেত্রে এই একই ঘটনা ঘটেছিল। এই বিষয়ে আমরা

আগেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই চরিত্রগুলির আলাদা আলাদা অনেক নাম রয়েছে ‘মাতৃ’, ‘জননী’, ‘কুটনী’, ‘শম্ভলী’ প্রভৃতি।

সাধারণতঃ বেশ্যাপল্লীতেই বসবাসকারী এই মহিলারা যথেষ্ট প্রভাব- প্রতিপত্তিশালিনি হতেন। কিছুজন এর আর্থিকসঙ্গতি থাকতো। গণিকাসমাজে এঁদের রীতিমত সম্মানজনক অবস্থান ছিল; অবশ্য সেই সম্মান অনেকাংশেই নির্ভর করতো তাঁদের কাজের উপর। যাঁর উপদেশগ্রহণ করে সাফল্যের হার যত বেশি তাঁর মর্যাদা তত বেশি।

গণিকারা জানতেন এই পেশায় সাফল্যের মূলমন্ত্র নিহিত রয়েছে হল কুটনীর উপদেশ আর আর তাঁর শিখিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতে। যা যা কর্তব্যকর্ম একজন কুটনী কোনো গণিকাকে বলে দিতেন সেগুলি যথাযথ অনুসরণ করলে অধিকাংশ সময়েই জয়লাভ নিশ্চিত ছিল। প্রসিদ্ধ কুটনীদেব কাছে প্রায় সময়ে কমবয়সী, অনভিজ্ঞ গণিকারা উপস্থিত থাকতেন। প্রণাম জানিয়ে সম্মানসহ বহুধরনের সাম্মানিক উপহার দিয়ে তবে তাঁদের নেকনজরে আসা যেত। মালতীর ঘটনাটি থেকেই বোঝা যায় সবার জন্য এক নিয়ম প্রযোজ্য ছিলোনা। গণিকার যোগ্যতা অনুসারে নির্দিষ্ট পদ্ধতি বলে দিতেন তাঁরা।

এতো হল সাধারণভাবে কুটনীদেব কথা এবং কাজের উল্লেখ। কিন্তু যখন কোনো ‘গণিকা-মাতা’ স্বয়ং এই বৃত্তি অবলম্বন করেন? তখন তাঁর কাজের গতি-প্রকৃতি কিরকম হয় সেই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবো। প্রয়োজন এবং চাহিদা বুঝে মনোরঞ্জন করে অর্থ উপার্জন করা এঁদের জীবিকা এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই শারীরিক সম্পর্কই মূল। গণিকাদের পেশার সাথে কৃত্রিমতা এতখানি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রেমের অভিনয় করতে হয়। প্রতিবার তাঁদের মায়েরা নতুন কাস্ত বা গম্যের এর কাছে নিজের মেয়ের সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় গুণাবলীর কথা উল্লেখ করতেন। সমগ্র বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতেন প্রেমিকের প্রতি সেই গণিকা একেবারে তদগতচিত্ত। সেই চিত্রই আমরা দেখতে পাই যখন বিকরলা শিখিয়ে দেন কীভাবে মালতীর মাতা চিত্তামণিকে আকর্ষণ করার জন্য কী ধরনের আচরণ করবেন, কোন কথা কীভাবে বলবেন ইত্যাদি।

এই সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তান্ত বিকরলা মালতীকে বলেছেন যেন কার্যোদ্ধারের জন্য মালতী ও তাঁর মা সেইগুলি যথাযথ প্রয়োগ করতে সমর্থ হন।

কোনো গম্যের যাবতীয় অর্থ-সম্পদাদি সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নিয়ে তাঁকে একেবারে নিঃস্ব,কপর্দকশূন্য করে পরিত্যাগ করাই গণিকাদের পেশাগত ধর্ম। একজন গণিকাকে কেন্দ্র করে বহুজনের মধ্যে অশান্তি, বাদানুবাদের সৃষ্টি হলে গণিকার মাতা তাঁদের মধ্যে শান্তিস্থাপন করে দেবেন। এর একটি অবশ্যাস্তাবী ফল ছিল অনেকেই মনে করতেন যে সেই গণিকাটি একমাত্র তাঁকেই প্রকৃত ভালবাসেন কিন্তু কেবলমাত্র নিজের মাতা অথবা মাতৃস্থানীয়া কুটুম্বীর জন্য সেই প্রেম পূর্ণতা পায়না। তাঁর এই অসহায়তার জন্য সেইসব পুরুষেরা এই মাতৃস্থানীয়াদের দোষারোপ করতেন। আমাদের একটা কথা মনে রাখতেই হবে, এই প্রেম-অনুরাগ ইত্যাদি অনুভূতিগুলি গণিকাদের ক্ষেত্রে কৃত্রিম। কোনো একজন নির্দিষ্ট পুরুষে আসক্তি গণিকার পেশার জন্য ক্ষতিকর। ব্যতিক্রম – বসন্তসেনা, হারলতা প্রমুখ।

প্রত্যেক গণিকার জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য থাকতো এবং কিছু কিছু সংসর্গের পূর্বেই সেই পরিমাণ অর্থ গণিকার মাতা অথবা কুটুম্বীকে দিতে হতো। সমস্ত ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে নেওয়ার পরে শুরু হতো গম্য-নিস্কাসনের পালা। বাৎসর্যায়নের কামসূত্রে এই সংক্রান্ত তথ্যাদি আলোচিত রয়েছে আর সেইসকল প্রদত্ত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করেই তাঁরা তাঁদের ত্যাগ করতেন কিন্তু সমস্ত পন্থা অবলম্বন করার পরেও যদি উদ্দেশ্যসিদ্ধ না হতো তখন তাঁরা যাবতীয় দায় নিজের মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার উপরে আরোপ করতেন এবং নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতেন। এই বিষয়টিকে সত্যতা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেই গণিকা তাঁর মাতার সাথে একরকম ‘লোকদেখানো ঝগড়া’ করতেন।

অতিসংক্ষিপ্ত এই আলোচনা থেকে গণিকাবৃত্তিসংক্রান্ত একটা দিক আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সেটি হল এই পেশার অন্যতম মূল একটি ভিত্তি হল প্রতারণা। একজন ‘গম্য’-কে আকর্ষণ করা, যৌনসংসর্গের জন্য মিথ্যাচার, মিথ্যে প্রেম-ভালবাসার অভিনয় করা কিংবা স্বার্থসিদ্ধির পরে সংশ্রব ত্যাগ করা। প্রতারণার চূড়ান্তসীমায় গিয়ে নিজের মাতার সাথে মিথ্যে কলহের অভিনয়-গ্রন্থগুলি পাঠের অভিজ্ঞতা আমাদের কিছু প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। গণিকা এবং গণিকাবৃত্তির মধ্যে

কোথাও কি ন্যূনতম কোনো সত্যতা নেই? সম্পূর্ণ মিথ্যাচার, লোকঠকানোর উপরে নির্ভর করে কীভাবে একটি পেশা সুদূর অতীত থেকে বর্তমান যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে? বসন্তসেনা (মদনিকা চরিত্রটিও রয়েছে), হারলতা ব্যতীত আর কোনো গণিকাচরিত্রই কি শুধুমাত্র ভালবাসার জন্য ভালবাসেনি কোনো পুরুষকে? নাকি স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁদের জীবনে প্রেমের সূচনা হলেও এই ‘ঘৃণ্য’ পেশাজনিত লজ্জা এবং জীবনধারণের রূঢ় বাস্তবতা তাঁদের বাধ্য করেছিল সেই অনুভূতিকে দূরে সরিয়ে রেখে দেহপশারিনির পরিচয় বেছে নিতে? সমাজ কি গণিকার প্রেমকে স্বীকৃতি দিতো? কোনো পুরুষ কি কোনো বেশ্যাকে সহজে অনায়াসে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেন? রূপ-রস-যৌবন- ইন্দ্রিয়সুখের তলায় চাপা পড়া কান্না কতজন শুনতে পেতেন জানা নেই কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় পোড়াখাওয়া বেশ্যার মুখোশের আড়ালে যে একসময়ের প্রায় কিশোরী অথবা যুবতী একটি মেয়ের সমস্ত স্বপ্নের ধ্বংসস্তূপ চাপা রয়ে গেছে তা স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

মাতা-বধূ অথবা কন্যারূপে গণিকা- বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের অনুসন্ধানের এই বিষয়টি *কুটুনিমিত* এ পরিষ্কৃত হয়ে উঠতে পারেনি। এই গ্রন্থটিতে তাঁদের একমাত্র পরিচয় তাঁরা গণিকাই। একমাত্র দ্বিতীয় কাহিনীতে প্রেমিকাসত্ত্বার আভাসটুকু পাওয়া গেছিল মাত্র। কিন্তু সেই রূপের কোনো মর্যাদা বা সামাজিক স্বীকৃতি নেই। মাতা অর্থে এখানে ‘কুটুনি’মাতাই যাঁরা কখনো জোর করে আবার কখনো বা সাহায্য করেন এই পেশায় টিকে থাকতে।

আসলে প্রশ্নগুলি যতখানি সহজভাবে সরাসরি করা যায় তার উত্তর পাওয়া কিন্তু ততখানি সোজা নয়। জীবনে সবকিছু শুধুমাত্র সাদা অথবা কালো হয়না। সাদাকালোর মাঝামাঝি ধূসর রঙের স্তর আছে, যেখানে দাঁড়িয়ে উত্তরের থেকেও প্রশ্নগুলিকে আরও কঠিন মনে হয়।

চতুর্ভাণী সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহিত্যকৃতি। শূদ্রকের *পদ্মপ্রাভাতক*, বররুচির *উভয়াভিসারিকা*, শ্যামিলক বিরচিত *পাদতাড়িতক* ও ঈশ্বরদত্তের *ধূর্তবিটসংবাদ*- এই চারটি ভাণকে একত্রে চতুর্ভাণী বলা হয়। ভাণচতুষ্টয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে গণিকা ও গণিকাবৃত্তির বিশদ একটি চিত্র পাওয়া যায়। গণিকাপল্লী ও তাতে বসবাসকারী গণিকা, সাহায্যকারী বিট, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-সমস্তকিছু সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। কুটুনি, অভিজ্ঞ বারবধূ,

অল্পবয়সী গণিকা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ধূর্ত বিট, কামুক পুরুষ, ভগ্নহৃদয়, নিঃস্ব বণিকপুত্রের মত চরিত্র। সাহিত্যদর্পণে ভাণের লক্ষণে বলা হয়েছে-

“ভাণঃ স্যদ্ ধূর্তচরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ।।

একাক্ষ এক এবাত্র নিপুণঃ পন্ডিতো বিটঃ।

রঙ্গে প্রকাশয়েৎ স্বেনানুভূতমিতরেণ বা।।

সম্বোধনোক্তি-প্রত্যুক্তৌ কুর্যাদাকাশভাষিতৈঃ।

সূচয়েদ্ বীরশৃঙ্গারৌ শৌর্য্যসৌভাগ্যবর্ণনৈঃ।।”^{৫৮}

পদ্মপ্রাভূতকে কর্ণীপুত্র মূলদেব গণিকা দেবদত্তার সাথে প্রণয় সম্পর্কে জড়িত হলেও তাঁরই ভগিনী দেবসেনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বিট উভয়ের মধ্যে সম্পর্কসূত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে সেই অনুসারে কাজ শুরু করেন এবং দেবসেনার কাছ থেকে অনুরাগচিহ্নস্বরূপ লীলাকমল সংগ্রহ করে বিদায় নিলেন।

সমগ্র ভাণ জুড়েই অগণিত গণিকা ও তাঁদের প্রেমিকপ্রবরের উল্লেখ রয়েছে। নানাবিধ সরস ঘটনার উদাহরণ রয়েছে। আসলে একটিমাত্র কাহিনী মূল হলেও অসংখ্য উপকাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় আর সেইসব কাহিনীর উপরে ভিত্তি করেই ফুটে ওঠে গণিকাপল্লীর জীবন্তচিত্র। সম্পূর্ণ কাহিনী ও ঘটনার বর্ণনা সবকিছুই বিটের কথনে বর্ণিত হয়েছে। পদ্মপ্রাভূতকের কাহিনীতে বনরাজিকা, তাম্বুলসেনা, কুমুদ্বতী, মগদসুন্দরী নামী কয়েকজন গণিকার নাম পাওয়া যায়। বিটের একটি শ্লোক থেকে গণিকাচরিত্র সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়-

“রত্যাখিনীং রহসি যঃ সুকুমারচিভাং

কান্তাং স্বভাবমধুরাক্ষর লালনীয়াম্।

বাগর্চিষা স্পৃশতি কর্ণবিরেচনেন

রক্তাং স বাদয়িব বল্লকিমুল্লুকেন।।”^{৫৯}

পরবর্তী ভাগ ‘উভয়াভিসারিকা’র রচয়িতা বররুচি। সম্ভবতঃ এটি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম ভাগ। প্রস্তাবনা অংশে সূত্রধার গণিকাদের প্রশংসা করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। বিট করেছেন বসন্ত-বন্দনা। তিনি নায়কের যাকে কামসূত্রে গণিকাদের ‘গম্য’ বলে অভিহিত করা হয়েছে তাঁদের কিছু গুণাবলী উল্লেখ করেছেন-

“কান্তং রূপং যৌবনং চারুলীলং

দানং দাক্ষিণ্যং বাক্ চ সামোপপন্না।

যৎপ্রাপ্যেতে সদগুণা ভাস্তি সৰ্বে

লোকে কামিন্যঃ কেন তস্য প্রসাদ্যাঃ।”^{৬০}

কাহিনীতে দেখা যায় বণিক কুবেরদত্ত গণিকা মদনসেনার নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে কুবেরদত্ত ও নারায়ণদত্তের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এমতাবস্থায় বিটের উজ্জ্বলিত কথিত কাহিনীসূত্র অনুযায়ী জানা যায় তিনি পাটলিপুত্র নগরীর রাজপথে ভ্রমণ করছেন। সেখানে গণিকা অনঙ্গদত্তা নির্ধন নাগদত্তের প্রেমে আসক্ত। ধীরে ধীরে বারাজনা মাধবসেনা, বৃদ্ধা দেহবিলাসিনী রামসেনা, সন্ন্যাসিনী বিলাসকুণ্ডিনীর মত ভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রের সাথে আলাপ হয় তাঁর। পরিশেষে গণিকা কনকলতার সাথে মিলনে কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

ঈশ্বরদত্তের ‘ধূর্তবিটসংবাদ’ ভাণের প্রস্তাবনায় বিদূষক বর্ষা ঋতুর বর্ণনা দিয়েছেন^{৬১}। তারপরেই বিট প্রবেশ করে জানান তিনি পাটলিপুত্রের রাজধানী কুসুমপুরে চলেছেন। তিনি দেখেন গণিকা মাধবসেনার সঙ্গে উপভোগ করে প্রতারক কৃষ্ণলক বিদায় নিচ্ছে, রাজপথে গণিকা মদনসেনার পরিচারিকা বারুণিকার সঙ্গে আলাপ। গণিকাদের দৈনন্দিন জীবনের চলচিত্র অন্যান্য ভাণের মত এই ভাণেও ফুটে উঠেছে। কখনো দেখা যায় গণিকা তাঁর অনুরাগী পুরুষটি অন্য কারো প্রতি আসক্ত সেকথা জেনে দুঃখিত হয়েছে আবার কোথাও দেখি জনৈক পুরুষ মোহাক্ষ হয়ে কপর্দকশূন্য হয়েছে। এই ভাণে বিশ্বলোক নামক চরিত্রটির মুখে আমরা দেহবিলাসিনীদের প্রেমের স্বরূপ ও কামক্ৰীড়ার বিস্তারিত বর্ণনা পাই।

‘পাদতাড়িতক’ ভাণের স্রষ্টা শ্যামিলক। সূত্রধারের মুখে কামদেবের জয়গান শোনা যায়। এই ভাণে বিট-ধূর্ত ব্যক্তিদের আড্ডার উল্লেখ দেখি। জানা যায় রঙ্গচ্ছলে গণিকা মদনসেনা প্রেমিক বিষ্ণুনাগের মাথায় মা তুলে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুনাগ রাজঘনিষ্ঠ, উচ্চপদাধিকারী গণিকার পাদস্পর্শে রুষ্ট, অপমানিত হয়ে শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বেশ্যাপত্নী, নানা বয়সী, বিবিধ প্রকৃতির গণিকাদের বর্ণনা, ঘটনার ঘনঘটা ইত্যাদির মধ্যে বিটেশ্বর জীমূতভট্টের নেতৃত্বে একটি বিট-সভার আয়োজন করা হয়, উদ্দেশ্য পাপমুক্তিহেতু বিধান দান। কিন্তু একেক জনের মত একেক রকম। সবশেষে ভট্টজীমূত বিধান দেন বিষ্ণুনাগের সামনে তাঁর মাথায় মদনসেনা পদদ্বয়স্পর্শ করবেন তবেই তাঁর প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হবে।

গণিকাচরিত্রের নিষ্ঠুরতা, জটিলতা, অর্থগুপ্ততা, মিথ্যাচার ইত্যাদি প্রায় সমস্তরকমের নেতিবাচক দিকগুলি ভাণে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও তাঁদের প্রেমিকা-ভগিনী রূপের পরিচয় রয়েছে কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে ভাণগুলি যেন এই বৃত্তির নগ্নস্বরূপ আমাদের সামনে নিয়ে আসে। তৎকালীন নাগরিক জীবন, অবাধ গণিকাসঙ্গ, তাঁদের কামকলায় নৈপুণ্য, বেশভূষা, এমনকি বেশ্যাসঙ্গের ফলে ঘটে যাওয়ার নানা ঘটনার বিধান নিয়ে স্মৃতিকারদের মধ্যে আলোচনা সমস্তকিছু এখানে উল্লিখিত। যে অভিব্যক্তি আমাদের লক্ষ্য তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নির্মাণের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণগুলি বিশেষতঃ এই চতুর্ভাগী অত্যন্ত উপযোগী। ‘পাদতাড়িতক’এর অন্তিম শ্লোকটি ভাণের সামগ্রিক চিত্র নির্মাণে যথায়থ-

“কটিন্যশ্চতুরকথা ভবন্তুরোগা

ধূর্তানামধিকশতাঃ পণা ভবন্তু।

ভূয়াসুঃ প্রিয়বিটসঙ্গমাঃ পুরেহস্মিন্

বারস্ত্রীপ্রণয়মহোৎসবাঃ প্রদোষাঃ।।”^{৬২}

গুরুসপ্ততি:

সত্তরটি গল্পের সংকলন গুরুসপ্ততি। সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল গল্পসাহিত্য।

শুকসপ্ততি আসলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কিনা এই বিষয়ে যথেষ্ট দ্বন্দ্ব রয়েছে। চিন্তামণি ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণের নামে প্রচলিত হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সংকলক বা বলা যায় সম্পাদক। জনৈক জৈনাচার্য পূর্ণভদ্রের নামে এই গ্রন্থ রচনার স্বত্বারোপ করতে চান কেউ কেউ। তবে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়ে ওঠেনি এখনো। আমরা আমাদের গবেষণার কাজে মূলতঃ দুটি সংকলন গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। যেহেতু রচয়িতার প্রকৃত পরিচয় জানা যায়নি, রচনার মূল ভাষাটিও অজানা তাই সময়কাল নির্ণয় করা একরকম দুঃসাধ্য। তবুও প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা যায় মোটামুটি একাদশ শতাব্দীর মধ্যে শুকসপ্ততির একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলিত রূপ সংস্কৃত সাহিত্যে নিজের স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলো।

এই গ্রন্থটি নির্বাচনের কারণ ব্যাখ্যা করার আগে গ্রন্থটি বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ সংস্কৃত গল্পসাহিত্য রচনার কতগুলি উদ্দেশ্য ছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিল নীতিশিক্ষা দান। প্রধানতঃ পশু-পাখিদের মূলচরিত্ররূপে উপস্থাপন করে এই গল্পগুলি লেখা হয়েছিল কিন্তু মনুষ্যচরিত্রও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথেই উপস্থাপিত হতো এমনকি অনেক গল্পে তাঁরাই প্রধানতম চরিত্র হিসেবে থাকতেন। কখনো তাঁরা গল্পগুলি বলতেন আবার কখনো পশুপাখিদের বলা গল্পে তাঁরা শুধু চরিত্র হিসেবে থাকতেন।

নিছক অবসরযাপন গল্পসাহিত্য রচনার অন্যতম কারণ হলেও মূলকারণ ছিল মনুষ্যচরিত্র গঠন। তাই নীতিশিক্ষা দানের উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হতো। তুলনামূলক কমবয়সী শিশুদের জীবনবোধের শিক্ষা দেওয়ার জন্য রচনা করা হতো বলেই বোধহয় তাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য পশু-পাখী প্রভৃতিকে গল্পের কথক বা মুখ্য চরিত্ররূপে উপস্থাপন করা হতো এবং সেটি করা হতো অত্যন্ত সচেতনভাবেই। শিশুরা সরল বিশ্বাসে দেখতো পশু-পাখিদের জগতেও একই ভাবে বন্ধুত্ব-ভালবাসা-বিশ্বাস যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে শত্রুতা-দ্বेष-ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো গল্পে দেখা যেত পশু-পাখীরা অবলীলায় মনুষ্যচরিত্র বর্ণনা করছে। মনুষ্যের জীব হয়েও তাদের গল্প বলার দক্ষতা এবং মনুষ্যচরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতা সত্যিই পাঠককে বিস্মিত করে।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যরচনার একটি বিশেষ ধরন রয়েছে। প্রাথমিক সূত্রপাত হিসেবে একটি গল্প থাকে এবং সেই গল্প থেকে একটির পর একটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মালার মত গল্পগুচ্ছ নির্মিত হয়। আবার কখনো সেই প্রথম গল্পটি থেকে পরবর্তী দ্বিতীয় গল্পটি শুরু হয় সেটি সমাপ্ত হলে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এইভাবে পরপর গল্প রচিত হয় কিন্তু এক্ষেত্রে গল্পগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়না; প্রত্যেকটি গল্পই পৃথক-স্বতন্ত্র গল্পরূপেই পরিগণিত হয়। এই গ্রন্থটি রচনার সময় এই দুটি পদ্ধতিরই একত্র অনুসরণ করা হয়েছে। অধিকাংশই গল্পই একক, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গল্প তবে কয়েকটি গল্প রয়েছে যেগুলি কয়েকটি পর্ব জুড়ে রয়েছে।

শুকসপ্ততির রচয়িতার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বলেই মনে হয় যার মাধ্যমে তিনি সমাজসংস্কার করতে চেয়েছেন। আসলে সংস্কার করতে চাওয়ার থেকেও তিনি সমাজের এমন একটা দিক তুলে ধরতে চেয়েছিলেন যেদিকটি বা যে বিষয়টি সম্বন্ধে সবাই অবগত কিন্তু স্বীকার করেনা কারন বিষয়টি একেবারেই সমাজ-নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে পড়েনা; তা সম্পূর্ণভাবেই নিয়ম বহির্ভূত। কিন্তু অস্বীকার করলেই তো আর কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে যায়না ঠিক সেই কারণেই অনেকটা “চোখে আঙ্গুল” দিয়ে দেখানোর জন্যই এই গল্পগুলির অবতারণা করা হয়েছে।

সংস্কৃতভাষার অন্যান্য গল্পসাহিত্যের গ্রন্থগুলির সঙ্গে শুকসপ্ততির একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। আর সেই পার্থক্যের জায়গাটি হল বিষয়বস্তু নির্বাচন। সম্পূর্ণ গ্রন্থে যে সত্তরটি গল্প রয়েছে তার অধিকাংশ গল্পেরই মূল আধার পরকীয়া-বিশ্বাসঘাতকতা-অবাধ যৌনতা। ব্যতিক্রম হিসেবে কয়েকটি গল্প রয়েছে তবে সেগুলির সংখ্যা নগন্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে পরকীয়া(adultery), উদাম যৌনতা, ব্যভিচার এগুলিই রয়েছে। সময়ের নিরিখে বিষয়বস্তুর নির্বাচন অদ্ভুত এবং আরও স্পষ্ট করে বললে তৎকালীন যুগে এই গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা সমাজে পাঠকদের কাছে কতোখানি ছিল তা প্রশ্নের অবকাশ রাখে।

এবারে আমাদের গবেষণার কাজের জন্য এই গ্রন্থটি নির্বাচনের কারণ আলোচনার প্রসঙ্গে আসা প্রয়োজন। গল্পগুলি পাঠের সময় কয়েকটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করি। প্রাথমিকভাবে গণিকা চরিত্রের অনুসন্ধান এবং সেইসমস্ত চরিত্রের অভিব্যক্তি নির্ণয় আমাদের উদ্দেশ্য হলেও শুকসপ্ততি একেবারেই তার ব্যতিক্রম। আমাদের গবেষণাপত্রের মুখবন্ধ অংশে আমরা গণিকাবৃত্তিগ্রহণের কারণগুলিকে

কতোগুলি ভাগে বিভক্ত করেছিলাম, যার মধ্যে অন্যতম হল স্বেচ্ছায় অন্য পুরুষের সঙ্গে দৈহিকসম্পর্ক কিন্তু তা অর্থের বিনিময়ে নয় শুধুমাত্র শারীরিক কারণে। যদিও বেশ্যাবৃত্তির সংজ্ঞা অনুযায়ী অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় এই গল্পগুলির নারীচরিত্রগুলিকে কোনোভাবেই ‘বেশ্যা’ বা ‘গণিকা’ বলা যায়না। কয়েকটি গল্পে বেশ্যাচরিত্র রয়েছে; রয়েছে ‘কুড়িনী’জাতীয়া চরিত্রও। যদিও এই ধরনের গল্পের সংখ্যা বেশি নয়। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, গণিকাচরিত্রের বিশ্লেষণই যখন আমাদের বিচার্য বিষয় তখন এই গ্রন্থটি বেছে নেওয়ার কারণ কী? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা যেতে পারে এই বইটি পাঠের অভিজ্ঞতা আমাদের গবেষণাকাজটিকে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে আমাদের।

শুকসপ্ততিতে বর্ণিত নারী চরিত্রগুলির অধিকাংশই স্নৈরিণী, কুলটী,দুশ্চরিত্রা। তারা স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সাথে অনায়াসে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হতো এবং তারা কিন্তু কোনোরকম প্রেম বা মনের টানে এধরনের সম্পর্কে আবদ্ধ হতো না। শুধুমাত্র শারীরিক তৃপ্তিবিধানের জন্য তারা অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্কে থাকতো এবং সেই অবৈধ সম্পর্ক ও সম্পর্কিত পুরুষটিকে রক্ষা করার জন্য সম্ভব-অসম্ভব যাবতীয় কূটবুদ্ধির সাহায্য নিত তারা। ঠিক এইখানেই শুকসপ্ততি অন্যান্য গ্রন্থের থেকে আলাদা।এই গ্রন্থের নারীচরিত্রেরা তথাকথিত নিয়মে বেশ্যা হয়তো নন কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে তারা বেশ্যার থেকেও নীচপ্রকৃতি।

বিশদ আলোচনার আগে আমরা শুকসপ্ততির সত্তরটি গল্পকে সাধারণভাবে দুটি ভাগে করে নিতে পারি এবং এই বিভাগটি করা হচ্ছে গল্পের মূল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে-

- নারীপুরুষের অবৈধ যৌনতা,পরকীয়া এবং কূটবুদ্ধির মেলবন্ধন ।
- প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্থিরবুদ্ধির প্রয়োগ।

মূলতঃ এই দুটি বিষয়কেই নানাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং উভয়ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে গল্প এবং গল্পের বিষয়বস্তুগত পুনরাবৃত্তি রসগ্রহণে বাধা হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়টি যেন এই বারংবার পুনরাবৃত্তির ফলে আরও বেশি জোরালো হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিভাগটির

সাথে আমাদের গবেষণাকাজের সরাসরি সম্পর্ক নেই তাই সেই গল্পগুলিকে আমরা আমাদের আলোচনার বাইরে রাখবো।

উপরের তালিকাটি খুবই সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং এই তালিকার উপর নির্ভর করে আমরা পরবর্তী তালিকাটি নির্মাণ করে নিতে পারব। এই দ্বিতীয় তালিকাটিতে আমরা প্রধানতঃ প্রথম বিভাগটিকে আরও দুটি উপবিভাগে ভাগ করে নিয়েছি-

- গণিকা বা বেশ্যাসম্বন্ধীয় কাহিনিসমূহ- ৬ টি,
- দুর্চারিত্রা, কুলটা রমণীদের বৃত্তান্ত- ৩৭ টি।

মোট তেতাল্লিশটি গল্পকে আমরা এই দুটি উপবিভাগে ভাগ নিয়েছি। তবে ৪৩ টি গল্পের মধ্যে প্রথম উপবিভাগের শুক কথিত প্রথম এবং একবিংশতি সংখ্যক গল্পটি দ্বিতীয় উপবিভাগেও রয়েছে, তাদের বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্যের কারণে। অর্থাৎ গ্রন্থে বর্ণিত গল্পের সংখ্যার হিসেবে ৪১(৩৭+৪)টি। অন্যান্য গল্প ২৯ টি। আমাদের পরবর্তী আলোচনা সেই অনুসারী হবে। এইভাবে বিভাগটি করার কারণ হল প্রথমতঃ শুকসংগতি গ্রন্থে প্রাপ্ত বেশ্যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়। দ্বিতীয়তঃ অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত নারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং এই দুই প্রকৃতির নারীদের পার্থক্য।

শুকসংগতির শুরুর কাহিনী অর্থাৎ মূল কাহিনী কিছুটা এরকম, চন্দ্রপুরস্থ বণিক হরিদত্ত ও তাঁর স্ত্রী শৃঙ্গারসুন্দরীর একমাত্র পুত্র মদনবিনোদ। মদনবিনোদের পত্নী শ্রেষ্ঠী সোমদত্তের কন্যা প্রভাবতী। মদনবিনোদ যৌবনের যাবতীয় দোষে দুষ্ট- “দ্যুতমৃগয়াবেশ্যামদ্যাতিষু অতীবঃ আসক্তিঃ।”^{৬৩} উপরন্তু সে নিষ্কর্মা। ইতিমধ্যে হরিদত্তের বন্ধু ত্রিবিক্রম নিজের পোষা শুক-সারি দম্পতি হরিদত্তকে দিয়ে বলেন পাখি দুটি তাঁর দুঃখ দূর করবে। মদনবিনোদ শুকটির যথাযথ যত্ন নিতেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত করার পরে শুকের বলা একটি কাহিনী শুনে তাঁর সদবুদ্ধির উদয় হয়; তিনি বাণিজ্যের জন্য বিদেশ যাত্রা করেন। এই পর্যন্ত কাহিনী স্বাভাবিক ছন্দে চলেছে। এরপরেই হয় পটপরিবর্তন। একটি তুলনামূলক কম আলোচিত বিষয় উঠে আসে কাহিনীতে যা প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থের आधार। স্বামীর বিরহে কাতর প্রভাবতীকে তাঁর সমবয়স্কা কয়েকজন সখী অন্যপুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক

স্থাপনে উৎসাহিত করতে শুরু করে। কোনো কারণে মানুষের মন দুর্বল হয়ে থাকলে তাঁর ভালোমন্দ, শুভাশুভের বোধ লোপ পায়। প্রভাবতীর ক্ষেত্রেও সেই একই বিষয় ঘটেছিল। অসৎসঙ্গে মিশে প্রভাবতী তাঁদের বলা কথাকেই আদর্শ জীবনদর্শন বলে মনে করতে শুরু করে। তাঁর মনে হয় ভোগ না করলে জীবনযৌবন সমস্তই বৃথা সেই কারণে তিনি সাজসজ্জা করে সন্ধ্যাভিসারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। এমতাবস্থায় সারিকা তাঁকে নিরস্ত করতে গেলে প্রভাবতী তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলে উড়ে গিয়ে কোনোক্রমে সারিকা নিজের প্রাণ রক্ষা করে কিন্তু বুদ্ধিমান শুক তাঁকে সরাসরি নিবৃত্ত না করে বুদ্ধির আশ্রয় নেয়। সে প্রভাবতীকে, তাঁর কাজকে সামনে সমর্থন করলেও কথার ভাঁজে চতুরতার সাথে অভিসারের প্রতিকূল একটি পরিস্থিতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দেয়, গল্পের ছলে। প্রভাবতীও গল্প শোনার জন্য শুকের কথা কৌতূহলী হয়ে শুনতে থাকেন। গল্পের শেষে শুকের করা প্রশ্নের উত্তরে তিনি এবং তাঁর সখীরা নিরন্তর থাকলে শুক উত্তরটি জানিয়ে দেয় কিন্তু ততক্ষণে অভিসারের সময় শেষ তাই সেইরাত্রির মত প্রভাবতী ঘরে থাকতে বাধ্য হন।

এইভাবেই একটির পর একটি গল্প শুক প্রভাবতীকে শোনাতে থাকে এবং গল্পের শেষে শুক একটি প্রশ্ন করে তাঁকে ও তাঁর বান্ধবীদের। প্রশ্নটি গল্পসম্বন্ধী হলেও উত্তর কিন্তু নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে পরিস্থিতির উপরে এবং কোন ব্যক্তি কতোখানি কূটবুদ্ধির প্রয়োগদক্ষতা দেখাতে পারে তার উপরে। প্রভাবতী বা তার সখীরা উত্তর দিতে অসমর্থ হলে শুক উত্তর দিয়ে দেয়। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ধারা অনুযায়ী প্রতিটি গল্পের শেষে নিশ্চিতভাবে একটি নীতিবাক্য থাকে এবং এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুকের এই গল্পের জাল বুনে চলার প্রকৃত উদ্দেশ্য মনোরঞ্জনের আড়ালে প্রভাবতীকে নিরস্ত করা যাতে কোনোভাবেই প্রভাবতী প্ররোচিত হয়ে ভুল পদক্ষেপ না নিয়ে ফেলেন কিন্তু এটিই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। প্রভাবতী আগ্রহী শ্রোতা, সেইসঙ্গে মনোযোগী পাঠকেরা কিন্তু শুকের গল্পের মাধ্যমে নারীজাতির এক অন্য পরিচয় পেয়ে থাকেন।

শুকের কথনের ক্রমানুসারে গল্পগুলির আলোচনা ও ব্যাখ্যার পরিবর্তে আমরা দ্বিতীয় তালিকাটি অনুযায়ী আলোচনা করবো কারণ আমাদের গবেষণাকাজের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি দ্বিতীয়

তালিকাভুক্ত। তার ফলে গল্পের চরিত্রগুলি, তাদের কার্যকলাপ, আচরণ এবং মনোবৃত্তি যথাযথ অনুধাবন করা সহজ হবে।

● গণিকা বা বেশ্যাসম্বন্ধীয় কাহিনিসমূহ -

প্রথমে যে বিভাগটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো গণিকা বা বেশ্যাসম্বন্ধীয় কাহিনিসমূহ সেগুলির অন্তর্গত। মোট ছয়টি গল্পে গণিকা বা বেশ্যা চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁরাই গল্পের মূল চরিত্র আবার কোনো কোনো গল্পে তাঁদের ব্যবহার করা হয়েছে তাঁদের পেশার কারণে অথবা নিছক কোনো প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য। এই চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ আমাদের কাজের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয়।

এই সংকলনের প্রথম গল্পে এক ‘কুটনী’ চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। চন্দ্রাবতী নগরের শ্রেষ্ঠী পুত্র সুধন রমণীমোহন পুরুষ। হরিদত্তের স্ত্রী লক্ষ্মীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে সে পূর্ণা নামক এক কুটিনীর কাছে গেলো। অর্থের লোভে সুধনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে তাঁর হয়ে দৌত্যকর্ম করতে ইচ্ছুক হলেন। পূর্ণা নানাধরণের চাটুকারিতার সাহায্যে লক্ষ্মীকে অনেকাংশেই নিজের বশীভূত করতে সমর্থ হলেন এবং বললেন তাঁর পছন্দমত কোনো একজন পুরুষকে সঙ্গ দিতে হবে-

“কুলস্রীণাং নৈতদ্যুজ্যতে পরং যত্তবাগ্রে প্রতিপন্নং তৎ করোমি”^{৬৪}-

এই কথা বলে সমস্ত রকমের পূর্বাপর বিচার করেও তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে রাজি হন। ঘটনাচক্রে সুধন অনুপস্থিত থাকায় কামতাড়িতা লক্ষ্মী পূর্ণাকে বলেন যে কোনো একজন পুরুষকে নিয়ে আসতে-

“যৎ কমপি নরং সমানয়।”^{৬৫}

নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে কুটনি পূর্ণা লক্ষ্মীর স্বামী হরিদত্তকে নিয়েই উপস্থিত হলে বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী প্রতিকূল পরিস্থিতিকে শুধুমাত্র নিজের স্থির মস্তিষ্ক এবং কূট বুদ্ধির সাহায্যে নিজের আয়ত্তে

করে নেন। নিজের স্বামীকে মিথ্যাবাদী, চরিত্রহীন ইত্যাদি অপমান করে নিজের চারিত্রিক স্থলনকে কালিমামুক্ত করে নেন।

এই গল্পটিতে কোনো বেশ্যা চরিত্র নেই। কিন্তু কুটনীপেশার সাথে যুক্ত একজন রমণী অর্থের লোভে একজন গৃহস্থ বাড়ির কূলবধূর চরিত্রনাশ করতে দ্বিতীয়বার ভাবেন না। নিজের অসামান্য বাক্চাতুর্য দিয়ে এমনভাবে বিবাহিতা গৃহবধূর ‘মগজধোলাই’ করে থাকেন যে তাঁর মন থেকে পাপপুণ্যের, সামাজিক লোকলজ্জার ভয় মুছে যায়। তবে এই কাহিনীর লক্ষ্মী চরিত্রটি পাঠ করে আমাদের যেটুকু মনে হয়েছে তাতে কেবলমাত্র পূর্ণার প্রভাবেই যে এরকম পরিবর্তন হয়েছে সেকথা মনে হয়না। তাঁর নিজের মধ্যে কোথাও যেন নিষিদ্ধ যৌনজীবনের আস্বাদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল আর সেই কারণেই সুধনের অনুপস্থিতিতে তিনি যে কোনো একজন পুরুষের আসঙ্গ কামনা করেছেন; যার সাথে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া যায়। পূর্ণা লক্ষ্মীর এই মনোবৃত্তিকে কিছুটা উস্কে দিয়েছে মাত্র। এর পাশাপাশি আরো একটি বিষয় লক্ষ্মণীয় সেযুগের ভদ্র, গৃহস্থ পরিবারের অন্তরমহলে কুটনীদেব প্রবেশাধিকার ছিল।

শুকসপ্ততির গল্পসংকলনের সপ্তম গল্পটিতে প্রথম একজন বেশ্যার কথা পাওয়া যায়। কাহিনীটি কিছুটা এরকম বোৎসন নগরে কেশব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি পিতার অনুগ্রহে জীবন অতিবাহিত করতে অনাগ্রহী হয়ে বহু বিচার বিবেচনা করে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময় তিনি একটি শ্মশানে অধিষ্ঠানকারী একজন তপস্বীর কাছে অর্থী হয়ে উপস্থিত হন। সেই তপস্বী তাঁকে একটুখানি সিঁদুর দিয়ে বলেন কেশব ঐ সিঁদুর স্পর্শমাত্র পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা পাবেন। কিন্তু তিনি একটি শর্ত দিয়ে বলেন যে কেশব যেন এই সিঁদুর ও সিঁদুরের মাহাত্ম্যের কথা কাউকে না বলেন অন্যথায় সিঁদুর আবার যোগীর কাছে ফিরে আসবে।

কেশব ব্রাহ্মণ এতো সহজেই অর্থলাভে সমর্থ হয়ে বেশ্যাসক্ত হয়ে পড়েন। রত্নাবতী নগরীতে বাসকারিণী স্থগিকা নামক এক বেশ্যার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। নানারকম উপহার ইত্যাদি দিয়ে তাঁর মনোরঞ্জে প্রয়াসী হন। বেশ্যা স্থগিকার পরিচিতা ‘কুটনিমাসী’ স্বাভাবিক কৌতূহলে কেশবের

অর্থাগমের উৎস জানতে আগ্রহী হয় কারণ কোনোরকমভাবেই কেশবের অর্থলাভের কোনো উপায় (ব্যবসা ইত্যাদি) তাঁরা বুঝতে পারেননি।

স্থগিকার বারংবার প্রশ্নেও কেশব নিরুত্তর থাকেন। তখন বেশ্যা নানানভাবে সেবা-শুশ্রূষা করে কেশবের কাছ থেকে তাঁর অর্থলাভের রহস্যটি জেনে নিয়ে ঘুমন্ত কেশবের কাছ থেকে সিঁদুরটি চুরি করে নেন। শুধু এটুকুই নয়; নির্দিষ্ট বেশ্যাপণ না পাওয়ার অজুহাতে তাঁরা কেশবকে অপমান করে বিতাড়িত করেন। অসহায় অবস্থায় কেশব রাজার কাছে বিচারের জন্য গেলে রাজা সব বুঝলেও উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে সঠিক বিচার করতে অসমর্থ হন। রত্নাবতী নগরীর জনগণ তাঁকে দেশছাড়া করে এবং তপস্বীর কথা অনুযায়ী সেই সিঁদুর তাঁর কাছেই ফিরে যায়।

এই কাহিনীটির দুটি প্রেক্ষিত রয়েছে। প্রথমটিতে শুক বোঝাতে চেয়েছে অতিরিক্ত কৌতূহলের ফল শুভকারী হয়না এবং দ্বিতীয় প্রেক্ষিতটি ‘বেশ্যা বা গণিকাকেন্দ্রিক’ যেটি আমাদের গবেষণাকাজের জন্য প্রয়োজন। এই গল্পটিতে বেশ্যা স্থগিকার বেশ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি একজন বেশ্যার সাধারণ বৈশিষ্ট্য রূপেই পরিগণিত হয়ে থাকে। বিভবান কোনো পুরুষের অর্থলাভের জন্য তাঁর সাথে সম্পর্ক এবং সেই ব্যক্তির ধনসম্পদ, আর্থিক সঙ্গতি শেষ হয়ে গেলে তাঁকে পরিত্যাগ করা। বাৎসর্যয়ন তাঁর কামসূত্রের বৈশিক অধিকরণে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ধনী ব্যক্তিটি বেশ্যাসঙ্গ করতে করতে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হয়ে গেলে সেই বেশ্যা তাঁর সঙ্গত্যাগ করেন অন্যথায় তাঁর কোনো লাভ হয়না। শুধু তাইই নয়, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা সবকিছুতেই তাঁরা সিদ্ধহস্ত। নানারকম ছলাকলা অবলম্বন করে অর্থসংগ্রহ করে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। সেই কাজের জন্য যতটা নির্মম, নিষ্ঠুর হতে হয় তাঁরা সেটা হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কেশবের অর্থসংক্রান্ত গোপন বিষয়টি কৌশলে জেনে নেওয়ার পরে স্থগিকা সেটি চুরি করেছে; শুধু তাইই নয় লক্ষ করতে হবে স্থগিকা সেই চুরিটি করেছে কেশবের ঘুমন্ত থাকার সুযোগে। যাতে কেশব তাঁকে কোনোভাবেই বাধা দিতে না পারে। একজন অসহায়, ঘুমন্ত মানুষের সর্বস্ব যে চুরি করে নিতে পারে সে অত্যন্ত নীচপ্রকৃতির।

শুকসপ্ততির এই গল্পটি থেকে বেশ্যাদের সম্বন্ধে যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাতে করে বেশ্যাদের হীন, কুটিল, লোভী এবং স্বার্থস্বেষী ব্যতীত অন্য কিছু মনে হয়নি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁরা যে কোনো সীমা পর্যন্ত যেতে পারেন।

পরবর্তী গল্পটি শুকসপ্ততির সপ্তদশ সংখ্যক। এই গল্পটিতে যদিও গণিকা চরিত্রটি গৌণ। আগের গল্পের স্থগিকা চরিত্রটির সাথে এই কাহিনীর মদনা চরিত্রটির বিশেষ মিল নেই। শুক এখানে গল্পের পুরুষটির উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করার প্রসঙ্গে কাহিনীটির উত্থাপন করেছিল। গুণাঢ্য নামে এক ব্যক্তি মদনা নামক এক বেশ্যার গৃহে রাত্রিবাস করতে মনস্থ করেন। গুণাঢ্যের একটি বলদ ছিল, সেই বলদটিকে দেখিয়ে নিজেকে অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিপন্ন করে এবং তাঁর মিথ্যাভাষণে বেশ্যা মদনা ও তাঁর কুটনি মাসি সেইমত আপ্যায়নের আয়োজন করেন। কিন্তু গুণাঢ্য অতি প্রত্যুষে বেশ্যার গলার হারটি চুরি করে পালিয়ে যায়। চোরের পরিচয় জানতে পারলেও তাঁরা কোনোরকম আইনি সহায়তা নেননি।

একদিন জুয়ায় সবকিছু হেরে দ্যুতগৃহ থেকে ফেরার সময়ে মদনা তাকে দেখতে পায় কিন্তু গুণাঢ্য মুহূর্তমধ্যে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসেন। তিনি অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে মদনাকে “শম্ভলী” নামে সম্বোধন করে তাঁর অনুসরণ করতে থাকেন। রাজভয়ে ভীত মদনা একটি নির্জন স্থানে এলে গুণাঢ্য তাঁকে সোনার হারটি ফিরিয়ে দেন।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এই কাহিনীতে মদনা নামক বেশ্যাচরিত্রটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়না। কেবলমাত্র সাধারণ বেশ্যাচরিত্রের ন্যায় লোভ-লোলুপতা তাঁর রয়েছে। কারণ তিনি ও তাঁর পরিচিত কুটনিমাসি উভয়েই গুণাঢ্যকে ধনী ব্যবসায়ী ভেবে তাঁর অর্থসম্পদ কৌশলে করায়ত্ত করে নেওয়ার লোভে নিজেদের গৃহে রাত্রিবাস করতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য একেবারেই ভালো ছিলোনা। কিন্তু শুকের বলা গল্পটি থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট নয় তা হল মদনারই স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিলেও তাঁরা কেন গুণাঢ্যের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা নিলেন না অথবা গুণাঢ্য তাঁকে অনুসরণ করলে মদনা কেন রাজভয়ে ভীত হয়েছিলেন? এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর গল্পটি থেকে পাওয়া যায়না। অথচ ‘কামসূত্র’ এবং ‘অর্থশাস্ত্র’-দুটি শাস্ত্রেই গণিকার কোনোরকম ক্ষতি (শারীরিক নির্যাতন ও

ধনক্ষয়) সাধন করা হলে রাষ্ট্র যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ করবে এরকম নির্দেশ আছে। তাই সেই বক্তব্যের সাথে শুকসপ্ততির এই গল্পটির কোনো মিল কিন্তু পাওয়া যায়না। কিন্তু আগের আলোচ্য *কুটনীমত্* গ্রন্থটিতেও আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছি সময়ের সাথে সাথে গণিকাদের জন্য গৃহীত রাষ্ট্রীয় নিয়ম, আইন ইত্যাদির প্রচলন ক্রমশঃ কমে আসছিল। রাষ্ট্র তার এই নাগরিকদের স্বার্থরক্ষায়, সুরক্ষার জন্য কতোখানি সচেতন ভূমিকা পালন করতো সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এরপরের গল্পটিতে(একবিংশতিতম) গণিকাগৃহের ‘কুটনী’র উল্লেখ রয়েছে। গণিকাবৃত্তির সাথে ‘কুটনী’ পেশাবলম্বনকারিণীদের সম্পর্ক ওতঃপ্রোত জড়িত। যৌবনের গণিকারাই অধিকাংশ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে এই বৃত্তি গ্রহণ করতেন। তাঁদের বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে বেশ্যা অথবা কূলবধু সকলেই নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণে সমর্থ হয়ে থাকেন। এই গ্রন্থে বেশ কয়েকটি গল্পে ‘কুটনী’ প্রসঙ্গ এলেও বিশদ কোনো বর্ণনা নেই।

শুকসপ্ততির ত্রয়োবিংশতিতম কাহিনীটি সমগ্র সংকলনের মধ্যে একমাত্র কাহিনী যেটি সম্পূর্ণভাবেই গণিকাকেন্দ্রিক। বিষয়বস্তু বিচারে এই কাহিনীটিকে ব্যতিক্রমী বলা যায় এবং আমাদের গবেষণা কাজের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক পাওয়া সম্ভব হয়েছে এই কাহিনীটি থেকে।

শুক বর্ণিত কাহিনীটি কিছুটা এরকম- পদ্মাবতী নগরীতে চন্দ্র ও প্রভাবতী নামে দম্পতি বাস করতেন। এই চন্দ্র পেশায় বণিক ছিলেন। তাঁদের একমাত্র পুত্রের নাম রাম। স্বাভাবিকভাবেই একটিমাত্র সন্তান থাকার কারণে প্রভাবতী মনঃকষ্টে থাকতেন কিন্তু তাঁর স্বামী চন্দ্র তাঁকে বাস্তবদিকটি নিয়ে ভাবতে বলেন এবং বোঝান যে, নির্গুণ ও নিষ্কর্মা অনেকগুলি পুত্রের থেকে একটিমাত্র গুণী ও কর্মঠ পুত্র বংশের মঙ্গলকারী। বণিক চন্দ্র পুত্র রামকে শিক্ষাদানের জন্য ধূর্তমায়া নামে একজন কুটনিমাসিকে নিয়োগ করলেন সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। কিন্তু শর্ত হল ধূর্তমায়ার প্রশিক্ষণে বণিকপুত্র রামকে যথেষ্ট চতুর এবং বাস্তববোধ সম্পন্ন করে তুলতে হবে যাতে কোনোভাবেই সে কোনো বেশ্যার ছলাকলায় প্রতারিত না হয়। যদি তা না হয় এবং রামচন্দ্র প্রতারিত হয় তবে শর্তানুযায়ী চন্দ্র বণিক ধূর্তমায়ার কাছ থেকে দ্বিগুণ স্বর্ণমুদ্রা আদায় করবেন। কুটনী এই শর্তে রাজি হয়ে যান। শুকের উক্তি পরের বিবরণ আমরা দেখি-

“বৈশিকীং কৃত্রিমাং বাণীং ব্যলীকান্ শপথাংস্তথা।

কৌটিল্যং কৃত্রিমং ভাবং কৃত্রিমং রুদিতং তথা ।। ১৫২

হাস্যং চ কৃত্রিমং দুঃখং সুখং চৈবমপার্থকম্।

যাচনং বিনয়োপেতং স্নেহভাবো নিরীহতা ।। ১৫১

সমত্বং সুখদুঃখেষু ধর্মাধর্মসমক্রিয়া।

ভুজঙ্গপুরতশ্চৈব কৌটিল্যক্রমদর্শনম্ ।। ১৫২ ।।^{৬৬}

ধূর্তমায়ার সাথে তাঁর গৃহে থাকার সময়ে বেশ্যাদের জীবনযাত্রা, তাঁদের কলাকৌশল সমস্ত কিছুই বণিকপুত্রের আয়ত্তাধীন হল। এমনকি নারীদেহের সাধারণ, স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতিও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিলোনা। তাঁর মতে যে রমণীর হৃদয়বৃত্তি কোমল, প্রেমবোধ রয়েছে একমাত্র সেইই সঙ্গিনী হওয়ার উপযুক্ত-

“অধরঃ করঃ কপোলঃ স্তনযুগলং নাভিমণ্ডলং রমণম্।

স্ত্রীজনসামান্যং হৃদয়ং যদ্ যস্য তৎ তস্যাঃ।”^{৬৭}

বৈশিককলা ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয় শিক্ষা সমাপ্তির পরে রাম সুবর্ণদ্বীপে বাণিজ্য করতে গিয়ে কলাবতী নামী এক গণিকার সঙ্গলাভে এক বছর সময় অতিবাহিত করলেন। গণিকা নিজের সমস্ত বিদ্যা-কলা-চাতুর্য প্রয়োগ করেও রামের অর্থসম্পদ নিজের হস্তগত করে নিতে অসমর্থ হলেন। নিরুপায় হয়ে নিজের মায়ের শরণাপন্ন হলে তাঁকে তাঁর মা প্রাণনাশের মিথ্যা অভিনয় করতে বলেন যাতে রামবণিক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কলাবতীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে তাঁকে সমস্ত সম্পদ দান করেন। প্রথমে ভীতা কলাবতী অরাজি হলেও মাতার সাঙ্ঘনাবাক্যে ও বুদ্ধির ভরসায় অভিনয় করেন। বুদ্ধিমান রাম তাঁর কৌশলে প্রতারিত হয়ে সব অর্থ তাঁর হাতে তুলে দিলে সেই নিষ্ঠুর গণিকা অসম্মানের সাথে বিতাড়িত করে দেন। রাম নিজের বাসভূমি পদ্মাবতী নগরীতে নিঃস্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

পূর্ব নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী চন্দ্র বণিক ধূর্তমায়াকে নির্দিষ্ট শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে পুত্রের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত জানান। সমস্ত কথা শুনে কুটনিমাসি নিজের অপারগতা স্বীকার করে নিয়ে রামের পিতাকে নানাধরনের স্তোকবাক্য শুনিতে একটি পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুসারে রাম বণিক পণ্যসম্ভার সাজিয়ে আবার সুবর্ণদ্বীপে উপস্থিত হবেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে থাকবেন ধূর্তমায়া স্বয়ং। সেই অনুযায়ী রাম উপস্থিত হলে অন্যান্য পৌরজনের সাথে বেশ্যা কলাবতীও তাঁকে সমাদর করে নিজের বাসগৃহে নিয়ে গেল। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে রাম বণিকের সমস্ত সম্পত্তি এবারও কৌশলে অধিগ্রহণ করে নিলো। এইবার ধূর্তমায়া তাঁর ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে চণ্ডালিনীর ছদ্মবেশে একদিন কলাবতীর গৃহে প্রবেশ করে রামকে প্রহার করতে উদ্যত হল। বিস্মিত কলাবতীর সামনে কুটনি মাসি ও বণিক রাম মাতাপুত্রের অভিনয় করলেন; যেন রাম তাঁর মায়ের সমস্ত অর্থ চুরি করে গোপনে ভ্রমণ করছিলেন। ধূর্তমায়া কলাবতীকে উদ্দেশ্য করে, তার পেশার জন্য অপমান করলে এবং রাজার ভয় দেখাতে শুরু করলে ভীতা কলাবতী নিজের মা(কুটনি মাসি)-কে ডেকে বারবার অনুরোধ করে সমস্ত অর্থ-সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ধূর্তমায়া সমস্ত সম্পত্তি ইত্যাদি বুঝে নিয়ে রাম বণিকের সাথে পদ্মাবতী নগরীতে ফিরে এলেন এবং নিজের কথা রাখলেন।

এবার কাহিনীটির বিশ্লেষণে আসা যাক। শুকের বলা কাহিনীটি আরও একটু বড় কিন্তু আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় অংশটুকু গ্রহণ করেছি। প্রথমেই বলা হয়েছে কাহিনীটি ব্যতিক্রমী। লক্ষ করার মত বিষয়টি হল পিতামাতা স্বয়ং তাঁদের একমাত্র পুত্রকে একজন কুটিনীর কাছে পাঠাচ্ছেন যাতে কোনোভাবেই পুত্র প্রতারিত না হতে পারেন। বিশেষত কোনো মহিলা যেন তাঁদের পুত্রকে কৌশলে প্রবঞ্চিত করতে না পারে সেইজন্য এই উদ্যোগ। তার জন্য তাঁরা ধূর্তমায়া নামের এক কুটনির সাথে চুক্তি করেন। নির্বাচন থেকে মনে হয় তিনি যথেষ্ট বয়স্ক, প্রসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ একজন কুটনী ছিলেন। এরকম হওয়াও খুব স্বাভাবিক যে, তিনি নিজের যৌবনকালে যথেষ্ট খ্যাতিনামা এক গণিকা ছিলেন এবং সেই কারণে চন্দ্র বণিক তাঁকেই নির্বাচন করেছিলেন পুত্রের শিক্ষার জন্য। শুধু তাইই নয়, বেশ্যালেয়ে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁরা। এ যেন গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভের মত। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একজন ‘কুটনী’ যিনি অল্পবয়স্ক বেশ্যাদের পেশা সংক্রান্ত নানা বিষয় শিক্ষা

দিয়ে থাকেন, তিনি একজন বণিকপুত্রের শিক্ষাদাত্রীর আসন পেয়েছেন; তার পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল, একজন কুটিনী যার পেশা প্রধানতঃ গণিকাদের সহায়তা করা তিনি কেবলমাত্র অর্থের বিনিময়ে একজন বণিকপুত্রকে বেশ্যাদের বৃত্তিসংক্রান্ত, একান্ত ব্যক্তিগত যাবতীয় তথ্য, কলাকৌশল সমস্ত কিছু শিখিয়ে দিতে রাজি হন। আশ্চর্যের বিষয় তো অবশ্যই কারণ নিজের সমপেশার ব্যক্তিদের গুপ্তকথা প্রকাশ করে দেওয়া পেশাদারিত্বের পরিচায়ক নয়।

বেশ্যাবৃত্তির সমস্ত রকমের গোপন বিষয় জানার পরেও রাম কলাবতীর প্রেমের অভিনয়ের কাছে পরাস্ত হয়ে প্রতারিত হন। গণিকালয়ে বাস করে যে দীর্ঘদিনের জ্ঞানলাভ তার কোনোকিছুই তাঁকে সাহায্য করতে পারেনি। তিনি বলেছিলেন হৃদয়বৃত্তি যাঁর আছে তিনি প্রকৃত প্রেমসী। কলাবতীর আত্মহত্যা ও প্রেমের মিথ্যা অভিনয়কে সত্য ভেবে তিনি তার পাতা ফাঁদে পা দেন, সব সম্পদ গ্রাস করে নিয়ে কলাবতী তাঁকে গৃহত্যাগ এমনকি সুবর্ণদ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। অর্থাৎ গণিকার প্রেমের অভিনয় ধরতে পারার মত দক্ষতা তাঁর তৈরী হয়নি।

এই প্রসঙ্গেই আসে কলাবতীর মাতার কথা। গল্প অনুযায়ী কখনো তাঁকে কলাবতীর নিজের মাতা বলা হয়েছে আবার কখনো বলা হয়েছে তিনি আসলে একজন কুটিনী; কলাবতী যাঁকে ‘মা’ বলে ডাকতেন। তিনি যখন জানতে পারেন যে, কোনো ছলা-কলায় রাম বণিককে পরাস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না তখন তাঁর প্রথম মন্তব্য ছিল-“ নিশ্চিতমেষ বেশ্যাসূতঃ।” তিনিই কলাবতীকে আত্মহত্যার অভিনয় করতে বলেন, শুধু তাইই নয় প্রাণভয়ে ভীতা কলাবতীকে যাবতীয় ব্যবস্থা করার কথা দিয়ে আশ্বস্ত করেন। মাতা অথবা মাতৃস্থানীয়রূপে একজন কুটিনী বা গণিকামাতা কিরকম হতে পারেন তার একটি উদাহরণ এই গল্পটিতে পাওয়া যায়। অর্থ উপার্জন, অর্থসংগ্রহই এঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলা যেতে পারে এবং সেজন্য তাঁরা যতখানি নিষ্ঠুর হওয়া সম্ভব হতে পারেন। মানবিক মূল্যবোধ তাঁদের জীবনে একেবারেই নেই বললেই চলে। পূর্বরাষ্ট্রেই যে অর্থবান ব্যক্তির সাথে অতিবাহিত করেছেন তারা, পরের দিন ভোরেই যদি সেই ব্যক্তির ধননাশ হয় তাহলে গণিকা তাঁর সাথে

কোনোরকম সংশ্রব তো রাখেনই না উপরন্তু তাঁকে অত্যন্ত অপমান করে গৃহত্যাগে বাধ্য করে^{৬৮}। এ যেন শাস্ত্রের প্রায়োগিকরূপ।

কুটনী ধূর্তমায়া যেভাবে নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধি, অভিনয়দক্ষতার সাহায্যে দ্বিতীয়বারের পরিস্থিতিকে নিজের অধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তাতেই বোঝা যায় গণিকারা নিজের পেশাগত বিষয়ে ঠিক কতোখানি দক্ষ। বণিক চন্দ্রের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেননি কিন্তু হাল না ছেড়ে নতুনভাবে পরিকল্পনা করেছেন এবং পরবর্তী সময়েও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখে স্বয়ং আসরে নেমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। রাম কেবলমাত্র তাঁকে অনুসরণ করে গেছেন এবং ফল আমরা দেখেছি।

এই একটি গল্পে আমরা কুটনী এবং গণিকা এই দুই ধরনের বৃত্তির রমণীদের দেখেছি। দেখেছি অর্থ ব্যতীত কোনোকিছুই এঁদের কাছে মূল্যবান নয়। হৃদয়বৃত্তি এঁদের নেই। শুকের মুখে বেশ্যাদের সম্বন্ধে একটি শ্লোক রয়েছে, এই প্রসঙ্গে সেটি একটু আলোচনা করে নেওয়া যাবে। শ্লোকটি সরাসরি কাহিনীটির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং আমাদের গবেষণার কাজে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে থাকবে কারণ সমাজ বেশ্যাদের সম্বন্ধে কি ধরনের চিন্তা প্রচলিত সেটি বোঝা যায় এই শ্লোকটি থেকে। বেশ্যাসংক্রান্ত শ্লোকটি হল -

“বেশ্যা অপি রমন্তে জনং প্রিয়মপি বঞ্চয়ন্তি অর্থলোভেন।

তাভ্যো নমো বেশ্যাভ্যঃ আত্মাপি ন বল্লভো যাসাম্।।”^{১৫৮}।^{৬৯}

আসলে ‘বেশ্যা’ শব্দটি উচ্চারিত হলে অর্থলিপ্সা-প্রতারণা-কৌশল-হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা এগুলি যেন অনেকটা সমার্থক শব্দ হিসেবে সাধারণভাবেই মনে আসে, যেন বেশ্যাদের কিছুই শুভ নয়। তাঁরা যেন বিনষ্টি তথা ধ্বংসের প্রতীক।

শুকসপ্ততির পরবর্তী যে গল্পটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, সেই পঁয়তাল্লিশতম গল্পটিতে বেশ্যাদের জীবনযাত্রার খুব সাধারণ কিছু দিক উঠে এসেছে। বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী বিলাসপুর

নগরে বিষ্ণু নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতো । এই ব্রাহ্মণ অসম্ভব রতিলোলুপ ছিল এবং সেইসঙ্গে তাঁর যথেষ্ট রতিকুশলতাও ছিল-

“রতিলোলুপঃ কুটুম্ববর্জিতো রতিকর্মণি সর্বনারীদুঃসহ ইতি নগরে প্রসিদ্ধো বভূব।”^{৭০}

অতএব একথা বুঝতে অসুবিধে হয়না যে বেশ্যা রমণীরা, যাঁরা নাকি তাঁদের কামকলায় দক্ষতার জন্যই সর্বজনবিদিত তাঁরা যখন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির রতিদক্ষতাকে ভয় পান তখন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

গণিকা রতিপ্রিয়া ষোল আনা বাজি ধরে নিজে থেকে তাঁর সঙ্গে যৌনক্রীড়ায় লিপ্ত হলেন। তাঁর দুটি উদ্দেশ্য ছিল বলেই মনে হয়েছে-ব্রাহ্মণকে বাজিতে হারিয়ে ষোল আনা লাভ এবং অন্ততঃ একজন গণিকা কামক্রীড়ায় বিষ্ণুকে পরাজিত করেছে এই সম্মানলাভ। গণিকাকুলের সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য। রাত্রির দুই প্রহরকাল পরে রতিপ্রিয়া পরাজিত হতে আরম্ভ করলেন এবং একপ্রকার বাধ্য হয়ে নিজের কুটনিমাসিকে অনুরোধ করলেন যাতে বাজির জন্য নির্ধারিত অর্থমূল্য ব্রাহ্মণকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু মাসি সেই প্রস্তাব অস্বীকার করেন। পরিবর্তে তৎক্ষণাতঃ পরিকল্পনা করলেন তাঁরা-

“অস্মদগৃহে ন কোহপি কামুকো গণিকাং জিত্বাং পণবন্ধং জগ্রাহ।”^{৭১}

বিষ্ণু তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে মাসির পরিকল্পনা বুঝতে পেরে পিপুল গাছের মগডালে পাথর নিক্ষেপ করামাত্রই মাসি আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। তাঁদের কারচুপি ধরা পড়ে যাওয়ায় সমস্ত বেশ্যাপল্লির বেশ্যারা তীব্র নিন্দা করলেন আর বিষ্ণুও নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট উপভোগশুল্কের দ্বিগুণ অর্থ আদায় করে ক্ষান্ত হলেন। এছাড়াও তিনি সম্পূর্ণ অর্থ দিয়েও অতৃপ্তিজনিত কারণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

গণিকাসংক্রান্ত প্রায় প্রতিটি কাহিনিতেই একটি সাধারণ বক্তব্য নিহিত রয়েছে। ‘গণিকা’ মানেই তাঁরা যেন প্রতারক, প্রবঞ্চক। অর্থগুপ্ততার জীবন্ত প্রতীক তাঁরা। কিন্তু এই অন্তিম কাহিনীটিতে একটু অন্যরকমভাবে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আদতে এই কাহিনীর দুটি পৃথক দিক রয়েছে এবং দুটি দিকই আলোচনাসাপেক্ষ-

একজন পুরুষ যিনি অর্থ দিয়ে রতিসুখ ভোগ করতে বেশ্যাগৃহে এসেছেন তাঁকে যথাযথ তুষ্ট করা সেই বেশ্যার পেশাগত কর্তব্য। তাই সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন না করা নিন্দনীয়। তার থেকেও নিন্দনীয় বিষয় হল যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বিষুকে প্রতারিত করার প্রয়াস করা হয়েছিল সেটি। স্বাভাবিকভাবেই বেশ্যাকুলের কেউই তা সমর্থন তো করেননি উপরন্তু সমালোচনা করেছিলেন।

এবার আসা যাক এই কাহিনীর বিপরীত দিকটিতে। একজন গণিকার কাছে নানা প্রকৃতির পুরুষ আসেন। কেউ আসেন তাঁদের শিল্পকলার টানে, কেউ আসেন তাঁদের বৈদগ্ধ্য মুগ্ধ হয়ে, কেউ আসেন সাময়িক সঙ্গলাভের জন্য আবার কেউ হয়তো আসেন নিছক রূপের মোহে, নিজের যৌন তৃপ্তিবিধানহেতু। একজন গণিকার কোনো ব্যক্তিকে পছন্দ করার অথবা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা কতোখানি থাকে বা আদতেও থাকে কিনা সেই বিষয়ে খুব স্পষ্ট কোন নির্দেশ পাওয়া যায়না। যেমন আচার্য কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রের* গণিকাধ্যক্ষ অধিকরণে বলা হয়েছে।^{৭২} অর্থাৎ সেক্ষেত্রে গণিকার নিজস্ব সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই। অন্যথায় শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা আছে।^{৭৩} আবার এই কাহিনীতে রতিপ্রিয়ার কুটনিমাসি বলেছেন কোনো কামুক পুরুষ কোনো গণিকাকে পরাজিত করেনি, তাই সুনাম বজায় রাখতে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করা যায় কিন্তু অত্যাচারিত মেয়েটিকে সাময়িক বিরতি দিয়ে মুক্ত করা যায়না। সুতরাং এখানেও তাঁর সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার নেই এমনকি সেই পুরুষটির সাথে যৌনক্রীড়ায় তাঁর শারীরিক অসুবিধা-ব্যথা-ক্লান্তি কোনো কিছুতেই নিরস্ত হওয়ার স্বাধীনতা নেই তাঁর। মতামত দেওয়া তো দূরন্ত। কোনোরকম ক্ষতি হলে সেই বিষয়ে নির্ধারিত শাস্তির তালিকা রয়েছে যদিও তবুও মনে হয় কোথাও গিয়ে যেন মনে হয় গণিকা ও তাঁর ভোক্তার মধ্যের সম্পর্ক যেন ‘ক্রেতা-বিক্রেতা’র মধ্যকার সম্পর্ক; চলতি ভাষায় ‘পয়সা উশুল’ যাকে বলে। পূর্ণ সন্তুষ্টি বিধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের মুক্তি নেই। কখনো কখনো মনে হয় এইধরনের হৃদয়হীনতাই বোধহয় বাধ্য করেছে ওঁদেরও হৃদয়হীন হতে। তাই নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সুরক্ষিত করতে তাঁরা যেনতেনপ্রকারেণ থেকে অর্থাৎ সঞ্চয় করে রাখেন।

শুকসপ্ততিতে গণিকাদের জীবনযাপনের বিশদ চিত্র পাওয়া যায়না। যেক’টি গণিকাচরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁদের সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্রের চরিত্রগত মিল রয়েছে যেমন –

অর্থলিঙ্গা, প্রতারণা, মিথ্যা প্রেমের অভিনয় ইত্যাদি। আমাদের নির্বাচিত পূর্ববর্তী সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্যে গণিকাদের যে গরিমাস্থিত রূপ বর্ণনা রয়েছে, তাঁদের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদির সাথে তুলনায় এই গণিকাদের অবস্থা সব দিক থেকেই নিম্নগামী। আসলে সময়ের সাথে সাথে এই পেশা ও পেশাবলম্বিনীরা তাঁদের অতীত গৌরব হারিয়ে ফেলেছেন। জীবনধারণের জন্য সামান্য উজ্জ্বলতার অবলম্বন করতেও দেখা যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালবিচার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলা হয়েছে যেহেতু এটি একটি সংকলন-গ্রন্থ এমনকি রচয়িতার পরিচয়ও নির্দিষ্ট নয় কিন্তু এটি সংকলনের সময়কাল দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বলেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে তাই সেইসময়ে গণিকাদের অবস্থার অবনমন বুঝতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয়না।

- দুঃচরিত্রা,কুলটা রমণীদের বৃত্তান্ত-

শুকসপ্ততিতে বর্ণিত দ্বিতীয় পর্যায়টিতে যে সকল গল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাতে আমরা কোনো বেশ্যাচরিত্রকে স্থান দিইনি। এই গল্পগুলির নারীচরিত্রগুলি মূলতঃ বিবাহিতা। তাঁদের সন্তানাদির উল্লেখ এখানে নেই। তাই তাঁদের মাতৃরূপের কোনোরকম পরিচয় এখানে পাওয়া যায়না। এই রমণীদের দাম্পত্য অসুখী ছিল কিনা, স্বামীর সাথে তাঁদের যৌন-সম্বন্ধ পরিপূর্ণতা পেয়েছিল কিনা সেই সম্পর্কে লেখক নিরন্তর অর্থাৎ কোনোরকম শারীরিক-মানসিক অতৃপ্তির কারণে তাঁরা পরকীরার মত বিষয়ে লিপ্ত হয়েছিলেন কিনা তারও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব কম সময়ের মধ্যে এমনকি কিছু গল্পে তো সামান্য কয়েক মুহূর্তের পরিচয়ে আবার কখনো কোন প্রয়োজনসিদ্ধি হেতু অচেনা, অজানা পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে তাঁদের কোনোরকম অনীহা দেখা যায়না, দেখা যায়না ন্যূনতম লজ্জা বা সংকোচ। এত অনায়াসে,অবলীলায় তাঁরা যৌনতায় লিপ্ত হয়ে পড়েন দেখে বিস্ময় জাগে।

কাহিনিগুলিতে বিশদ ইঙ্গিত না থাকলেও আমাদের মনে সম্ভাব্য কয়েকটি কারণের কথা উদয় হয়েছে। সেগুলি খুব সংক্ষেপে আমরা দেখে নিতে পারি-

প্রথমতঃ বিবাহিত সম্পর্কে যদি স্ত্রী সুখী না হন যার অন্যতম কারণ মনোমত, যোগ্য পতির সাথে বিবাহ না হওয়া। তাহলে তিনি অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বেন।

দ্বিতীয়তঃ শারীরিক সম্পর্কে নারীপুরুষ উভয়েরই সমান তৃপ্তিলাভ বাঞ্ছনীয় কিন্তু সমাজে নারীদের যৌনতা, তাঁদের যৌনতার বোধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা সেইভাবে হয়না। শুধু তাইই নয় মেয়েদের শেখানো হয় যাতে তাঁরা নিজেদের যৌনতা অবদমিত করে রাখেন কারণ কোনো নারী সোচ্চারে নিজের যৌনাকাজ্জল কথা উচ্চারণ করলে তাঁকে সমাজ খুব সহজেই ‘খারাপ মেয়ে’র তকমা দিয়ে দেয়। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, সেইসব নারীরা নিজেদের অতৃপ্ত, অবদমিত যৌনবাসনা পূর্ণ করার কারণে অবাধ ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

শুকসঙ্গতিতে বর্ণিত মেয়েদের ক্ষেত্রে যে এমনটাও হয়ে থাকতে পারে সেটা মনে করা অস্বাভাবিক হবেনা। এরকম হয়ে থাকেই। সবগুলি গল্পের ক্ষেত্রে না হলেও অন্ততঃ কিছু ক্ষেত্রে তো অবশ্যই। কিন্তু এই যুক্তিতে তাঁদের আচরণকে সমর্থন করা যায়না। কেননা তাঁদের সমর্থন করলে অনৈতিক কার্যকলাপকে সমর্থন করা হয়। অনেকক্ষেত্রেই মানুষের জীবনে অতৃপ্তি আসতে পারে কিন্তু সেই অতৃপ্তির বশবর্তী হয়ে প্রতারণা করা একেবারেই ন্যাকরজনক এবং অনুচিত। কিন্তু *শুকসঙ্গতি*র নারীরা নির্দিধায় পরিবার-বিবাহ-সমাজ কিছুর তোয়াক্কা না করেই অবাধ যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয়েছেন।

তৃতীয়তঃ পুরুষের বেশ্যাসক্তির কথা সর্বজনবিদিত কিন্তু বেশ্যা ব্যতীত বিবাহিতা রমণীরাও যে অন্য পুরুষে আসক্ত হন তার অজস্র উদাহরণ রয়েছে এই গ্রন্থটিতে। অনেকক্ষেত্রেই আমাদের মনে হয়েছে *adventure* বা নতুনত্বের আশ্বাদ পাওয়া এই ধরনের সম্পর্কের কারণ।

চতুর্থতঃ বেশ কয়েকটি কাহিনী রয়েছে যেখানে পুরুষটি কোনো দ্রব্য উপহাররূপে দেওয়ার বিনিময়ে নারীটিকে ভোগ করতে চেয়েছে এবং লোভের বশবর্তী হয়ে মেয়েটিও তাতে রাজি হয়ে যায়। তবে এই পর্যায়ভুক্ত কাহিনীগুলির স্ত্রীচরিত্রগুলিকে ‘বেশ্যা’ পেশাবলম্বনকারিণীদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে কারণ তাঁরা কোনো দ্রব্যের (বস্ত্র/অলংকার/ধন ইত্যাদি) প্রাপ্তিলোভে শারীরিক সম্পর্কে আবদ্ধ

হয়েছিলেন। এই প্রত্যেকটি শারীরিক সম্পর্ক একবারমাত্র সংঘটিত হয়েছে। এরপরের তালিকাটিতে আমরা ক্রমান্বয়ে অনুযায়ী কাহিনিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখে নেব-

তালিকা ১: গুরুসংগৃহের কাহিনিবিন্যাস-

গল্পের ক্রমিক সংখ্যা	নারী	পুরুষ	কুটনি/সহায়ক চরিত্র	আত্মীয়ক/ইঙ্গিতকারী	কারণ
প্রথম	লক্ষ্মী	সুধন	পূর্ণা	পুরুষ	যৌনতা
দ্বিতীয়	শশিপ্রভা	বীর	যশোবতী	”	”
তৃতীয়	রুশ্মিণী, সুন্দরী	কুটিল	-	বিমলেরবেশধারীব্যক্তি	যৌনতা ও সম্পদ আত্মসাৎ
চতুর্থ	মোহিনী	বিষ্ণু	-	উভয়	যৌনতা
অষ্টম	সুভগা	জনৈক বণিক	-	নারী	”
নবম	রাণী	অন্য পুরুষ	-	নারী	”
দশম	শৃঙ্গারবতী, সুভগা	সুভগার উপপতি	শৃঙ্গারবতী	উভয়েই (নারী)	”
একাদশ	রম্ভিকা	পথিক ব্রাহ্মণ	-	নারী	”
দ্বাদশ	শোভিকা	উপপতি	-	নারী	”
ত্রয়োদশ	রাজিকা	উপপতি	-	নারী	”
চতুর্দশ	ধনশ্রী	অন্য পুরুষ	সখীরা	নারী	”
পঞ্চদশ	শ্রিয়া দেবী	সুবুদ্ধি	-	নারী	”
ষোড়শ	মুঞ্চিকা	উপপতি	-	নারী	”
উনবিংশ	স্বচ্ছন্দা	অন্য পুরুষ (বণিক)	-	নারী	”
বিংশ	কেলিকা	ব্রাহ্মণ পুরুষ	প্রতিবেশিনী দূতী	নারী	”
একবিংশ	মন্দোদরী+স্বামী	জনৈক রাজপুত্র	দংষ্ট্রাকরালী (কুড়িনী)	নারী	”
দ্বাবিংশ	মাটুকা	উপপতি (সুরপাল)	-	নারী	”
চতুর্বিংশ	সজ্জনী	দেবক	-	নারী	”
ষড়বিংশ	রত্নাদেবী	দেবসাখ্য, ধবল (পিতা পুত্র)	-	নারী	”
সপ্তবিংশ	মোহিনী	কুমুখ	-	”	”

অষ্টবিংশ	দেবিকারানী	প্রভাকর	-	”	”
একোনত্রিংশ	সুন্দরী	মোহন	-	”	”
দ্বাত্রিংশ	রাজিনী	উপপতি	-	”	”
ত্রয়ত্রিংশ	রম্বিকা	বহুভ,তৃকা(উপপতি)	-	”	”
চতুস্ত্রিংশ	জনৈক বালিকা	শম্ভু ব্রাহ্মণ	-	পুরুষ	দ্রব্যের লোভপ্রদর্শন
পঞ্চত্রিংশ	অন্যের স্ত্রী	শম্বক বণিক	-	”	”
সপ্তত্রিংশ	সুভগা	পূর্ণপাল(চাষি)	-	নারী	যৌনতা
অষ্টত্রিংশ	জনৈক বণিকস্ত্রী	প্রিয়ম্বদ ব্রাহ্মণ	-	পুরুষ	দ্রব্যের লোভপ্রদর্শন
ত্রিপঞ্চাশত	দেবিকা	উপপতি	-	নারী	যৌনতা
সপ্তপঞ্চাশত	রানী চন্দ্রলেখা	রাজপন্ডিত শুভঙ্কর	-	নারী	”
অষ্টপঞ্চাশত	দুঃশীলা	ঈশ্বর(গণপতি)	-	নারী	”
একোনষষ্ঠিতম	রুগ্মিণী	উপপতি	-	নারী	”
একষষ্ঠিতম	তেজুকা	অন্য পুরুষ	-	নারী	”
দ্বিষষ্ঠিতম	শোভিকা,তেজিকা	অন্য পুরুষ	ক্ষৌরকার	নারী(উভয়)	”
চতুঃষষ্ঠিতম	মণ্ডুকা	উপপতি	-	নারী	”
অষ্টষষ্ঠিতম	বণিকপত্নী	কেশব ব্রাহ্মণ	-	পুরুষ	যৌনস্পর্শ
একোনসপ্ততি	বেজিকা	উপপতি	-	নারী	যৌনতা

খুব সংক্ষিপ্ত এই তালিকাটি থেকে আমরা একটি পরিষ্কার চিত্র পাচ্ছি, যে চিত্রটি আমাদের সামনে *শুকসপ্ততি*তে বর্ণিত সমাজকে তুলে ধরেছে। এই সমাজ প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামের কৃষক-কুম্ভকার-চর্মকার-কর্মকার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মানুষদের কথা লেখা হয়েছে এখানে। রয়েছে বণিকসম্প্রদায়ের কথা আবার কিছু গল্পে রাজা এবং রাজপরিবারের উল্লেখও রয়েছে। সংখ্যার হিসেবে সেগুলি অনেক কম। সামাজিক পরিকাঠামোর একেবারে উচ্চস্তরে বাসকারী রাজা এবং সমাজের নীচেরতলায় বাসকারী সাধারণ বৃত্তিধারী মানুষের মধ্যে মূল পার্থক্য কিন্তু অর্থনৈতিক এবং সেই কারণেই তাঁদের সামাজিক অবস্থানেও স্বাভাবিক পার্থক্য তৈরী হয়েছে। অথচ শুকের বলা গল্পগুলি কোথাও গিয়ে যেন এই দূরত্ব দূর করে দিয়েছে। সেখানে রাজা এবং নিম্নবিত্ত মানুষের এক পঙতিতে

অবস্থান করেন যদিও এই সহাবস্থানের কারণটি একেবারেই সুখকর নয়। উভয়ক্ষেত্রেই তাঁদের বিবাহিতা স্ত্রীরা তাঁদের প্রতারণা করেছেন।

তালিকাভুক্ত সাঁইত্রিশটি গল্পের মধ্যে ত্রিশটি গল্পের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নারীচরিত্রগুলি প্রথম কোনো পুরুষকে আকারে ইঙ্গিতে আহ্বান করেছেন। পুরুষটি সেই ইঙ্গিতে সাড়া দেওয়ায় তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ছয়টি গল্পে পুরুষ মিলনেচ্ছু হয়ে সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী হয়েছে। আর একটি মাত্র কাহিনীতে নারীপুরুষ উভয়ে উভয়কে কামনা করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উপপতির কথা রয়েছে কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচেনা বা সদ্য আলাপ হওয়া কোনো পুরুষের সাথে অবলীলায় যৌনতায় লিপ্ত হয়েছেন তাঁরা। এই বিষয়ে বিশেষ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁদের মধ্যে দেখা যায়না। ন্যায়-অন্যায়ের নৈতিক মূল্যবোধ তাঁদের কাছে একেবারেই গুরুত্বহীন। ক্ষণিকের দৈহিক সুখবিধান তাঁদের কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। কাক্ষিত পুরুষটির সাথে মিলনের জন্য গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। আবার যৌনতাড়নায় স্থান-কাল বিচার না করেই বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা মিলিত হয়েছেন অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তবে তার আদত লক্ষ্য ছিল বুদ্ধির প্রয়োগে বিপদমুক্তি। সেই বিষয়েও এঁরা সফল। হয়তো পরে আর কোনোদিন সেই পুরুষটির সাথে কোনোভাবেই দেখা হবেনা তবু তাঁর সাথেই মুহূর্তের জন্য কামসম্বন্ধে জড়িয়েছেন। স্বল্প আলাপে যাঁর সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছেন তাঁকে মুক্ত করার জন্য, নিজের কলঙ্কমোচনের জন্য কতো অনায়াসে এই রমণীরা মিথ্যার সাহায্য নিয়েছেন দেখলে বিস্ময় জাগে। শান্তভাবে, স্থির মস্তিষ্কে সব দিক বিচার-বিবেচনা করে তাঁরা বুদ্ধির প্রয়োগ করেছেন। যেখানে বুদ্ধি প্রয়োগে কার্যসিদ্ধি হয়নি তখন সরল-সাদাসিধে স্বামী কাল্পনিক কথা বলে উপায় বের করেছেন কিন্তু ধরা পড়েননি। এঁদের এমনই কুহকমায়া যে পরিজনেরা বারংবার সাবধান করে দিলেও তাঁদের স্বামীরা তাঁদের বিশ্বাস করেছেন। কয়েকটি গল্পে দেখা গেছে পুরুষটি কোনো দ্রব্যের(শাড়ি,আংটি ইত্যাদি)দেওয়ার কথা বলে এবং সেই প্রলোভনে প্রলুদ্ধ হয়ে নারীটি তাঁর সাথে দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। যদিও কূটবুদ্ধির প্রয়োগ করে শারীরিক সুখভোগের পরে প্রদত্ত উপহারটি পুনরায় নিজের আয়ত্তাধীন করে নেয় সেই পুরুষটি। শরীরের কাছে রূপ-গুণ-জাতিবিচার অথবা সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান কোনোটিই বিচার্য হয়ে

ওঠেনি। কয়েকটি গল্পে দেখা যায় নীতিকথার প্রয়োগ করে পুরুষ বা নারীটি মিলনে আগ্রহী নয় তা জানালেও অপরদিক থেকে সেগুলি পূর্ণমাত্রায় অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত মনোকামনা চরিতার্থ করেছেন।

এবার আমাদের অধ্যায়ের শিরোনামের প্রসঙ্গে আসা যাক- আমরা এই অধ্যায়ে গণিকাদের একটু অন্য প্রেক্ষিতে বিচার করতে চেয়েছি। মাতা-বধূ এবং কন্যারূপে তাঁদের চারিত্রিক বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী হয়েছি। এই সংকলনে গণিকাদের কাহিনী বিশেষ নেই। যেটুকু আছে তা নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রধানভাবে যে সকল নারীদের কথা আছে তাঁরা মূলতঃ গৃহবধূ। মাতা বা কন্যারূপের কথা না থাকলেও বধূরূপের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁরা বধূর চিরাচরিত কল্যাণময়ী মূর্তির প্রতীক নন। এমন বহু উদাহরণ আছে যেখানে স্ত্রী স্বামীকে অভুক্ত রেখে অন্য পুরুষের সাথে রতিক্রিয়ায় রত অর্থাৎ নিজের কর্তব্য, দায়িত্ব কোনোটিই যথাযথভাবে পালন করেননা তারা। সুতরাং তাঁরা ‘বধূ’ আখ্যায়ও যোগ্য নন। শুধুমাত্র নিজের ক্ষণিক সুখভোগটুকুই তাঁদের কাছে এক এবং একমাত্র সত্য। অন্যান্য জাগতিক যা কিছু শুভাশুভ বোধ সব তুচ্ছ করেছেন তাঁরা।

উপরের তালিকাভুক্ত নয় এমন কয়েকটি গল্প আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুলি কিছুটা ব্যতিক্রম আর সেকারণেই এগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। চল্লিশতম গল্পে সুবুদ্ধি এবং দুর্বুদ্ধির (পাঠান্তরে কুবুদ্ধি)কাহিনী অনুযায়ী, দুর্বুদ্ধির আসল উদ্দেশ্য ছিল ছলে-বলে-কৌশলে সুবুদ্ধির স্ত্রীকে আত্মসাৎ করা। সুবুদ্ধির অনুপস্থিতির সুযোগে সে বেশ কয়েকবার সেইমত সুযোগও খুঁজলেও বিফলমনোরথ হয়। তাই সুবুদ্ধির প্রস্তাবে রাজি হয়ে ছলনার আশ্রয় নিয়ে বাজি জিতে গেলেও যেহেতু সুবুদ্ধি তার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন তাই তিনি নিজের স্ত্রীকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে নিশ্চিন্তে ছিলেন। সুবুদ্ধির কৌশলের কাছে দুর্বুদ্ধি পরাস্ত হয়। এই গল্পটি উল্লেখের কারণ স্বামী প্রবাসে থাকলে তার বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কর্তব্য তাঁকে রক্ষা করা, বিপদে-আপদে সহায়তা করা কিন্তু এখানে বিপরীত পরিস্থিতি। সুবুদ্ধির স্ত্রী নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারলেও সবার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। আর এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন আজকের যুগেও হয়নি।

এরপরের কাহিনীটি অন্যরকম। শুকসপ্ততির বাহ্যিকতম গল্পটি এই সংকলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্প। রাজপুত্র-ব্রাহ্মণপুত্র-ছুতোর এবং বণিক এই চারজন বহু তপস্যা ও কৃচ্ছসাধনের পরে সমুদ্রদেবতাকে তুষ্ট করে চারটি বহুমূল্য রত্ন লাভ করেন কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে বণিক সবকটি রত্নই নিজের শরীরের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। বহু বিবাদ-বিসম্বাদের পরে তাঁরা ঐরাবতী নগরীর বিখ্যাত মন্ত্রী বুদ্ধিসারকে অনুরোধ করেন যোগ্য বিচার করতে। বুদ্ধিসার চিন্তাকুল হয়ে পড়লে তাঁর সুযোগ্যা কন্যা জয়শ্রী জানান তিনি এর সমাধানে সক্ষম। সুন্দরী, যুবতী জয়শ্রী প্রথমে রাজপুত্রের ঘরে তাঁর রতিপ্রার্থিনী রূপে উপস্থিত হলেন কিন্তু আর্থিক অসুবিধাজনিত কারণে নিজের অপারগতা জানালে বুদ্ধিমতী জয়শ্রী বুঝতে পারলেন তাঁর কাছে রত্নগুলি নেই। এই একই পদ্ধতি তিনি ব্রাহ্মণ, ছুতোর এবং বণিকের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করলেন। সকলের মধ্যে একমাত্র বণিক জয়শ্রীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে তার হাতে চারটি রত্ন দিলো। জয়শ্রী নিজের সম্ভ্রম রক্ষাহেতু রত্নগুলি নিয়ে কোনোমতে নিজের পিতার হাতে দিয়ে দেন। মন্ত্রী বুদ্ধিসারও আগের শর্তানুযায়ী কোনোরকম শাস্তি বিধান না করে তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে রত্ন ফিরিয়ে দেন।

এই কাহিনীতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করবো সেটি হল একজন সুন্দরী, যুবতী উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নিজের দেহকে, নিজের রূপ-সৌন্দর্যকে ‘টোপ’ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যদিও কারো সাথে তাঁর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি তবু একজন বিদুষী মন্ত্রীকন্যার এরকম পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা সফল করার জন্য যে পরিমাণে ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর।

গণিকারা তাঁদের দেহকে পণ্য হিসেবেই ব্যবহার করতেন বিনিময়ে রতিপ্রার্থীদের থেকে অর্থলাভ ছিল তাঁদের জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায়। সেই দেহকে যতভাবে সম্ভব সজ্জিত করে উপস্থাপিত করা ছিল তাঁদের পেশার অন্যতম শর্ত। ঠিক সেই একইভাবে যেন মন্ত্রীকন্যা সমস্যার সমাধানে শুধু নিজের বুদ্ধির উপরে ভরসা না রেখে নিজের শারীরিক সৌন্দর্যকে ব্যবহার করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন পুরুষমাত্রই নারীদেহ ভোগেছু তাই পুরুষের সেই স্বাভাবিক সাধারণ প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিলেন। শরীরকে এইভাবে অস্ত্র হিসেবে তুলে ধরার কারণে

এই জয়শ্রী চরিত্রটি ভীষণভাবে ব্যতিক্রমী। অবাক লাগার সাথে খারাপ লাগে এটা ভাবতে যে, একজন বিদুষী, বুদ্ধিমতী মেয়েকে শেষ পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের দেহকেই ব্যবহার করতে হচ্ছে। এ সত্য বড় পীড়াদায়ক।

পরবর্তী গল্পটি শুকসপ্ততির অন্তিম গল্প। এই গল্পটি শুক মদনবিনোদের গৃহে প্রত্যাগমনের পরে বলেছিল আর তাঁর এই গল্পটি একেবারে অন্তিমে পরিবেশনের একটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রভাবতী যে দুষ্কর এবং অনৈতিক কাজে আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন নিজের কিছু তথাকথিত ‘বান্ধবী’দের প্ররোচনায় সেখান থেকে শুক তাঁকে বিরত রাখতে পারেন। তিনি প্রভাবতীকে পদস্থলনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত প্রভাবতী বিদেশ প্রত্যাগত স্বামীকে সব সত্য কথা বলেন। বিমূঢ় মদনবিনোদ শুকের কাছে সত্যাসত্য জানতে চাইলে করুণাবশতঃ শুক জানায় একাকীত্বের কারণে প্রভাবতী ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শুক অন্তিম গল্পটি বলেছে, মলয় নামক পর্বতে মদনমঞ্জরী নামে অসামান্য রূপ-লাবন্যময়ী এক গন্ধর্বকন্যা বাস করতেন। একদা দেবর্ষি নারদ সেই কন্যাকে দেখে কামমোহিত হয়ে পড়েন কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হয়েই তিনি নিজের চিত্তবিকারের জন্য মদনমঞ্জরীকে অভিশাপ দেন যে তাঁরও চরিত্রনাশ হবে।

মদনমঞ্জরীর স্বামী কনকপ্রভের অনুপস্থিতির সুযোগে এক বিদ্যাধর তাঁকে ভোগ করতে চাইলেন কিন্তু মদনমঞ্জরী অসম্মত হওয়ায় সেই বিদ্যাধর কনকপ্রভের রূপধারণ করে এসে তাঁর সাথে যৌনতায় লিপ্ত হন। প্রকৃত ঘটনা জানার পরে তাঁর স্বামী তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলে দেবী চণ্ডিকা কনকপ্রভকে নারদের অভিশাপ-বৃত্তান্ত বিশদে জানালেন। ফলে নিজের স্ত্রীকে নির্দোষ বুঝতে পেরে কনকপ্রভ সসম্মানে স্ত্রীর সাথে সংসার করতে থাকেন।

আমাদের আলোচনায় এই কাহিনীটির উল্লেখ করার কারণ দুটি- প্রথমতঃ একজন নারী, তিনি রূপবতী, অনিন্দ্যসুন্দরী, যৌবনবতী হওয়া যেন অপরাধ। দেবর্ষি নারদ নিজের কামনা-বাসনা, নিজের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সংযত করতে পারেননা কিন্তু নিজের এহেন পদস্থলনে তিনি নিজের কোনো দোষ তো দেখেননা উপরন্তু একটি মেয়েকে অনায়াসে দোষী সাব্যস্ত করেন। শুধু তাইই নয় এর সঙ্গে জারি করেন চরিত্রদোষে দুষ্ট হয়ে কালিমালিপ্ত হওয়ার ফরমান। বড় আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় এই ধরনের

বিচারে। দ্বিতীয়তঃ মদনমঞ্জরীর পতি কনকপ্রভ প্রকৃত সত্য না জেনে, পূর্বাপর ঘটনাক্রম অবগত না হয়ে প্রথমেই স্ত্রীর শাস্তিবিধান করেছেন তাও হত্যার মত শাস্তি।

এই গল্পটির উল্লেখ না করলে শুকসম্পত্তির আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। প্রথম থেকে শেষ অবধি গল্পগুলিতে শুক যেধরনের নারীচরিত্র এঁকেছে অন্তিম গল্পটি একেবারেই আলাদা। এর মাধ্যমে যেন শুক শেষে এটাই বোঝাতে চেয়েছে, অনেকাংশে বিপরীতধর্মী হলেও নারী মাত্রেই দুশ্চরিত্রা, কূলটা অথবা সংসারত্যাগকারিনি নয়। তাই অন্তিমে শুভকারী একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছে সে।

একেবারে প্রথম গল্পে মদনবিনোদ পেশায় বণিক ছিলেন। পৈতৃক পেশায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন তিনি এবং পেশার প্রয়োজনেই তাঁকে বছরের বেশ কিছুটা সময় প্রবাসে অতিবাহিত করতে হয়। স্বামীসঙ্গ বঞ্চিত প্রভাবতীকে তাঁর দুর্বল চিত্তের সুযোগ নিয়ে তাঁর তথাকথিত বান্ধবীরা তাঁকে নিষিদ্ধ পথের সন্ধান দিয়েছে। পরপুরুষের সাথে সম্পর্ককে মান্যতা দিয়েছে। আসলে এখানে মানবমনের একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর দিক আলোচিত হয়েছে। স্বামী যতদূর প্রবাসেই থাকুন না কেন স্ত্রীটিকে কিন্তু একনিষ্ঠ হয়ে থাকতে হবে, পতিব্রতার ভূমিকা পালন করতে হবে। একজন নারীর স্বাভাবিক যে দৈহিক কামনা; দীর্ঘদিন স্বামীসঙ্গে বঞ্চিত হয়ে নারীটির সেই কামনা তীব্র হয়ে ওঠে। আত্মিক শুদ্ধতা এবং সমাজ কল্যাণের জন্য ইন্দ্রিয়সংযমের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই সংযম নারীপুরুষ উভয়ক্ষেত্রেই পালনীয়। পুরুষের জন্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী তুলনায় কিছুটা হলেও শিথিল কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত কড়া। এই গল্পগুলি পড়তে পড়তে কখনো কখনো মনে হয়ে তবে কি এতো শাসন-নিয়ম-বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে থাকতে থাকতে এই নারীচরিত্রগুলি স্বেচ্ছাচারিতাকে নিজেদের প্রতিবাদের মাধ্যম রূপে বেছে নিয়েছিলেন? যদি তাই হয়েও থাকে তাহলে বলতে হবে সমাজের তথাকথিত বেঁধে দেওয়া নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর এটি সঠিক পন্থা নয়, কখনোই হতে পারেনা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য শুক গল্পছলে বলে গেলেও আসলে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রভাবতীকে তাঁর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে রক্ষা করা। আরও গভীর বিচারে শুকসম্পত্তির প্রতিটি গল্পের শেষে নীতিবাক্য থাকলেও সেই নীতিবাক্যটির প্রভাবে কিন্তু প্রভাবতী নিজের পরপুরুষের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে

অবদমিত করে রাখেননি। তাঁর অন্যপুরুষের আসঙ্গ কামনা এতোটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তাঁর অভিসারে গমনের ঠিক পূর্বমুহূর্তেই শুককে প্রতিদিন নিত্যনতুন গল্পের ঝাঁপি খুলে বসতে হতো। এখানেই তার চাতুরী। গল্প শোনার আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে বুদ্ধিমান শুক প্রভাবতী এবং তাঁর সখিদের সাক্ষ্য অভিসারের পরিকল্পনাকে রদ করতে সক্ষম হতো।

শুক প্রথমে প্রভাবতীর অভিসারের ইচ্ছাকে সমর্থন করেও তার ঠিক পরমুহূর্তেই এমন একটি চরিত্রের কথা উল্লেখ করে যে কিনা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র নিজের স্থির মস্তিষ্ক এবং উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে সেই পরিস্থিতিতে নিজের আয়ত্তাধীন করতে সক্ষম হয়েছে। গল্পের শেষে শুকের প্রশ্নের উত্তরে প্রভাবতী নিরন্তর থাকতেন কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে, কাহিনীতে বর্ণিত নারীটির মত শীতল মস্তিষ্ক এবং ক্ষুরধার বুদ্ধি কোনোটাই তাঁর নেই। তবে আগেও আমরা যেমন বলেছি হয়তো তাঁর মনের মধ্যে কর্তব্য-অকর্তব্য, ন্যায়-নীতির বোধ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি তাই তিনি ততটাও দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারেননি। শুধু তাইই নয়; প্রতিদিন অভিসারে যাওয়ার আগে তিনি শুককে জানিয়ে যেতেন। এইখানে একটি আশ্চর্যজনক বিষয় রয়েছে যা আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে, শুক একেবারে শেষোক্ত অর্থাৎ সত্তরতম গল্পটি মদনবিনোদ ও প্রভাবতী দুজনের সামনে বলেছে এবং তার সেই গল্পটি বলার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু পূর্ববর্তী যে ঊনসত্তরটি গল্প শুক বলেছে সেগুলি কিন্তু প্রতিদিন একটি করে এই হিসাবে। প্রভুপত্নী অথবা বন্ধুপত্নী যেভাবেই ভাবি না কেন শুক কিন্তু আসলে তাঁকে পদস্বলন থেকে, চরিত্রহননের কালিমা লেপনের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। তাই তার এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণ বোঝা যায়। যতদিন না মদনবিনোদ প্রত্যাবর্তন করছেন ততদিন প্রভাবতীকে রক্ষা করা তার কর্তব্য। কিন্তু পাশাপাশি যে দিকটি লক্ষ্য করতে হবে তা হল, যদি প্রভাবতীর অন্তর সম্পূর্ণরূপেই কলুষপূর্ণ হতো অথবা তাঁর মানসিকতা জটিল হতো তাহলে কয়েকটি রাত্রি নিষ্ফল হওয়ার পরে তিনি খুব সহজেই শুকের অভিপ্রায় বুঝতে পারতেন এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা নিতেন। কিন্তু একটির পর একটি এইভাবে টানা ঊনসত্তরটি রাত্রি তিনি শুকের গল্প শুনেছেন এবং তাও সমান আগ্রহের সাথে। আগ্রহী পাঠক হিসেবে বেশ কিছু গল্পের বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনাগত একঘেয়েমি আমাদের নজরে এসেছে অথচ অদ্ভুতভাবে প্রভাবতী

কিন্তু একইরকম আশ্রয়ের সাথে প্রতিদিন গল্পগুলি শুনেছেন। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় গুরুসগুতির গল্পগুলিতে প্রভাবতী অথবা তাঁর সখীরা নিজে থেকে কোনোরকম কৌতূহল পোষণ করেননি এমনকি কোনোরকম প্রশ্নও করেননি। এই বিষয়টি যথেষ্ট বিস্ময়োদ্বেককারী। নারীচরিত্রের অন্যতম স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হল কৌতূহল প্রদর্শন কিন্তু এইখানে কেউই সামান্যতম প্রতিপ্রশ্নও তোলেননি। একটি গল্পের ক্ষেত্রেও শুকের সাথে তর্কে বা মতানৈক্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। আরও অদ্ভুত লাগে যখন দেখি শুকের বলা অধিকাংশ গল্পের রমণীরা দুশ্চরিত্রা, কুটিলস্বভাব তখনও কিন্তু স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে প্রভাবতী বা তাঁর সঙ্গিনীদের এই বিষয়েও একবারও প্রতিবাদ করতে দেখা যায়না।

উপরে যে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে সেই তালিকাটি একনজরে দেখলেই বোঝা যাবে অধিকাংশ গল্পের ক্ষেত্রেই প্রথমে নারীচরিত্রটি পুরুষটিকে আহ্বান করেছেন, ইঙ্গিত করেছেন যৌনসম্পর্ক স্থাপনের জন্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের একজন নির্দিষ্ট উপপতির উল্লেখ রয়েছে আর অন্যান্য গল্পগুলিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো পুরুষের সাথে ক্ষণিকের পরিচয়ে সরাসরি শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েন। গুরুসগুতিতে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় হল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, অচেনা একজন পুরুষের সাথে আচম্বিতে এইধরনের সম্পর্ক স্থাপন। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিহেতু ক্ষণিকের শারীরিক সুখ এতখানি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে যে তাতে দিকবিদিক বোধশূন্য হয়ে একের পর এক রমণীরা তাঁদের দীর্ঘলালিত সংস্কারকে এক নিমেষে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এক ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন যাবতীয় সমাজ নির্দিষ্ট নিয়ম। এখানেই প্রশ্ন জাগে কেন? ঠিক কী কারণে তাঁরা এরকমভাবে স্রোতের বিপরীতে হেঁটেছেন? ‘কুলটা’, ‘পুংচলী’, ‘লম্পটা’, ‘দুশ্চারিণী’- ইত্যাদি নানাবিধ অবমাননাসূচক শব্দমালা দিয়েই কাহিনীকার তাঁদের সন্মোহন করেছেন। প্রতিটি গল্পের শুরুতেই এক অদ্ভুত নৈর্ব্যক্তিক ঔদাসীন্যে শুক জানিয়ে দেয় গল্পের নায়িকার চরিত্রদোষ রয়েছে এবং সেইকারণে তাঁর যথেষ্ট বদনামও রয়েছে। পাঠক মনে মনে প্রস্তুত হয়ে থাকেন কাহিনীর পরিচিত গতানুগতিক গতিপ্রকৃতি বিষয়ে এবং সেই কাহিনীর বিশেষ পরিবর্তন হয়না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুরুসগুতির প্রতিটি গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধিমত্তা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের বুদ্ধির সাহায্যে কীভাবে নিজের আয়ত্তে আনা যায় তার অজস্র উদাহরণ রয়েছে

এই সংকলনে। কিন্তু সেই বুদ্ধির সূক্ষ্মতা কিংবা তার প্রয়োগের দক্ষতা বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এই গল্পগুলি থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় নির্যাসটুকু সংগ্রহ করে নেব। যে সমস্ত নারীদের কথা এখানে রয়েছে তাঁরা ভিন্ন-ভিন্ন আর্থসামাজিক অবস্থানে বাস করেন। মূলতঃ তাঁদের স্বামীরা অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা নানা কায়িক পরিশ্রমের কাজের সাথে যুক্ত। সারাদিনের উদয়াস্ত পরিশ্রমের পরে তাঁদের পক্ষে স্ত্রীদের কার্যকলাপ যথাযথভাবে জানা সম্ভবপর হতোনা। এর পাশাপাশি যে বিষয়টি আলাদা করে উল্লেখের দাবী রাখে সেটি হল, যেভাবে স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীদের প্রতারিত করেছেন, যতোটা সহজে তাঁদের বুদ্ধির মারপ্যাঁচে পরাজিত করেছেন তাতে মাঝেমাঝে মনে হয় সত্যিই কি কোনো মানুষের পক্ষে এতখানি বুদ্ধিহীন হওয়া সম্ভব? ঠিক কতোখানি সরল বলে তবে এতো সহজে দৃষ্টপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রতারক স্ত্রীদের বিশ্বাস করেছেন? যেন গুণসম্পত্তির রচয়িতা মেয়েদের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্নের সামনে তুলে দিয়েছিলেন, গল্পগুলি পড়তে পড়তে একথা মনে হতে বাধ্য তাহলে কি নারীমাঝেই প্রবঞ্চক? আমরা গণিকাদের নিয়ে গবেষণা করছি তাই তাঁদের সম্বন্ধে যেসকল তথ্য সংস্কৃত প্রাচীন শাস্ত্রে আমরা পেয়েছি তাতে বোঝা যায় এই পেশাটির সঙ্গে ‘লোকঠকানো’ ভীষণভাবে জড়িয়ে রয়েছে কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরের গৃহবধূ? তাঁরা যখন সামান্য জিনিসের লোভে অথবা নিছক ইন্দ্রিয়ের বশে মিথ্যাচার করেন, নিজের স্বামীর সাথে প্রতিমুহূর্তে ছলনা করেন তখন যেন মনে হয় বেশ্যালায়ে শিক্ষিত বেশ্যা আর কুলবধূ - দুজনের মধ্যে আদতেও কোনো পার্থক্য আছে কি? এইধরনের ব্যভিচারের কাহিনী সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যমান; কেবলমাত্র পেশাগত কারণের জন্য গণিকাদের ছলনাময়ী বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো কতোখানি যুক্তিযুক্ত সে প্রশ্ন রয়েই যায়।

অন্ত্যটীকা ও তথ্যসূচি

১। বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজকৃতঃ সাহিত্যদর্পণম্*, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ.১৭:

‘বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্’।

২। *তদেব*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ.২৯৮।

৩। *তদেব*, পৃপৃ.৩২৪-৩২৫।

৪। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, অধ্যায়৩৫, পৃ.২৩৩।

৫। *তত্রৈব*।

৬। M.R.Kale, *The Mṛichchhakaṭika of Śūdraka*, p.8.

৭। *Ibid.* p. 52.

৮। ত্রিদিবনাথ রায়, বাৎস্যায়ন, *কামসূত্র*, পৃ.১৮৮।

৯। M.R.Kale, *op.cit.* p.26.

১০। *Ibid*, p.46.

১১। *Ibid*, p.26.

১২। *সটীকানুবাদ অমরকোষ বা অমরার্থ চন্দ্রিকা* (সম্পা. শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি-ভট্টাচার্য),
পৃ.৭৪:

নাট্যবর্ণঃ - (৩৮৯) নাট্যোক্তৌ গণিকাংজ্জুকা - গণিকা বেশ্যা অজ্জুকা।

১৩। M.R.Kale, *op.cit.* p.26:

১৪। *Ibid*, p.30.

১৫। *Ibid*, p.31.

১৬। *Ibid*, p.36.

১৭। loc.cit.

১৮। loc.cit.

“তুং বাপীব লতেব নৌরব জনং বেশ্যাংসি সৰ্বং ভজ।”

১৯। *Ibid*, p38.

২০। loc.cit.

২১। M.R.Kale, *op.cit.*, p.46:

“ইয়ং রঙ্গপ্রবেশেন কলানাং চোপশিক্ষয়া।

বঞ্চনাপণ্ডিতেন স্বরনৈপুণ্যমাস্রিতা।।”

২২। *Ibid*. p. 46.

২৩। ত্রিদিবনাথ রায়, বাৎস্যায়ন, *কামসূত্র*, বৈশিকাধিকরণ. ।

২৪। M.R.Kale, *op.cit.*, p.68

২৫। *Ibid*. p.70.

২৬। R.P. Kangle, *The Kauṭilīya Arthaśāstra*. Part II, pp.159-160.

২৭। ‘প্রকাশ্যনারী’- গণিকা, বেশ্যা।

২৮। M.R.Kale, *op.cit.*, p.132.

২৯। ত্রিদিবনাথ রায়, *প্রাণ্ড*, পৃপৃ.২০৬-২০৭।

৩০। M.R.Kale, *op.cit.*, p.134.

৩১। *Ibid*. p.142.

৩২। *Ibid*. p.144.

৩৩। loc.cit.

৩৪। loc.cit.

৩৫। loc.cit.

৩৬। M.R.Kale, *op.cit.*, pp. 110-114.

৩৭। *Ibid.*, p.162:

“পরগৃহললিতাঃ পরান্নপুষ্টা পরপুরুষৈর্জনিতা পরাঙ্গনাসু।

পরধননিরতা গুণেষুবাচ্যা গজকলভা ইব বন্ধুলা ললামঃ।।”

বান্দুল/ বান্দুলি- গণিকাপুত্র।

৩৮। M.R.Kale, *op.cit.*, p.219.

৩৯। *Ibid.* p.232.

৪০। *Ibid.*p.36.

৪১। *Ibid.* p.276.

৪২। *Ibid.* p.286.

৪৩। *Ibid.*p.346.

৪৪। *Ibid.*p.402.

৪৫। নিদর্শনকাব্য – কুটনীমতম্

৪৬। Vaman Shivram Apte. *The Student's English-Sanskrit Dictionary.* p.407:

‘কুটনী’, ‘কুটুনী’- A bawd, procuress.

৪৭। R.P. Kangle, *op.cit.*, p.159.

৪৮। ত্রিদিবনাথ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৮।

৪৯। ত্রিদিবনাথ রায়(অনু.), দামোদর গুপ্ত, *কুটনীমতম্*, পৃ.৫।

৫০। *তদেব*, পৃ.৬।

৫১। ত্রিদিবনাথ রায়, *কামসূত্র*, পৃ.১৯০।

৫২। ত্রিদিবনাথ রায় *কুট্টনীমতম্*, পৃ.১৬৮।

৫৩। ত্রিদিবনাথ রায়, *কামসূত্র*, পৃ. ১৮৯।

৫৪। ত্রিদিবনাথ রায় *কুট্টনীমতম্*, পৃ.৪৪০।

৫৫। *তদেব*, পৃ. ২৩২।

৫৬। *তদেব*, পৃপৃ. ৫২-৫৩।

৫৭। বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ.৮০।

৫৮। *তদেব*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ.৩২৬।

৫৯। *Chaturbhāṇī or Srngarhata: A Collection of Four Sanskrit Bhanas*, Motichandra and V.S. Agarwal (ed. and trans.), Padmaprābhṛtaka, p.126.

৬০। *Ibid.*, p.229.

৬১। *Ibid.*, p.169.

৬২। *Ibid.*, pp. 362-363.

৬৩। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, *শুকসংগতি*, পৃ.৭১।

৬৪। *তদেব*, পৃ.৭৩।

৬৫। *তত্রৈব*।

৬৬। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, *শুকসংগতি*, পৃ.১৪০।

৬৭। *তত্রৈব*।

৬৮। ত্রিদিবনাথ রায়, *কামসূত্র*, ‘নিকাসনক্রম প্রকরণ’, পৃপৃ.২১৩-২১৭।

৬৯। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, *শুকসংগতি*, পৃ. ১৪১।

৭০। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, *শুকসংগতি*, পৃ.১৮৭।

৭১। তত্রৈব।

৭২। R.P. Kangle, *op.cit.*, pp.160-161.

৭৩। *loc.cit.*

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচিত বাংলা গল্প ও উপন্যাসে গণিকা: আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থান

ভূমিকা:

এই অধ্যায়ের প্রস্তাবিত শিরোনামের প্রেক্ষিতে প্রথমেই কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করে নেওয়া আবশ্যিক। বর্তমান গবেষণার শিরোনাম হল, “সংস্কৃত শাস্ত্র ও সৃজনশীল সাহিত্যে গণিকাবৃত্তি: প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতান্তর যুগের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে তার অভিব্যক্তি ও প্রভাব (১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)।”

এই অধ্যায়টি থেকে আমরা আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় ভাগে প্রবেশ করব। এই প্রবেশপথের বেশ কয়েকটি পর্যায় রয়েছে, তাই বিষয়বস্তুর ক্রমবিস্তৃতি এবং আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র অধ্যায়টিকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করেছি-

প্রথমতঃ ১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ এই সময়সীমা নির্বাচনের কারণ।

দ্বিতীয়তঃ এই সময়সীমায় ঘটা ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের অভিঘাতে বঙ্গসাহিত্যে লক্ষণীয় পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

তৃতীয়তঃ আলোচ্য কালপর্বে রচিত সাহিত্যের (নির্বাচিত গল্প ও উপন্যাসের) একটি তালিকা।

চতুর্থতঃ সাহিত্যের ‘গণিকা’-চরিত্রগুলির আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থাননির্ণয়।

১৯৪০--১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ এই সময়সীমা নির্বাচনের কারণ:

সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা এটি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম ও তাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া নানা আনুষঙ্গিক ঘটনার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বাংলার রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল, স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাবে জনজীবনে দেখা দিয়েছিল অবশ্যম্ভাবী কিছু বদল। ঔপনিবেশিক ভারত থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরের ভারত- এই পরিবর্তনের সময়টি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। শুধু ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত গ্রন্থেই নয়, স্বাধীনতান্তর সময়ে সারা দেশে যে ভঙ্গুর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা ধরা রয়েছে সেইসময়ের বিভিন্ন গ্রন্থে। শুধু সেইসময়েরই নয়, পরবর্তী যুগের, এমনকি বর্তমানকালের অনেক গ্রন্থেই ‘অগ্নিগর্ভ’ সেই যুগের কথা উঠে আসছে, বহু আলোচনা আর গবেষণা চলছে, চলছে ফেলে আসা যুগের যাপনচিত্র পুনর্নির্মাণের প্রয়াস। কারণ ইতিহাস মানে কেবল সাল-তারিখ সম্বলিত অতীত ঘটনাবলি নয়, সেই ইতিহাস বর্তমানের প্রস্তুতির সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারিগর- আর তাই ইতিহাসকে বারবার ফিরে দেখতে হয়। আলোচ্য সময়পর্বের ব্যাপ্তি দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর, যে সময়টিকে আমরা এককথায় ‘আন্দোলনের কাল’ বলতে পারি। ১৯৪০-৭৫ - এই মধ্যবর্তী সময়সীমায় সংঘটিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫ খ্রী.), পরাধীনতার কবল থেকে উদ্ধার পেতে ভারতে হয়েছে বহু আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’ দিয়ে তার সূত্রপাত, ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি। অবশ্য এই সমাপ্তির হাত ধরেই শুরু হয়েছিল এক অন্য অধ্যায়। দেশভাগ এবং সেই লজ্জাকর ঘটনার পরম্পরায় ঘটে যাওয়া বেশ কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা বা দুর্ঘটনা। দেশভাগ- যা এদেশের মানুষদের সুদূরতম দুঃস্বপ্নেও ছিল না, তার ক্ষত নিরাময়ের আগেই রাজনীতির কুটিল আবর্তে পড়ে পশ্চিমপাকিস্তান ও পূর্বপাকিস্তানের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ হয়। প্রথমবার দেশভাগ করা হয়েছিল সুনিপুণভাবে ধর্মের নিরিখে, ধর্মের আড়াল নিয়ে। আর এইবার সেই বিভাজন হল মূলতঃ ভাষার নিরিখে, জীবনযাত্রার নিরিখে। ’৭১ এর সেই যুদ্ধ ‘মুক্তিযুদ্ধ’ নামেই পরিচিত। ঝর্ণা বসু তাঁর *ভাগফল ৭১ মেয়েদের কথা*^২ বইটিতে এমন ষোলজন মহিলার কথা তুলে ধরেছেন, যাঁরা নিজেদের

জীবনের মর্মস্তুদ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দুঃসহ সেই স্মৃতি যার অতি সামান্য অংশ লেখা রয়েছে ইতিহাসের পাতায় আর সেই বৃত্তান্ত মানবতার ইতিহাসের এক কালিমালিঙ্গ অধ্যায়।

ইতিহাস রচনা প্রথমতঃ তথ্যনির্ভর। কিন্তু ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে তথ্য ব্যাখ্যা ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে কিছু গরমিল লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ তথ্য সব সময় হাতে পান না যার ফলে তাঁকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়, যদিও সেই কল্পনা কখনোই যুক্তি ও সাক্ষ্যপ্রমাণের পরিপন্থী হতে পারে না। পক্ষান্তরে সাহিত্যের প্রয়োজন প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ রসসৃষ্টি। তাতে আখ্যানের অবলম্বন হিসেবে তথ্যের অপেক্ষা অবশ্যই থাকে, কিন্তু তা কেবলমাত্র তথ্যের বিন্যাস ও বিশ্লেষণে আবদ্ধ নয়। স্রষ্টার কল্পনা আর বাস্তবের নিপুণ বুননে রচিত হয় সাহিত্য। ইতিহাসকে আশ্রয় করে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তার ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবে সত্য। সাহিত্যিকের মানসলোকের সত্যের সঙ্গে ঐতিহাসিকের কেজো সত্যের এক অলৌকিক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যার ফলে উৎসারিত হয় লোকোত্তর আহ্লাদজনক শব্দার্থরাশি। রচনার প্রকৃতি অনুসারে কল্পনার আর তথ্যের অনুপাত নিয়ন্ত্রিত হয়।

যে সময়খন্ডকে আমরা নির্বাচন করেছি তার প্রভাব সারা দেশের মতই বাংলাতেও প্রবলভাবে পড়েছিল; হয়তো বা কিছু বেশিই পড়েছিল। সমকালীন বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার ছবি ধরা পড়েছে বাংলা সাহিত্যের অজস্র খ্যাত-অখ্যাত নন্দিত-বিনিন্দিত গ্রন্থের দর্পণে যাদের প্রতিটি বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, শৈলী, দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতায় স্বতন্ত্র।

যে কোনো যুদ্ধ, তা আভ্যন্তরীণ কিংবা বহির্দেশীয় আক্রমণ যাই হয়ে থাকুক না কেন, সেই আদিম যুগ থেকে সব ক্ষেত্রেই তাতে একটি সাধারণ বিষয় হল জাতি-ধর্ম-দল-মত-ভাষা নির্বিশেষে নারী, শিশু এবং বয়স্কদের উপর আক্রমণ অর্থাৎ দুর্বলতর যারা, তারাই শক্তিপ্রদর্শনের লক্ষ্য। বৃদ্ধ ও শিশুর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে পরিণতি মৃত্যু আর নারীর মৃত্যুর অধিক, শারীরিক-মানসিক ধ্বংস যার পরে নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অস্তিত্ব বিপন্নতম হয়ে পড়ে। যে কোনো বয়সের নারীর সত্ত্বাই যেন দেহসর্বস্ব। বলা ভাল ‘নারীদেহ’-ই সবচেয়ে পছন্দের শিকার। ধ্বংসের ক্ষেত্রে জাত-ধর্ম-বয়স-রূপ-গায়ের রং তথাকথিত সুন্দর-অসুন্দরের কোনো মাপকাঠিই বিবেচ্য হয়ে ওঠে না। বিজয়ী পুরুষ আর

বিজিত নারীর মধ্যে এক ভোগদখলের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের সবথেকে উপযোগী, প্রকৃষ্ট স্থান হল শত্রুপক্ষের নারীদের উপর আক্রমণ, তাদের বন্দী করা, ধর্ষণ, আবার কখনো বা নামমাত্র বিবাহে জোর করে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করে সন্তান উৎপাদনে বাধ্য করা যাতে বিজয়ীর দলবৃদ্ধি হয় আর কে না জানে দলবৃদ্ধি মানেই ক্ষমতাবৃদ্ধি^৩। বৌদ্ধিক না হলেও কায়িক তো অবশ্যই।

রাজনৈতিক কারণে যুদ্ধ এবং রাজায়-রাজায় যুদ্ধের ফলে যাদের প্রাণনাশ হয় তারা মরে বাঁচে। কিন্তু যাদের উপর যৌন হেনস্থা হয়, তারা যেন ‘জীবন্ত লাশ’। দেহে-মনে যে গভীর থেকে গভীরতর ক্ষত সৃষ্টি হয় তার উপশম নেই। বিজিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলেই ‘নারী’ যৌনাকাঙ্ক্ষা মেটানোর, ক্ষমতাপ্রদর্শনের ক্ষেত্র। শারীরিক শক্তির স্বল্পতার কারণেই যেন তাদের উপর অত্যাচার অনিবার্য।

সমাজ-সংসার তাদের নিরুপায়তার কথা জানে। আত্মহত্যা বা মৃত্যুর পথ বেছে নেওয়া হয়তো বা যায়, অনেকে তাও করে। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে সেটুকু উপায়ও থাকেনা আর মৃত্যুকে বেছে নেওয়ার মতো মানসিক জোরও সবার থাকেনা। আবার কোথাও হয়তো কারোর মনে এটুকু ক্ষীণ আশা থেকে যায় যে, এই অত্যাচারের, লজ্জার দায় তার নিজের নয়; সমাজ-সংসার হয়তো তাকে ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই তার আশা বিফল হয়। কারণ আজও ‘সতী’, ‘সাপ্থরী’, ‘কুমারী’ ইত্যাদি বিশেষণেই নারীর নিজস্ব পরিচয় আটকে আছে। ফলতঃ বাধ্য হয়ে জীবন অতিবাহিত করার জন্য এই সব নারীকে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। যুদ্ধবন্দীর দশা থেকে মুক্তির পরে অনেকে নিতান্তই নিরুপায় এই পেশায় এসেছে, কারণ শারীরিক নিগ্রহের পরে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসা যায়নি। আবার এমন অনেক নারীর কথা জানা যায় যারা বংশপরম্পরায় এই পেশায় যুক্ত আর এই পেশার নিগড় ভেঙে সমাজে সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা শূন্য। এমন অনেক মেয়েও রয়েছে যাদের পরিবার নানাকারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাতে একরকম বাধ্য হয়েই মেয়েটিকে এই উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে।

১৯৪০ থেকে ১৯৭৫ এই সময়পর্বটিকে নির্দিষ্ট করে বেছে নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কালের নিরন্তর বহমানতার কারণে ১৯৪০-এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং ১৯৭৫-এর অব্যবহিত পরবর্তী কালখণ্ডে অনুপ্রবেশ স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান আলোচনায় হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এই সময়সীমার ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের অভিঘাতে বঙ্গসাহিত্যে লক্ষণীয় পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা:

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ সম্ভার যে কোনো সৃজনশীল সংস্কৃতির কাছেই ঈর্ষণীয়। আলোচ্য সময়পর্বে রচিত অজস্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিশ্ব-দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উজ্জ্বল উপস্থিতির কারণ হয়েছে। প্রতিটি কালখণ্ডকে প্রায় নিখুঁত করে ঐকেছেন লেখকেরা। যেকোনো বিপ্লব, বিদ্রোহ অথবা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনেই বাংলা প্রভাবিত, আন্দোলিত, উদ্বেলিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়াও লেখনী এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে সমাজে বদল আনার ক্ষেত্রে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ থেকে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতান্তর বিধ্বস্ত সময়কে বইয়ের পাতায় তুলে ধরেছেন অনেক স্বনামধন্য সাহিত্যিক। দেশভাগের অনভিপ্রের প্রসব হিসেবে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন মানুষের জীবনে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তার বিভীষিকাময় জীবন্ত দলিল সেই সময়ের যে লেখাগুলি, তার মধ্যে থেকে কয়েকটি আমরা নির্বাচন করেছি। সেই নির্বাচনের অন্যতম নির্ধারক হল আখ্যানবস্তু, উপস্থাপনা ও কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রসমূহের সুস্পষ্ট বিভিন্নতামূলক বৈচিত্র্য।

তৃতীয়তঃ আলোচ্য কালপর্বে রচিত সাহিত্যের (নির্বাচিত গল্প ও উপন্যাসের) একটি তালিকা:

লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার বিশ্বস্ত দর্পণ তাঁর রচনা। লেখককে যে তাঁর বর্ণনীয় বিষয়ের সমসাময়িক হতেই হবে তা নয়। তিনি যে কোনো সময়ের বিষয়, যা ঘটমান বর্তমান ছাড়াও অতীত, অনতি-অতীত, বা কল্পনানির্ভর ভবিষ্যৎও হতে পারে, তা নিয়েও সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারেন।

আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য-উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম এবং উপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ঐ সময়কে ফিরে দেখার জন্য, তার যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য আমাদের মূলতঃ নির্ভর করতে হচ্ছে সাহিত্যের উপর। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সুবিশাল বাংলা

সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে আমাদের গবেষণা কাজের জন্য গ্রন্থ-নির্বাচনের নিয়ন্ত্রক কী? এর উত্তরে বলা যেতে পারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অবধান রেখেই এই নির্বাচন সম্পাদিত হয়েছে-

(১) ১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের সময়সীমা।

(২) ঐ সময়ে রচিত উপন্যাস ও ছোটগল্প।

(৩) ঐ সময়ে রচিত গণিকা-কেন্দ্রিক বা গণিকা-চরিত্র-সম্বিত উপন্যাস ও ছোটগল্প।

(৪) উত্তরকালের লেখকদের সেই সব গণিকা-কেন্দ্রিক বা গণিকা-চরিত্র-সম্বিত উপন্যাস ও ছোটগল্প যেগুলি ঐ সময়ের পটভূমিতে রচিত।

এই নির্বাচনের মধ্যে প্রধানতঃ উপন্যাস ছাড়াও রয়েছে একটি আত্মকথন এবং দুটি গল্প-সংকলন। এই তিন ধরনের সাহিত্যকৃতি বেছে নেওয়ার একটি কারণ হল এদের রচনাপ্রকৃতিগত বিভিন্নতা। সাহিত্যের সত্যের সঙ্গে বাস্তবের মিল কতোটা তা বোঝার জন্য সমসময়ের সমজীবীর আত্মচরিতমূলক রচনার আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন। সংকলন গ্রন্থদুটির মধ্যে প্রথমটি একটি বিশেষ সময়ের নিরিখে বেশ্যাবৃত্তির অবস্থা নির্ণয়ের জন্য আর দ্বিতীয়টি বারবনিতাদের বিবিধ বৈচিত্র্যের উপর আলোকপাতের কারণে নির্বাচিত।

ভূমিকা অংশটিতে স্বল্পপরিসরে নারীর গণিকাবৃত্তি অবলম্বনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ নির্দেশের চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে নির্বাচিত সাহিত্যকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা গভীরতর অনুসন্ধানের দিকে এগিয়ে যাবো, যা আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে।

নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা নিম্নে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই তালিকাটিতে গ্রন্থগুলির পরিচয়চুম্বক দেওয়া হল।

গ্রন্থনাম	লেখক/ সম্পাদক	প্রকারভেদ	প্রথম প্রকাশকাল
কেরী সাহেবের মুঙ্গী	প্রমথনাথ বিশী	উপন্যাস	১৩৫৬বঙ্গাব্দ(ইং-১৯৫৮ খ্রি।)
সাহেব বিবি গোলাম	বিমল মিত্র	ঐ	১৩৮৪(আশ্বিন)বঙ্গাব্দ,ইং- ১৯৭৭(পেপারব্যাক)
নিশিপদ্ম	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	-
কবি	ঐ	ঐ	-
উত্তর-ফাল্গুনী	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	ঐ	১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ইং-১৯৫৯ খ্রি
জন-অরণ্য	শংকর	ঐ	১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, ইং-১৯৭৬ খ্রি
দৌলতী	মহাশ্বেতা দেবী	ঐ	১৩৭২ বঙ্গাব্দ, ইং-১৯৬৫ খ্রি
শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত	মানদা দেবী	আত্মকথন	১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ (ইংরাজি অনুবাদ ২০২১ খ্রি)
বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ	লেখক বিবিধ (সম্পা.মৌ ভট্টাচার্য)	সংকলন গ্রন্থ	২০১১ খ্রি
বারবনিতাদের গল্প	লেখক বিবিধ(সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ)	ঐ	১৩৭০ বঙ্গাব্দ, ইং-১৯৬৩ খ্রি

উপরের তালিকাটিতে আমাদের নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি উপন্যাস, একটি আত্মকথন এবং গল্পসংকলন আছে। এই নির্বাচনের মানদণ্ড আগেই বলা হয়েছে। সেই বিচারে উপরিউক্ত গ্রন্থগুলিকে প্রতিনিধিমূলক বলে ধরে নিয়ে এদের মাধ্যমে বর্তমান অধ্যায়ে প্রতিশ্রুত অভিব্যক্তি প্রদর্শনের প্রয়াস করা হবে। এখানে বিনীত নিবেদন যে, গবেষণাপত্রের অতিবিস্তার এড়াতে এই গ্রন্থগুলির পরিসরে সীমিত থাকার অর্থ কিন্তু আলোচনা-চক্রের পরিধির বাইরে থাকা অনুরূপ বিষয়াশ্রয়ী সাহিত্যকৃতিকে অবহেলা করা নয় বা মূল্যহীন

প্রতিপাদন করা নয়। প্রতিটি গ্রন্থই স্বমহিমায় ভাস্বর এবং তথ্যসম্পদে ভরপুর। প্রয়োজনে এই তালিকার অতিরিক্ত গ্রন্থকেও বিশেষ বা ব্যতিক্রমী তথ্যের কারণে অবশ্যই চর্চার আওতায় নিয়ে আসা আবশ্যিক হবে।

রচনার কালপর্ব দেখে খুব সহজেই অনুমান করা যায় ১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই গ্রন্থগুলি রচনা করা হয়েছে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, রচনার সময় আর বর্ণিত বিষয়ের সময়-এই দুটিকে যে একই হতে হবে তা নয়। লেখকের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে তিনি কী লিখতে চাইছেন বা কোন সময়টিকে তুলে ধরতে চাইছেন সেই ব্যাপারে। এক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছা বা স্বাচ্ছন্দ্যই প্রাধান্য পায়।

যে যে উপন্যাস, গল্পসমূহ বেছে নেওয়া হয়েছে তার সবগুলিই যে কাল্পনিক বা বাস্তবজগতের সাথে সম্পর্কহীন তা একেবারেই নয়। পৃথিবীর অন্যতম, আদিমতম জীবিকা বলেই বোধহয় খুব স্বাভাবিকভাবেই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই পেশার পরিচিতি, আর অবশ্যই প্রয়োজনীয় অথচ গোপনীয় গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, কিন্তু সম্মান বা অভিনন্দন নেই। কবি, লেখক এঁরা ক্রান্তদর্শী। কিন্তু তাঁরা কখনোই রিপোর্টারজ তৈরির দৃষ্টিতে ঘটনাকে নিরীক্ষণ করেন না। মানবজীবনের বিশেষ বিশেষ সুখ-দুঃখের সাধারণীকরণেই তাঁদের সার্থকতা। সে দিক থেকে তাঁরা এক ধরনের সাপেক্ষ নিরপেক্ষতার চর্চা করেন। সত্য যত কর্কশ, দুঃখময় বা যন্ত্রণানীল হোক না কেন, সাহিত্যিকের কলমে তার মস্তনে অমৃতই ওঠে। তাই সাহিত্যিক অসহায়, আর্ত, দুঃখী, ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের কাহিনী বর্ণনার সময়ে সমাজনির্ধারিত নিয়মের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই নিজের কাহিনীর নায়িকারূপে যখন বেছে নেন বারবনিতাদের, তখন সাহিত্যের উপাদান কঠোর বাস্তব থেকে সংগ্রহ করা হলেও কবি-দৃষ্টির ঐন্দ্রজালিক মাধ্যম তাকে করে তোলে সর্বজনের অভীক্ষিত। বারবধূদের প্রতি দৃশ্যতঃ বিমুখ সমাজের মানুষেরা সেই সৃষ্টি বার বার হৃদয়ের রসনায় আশ্বাদন করতে চান।^৪ তাই সাহিত্যে তৎকালীন যুগের প্রতিচ্ছবি অন্বেষণ নিছক আখ্যানমূলক গল্প-উপন্যাসে সীমাবদ্ধ থাকলে গবেষণার পূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। সেজন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ তথ্য সংবলিত দলিলের কড়া হাতুড়িরও।

এই গ্রন্থগুলিতে গণিকাচরিত্র নানাভাবে রয়েছে। কোথাও এক আবার কোথাও একাধিক, কোথাও মুখ্য আবার কোথাও গৌণ। তাঁদের জীবন, তাঁদের যাপনের দৈনন্দিনতা, নিত্যকার সুখ-অসুখ সব উঠে এসেছে এই রচনাগুলিতে।

চতুর্থতঃ সাহিত্যের ‘গণিকা’-চরিত্রগুলির আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থাননির্ণয়।

নিজস্ব মানবিক বোধের ও ব্যক্তিগত সামাজিক-রাজনৈতিক নৈতিকতার আলোকে লেখক তাঁর নির্মিত চরিত্রগুলিকে নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই হয়তো সমাজের তথাকথিত অচ্ছৃত, অন্ত্যজ মানুষের ওপর সিদ্ধি হয় তাঁদের করুণাবারি। গৃহীত সাতটি উপন্যাস, দুটি গল্পসংকলন আর একটি আত্মকথন- এই ত্রিবিধ সাহিত্য-শৈলীর মূল বর্ণিতব্য বিষয়বস্তুর নিরিখে আমাদের গবেষণাকার্য অগ্রগতি পাবে।

প্রত্যেকটি উপন্যাস ভিন্নধর্মী। ভিন্ন-ভিন্ন কাহিনী, বহুপ্রকার ও বহুসংখ্যক চরিত্রের সন্নিবেশ, কালিক ভিন্নতাও রয়েছে। এই পর্যায়ে আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হল প্রতিটি ক্ষেত্রে উপস্থিত গণিকাচরিত্রের সর্বতোমুখ বিশ্লেষণ এবং তাঁদের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান নির্ণয়। তার জন্য আমাদের নির্বাচিত প্রতিটি সাহিত্যকীর্তির আখ্যানভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করা নেওয়া প্রয়োজন।

১) কেরী সাহেবের মুঙ্গী

প্রমথনাথ বিশী রচিত এই উপন্যাসটিতে বাংলার ইতিহাসের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়কে তুলে ধরা হয়েছে। দেশে তখন ইংরেজ শাসন শুরু হয়েছে, এদেশে এসে তারা বুঝতে পারছে যে, রাজকার্যে দেশীয় কর্মচারীর প্রয়োজন ঠিক কতোটা। আবার পাশাপাশি সেই একই সময়ে ভারতবর্ষে আসছেন খ্রিস্টান মিশনারী পাদ্রীরা যাঁদের উদ্দেশ্য খ্রিষ্টধর্মের প্রচার। আঠারো শতকের শেষ আর উনিশ শতকের শুরু অর্থাৎ বঙ্গ-নবজাগরণের সূচনালগ্নের মেলবন্ধনের সময় এটি। কাহিনীর সূত্রপাত ১৭৯৩

সালের ১১ই নভেম্বর আর সম্পূর্ণ কাহিনীর সময়সীমা নিয়ে স্বয়ং প্রমথনাথ বিশী ‘লেখকের বক্তব্য’ শিরোনামে বলেছেন- ‘১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ সালের ইতিহাস এর কাঠামো’^৫।

উইলিয়াম কেরী^৬, বাংলা ভাষার নবরূপায়ণে এই মানুষটির অবদান অনস্বীকার্য। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই দেশে এসেছিলেন তিনি, তবে ধর্মযাজকের পরিচয় ছাড়িয়ে বাংলাদেশ আর বাংলা ভাষার মায়ায় অনেক বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন। যেহেতু তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্নভাষার মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর একজন এদেশীয় মুন্সীর প্রয়োজন ছিল। শ্রী রামরাম বসু^৭ ছিলেন তাঁর সেই মুন্সী যিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেরীকে সাহায্য করেছিলেন। এই উপন্যাসটি বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ইংরেজ আমলের ইতিহাস, সেইসময়কার সমাজচিত্র খুব বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই রচনায়। বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে মসৃণভাবে মিশে আখ্যানের গতিবৃদ্ধি করেছে লেখকের কল্পনানির্ভর কয়েকটি চরিত্রও।

এটি একটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস কিনা সে বিষয়ে লেখক নিজেও সন্দেহান^৮। রামরাম বসুর জীবনের কথাই এখানে বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে। সেই প্রসঙ্গেই এসেছে টুশকি, রেশমী, নিকি বাইজী এরকম আরও বেশ কিছু নাম। কাহিনীর বিস্তারের নির্দেশ একপ্রকার অসম্ভব, কারণ তার ব্যাপ্তি বিশাল। তাই আমরা গবেষণা-কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অংশগুলিই বেছে নেব।

প্রথমেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝে নিতে হবে, এই কাহিনী থেকে আমরা অষ্টাদশ শতকের কলকাতার পতিতাবৃত্তির চিত্র পাবো ঠিকই, কিন্তু সেগুলি খণ্ডচিত্র, কারণ কাহিনীর শুরুর অংশে এই বিষয়ে সামান্য কিছু তথ্য ব্যতীত বিশদ কোনো তথ্য পাওয়া যায়না। তারপরে যে কাহিনীর শুরু তার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন কেরী, তাঁর পরিবারবর্গ, টমাস এবং রামরাম বসু ও তাঁর বন্ধু পার্বতী। তাই যে তথ্যসমূহ আমরা সমগ্র উপন্যাসটি থেকে পাবো তার অধিকাংশই রামরাম বসুর জীবন সম্পর্কিত। তবে সামগ্রিক চিত্রে বিশেষ ব্যতিক্রম হবেনা।

এই আখ্যানে বিভিন্ন ধরনের দেহবিলাসিনীদের কথা রয়েছে। বিদেশিনীদের উল্লেখ আছে, রয়েছে সাধারণী টুশকির কথা আবার সমানভাবে রয়েছে নিকি বাইজীর উল্লেখ। সেকালের ‘বাবু সম্প্রদায়’-এর বিলাসিতার অন্যতম নমুনা প্রদর্শনের পস্থা ছিল ‘রক্ষিতা’ রাখা, যাকে চলতি ভাষায় ‘মেয়েমানুষ পোষা’ও বলা হতো। ছতোম নিজস্ব ভঙ্গীতে বলছেন-

“বেশ্যাবাজীটি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোসাখের মধ্যে গণ্য, অনেক বড় মানুষ বহু কাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়ি গুলি আজও মনিমেন্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েছে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর যামন কিছু কাজ হয়নি যা দোখে সাধারণে তাঁরে করে।”^৯

তার মধ্যে পেশাদার বেশ্যাও যেমন থাকতো তেমনি আবার নিতান্ত ছাপোষা গৃহস্থ বাড়ির মেয়ে, বৌরাও থাকতো। অত্যাচারী জমিদার বা বাবু ততোধিক কোনো অত্যাচারী ইংরেজের সাথে যোগসাজশ করে জোরজুলুম করতো। আবার ইচ্ছে হলে পথচলতি রমণীকে পছন্দ হলে তাকে বাগানবাড়িতে তুলে নিয়ে আসা ছিল খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা^{১০}। আসলে নারী হল ভোগ্যপণ্য যাকে যার যখন ইচ্ছে, যেভাবে ইচ্ছে ভোগ করতে পারা যায় আর আইনপ্রণয়নকারী, নিয়মরক্ষকেরা যদি ভক্ষক হন তাহলে বলার কিছুই থাকেনা।

একেবারে সূচনাপর্বে অ্যাব্রাহামের ও রাম বসুর সরস কথোপকথন থেকে জানা যায়, জাহাজী গোরাদের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ‘সেইলরস হোম’^{১১} নামে একটি নতুন ব্যবস্থা করেছে। তাই অ্যাব্রাহামের ব্যবসা নষ্ট হচ্ছে, হাসির ছলে সে নিজের ব্যবসাটিকে ‘কাঁচা চামড়ার ব্যবসা’ বলে যার অর্থ একেবারেই স্পষ্ট, সে নারীদেহের ব্যবসায়ী। নতুন জাহাজ ঘাটে এলেই সে ডিঙ্গি নিয়ে কোনোভাবে জাহাজে চড়ে গোরা নাবিকদের নিজের ব্যবসার কথা জানায়। বলা হয় প্রতি বন্দরে নাকি নাবিকদের একটি করে ‘বৌ’ থাকে, তবে বিবাহিতা নয়। এখানে উদ্দাম নারীসংসর্গের কথা বলতে চাওয়া হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

কাহিনীর পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বেশ কয়েকবার ইংরাজ পুরুষদের নারী-বুভুক্ষার কথা রয়েছে। দীর্ঘ দিনের প্রবাসী জীবন এবং পরিবারের মানুষদের থেকে দূরত্বের ফলে তাদের মধ্যে নারীসঙ্গের তীব্র

আকৃতি দেখা যেত। স্বভাবতই মানসিক বা প্রেমমূলক সম্পর্কের থেকেও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের চাহিদা প্রধান ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেই তাড়নায় দেশীয় পতিতা মেয়েদের সাথে সম্পর্কে তারা কোনোরকম বাছবিচার করতো না। তা যেন নিতান্তই ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ।

আগেই বলা হয়েছে যে কাহিনী আবর্তিত হয়েছে রামরাম বসুকে কেন্দ্র করে, তাঁর জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল টুশকি। বর্ণনা থেকে একথা বোঝা যায় টুশকি একজন পতিতা। রাম বসু^{১২}-র রক্ষিতা নয়, তিনি সাধারণী কিন্তু গল্পে তাঁর অন্য কোনো ‘বাবু’র উল্লেখ পাওয়া যায়না যেমন, তেমন তিনি যে একান্তই রাম বসুর ‘বাঁধা মেয়েছেলে’ সে কথারও ইঙ্গিত নেই। রাম বসুর সাথে তাঁর সম্পর্ক যৌনতাসর্বস্ব নয়, তাতে স্নেহ-ভরসা ইত্যাদি পেলব অনুভূতি রয়েছে^{১৩}। সংসারে স্ত্রীর সাথে বনিবনা বা অশান্তি হলেই তিনি তাঁর কাছে চলে যেতেন একটু সাম্নিধ্য লাভের আশায়।

এছাড়াও আছে নিকি বাইজীর উল্লেখ। যদিও তাঁর বিষয়ে বিশেষ কোনো তথ্য কাহিনীতে নেই। কিন্তু *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* গ্রন্থে ‘নিকি বাইজী’র উল্লেখ পাওয়া যায়।^{১৪}

রেশমি এই উপন্যাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির মধ্যে একটি। যদিও চরিত্রটি কাল্পনিক, কিন্তু সেই যুগের প্রেক্ষিতে এইধরনের চরিত্র সৃষ্টি আলাদা কৃতিত্বের দাবী রাখে। এই একটিমাত্র চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজের নারীকেন্দ্রিক অধিকাংশ সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন। সতীদাহের চিতা থেকে পালিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পুনর্জীবনলাভ, তাকে হত্যা করার জন্য গ্রামের মাথাদের ষড়যন্ত্র আর সেই ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগসাজশে কলকাতা শহরের এক কুখ্যাত ‘জমিদার-বাবু’-র তাকে অপহরণ করে নিজের বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভোগ করার প্রয়াস-এই সবকটি ঘটনাই অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গে খুব স্বাভাবিক এবং সাধারণ ঘটনা। রেশমিকে অপহরণ করতে চাওয়ার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তাকে খুঁজে না পেলে পথচলতি যেকোনো গৃহস্থবাড়ির মেয়ে বৌকে পাইক দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে যথেষ্ট ভোগ করা এগুলি কাল্পনিক উদাহরণ নয়। সেই সময়ের সমাজের এ ধরনের ঘটনা প্রবলভাবে ছিল আর তার মদতদাতা ছিল ইংরাজ সরকার।

আর্থসামাজিক অবস্থান: ‘আপনা মাংসে হরিণা বৈরি’ – নারীর দেহই তার শত্রু। তাই জীবিকার তাগিদে বাধ্য হয়ে তাকে নিজের শরীরকে পণ্য করে তুলতে হয়। এই উপন্যাসে নানা প্রসঙ্গে এই পেশা এবং পেশাজীবীদের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য সামগ্রিকভাবে এঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নেই। একটিমাত্র এই ধরনের চরিত্রকে লেখক নিপুণভাবে চিত্রণ করেছেন- টুশকি। তাঁর পেশা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা নেই, তাই বিশদ তথ্যসংগ্রহ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে চরিত্রটি কাল্পনিক হলেও লেখক কিন্তু কেবলমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় করে তাঁকে তৈরি করেননি। টুশকির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বর্ণনানুসারে খুব উন্নত নয়। তাঁর বাড়ি এবং জীবনযাপনের যে দৈনন্দিন চিত্র পাওয়া যায় তা একথার সাক্ষ্যবহন করে। যদিও রাম বসু ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির উল্লেখ নেই যার সাথে তাঁর পেশাগত (ব্যবসায়িক) সম্পর্ক রয়েছে, এমনকি রাম বসু দিনের যেন কোনো সময়ে তাঁর কাছে আসার অধিকারী ছিলেন। এই বর্ণনা থেকে কখনো কখনো তাঁকে রাম বসুর ‘রক্ষিতা’ বলে মনে হলেও কিন্তু অচিরেই রাম বসুর আর্থিক অবস্থার বর্ণনা থেকে এ ধারণা ভ্রান্ত বলেই মনে হতে পারে। তাঁর চরিত্রের স্নেহবুভুক্ষু দিকটি উপলব্ধির জন্য রাম বসুর একটি উক্তিই যথাযথ-

“এক রাত্রির আকাজক্ষা নিয়ে যারা ওর কাছে যায়, তাদের প্রতি ওর দারুণ ঘৃণা”^{১৫}।

এ থেকে মনে হয় টুশকির কাছে অনেক লোকেরই আসা যাওয়া ছিল, কিন্তু মনের সম্পর্ক একমাত্র রাম বসুর সাথেই তাঁর ছিল। তাঁর একজন দাসী রয়েছে, কিন্তু তিনি একাই থাকতেন। সেই সময়ে একজন অতিথিকে বেশ কিছুদিন ধরে আতিথ্য দেওয়ার, আপ্যায়ন করার আর্থিক সঙ্গতিও তাঁর ছিল।

এই পেশায় আসা ভিন্ন টুশকির অন্য কোনো উপায় ছিলনা। কিশোরী বয়সে নিজের পরিবারের সঙ্গে গঙ্গাসাগরের মেলায় যাওয়ার পথে বোম্বেটেদের হাতে অপহৃত হয়, তাঁকে বিক্রি করা হয় কলকাতার কলিঙ্গাবাজারে^{১৬} এক ব্যক্তির কাছে। বর্ণনা থেকে বোঝা যায় সেই লোকটি অপহৃত কিশোরীদের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতো। উদ্দেশ্য পরিষ্কার- এই অনাথ মেয়েদের দেহব্যবসায় যুক্ত করা। মালিকানা বদল হয়ে টুশকিকে যে ব্যক্তি কিনেছিলেন তিনি তাঁর নতুন নামকরণ করেছিলেন- টুনি থেকে টুশকি। সেই ব্যক্তি বাগবাজারের বাড়িটি তাঁকে তৈরি করে দেন এবং কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকে যে চিত্রটি পাওয়া যায়, এই জীবনের শুরুতে টুশকি একজনের ‘রক্ষিতা’ বা ‘বাঁধা

মেয়েমানুষ' ছিলেন। সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক না থাকলেও তার দেওয়া বাড়ি ও অর্থ টুশকির জীবনধারণের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই বাবুটি হয়তো সাময়িক আবেগের বশবর্তী হয়ে এই কাজটি করেছিলেন, কিংবা নিছক বড়লোকি খেয়ালে, কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে টুশকিকে পরে অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

এই কাহিনীতে ক্রীতদাসপ্রথার উল্লেখ রয়েছে, নানাভাবে অপহরণ করা অথবা চুরি করে আনা বালক-বালিকাদের ইংরেজরা যে নিজের বাড়িতে কাজে নিযুক্ত করতো তার উল্লেখ আছে^{১৭}।

তাঁর সামাজিক অবস্থানের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, জনসাধারণের জন্য নির্ধারিত মদনমোহন মন্দিরে তিনি যেতেন ও আরতি দেখতেন। তাঁর পেশা এই ক্ষেত্রে কোনোরকম বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

সামাজিক অবস্থানের প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঘটনাটি এই বৃত্তি অবলম্বনকারিণীদের সম্পর্কিত নয়, কিন্তু সমাজে বিশেষ করে পুরুষের দৃষ্টিতে মেয়েদের অবস্থান বোঝার জন্য উল্লেখ্য। এই উপন্যাসের অন্যতম দুটি চরিত্র হল -জন ও রেশমী। এদেশীয় মেয়ে রেশমীকে বিবাহে ইচ্ছুক শুনে জনের বোন লিজা যখন তাঁকে 'বেশ্যা' বলে গালি দিয়েছে।^{১৮} সেই মুহূর্তে প্রতিবাদ করলেও প্রেমাস্পদা রেশমী বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় ক্রোধোন্মত্ত জন একই ভাষা প্রয়োগ করে তাঁর প্রতি^{১৯}। অর্থাৎ যে কোনো কারণে অবলীলায় একটি মেয়েকে যৌনইঙ্গিতবাহী গালাগালি দেওয়া যায় আর সেক্ষেত্রে পুরুষ নারী উভয়েই সমান। নিজে একটি মেয়ে হয়েও লিজা অনায়াসে অন্য একটি মেয়েকে এই শব্দপ্রয়োগে লাঞ্ছিত করেছে। আর দুর্বীর আবেগের বশে প্রেমিকার প্রতি সম্বোধন পরিবর্তিত হয় বেশ্যা-বিশেষণে। নারীত্বের এতো বড় লজ্জা আর দ্বিতীয় নেই। যৌন সম্বন্ধযুক্ত শব্দের ব্যবহার যে কত অনায়াসে করা যায় তার উদাহরণ এটি।

রাজনৈতিক অবস্থান:

এই কাহিনীতে রাজনীতির যে অংশটুকু রয়েছে তার সাথে টুশকির সরাসরি সংযোগ নেই। ভারতবর্ষের রাজনীতির পরিবর্তিত পটভূমিকায় বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরের আখ্যান এটি। কল্লনার সঙ্গে বাস্তবের মিশেলের জন্য যেটুকু সত্যির প্রয়োজন, তার ইঙ্গিতও রয়েছে। বিশেষ

করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনহেতু দেহপসারিনিদের ‘উপহার’ রূপে কর্তাব্যক্তিদের কাছে তুলে দেওয়া অত্যন্ত পুরানো প্রথা। ইংরাজ আমলে কলকাতা শহরে বেশ কিছু ‘বাবু’^{২০} সম্প্রদায়ের মানুষের বাস ছিল, যাদের সামাজিক প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতার আশ্ফালন ছিল মূলতঃ ইংরেজদের দয়ার দান। আদতে এরা ছিল প্রভু ইংরেজদের হাতের পুতুল। বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে নানাধরনের রাজনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য এদেশীয় ‘বাবু’দের বহু অন্যায়-অত্যাচারে ইংরেজরা ইক্ষন দিত। ফলে সেই সময় সমাজে নারীসুরক্ষার ব্যবস্থা যে নারীদের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না তা বলাই বাহুল্য। তবে বর্তমান যুগেও এই পরিস্থিতির পরিবর্তন বিশেষ হয়নি বলা যায়। কারণটা এক্ষেত্রে যতটা না রাজনৈতিক, তার চেয়ে অনেক বেশি অভ্যাসগত। আজ নারীদের পক্ষে সুরক্ষামূলক অনেক আইন-কানুন হয়েছে, অনেক সুযোগ-সুবিধা, অধিকার নির্ভীক নারীরা লড়াই করে আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে নিপীড়ন শেষ হয়নি, তার অন্যতম কারণ আধুনিক পৃথিবীতেও পুরুষের তো বটেই, সমাজের সাধারণ নারীর নিজের অভ্যাসেও সম্ভবতঃ তার অস্তিত্ব ও মূল্য পুরুষসাপেক্ষ। সে নিরাপত্তার লোভে পণ্য হতেও দ্বিধা করে না বা প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। পুরুষতন্ত্রের আপাত-সুরক্ষার খাঁচায় সে নিজেকে নির্বিঘ্ন ভাবে ভালোবাসে। রাজনীতি হয়তো এই অভ্যাসের ব্যবহার করে, ফায়দা তোলে।

সাংস্কৃতিক অবস্থান:

সাংস্কৃতিক জগতের সাথে এই উপন্যাসের বিশেষ কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পাওয়া যায়না। কিছু টুকরো টুকরো তথ্য পাওয়া যায় মাত্র। টুশকির গানের প্রতি ভালোবাসা শিশুবয়স থেকেই^{২১} কীর্তন, নামগান ইত্যাদির প্রতি তার সহজাত আকর্ষণ ছিল। তবে তার পেশার সঙ্গে সঙ্গীত-নৃত্যাদি যোগের কোনোরকম উল্লেখ পাওয়া যায়না।

অন্যদিকে নিকি বাইজীর কথা রয়েছে, যার জীবনযাত্রার সঙ্গে সংগীতাদির সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ‘বাইজি’^{২২} বলতে মুসলমান, নৃত্যগীত পারঙ্গমা বেশ্যাদের বোঝানো হত।

২) সাহেব বিবি গোলাম

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বিমল মিত্রের *সাহেব বিবি গোলাম* আমাদের নির্বাচিত অন্যতম উপন্যাস। এই উপন্যাসটি এমন এক ঐতিহাসিক সময়ের পটভূমিকায় লিখিত যে সময়টি ভারতবর্ষের তথা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাহিনীর সময়সীমা ১৭৫৭ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ ঠিক এর আগেই ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী তাঁদের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করেছিল। ইংরেজ শাসক এবং শাসিত ভারতীয় জনগোষ্ঠী এই দুইয়ের মধ্যে শাসক ও শোষিতের সম্পর্ক ছাড়াও ছিল কর্তা ও কর্মচারীর সম্পর্ক আর তার ফলে সমাজে তৈরী হয়েছিল একধরনের ‘কেরানী’ সম্প্রদায়। আমাদের আলোচনায় আগেও ‘বাবু’ কালচারের প্রসঙ্গ এসেছে, যে বাবু-কালচার অনেকটাই ইংরাজী শাসকের নেতিবাচক প্রভাবের ফলাফল। হুতোমের নকশায় এই ‘বাবু’দের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়^{২৭}। যদিও ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে লেখা তবু সত্যের কশাঘাত নিষ্ঠুর হয় বইকি ! *সাহেব বিবি গোলাম* উপন্যাসটি মূলতঃ সেই বাবুকালচারেরই প্রতিবিম্ব। আমাদের নির্বাচিত গ্রন্থতালিকার প্রথম উপন্যাসটি হল *কেরী সাহেবের মুঙ্গী*। এই উপন্যাসে বিশদে রয়েছে ইংরাজ শাসকদের কথা, ইংরাজসরকারের মদতপুষ্ট জমিদারদের কথা। বাবুসম্প্রদায়ের সম্পর্কে খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় সেইসম্পর্কিত বিশদ তথ্যসংগ্রহ সম্ভব নয়। আমাদের নির্বাচিত তালিকার পরবর্তী উপন্যাসটি হল *সাহেব বিবি গোলাম*; যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু তৎকালীন কলকাতা এবং কলকাতার বাবু-সম্প্রদায়। বঙ্কিমের ব্যঙ্গে-

“যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মুনিব সাহেবের গলাধাক্কা খান তিনিই বাবু।”^{২৮}

সাহেব বিবি গোলাম সুবিশাল উপন্যাস। অসংখ্য চরিত্রের ভিড় সেখানে। লেখক চরিত্রগুলিকে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে অনায়াস যাতায়াতে বাধ্য করেছেন। সেই কারণেই সময়রেখার সূক্ষ্ম হিসাব করতে পাঠকের অনেক সময় ভুলে হয়ে যায়। সময় এই উপন্যাসের অন্যতম কারিগর। এই উপন্যাসের অন্যতম মূল পুরুষচরিত্র যেমন ভূতনাথ ঠিক তেমনি কেন্দ্রীয়চরিত্র কিন্তু খোদ কলকাতা শহরও। এই বিশাল আয়তনের উপন্যাসের মধ্যে অসংখ্য চরিত্রের উপস্থিতি থাকলেও স্বাভাবিকভাবেই সকলে

সমান গুরুত্বপূর্ণ নন। আমরা আমাদের গবেষণার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় এবং সেই সম্বন্ধিত চরিত্রগুলিকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

উপন্যাসটির অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে গণিকাবৃত্তি। কলকাতা শহরে বসবাসকারী, ধনাঢ্য এক পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন লেখক। যে পরিবারের আয়ের উৎস তাঁদের পারিবারিক জমিদারি। বিগত বেশ কয়েকটি প্রজন্মের মাত্রাতিরিক্ত ভোগবিলাসের কারণে বর্তমানে যাঁদের আর্থিক অবস্থা সঙ্গিন কিন্তু বাড়ির বর্তমান প্রজন্মের পুরুষেরা সে সম্পর্কে একেবারেই ওয়াকিবহাল নন। আসলে এটাই ‘বাবুয়ানি’ যে তাঁরা নিজেদের আয়ের উৎস বা গতিপ্রকৃতি জানতে একেবারেই ইচ্ছুক নন, শুধু তাইই নয় এসব তুচ্ছ টাকাপয়সার হিসেব তাঁদের জন্য নয়। জীবনকে তাঁরা ভোগের চড়া তারে বেঁধে রেখেছেন। বউবাজার স্ট্রীট ও সেন্ট্রাল এভিনিউ – এই দুটি রাস্তার সংযোগকারী বনমালী সরকার লেনে অবস্থিত, এককালে ‘বড়বাড়ি’ নামে পরিচিত বাড়িটি ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নোটিশে ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে^{২৫}। দায়িত্বে রয়েছেন ওভারসীয়ার শ্রীমান ভূতনাথ চক্রবর্তী। ঘটনাচক্রে চাকরির সন্ধানে নদীয়া থেকে কলকাতায় এসে তিনি এইবাড়িতেই আশ্রিত হয়ে জীবনের বেশ কিছু দিন কাটিয়েছিলেন। বড়বাড়ির মালিক ছিলেন চৌধুরীবাবুরা- বৈদূর্যমণি, হিরণ্যমণি, কৌস্তভমণি ও বৈদূর্যমণির পুত্র চূড়ামণি চৌধুরী। সেযুগের কলকাতায় তাঁদের বোলবোলাও রীতিমত ঈর্ষনীয় ছিল। গণিকাদের যে বিশেষ শ্রেণীটির(রক্ষিতা)কথা আমরা এই উপন্যাসে পেয়েছি তার অধিকাংশই এই পরিবারকেন্দ্রিক। তাঁরা ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর পতিতা, বাইজিদের উল্লেখ রয়েছে এই উপন্যাসে কিন্তু সেগুলি রয়েছে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে। লেখক তাঁর বর্ণনায় অতীত-বর্তমান এই কালদুটিকে একে অন্যের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন। চৌধুরীবংশের কাহিনীর সাথে সমান্তরালে বয়ে চলেছে গ্রামীণ পরিবেশ থেকে আসা নিতান্ত সাধারণ ভূতনাথ চক্রবর্তীর ভাগ্যবিড়ম্বনা ও ভাগ্যপরিবর্তনের কাহিনী। আশ্রিত হয়েও কিন্তু বড়বাড়ির মানুষজন সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছিলেন তিনি। ভূতনাথের চোখ দিয়ে আমরা বড়বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করি।

তৎকালীন বাবুদের বিলাসিতার অন্যতম নিদর্শন হল ‘রক্ষিতা’ রাখা, সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। তবে একাধিক হওয়াটাই একরকম দস্তুর ছিল কারণ তা থেকে সেই বাবুর আর্থিক ক্ষমতা,

ব্যয় করার মানসিকতা, বিলাসী মনোভাব বোঝা যেত। শুধু নিজের বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি একমুখী না থাকাই নয় বাইরের জগতেও তাঁরা কোনো একজন বিশেষ বা নির্দিষ্ট রমণীর সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ হতেন না। অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা কেবলমাত্র ক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্য একাধিক রক্ষিতা বা ‘বাঁধা মেয়েমানুষ’ রাখতেন। তাঁদের সাথে তাঁদের বাবুদের প্রেমের সম্পর্ক বিশেষ থাকতো না, থাকতো মূলতঃ যৌন আকর্ষণ^{২৬}। যদিও অনেকক্ষেত্রেই সমাজের উচ্চবিত্ত পরিবারের পুরুষদের এই বহিমুখী স্বভাব তৈরি হত কিশোর বয়সেই নিজের বাবা, কাকা বা দাদাদের দেখে। এই বিষয়টি কিছুটা পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ত্বের (যার ধারক-বাহক একাধারে পুরুষ ও নারী উভয়েই) আলোয় বিচার্য। পুরুষজাতির বেশ্যাগমন নতুন নয় কিন্তু আঠারো থেকে উনিশ হয়ে বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত কলকাতাতে বিশেষ করে রক্ষিতা রাখা যেন বাবুয়ানির অন্যতম নিদর্শন হয়ে উঠেছিল^{২৭}। যিনি যত বেশি বিলাসিতা করেন তিনি তত বড় বাবু আর তাঁর মোসাহেবের সংখ্যাও তত বেশি। কাজেই এই উপন্যাসের চৌধুরীবংশের কাহিনী যে একেবারেই লেখকের কল্পনাপ্রসূত তা কিন্তু নয়। কাহিনীতে বড়বাড়ির তিনজন পুরুষের কথা রয়েছে, রয়েছে তাঁদের বিচিত্র শখ-আহ্লাদের কথা। আগে পরে ছড়িয়ে থাকা তথ্যগুলিকে একত্রিত করে বিশ্লেষণ করলে আমাদের পক্ষে স্পষ্ট চিত্র পাওয়া সম্ভব হবে, তাই আমরা আলোচনাটিকে সেই ক্রমেই সাজিয়েছি।

ভূমিপতি চৌধুরী এই পরিবারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ। তিনি নিজের স্ত্রী-সন্তান থাকা সত্ত্বেও বয়সকালে একজন ইটালিয়ান চিত্রশিল্পী সাহেবের বিদেশিনী স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে তাঁকে নিজের বাড়ির ‘চোরকুঠুরি’তে নিয়ে এসেছিলেন এমনকি তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও হয়। বিবাহ করেননি তাই এই বিদেশিনীকে তাঁর রক্ষিতাই বলা যেতে পারে।

মেজবাবুর রক্ষিতা হাসিনী, নৃত্যগীতপটীয়সী। হাসিনী ও তাঁর মা এসেছিলেন কাশী থেকে দোলের সময় গান গাইতে তখন তিনি আট কি দশ বছরের বালিকা। সেইসময়েই মেজবাবুর ভালো লাগায় কলকাতাতেই ভাড়া বাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি সঙ্গে আসবাবপত্র, চাকর, দারোয়ান-

“এখন হাসিনী মেজবাবুর সম্পত্তি”^{২৮}।

এহেন মেজবাবুর তিনজন রক্ষিতা ছিলেন, তাঁর বাবুয়ানি দেখে কলকাতার বাবু-সমাজের তাক লেগেছিল। ‘বাঁধা মেয়েমানুষ’ রাখার মত মোসাহেবের দল হল এই বাবুয়ানির অন্যতম চিহ্ন। এছাড়াও পায়রা ওড়ানো, গঙ্গায় পানসি নিয়ে বাইনাচ একের পর এক উদাহরণ। এই মেজবাবুর ছিল নিত্যনতুন শখ তার মধ্যে বাগানবাড়িতে রক্ষিতাদের নিয়ে বস্ত্রহরণ-কালীয়দমন পালা অনুষ্ঠিত হত যে পালায় তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সাজতেন। কুশীলবদের সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পালাটিতে অংশগ্রহণ করতে হত ^{২৯}। এই ঘটনা অর্থবান ব্যক্তির বিকৃত মানসিকতার উদাহরণ।

তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ মেজগিন্নীর বাবার রক্ষিতা আছে এমনকি ‘বুড়ো থুথুড়ো’ হলেও রবিবার রাতটা তিনি বাড়ির বাইরে থাকেন। নিজের বাবার রক্ষিতাকে মেজমা ‘রাঙামা’ সম্বোধন করেন। তিনি তাই নিজের স্বামীর নারীসঙ্গ, বেশ্যাসক্তি, মদ্যপান ইত্যাদি কুঅভ্যাসে নিরাসক্ত ছিলেন কারণ

“মেজমা বড় ঘরের মেয়ে ওসব গা-সওয়া”।^{৩০}

এই মেজগিন্নি বাড়ির ছোটবউকে বলেন-

“...বড়ঘরের পুরুষমানুষেরা কবে আর ঘরে কাটিয়েছে শুনি, আমার বাপের বাড়িতেও দেখেছি, এ-বাড়িতেও দেখছি।”^{৩১}

এই কাহিনীর অধিকাংশ জুড়েই রয়েছে এই পরিবারের ছোটবাবু ও ছোটগিন্নীর কথা। ছোটবাবুর একজন রক্ষিতা; চুনী তাঁর নাম। তিনি ছিলেন বড়বাড়ির দাসী রূপোর মেয়ে। ছোটবাবু বিয়ের আগেই তাঁকে পছন্দ করেছিলেন আর বিয়ের পরে জানবাজারে নতুন বাড়িতে মা-মেয়ের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স তেরো। দাসীর মেয়ে থেকে খোদ বাবুর রক্ষিতা-

‘রঙিন শাড়ি উঠল চুনীবালার গায়ে, কানে মাকড়ি। পায়ে আলতা’^{৩২}।

তিনি রক্ষিতার বাড়িতেই রাত্রিবাস করতেন। কখনো কখনো ফিরলেও মদ্যপানে অচৈতন্য জড়পদার্থের মত যার শুভাশুভ, কর্তব্যাকর্তব্য বোধ থাকতোনা। আয়ের উৎস নিয়ে চিন্তিত নন তিনি কিন্তু ব্যয়ের জন্য নিত্যনতুন মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। তা রক্ষিতার মর্জিমতন ‘হাওয়া-গাড়ি’ কেনাই হোক অথবা যথেষ্ট মদ্যপান।

বড়বাড়ির পুরুষমানুষেরা জন্মের আগে থেকে মদ খেতে শেখে, মানুষ হয় ঝি-চাকরের কোলে, আটদশ বছর বয়সের পর অন্দরমহলে ঢোকা বন্ধ তাদের, বয়েসকালে রক্ষিতা রাখে, পাল্লা দিয়ে বাবুগিরি করে, মোসাহেব পোষে।”^{৩৩} লেখক নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন-

“...ঘরের বউরা তা পারবে না, বড়বাড়ির কোন বউ পারেনি আজ পর্যন্ত, শুধু বড়বাড়ি কেন, দত্তবাড়ি, মল্লিকবাড়ি, শীলবাড়ি, শেঠাবাদের বাড়ির কোন বউ চেষ্টাও করেনি, পারেওনি। ওতে অনেক ল্যাঠা, সে পারে ওরা- ওই বাগানবাড়ির মেয়েমানুষেরা-ওরা কায়দা-কানুন জানে।”^{৩৪}

চুড়ামণি চৌধুরী ওরফে ছুটুকবাবু এই বংশের শেষ ব্যক্তিত্ব যিনি ‘বাবু’ তকমা পেয়েছিলেন। তিনি বিধবা বড় বউঠাকরুণের একমাত্র পুত্র। তাঁর সঙ্গীতচর্চার প্রতি আকর্ষণ ছিল, বিশেষতঃ ধ্রুপদী সঙ্গীত। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের নেশার বস্তুর প্রতিও তাঁর দুর্বলতা ছিল। তাঁর কোনো রক্ষিতা-র উল্লেখ উপন্যাসে না থাকলেও তাঁর অনিয়ন্ত্রিত যৌনসংসর্গের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর এককালের ইয়ারবন্ধিরা-

“তা বাড়ির ঝি-টি কাউকে আর বাদ দেয়নি।”^{৩৫}

আর অনিয়ন্ত্রিত যৌনসংসর্গের ফল যৌনরোগ। এছাড়াও সঙ্গদোষে মতিয়া নামী বাঈজীর বাড়িতে রাতকাটানোর উল্লেখও পাই। তবে চৌধুরীবংশের আর্থিক অবস্থা যখন একান্তই নিম্নগামী তখন তাঁর বিয়ে হয়। শ্বশুরের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনায় ভালো হওয়ার কারণে এবং পরিবর্তিত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তিনি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সঞ্চিত অর্থে বাবুগিরি তো দূর অস্ত দিনাতিপাত করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। তিনি ওকালতি পাশ করার চেষ্টা করতে থাকেন। বংশকৌলীন্য, গৌরব-গরিমা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে একেবারেই সাধারণ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

আলোচনা:

কাহিনীক্রম খুব সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে এবং সেখান থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে উঠে এসেছে-

প্রথমতঃ এই উপন্যাসে গণিকা ও তাঁদের বৃত্তির প্রসঙ্গ যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে মূলতঃ একটি বিশেষ বিভাগের কথা বলা হয়েছে এবং সেটি হল ‘রক্ষিতা’^{৩৬}। দেহবৃত্তির সাথে জড়িত অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির উল্লেখ এখানে খুব কম।

দ্বিতীয়তঃ এই কাহিনীটি যেহেতু একটি বিশেষ পরিবার ও সেই পরিবারের ব্যক্তিবর্গকেন্দ্রিক তাই এক্ষেত্রে আমরা বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে আমাদের গবেষণার অভিমুখ রেখেছি।

তৃতীয়তঃ একই অনুশঙ্গে বলা যায়, রক্ষিতা ব্যতীত অন্য শ্রেণীর দেহবিলাসিনিদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান নির্ণয় এই কাহিনীর নিরিখে সম্ভব নয়। আবার যেসব রক্ষিতাদের উল্লেখ রয়েছে কেবলমাত্র তাঁদের সম্বন্ধেই আমরা স্পষ্ট ধারণা করতে পারবো।

আর্থসামাজিক অবস্থান:

এই উপন্যাসে গণিকাদের বিশেষ একটি শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাও একটি বিশেষ পরিবারকেন্দ্রিক। রক্ষিতারা যেহেতু কোনো একজন বাবুর অধীনে থাকতেন তাই তাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও সেইসব বাবুদের উপরেই ন্যস্ত থাকতো। এই বাবুরা প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হতেন এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই তা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়ার কারণে রক্ষণাবেক্ষণের কোনো দায় তাদের থাকতো না। ফলে একাধিক রক্ষিতা রাখা তাঁদের পক্ষে সাধারণ বিষয় ছিল। রক্ষিতাদের নিজস্ব বাড়ি, দাসদাসী, কর্মচারী এমনকি গাড়িও থাকতো।

অষ্টাদশ শতকের শহর কলকাতার বাবুদের দিনলিপি এই উপন্যাসটি। বাবুদের মধ্যে একে অন্যের রক্ষিতা নিয়ে রেষারেষি ছিল খুব সাধারণ ও স্বাভাবিক কারণ সমাজে নিজের নাম, প্রতিপত্তি ইত্যাদি প্রমাণ করার তাগিদে তাঁরা এহেন কাজ করতেন আর এর প্রভাব পড়তো রক্ষিতাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর^{৩৭}। এই উপন্যাসের মেজবাবু হিরণ্যমণি ও ঠনঠনিয়ার বাসিন্দা ছেনি দত্তের মধ্যে এরকম রেষারেষির উদাহরণ পাওয়া যায়।

অনেক সময়ে হাত-বদল হওয়ার কারণে তাঁদের আর্থিক অবস্থা উন্নতি হত। আবার কখনো একই কারণে অবস্থার অবনতিও হতো। সাধারণ গণিকা ও রক্ষিতাদের মধ্যে পার্থক্য হল এই দ্বিতীয়

শ্রেণিটিকে উপার্জনের অনিশ্চয়তা ভোগ করতে হতনা। শুধু তাইই নয়; অনেকক্ষেত্রে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্যান্যদের তুলনায় সুরক্ষিত থাকতো। আমরা *কেরী সাহেবের মুঙ্গী* উপন্যাসে টুশকি চরিত্রটির প্রসঙ্গেও এর উল্লেখ পেয়েছি। যদিও বিপরীত একটি চিত্রের উল্লেখও পাই চুনীবালার সঙ্গী বৃন্দাবনের কথায়; যেখানে তাঁর বাঁধা-বাবুর অনুপস্থিতির কারণে তাঁদের নিত্যদিনের জীবনযাপন দুষ্কর হয়ে ওঠার কথা রয়েছে ^{৩৮}।

সমগ্র উপন্যাসটিতে রক্ষিতাদের যে চিত্র পাই তাতে বাবুদের জীবনে এঁদের গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি ছিল বলে মনে করা হয়; বিশেষ করে বড়বাড়ির পুরুষেরা নিজের মুখেই তা বলেছেন। কিন্তু বিবাহিতা পত্নীদের তুলনায় এঁদের স্থান সমাজে একেবারেই নিম্নস্তরীয় ছিল। স্বীকৃতি তো দূর অস্ত সামাজিক সম্মানও এঁদের প্রাপ্য হতোনা।

‘কজ্জন বাঈ’, ‘নান্নে বাঈ’ এঁদের কথা রয়েছে কারণ সেসময় কাশী-লক্ষ্মৌ থেকে ‘বাঈজী’ এনে বাইনাচ অত্যন্ত সাধারণ বিষয় ছিল। এঁদের আর্থিক অবস্থার একটি নমুনা দেওয়া যাক-

“খাসা বাঁধুনি চেহারাটার। নাকে হীরের নাকছাবি। গলায় চন্দ্রহার। ডান কাঁধে শাড়ির আঁচলটা ঝুলিয়ে দেয়।”^{৩৯}

এই উপন্যাসেই উল্লেখ আছে ‘ফুলবালাদাসী’-র। খ্রিস্টান মিশনারী পাদ্রিদের থেকে মুক্ত করে স্বধর্মে বিবাহ দেওয়ার পরেও তিনি পুনরায় বিধবা হন। তখন যুবক-সঙ্ঘ থেকে আর্থিক সাহায্য না করলে মেয়েটিকে আবার ধর্মান্তরিত হতে হত। অথচ শেষপর্যন্ত মেয়েটি আত্মহত্যা করেন কারণ তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েছিলেন। বিধবা মেয়েটি বোধহয় সমাজের রক্তচক্ষু থেকে বাঁচতেই এই পথ অবলম্বন করেন ^{৪০}।

রাজনৈতিক অবস্থান:

এই উপন্যাসে হাসিনী-চুনীবালা কিংবা কজ্জন ‘বাঈ’ এঁদের সঙ্গে রাজনীতির সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিলোনা। কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, স্বদেশি-বিদেশী রাজনীতি যে সময়সময় এঁদের জীবনযাত্রায় রীতিমত প্রভাব ফেলেছিল তার উল্লেখ উপন্যাসটি খুঁজলে চোখে পড়ে। যেমন বৃন্দাবনের কথায়-

“দেশে থাকলে আমাদের দু’বেলা পেট ভরে ভাত জোটে না, এমন আকালের দেশ, কিন্তু তবু দেশে-
গাঁয়ে সমাজ আছে, পঞ্চগয়েত আছে- এ সব জানলে ‘এক ঘরে’ করবে যে।”^{৪১}

গ্রাম্য রাজনীতি, কূটকাচালির পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। আকাল বা দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক কারণে হলেও কৃত্রিমভাবে মানুষ পরিস্থিতি আরও জটিল ও দুর্বিষহ করে তোলে।

বাড়ির দাসীদের সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে অবাস্তব গর্ভাধান হয়ে থাকে এবং সেই গর্ভস্থ ভ্রূণ পড়ে থাকে রাস্তায়^{৪২}। ভ্রূণহত্যার মত ন্যাকারজনক অপরাধের কোনো শাস্তিবিধানের উল্লেখ নেই এই কাহিনীতে বরং সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থের জোরে অপরাধ চাপা দেওয়ার, আইনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার উদাহরণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গেই বলতে হয় এই যে অবাধ যৌনতা তার কতোখানি স্বেচ্ছায় আর কতোখানি বলাৎকার সে প্রশ্নই রয়ে যায়।

সাংস্কৃতিক অবস্থান:

এই উপন্যাসে গণিকাদের বিশেষ করে রক্ষিতাদের জীবনের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক জগতে বিশদ সম্পর্ক দেখা যায়না। সামান্য নাচ, গান বা অভিনয়ের উল্লেখ থাকলেও তাতে পারদর্শিতার কোনো বিশেষ উদাহরণ নেই। অন্যদিকে বাইজি চরিত্রগুলির উল্লেখ করাই হয়েছে তাঁদের নৃত্যগীতাদি পারঙ্গমতার জন্য। আসলে এই উপন্যাসে দেহবৃত্তি অবলম্বনকারিণীদের উল্লেখ থাকলেও তাঁদের তুলনায় অনেক বেশি তথ্য তাঁদের বাবুদের সম্বন্ধে রয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই বাড়ির দাসীদের অল্পবয়সী এমনকি বালিকাকন্যাদের পরিবারের বাবুরা ‘বাঁধা মেয়েমানুষ’ এর স্থান দিয়েছিলেন। কমবয়সের জৌলুস এর অন্যতম কারণ। সামাজিক প্রতিপত্তি এইসব মেয়েমানুষ পোষার সংখ্যার উপরের নির্ভর করতো বলে অনেকক্ষেত্রেই বাবুরা একাধিক রক্ষিতা রাখতেন তাই সংখ্যাই সেখানে প্রাধান্য পেত; গুণগতমাণ নয়।

৩) নিশিপদ্ম

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটির পটভূমি ১৯৪২ সালের বাংলা। লেখক স্বয়ং উপন্যাসের শুরুতেই সেই কথা জানিয়েছেন^{৪৩}। উপন্যাসটিতে দুটি পর্যায় আছে- ‘প্রথম পর্ব’ ও ‘দ্বিতীয় পর্ব’।

মূল চরিত্রের নাম কাঞ্চনমালা। তার মৃত্যু সংবাদ দিয়েই কাহিনির সূচনা। কীর্তন-গায়িকার পরিচয়ে জীবনের শেষে পরিচিতি হলেও তাঁর প্রথম জীবনের পেশা ছিল দেহব্যবসা-খেমটাগান পরিবেশন^{৪৪}। কাঞ্চনমালার মেয়ে মুক্তামালা, মায়ের ডাকে সে মুক্তো। সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর বয়সী মা তাঁর তের-চোদ্দ বছরের মেয়েকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে নিজের জীবনকথা বলে গেছেন।

কাঞ্চনের বয়ানেই আমরা জানতে পারি সেই সময়ের কথা। আসলে লেখক মূল চরিত্রকে আশ্রয় করে সেই যুগের বর্ণনা দিয়েছেন^{৪৫}। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন দেহব্যবসায়িনী হলেও কাঞ্চনের বাস্তববোধ, জাগতিক জ্ঞান প্রখর এবং দেশ ও কালের পরিবর্তিত অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন।

কাঞ্চনের মা ব্রাহ্মণঘরের বালবিধবা ছিলেন। অদৃষ্ট বা নিজের প্রমাদ যে কোনো কারণেই হোক কলকাতার রামবাগানে^{৪৬} তাঁর স্থান হয়। রূপ থাকলেও নাচগান কিছুই তিনি জানতেন না। নিজে খেমটা নাচতেন এবং ‘দেহের কারবারের ফল হিসেবে সে এসেছিল মায়ের কোলে’। কাঞ্চন ও তাঁর বোন চম্পকমালাকে খুব অল্প বয়স থেকে ‘ব্যবসা’-তে নামিয়েছিলেন তাঁদের মা। বিভিন্ন বায়না, পালা-বিয়ে-অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আবার রাস-দোল-বুলনে ঢপকীর্তন^{৪৭} হত-

‘সন্ধ্যার আসরে একরকম গান, রাত্রি বারোটোর পর আর এক রকম গান’^{৪৮}।

কাঞ্চনের নিজের কথায় তাঁর বয়স যখন চোদ্দ-পনেরো,

‘তখন প্রথমবার যুদ্ধ লেগেছে-এই জার্মানী আর ইংলণ্ডে’^{৪৯}।

অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮ খ্রি.)। কিন্তু যুদ্ধান দুইপক্ষের লড়াই শেষ হলেই তো আদতে যুদ্ধ শেষ হয়না; তার প্রভাব রেখে যায় জীবনের প্রতিটি ধাপে। রাজনৈতিক বদলই শুধু নয়, অর্থনীতি-সামাজিক পরিকাঠামো সব কিছুর ভীষণরকম বদল ঘটে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জীবনযাত্রায় আসে পরিবর্তন, কখনো তা খুব সূক্ষ্ম আবার কখনো মানুষের বেঁচে থাকাটাই আমূলভাবে পালটে যায়। স্বাভাবিকভাবেই দেহপসারিনি-সম্প্রদায়ও তার বাইরে নয়। যাঁরা কোনো ‘বাবুর’ ‘রক্ষিতা’ পদমর্যাদাভুক্ত ছিলেন কেবল তাঁদের কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক অবস্থান ভাল ছিল, আর

বাকিদের অবস্থা ছিল নিতান্তই কষ্টকর ^{৩০}। দেহব্যবসার সাথে যুক্ত থাকা অনেক মহিলাই থিয়েটারে অভিনয়, নাচ-গান ইত্যাদি করতেন। কিন্তু কালক্রমে শিক্ষিত, ভদ্র পরিবাবের মেয়েরা আস্তে আস্তে অভিনয় জগতে এলে সেই রুজিরোজগারের পথও তাঁদের বন্ধ হয়ে যায়।

এই থিয়েটারে অভিনয় ও নাচ-গানের সুবাদে ‘লালপাহাড়ী’ কোলিয়ারির রাজা ও কুমার তাঁদের দুই বোনকেই নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ‘রক্ষিতা’ করে নিয়ে যান, অবশ্যই যতদিন না নতুন কাউকে তাদের ‘মনে ধরছে’ ততদিনই এঁদের মেয়াদ।

ঘটনাচক্রে রাজবাড়ির অতিথি এক ‘লেখাপড়া-জানা, শিক্ষিত, পণ্ডিত মানুষ, ভালঘরের ছেলে’ জাতে কায়স্থ, পেশায় উকিল এক ব্যক্তির প্রেমে অনুরক্ত হয় কাঞ্চন। প্রেমের মূলে ছিল কীর্তনগান ও শ্যাম-ভক্তি এবং উভয়ের সঙ্গীতপ্রীতি। শুধু তাই একমাত্র কারণ নয়, এই প্রথম বোধহয় কোনো পুরুষ তার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকায়নি, সে দৃষ্টি মেয়েরা বুঝতে পারে- তাঁর মতো দেহবিলাসিনীরা তো বটেই। বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অবশেষে তাঁর ‘রক্ষিতা’ পরিচয় মিটেছিল আর সেজন্য বহু মূল্য চোকাতে হয়েছে তাঁকে - কুমারের কাছে চাবুকের মার, নিজের গর্ভধারিণী মায়ের কাছ থেকে শারীরিক-মানসিক উৎপীড়ন, রাস্তায় অপরিচিত ব্যক্তিদের হাতে নিগ্রহ, সব সহ্য করেছিলেন প্রেমের জন্য। তাঁর প্রেমিকপুরুষটি তাঁকে বিবাহ করেননি কোনোদিন, সেই অর্থে স্বীকৃতিও দেননি। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কালে সেবা করার মুহূর্তে এক দুর্বল সময়ে তাঁদের শারীরিক সম্পর্ক হয়, যার ফল কাঞ্চনমালা ও ‘বোসবাবু’-র সন্তান মুক্তোমালা। মায়ের মৃত্যুর পরে মাসির বাড়িতে তার আশ্রয় হয়। স্কুলে ভরতি করা হলেও মায়ের পরিচয় প্রকাশ হওয়ার কারণে তাকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়, পরে নার্সিং শিখে একটি হাসপাতালে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। কিন্তু বিধি বাম। কিশোরী বয়সের অপমানে মুক্তো নিজের নাম রাখে ‘মুক্তি’। শুধু নিজের কাজে লজ্জাকর, অপমানকর পিতৃপরিচয়ের দুর্বিষহ স্মৃতি আর লাঞ্ছনা মুছে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই যেন সে ‘মুক্তি’ নামটি বেছেছিল মনে হয়। আসলে নতুন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছিল সে। সে নিজেকে ভয় পেয়েছে সবসময়, ভয় পেয়েছে তার জন্মদোষকে- “এ কলঙ্কই যে তার রক্তে রক্তের কলঙ্ক”। এক জুনিয়র ডাক্তারের সাথে এক অদ্ভুত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সে। প্রেম নাকি কেবলমাত্র যৌন আকর্ষণ-

বিকর্ষণের খেলা তাতেই সন্দিগ্ধ হয় তার মন, বারবার তার মনে হয় তার জন্মপরিচয়, রক্তের দোষ সব যেন তাকে ঘিরে ধরতে আসছে। দূরে সরিয়েও সে আবার সেই ডাক্তারের কাছে ফিরে আসে। থিয়েটারে অভিনয়ের কারণে নিজের মাসতুতো বোনের প্রতিও তার রীতিমত যৌন-ঈর্ষা কাজ করে। তাদের শারীরিক সম্পর্কের ফলে একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। ‘প্রেমিক’ বিবাহে অপারগতা জানিয়ে অনাথ আশ্রমের প্রস্তাব দেয়, জানায় তার বিদেশগমনের কথা। নির্বাক মুক্তি একা স্বেচ্ছায় সন্তানের জন্ম দেয়, তাকে নিজের প্রকৃত পরিচয় না দিয়ে পালন করতে থাকে। নিজের শিল্পীসত্তাকে আঁকড়ে জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকে সে। দেশজোড়া নামডাক হয় তার। নিজের সতীর্থের কাছ থেকে বিবাহ প্রস্তাব পেলে বিহ্বল হয়ে গুরু শ্রীনারায়ণকে জানায় সন্তানের কথা, তার মাতৃত্বের কথা যা সে সযতনে লুকিয়ে রেখেছিল। বিয়ে করে গৃহিণী হওয়ার যে স্বপ্ন তার বাস্তবায়িত হতে পারতো মুক্তি নিজেই সে সম্ভাবনা নষ্ট করে। গুরুকে জানায় নিজের ছেলেকে বিদেশে তার জন্মদাতার কাছে পাঠিয়ে সঙ্গীত-নৃত্যের সাধনার মধ্যে দিয়েই জীবনের সার্থকতা খুঁজে নেবে সে।

আলোচনা:

নিশিপদ্ম উপন্যাসটি সম্পূর্ণভাবেই পতিতাবৃত্তি-অবলম্বনকারিণীদের নিয়ে লিখিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কথাশিল্পী, তাঁর লেখায় চরিত্রের প্রতি মমত্ববোধ যতটা রয়েছে, ঠিক ততটাই রয়েছে সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা। কাহিনীর দুটি পর্বকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এবং অনুধাবন করলে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা সহজ হবে।

সমগ্র উপন্যাসটি জড়িয়ে রয়েছে- মা এবং সন্তানের কথা। চারটি প্রজন্ম, প্রথম দুটি ক্ষেত্রে ‘মা এবং মেয়ে’ আর অন্তিমটিতে ‘মাতা-পুত্র’। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই মাতৃত্বের আশ্রয় হল পেশায় দেহব্যবসায়ী ‘বেশ্যা’ মহিলারা। মাতৃত্বে নারীসত্তার পরম সার্থকতা। কিন্তু জীবনধারণের প্রশ্ন বোধহয় তার চেয়েও বড়ো। সেই কারণেই মা নিজের সন্তানকে এই আদিম পেশায় নিযুক্ত করে, নিজে প্রতিনিয়ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করলেও আত্মজাকে একই পথে ঠেলে দেয়।

মা জানেন তিনি যে পেশাকে বেছে নিয়েছেন, স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে, সমাজে তাঁর আর স্থান নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সন্তানেরও কোনো ঠাঁই নেই। পিতৃপরিচয় যাই হোক না কেন সামাজিক স্বীকৃতি মিলবেনা কোনোদিন। অতএব এই বৃত্তিতে তাকে যুক্ত করা যাতে জীবনধারণটুকু সম্ভব হয়। আবার কন্যাসন্তানের জন্ম ‘গণিকা’দের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক কারণ ভবিষ্যতে মেয়ের উপার্জনে সংসার প্রতিপালন হবে, বার্ষিক্যে অর্থকষ্ট পেতে হবে না।

একটি অপ্রিয় সত্য হল আজকের পৃথিবীতেও মেয়েদের শরীরকে, তাদের রূপকে তাদের একমাত্র বিনিময়যোগ্য সম্পদ বলে বিশ্বাস করা হয়। তার সাহায্যে নাকি তারা সহজেই সবকিছু জয় করে নিতে পারে- এই একবিংশ শতকেও সমাজ এই নাবালক বিশ্বাস পোষণ করে চলেছে। এখনও এই ধরনের কথা শোনা যায় অহরহ, কখনো ফিসফিস স্বরে, আবার কখনো সোচ্চারে। কখনো পুরুষকণ্ঠে উচ্চারিত হয় এই অপমান, আবার কখনো এক নারী নিজেই অন্য নারীকে কালিমালিপ্ত করেন সহজেই। তাই যখনই কোনোরকম অনন্যোপায় আর্থিক প্রয়োজন বা অন্ন-সংস্থানের পরিস্থিতি তৈরি হয়, সমাজের একটা বড় অংশ যেন মেয়েদের দেহকেই একমাত্র সহজ লগ্নিযোগ্য সম্পদ বলে ভাবে।

একথা সত্যি যে, সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই পেশায় মায়ের কাছেই মেয়ের হাতেখড়ি হয়। এই কাহিনীও তার ব্যতিক্রম নয়। তবু একটু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে যেখানে গল্পের দ্বিতীয় প্রজন্ম কাঞ্চন নিজের মেয়েকে এই পেশায় যুক্ত করতে চাননি, তাকে তুলনায় সুস্থ পরিবেশে বড় করতে চেয়েছেন-

“না-হলে এই যুবতী সুন্দরী মেয়ে মুক্তামালা মূলধন থাকতে তাঁকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হত না। তা হোক—বিনা চিকিৎসায় সে মরুক—সে মুক্তামালাকে মূলধন করে তাঁর দেহ বিক্রির টাকায় চিকিৎসা করিয়ে বাঁচতে চায় না; তাঁর থেকে এ মৃত্যু তাঁর মুক্তি। সে কি তাই পারে?” ^{৫১}

পরে মুক্তিও তার সন্তানকে নিজের পরিচয় লুকিয়ে এক অনাথ আশ্রমে রেখেছে, অভিনয় জানা সত্ত্বেও সিনেমায় অভিনয় করেনি কারণ তার ছেলে। এই উপন্যাসের প্রধান রসের আশ্রয় মাতৃত্ব, আরও সূক্ষ্মভাবে বললে ‘গণিকার মাতৃত্ব’। মাতৃরূপিণী গণিকার স্নেহময়ী রূপটি সবকিছু ছাপিয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

এরপরে ক্রমান্বয়ে কাহিনী অনুযায়ী মূল চরিত্রগুলির আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান আলোচনা করা যেতে পারে।

আর্থসামাজিক অবস্থান: ১৯১৪-১৯৪২ সালের ভারতবর্ষ কাহিনীর পটভূমি- অর্থাৎ দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং আরও নানা আন্দোলনের ফলে দেশ যখন উত্তাল হয়ে রয়েছে, সমাজের সর্বস্তরে আর্থিক ভাঙ্গন দেখা যাচ্ছে। কোনো গোষ্ঠী একেবারেই নিঃস্ব, আবার তারই মধ্যে কারো আর্থিক উন্নতি হচ্ছে। নিজেদের পেশার দুর্দিন এবং তার ফলে রোজগারের কষ্ট এইসব কিছু নিজের মত করেই অনেকটা স্মৃতিচারণার মতো করে কাঞ্চন বলেছেন স্বদেশী আন্দোলনের কথা, দেশের মানুষের জীবনে পরিবর্তন এসেছিল। শুধু পতিতারা নন; ভদ্রবাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া ও নাচগানের যৌথ উপস্থাপনার ফলে সেই জগতে ধীরে ধীরে পতিতাদের উপস্থিতি কমে আসতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদির বায়না, চর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর্থিক পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হতে থাকে।^{৭২}

এই অতীতচারণা থেকেই আমরা জানতে পারি তাঁর মায়ের কথা। তার মা বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যা, কিন্তু নিজের ভুল কিংবা ভাগ্যদোষে কলকাতার রামবাগানে তার স্থান হয়। এই রামবাগান কলকাতার দেহব্যবসার ইতিহাসে অন্যতম কুখ্যাত স্থান, সেখানেই কাঞ্চনের জন্ম। তার মা রীতি অনুযায়ী তাকে এই পেশায় নিয়োগ করে অর্থাৎ বংশানুক্রমিক এই পেশা, মায়ের থেকে মেয়েতে সংক্রামিত। সেকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সে আর তার বোন দুজনকেই খুব অল্প বা বলা যেতে পারে কিশোরী বয়স থেকেই এই পেশায় ব্যবহার করে তাদের মা। ‘খ্যামটাগান-ঢপকীর্তন-পালাগান’ এই সবের মাধ্যমে যেমন তাদের রোজগার হত, সেরকম ঐসব আসরে রাত্রে রাত্রি বারোটার পর হতো অন্যরকম গান। সেইসঙ্গে ছিল থিয়েটারে অভিনয়। একটা দীর্ঘ সময় মনে করা হতো মঞ্চের ভদ্র বাড়ির মেয়েরা অভিনয় করেননা। তাই সেই কাজের জন্য এই বিশেষ সম্প্রদায় থেকে মেয়েদের আনা হতো। আরেকটা কারণ হল, ‘ভদ্রবাড়ির মেয়েদের’ মঞ্চপযোগী নাচ-গান বা অভিনয় শেখানোতে আপত্তি ছিল, অথচ পেশার তাগিদেই কিন্তু এই মেয়েদের (পতিতাপত্নীর) ঐসব বিদ্যায় নিপুণ হতে হয়। সহজাত তাদের দক্ষতা, ফলে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা সোজা। এই থিয়েটারও তাদের জীবনধারণের অন্যতম উপায় ছিল। আর ছিল ‘রক্ষিতা’ হওয়ার সুযোগ। সেই সুযোগ যাদের হয়েছে

তাদের অর্থের চিন্তা কিছুটা হলেও কম, কারণ একটি নির্দিষ্ট অর্থ যোগানের উৎস তাদের আছে, বাসস্থান আর খাদ্যের চিন্তা অন্যান্যদের মতো গুরুতর নয়। কিন্তু সব বিষয়ের যেমন সদর্থক ও নঞর্থক দুটি দিকই থাকে সেরকমই এই ‘রক্ষিতা’ বা ‘রাখেল’ প্রথার নেতিবাচক দিকটি হল যতক্ষণ মালিক বা প্রভুর মন জুগিয়ে চলতে পারা যায় অথবা অন্য কোনো নারীর আগমন না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আপাতভাবে কোনো সমস্যা হয়না, কিন্তু পরিস্থিতি বদলালে সেই মেয়েটির জীবনধারণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

এই গল্পে খুব বিশদে একটি বিষয় লেখক তুলে ধরেছেন। এই পেশার অত্যন্ত লজ্জাকর, হীন একটি দিক আবার চূড়ান্ত বাস্তব একটি ব্যাপার- মা কীভাবে সন্তানকে তার ‘বাবু’ বা ‘খদ্দের’-এর সঙ্গে যেতে দিচ্ছে। কীভাবে রীতিমত দরদস্তুর করে, হিসেবনিকেশ করে মেয়েকে ছাড়তে রাজি হচ্ছে, তার সবটুকু পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। এই প্রসঙ্গে লেখকেরই ভাষায় বর্ণিত আমরা দেখবো যা থেকে আমরা আরও পরিষ্কার চিত্র পাবো যে ঠিক কেন এবং কীভাবে এই পেশার মেয়েরা নিজেদের আর্থিক অবস্থান পোক্ত করতে চায়-

“পাকা বাড়ি—বছরে ছ হাজার টাকা তনখা—চাকর ঠাকুর দারোয়ান—খাইখরচ—
এসব আলাদা। অগ্রিম পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে—যার নামে তারা চায় তার নামে। মায়ের নামে বলে মায়ের নামে, মেয়েদের নামে নামে বলে তাই। এ ছাড়া গয়নাগাঁটি যা দেবে—তা দেবে।..... এরপর রাজা কুমারকে খুশী করে তাঁদের মোহিনী মায়ার ফাঁদে ফেলে কলকাতায় বাড়ি করিয়ে নিতে কতদিন লাগবে! টাকাটা দশ হাজার মায়ের নামেই ব্যাঙ্কে জমা হয়েছিল।”^{৫০}

অতএব এই ব্যবসায় ‘কন্যাজন্ম’ অর্থাৎ মেয়েসন্তান হলে মা খুশি এবং ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভেবে নিশ্চিতও খানিকটা। কন্যাসন্তান এই পেশায় শুভকরী, কারণ এর মাধ্যমে জীবিকার ধারা বজায় থাকবে, অর্থের যোগান বজায় থাকবে। অবস্থাগতিকে গর্ভধারিণী মা কতটা নিষ্ঠুর, অত্যাচারী আর কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে উন্মুখ একজন ক্ষুদ্র স্বার্থাশ্বেষী মানুষে পর্যবসিত হতে পারে তাও আমরা দেখেছি। তবে খুব গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে এহেন আচরণেরও ব্যাখ্যা সম্ভব। আজকের ‘বেশ্যা’ বা ‘পতিতা’-দের যারা মা বা মাতৃস্থানীয়া তাদের অতীতস্মৃতি বা বলা ভাল অতীত

অভিজ্ঞতা-ই আজকে তাদের এতটা নিষ্ঠুর করে তুলেছে; এক দিক থেকে এই আচরণকে বাস্তবপ্রণোদিত বললেও ভুল হয়তো হবেনা। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানেন যে, যতদিন দেহ সুস্থ-সবল এবং ‘বাজারে দর’ আছে ততদিনই তাঁদের মূল্য। তাঁদের আগামী জীবনের নিরাপত্তা বর্তমানেই নিহিত, তাই যতবেশি সম্ভব অর্থসঞ্চয় করে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, ‘গণিকা’-র জীবনে প্রেম যে অনেকটাই ‘পদ্মপাতায় জল’-এর মতো সে সম্পর্কেও তাঁরা অবগত, তাই কাঞ্চনের মা সেকথাও তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে^{৫৪}।

আজ যাকে সে প্রেম বলে ভাবছে আর ভেবে নিজে তার পশার, তার ব্যবসা নষ্ট করছে সেই প্রেমের কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ প্রেম বলে যাকে সে ভাবছে তা তার মোহ, মোহ নষ্ট হয়ে গেলে তার হাতে কিছুই থাকবেনা। অবশ্য কাঞ্চনের ক্ষেত্রে সে কথা প্রযোজ্য হয়নি। প্রেমের জন্য অশেষ দুঃখ স্বীকার করেছে সে, তার প্রেমের একনিষ্ঠতা দেখে তারই প্রাক্তন বাঁধাবাবু লালপাহাড়ির কুমার তাকে বর্ধমানে বাড়ি আর মাসিক ত্রিশ টাকা মাসোহারার বন্দোবস্ত করেছিলেন। যার প্রেমে কাঞ্চনের উত্তরণ সেই ‘উকিল-বোসবাবু’ তাকে গান শেখার ব্যবস্থা করে দেন, তার কিছু কীর্তন রেকর্ড হয়েছিল যার থেকে তার আয় হতো।

সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল, কাঞ্চন কিন্তু তার সম্ভানকে তার পেশায় যুক্ত করেনি। যুক্ত করা তো দূর অস্ত, সেই সম্ভাবনার কথা কখনো সে তার ভাবনাতেও আনেনি। এমনকি রোগশয্যায় যখন সে বুঝতে পারছে যে তার মৃত্যু আসন্ন তখন মেয়েকে নিজের অতীতবৃত্তি সম্বন্ধে জানিয়েছে। তবে তার স্বীকারোক্তির মধ্যে কোনো কলঙ্ক বা পাপবোধ নেই, কেননা ঈশ্বরভক্তি, গোবিন্দপ্রেম আর প্রেমিকের স্পর্শে যেন তার মুক্তি ঘটেছে। বারবার তার মুখে আমরা সেই কথা শুনি। সেই সময়েই তার মনের ভাবে নিজের প্রেমের শক্তি, সেই সম্পর্কে তার প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ বুঝতে পারি। তবে যে গর্ব সে করেছে বা নিজের যে চারিত্রিক দৃঢ়তা সে দেখাতে পেরেছে মেয়েকে এই ঘৃণ্য পেশায় যুক্ত না করার প্রসঙ্গে, তার মাথায় ছাদ না থাকলে কিংবা কুমারের মাসোহারা বা কন্যার জন্মের পরে তার গুরু, তার প্রেমিক অর্থের সংস্থান করে না গেলে হয়তো বিষয়টা এত সহজ হত না বলেই মনে হয়।

অন্যদিকে তার বোন চাঁপাও একজন দেহপসারিনি। সেও থিয়েটারে অভিনয় করতো এবং দিদির মত একই ভাবে লালপাহাড়ীর রাজা তাকে ‘রক্ষিতা’ করে রেখেছিল, শর্ত একইরকম। তবে যখন আবার সে কলকাতায় ফিরে এসে থিয়েটারে যোগ দিলো তখন তার জীবনেও এল প্রেম। সুরেন বাড়ুজ্জে নামে এক সহশিল্পীকে বিয়ে করে, ঘর বাঁধে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হল, অন্ততঃ সেইসময়ের নিরিখে চাঁপা ও তার প্রেমিক আইনী বিবাহ করে ভদ্রপল্লীতে আর পাঁচটা সাধারণ গৃহস্থের মতো সংসার পেতেছিল। একটি কয়লার দোকান তাদের আয়ের উৎস ছিল।

সামাজিক অবস্থান: এই প্রসঙ্গে বলা যায় ‘পতিতা’ সম্প্রদায় আক্ষরিক অর্থেই পতিত। এই উপন্যাসের নায়িকার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। তাঁরা ঘৃণ্য, তাঁরা সমাজের একেবারে নিচুতলার বাসিন্দা। আবার অনেকক্ষেত্রে তো তাদের স্থান অপরাধীদেরও অধম। এদের কাছে দৈহিক সুখভোগের কারণে আসা যায় কিন্তু সে আসা রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি, দিনের আলোয় এরা অস্পৃশ্যা, ‘অবিদ্যা’ এদের পরিচয়। সমাজের কোনো তলার লোকই এঁদের পক্ষে নয়; এমনকি এঁদের সমপেশার যাঁরা তাঁদেরও নিজেদের মধ্যে একতা নেই বললেই চলে। কেউ কোনো বাবুর ‘বাঁধা মেয়েছেলে’ হলে সমাজে সেই বাবুর কিছুটা সম্মান বাড়ে, কারণ ‘মেয়েমানুষ পোষা’ সামাজিক প্রতিপত্তির অন্যতম মাপকাঠি। কাঞ্চনের জীবনে সবরকম অভিজ্ঞতাই রয়েছে, কীর্তনগান-পালাগান গাওয়া থেকে শুরু করে বাবুদের বাগানবাড়ীতে রাতের ‘মাইফেল’ আবার থিয়েটারে অভিনয়- সেই সূত্রে প্রত্যন্ত কোলিয়ারি অঞ্চলের মালিকের রক্ষিতা হওয়া। এ যেন স্রোতের মতো ভাসতে ভাসতে চলা, কোনো কূলের সন্ধান নেই। সামাজিক স্বীকৃতিও তাই বাতুলতামাত্র। সব ছেড়ে প্রেমিকের আশ্রয়ে যাওয়ার পথে অত্যাচারিতা হয় সে, কারণ তার বেশভূষা। যেহেতু সে বেশ্যা তাই সে সর্বজনভোগ্যা- তার সম্মতির প্রশ্নই ওঠেনা। বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনকারী কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে সম্মতি দেয় না সমাজ, সম্মানও নয়। তাই কাঞ্চন ভালোবেসে নিজের বৃত্তি ছাড়লেও, কৃচ্ছসাধন করলেও তার ‘গুরু’, তার ‘ঈশ্বর’, তার ‘প্রেমিক’ প্রথম থেকেই তার প্রেমে সম্মতি দেননি, কারণ সে ‘পতিতা’। কিন্তু নিজের অন্তিম সময়ে রোগশয্যায় কাঞ্চনের হাতের সেবা নিয়েছেন, শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছেন তার সাথে। সন্তান এসেছে কাঞ্চনের গর্ভে, পিতৃপরিচয় দিয়েছেন তাকে, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কাঞ্চনকে বিয়ে করে বিবাহিতা স্ত্রীর

সামাজিক পরিচয় বা সম্মান কোনোটাই কিন্তু দিয়ে যাননি। এর কারণ অনুসন্ধানে আমাদের একটি কথাই মনে হয়েছে, সমাজের ভয়, লোকলজ্জার ভয় আর নিজের সামাজিক সম্মান হারানোর ভয়। যার পরিণাম ভুগতে হয়েছে তাদের সন্তান মুক্তো বা মুক্তিকে। মায়ের মৃত্যুর পর মাসির বাড়িতে থাকাকালীন একটি স্কুলে তাকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু মায়ের অতীত পরিচয়, সহপাঠীর অপমানকর প্রশ্নে, তাদের বিদ্রোহে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সে। দিদিমনিদের কৌতূহল মেটাতে অক্ষম সে। শেষ পর্যন্ত স্কুল থেকে বিতাড়িত হওয়াই যেন তার ভাগ্য- কারণ তার মা ছিল বেশ্যা এবং তার মা-বাবার সামাজিক ও আইনী বিয়ের প্রমাণ দিতে সে অক্ষম। নিজের জন্মের এই বিড়ম্বনা সারাটা জীবন তাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। শিক্ষা-পেশা-প্রেম সবক্ষেত্রেই সে হীনম্মন্যতায় ভুগেছে, নিজের রক্তকে, নিজের জন্মকে কলঙ্কিত ভেবেছে, সে যেন সবার উপহাসের পাত্রী। কোথাও যেন তার মনে হয়েছে তার জন্মপরিচয় সমাজস্বীকৃত নয় বলেই তার প্রেমিক তাকে, তার সন্তানকে মান্যতা দেয়নি। এই কারণেই নিজের জন্মবৃত্তান্ত শুনে সে নিজের মাকে তীব্র ঘৃণা করেছে, প্রশ্ন তুলেছে নিজের মায়ের সামনে, কেন তার বাবা মাকে বিয়ে করেননি? কেন তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেননি? সামাজিক বিবাহ না করার ফল কাঞ্চনকে ততটা ভুগতে হয়নি যতটা তার মেয়েকে সহ্য করতে হয়েছে, একটি শিশু বা মানুষের পরিপূর্ণভাবে বেড়ে ওঠার পেছনে সমাজের ভূমিকা অপরিসীম, কিন্তু সমাজের সেই নিয়ম বেশ্যার সন্তানের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই অন্যে নিজের মাকে অপমান করলেও শাস্তি তাকেই পেতে হয়। অন্য মেয়েদের সাথে একাসনে বসে পড়াশোনার অধিকার তার নেই, বরং বিদ্যালয় থেকে বিতাড়ন করা যায় তাকে। নাহলে যে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

আইনকানুনের দৃষ্টিতে: আইন সবার জন্য সমান এই কথাটাও এদের ক্ষেত্রে সত্য নয়। শারীরিক নিগ্রহ, জোর করে মদ্যপান, ধর্ষণ ইত্যাদি ছিল, এমনকি বাবুদের বেঁধে দেওয়া নিয়মের বাইরে গিয়ে কোনোরকম কাজের ফল মৃত্যু অবধিও ছিল। যারা ‘রক্ষিতা’ হতো তাদের আর্থিক নিরাপত্তা থাকলেও কোনোরকম স্বাধীনতা ছিলনা। অত্যাচারের নির্মম বর্ণনা রয়েছে। শুধু তাই নয় টাকার জোরে গুমখুনের মতো বিষয়ও চাপা দেওয়া যেত। কোনো পতিতার মৃত্যু বা তার উপরে হওয়া শারীরিক অত্যাচারের বিচার হবে কিনা তার সবটাই নির্ভর করত অপরাধীর সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তির

উপরে। কুমার নিজের মুখেই নিজের অপরাধের কথা বলেছেন অর্থাৎ সমাজ ও আইন -দুইই নির্বাক দর্শকমাত্র।^{৫৫}

রাজনৈতিক অবস্থান: উপন্যাসটিতে স্পষ্টভাবেই বেশ কিছু রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের উল্লেখ রয়েছে। নায়িকার আত্মকথন থেকে সেইসব কথা জানা যায়। যদিও কাহিনীর ঘটনাবিন্যাসের সঙ্গে রাজনীতির সরাসরি যোগাযোগ নেই, নায়িকার সঙ্গেও নয়। তবে রাজনৈতিক পালাবদল ও চাপানউতোর কীভাবে ‘দেহব্যবসা’-র যুক্ত মেয়েদের জীবনধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার কথা আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই প্রভাব খুব নেতিবাচক হয়ে থাকে ^{৫৬}।

তবে দেশ, দেশের সেইসময়ের পরিস্থিতি এবং রাজনীতি সম্পর্কিত খবর বিষয়ে যে কাঞ্চন যথেষ্ট সচেতন ছিল তা তার কথাতেই প্রমাণিত। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ফলে ধ্বস্ত অর্থনীতির ফলাফল সে তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছে।

সাংস্কৃতিক অবস্থান: প্রাচীনকাল থেকেই চৌষট্ঠিকলা-শিক্ষার সাথে ‘গণিকাবৃত্তি’ অবলম্বনকারিণীদের সম্পর্ক রয়েছে। অতগুলি না হলেও নৃত্য-গীত-বাদ্য, অঙ্গসজ্জা-বেশভূষা, কথা বলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যা মনোরঞ্জনের জন্য শিখতে হত তাঁদের। ‘মা’ বা ‘মাতৃস্থানীয়া’ কোনো মাসি অর্থাৎ অভিজ্ঞ কোনো প্রাচীনা এই বিষয়গুলি শিখিয়ে থাকেন। একান্তই রূপ বা গুণ নেই যাঁদের তাঁদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মদ্যপান ও যন্ত্রের মতো দৈহিক সম্পর্ক যা একরকম শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার নামান্তর বলা চলে, তার জন্য শৈল্পিকবোধ বা সূক্ষ্মরচির প্রশ্ন নেই।

এই উপন্যাসের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে কীর্তন ও পরবর্তীকালে থিয়েটারের কথা। কীর্তন বা পালাগানের সুবাদে কাঞ্চনের মায়ের কথা ডাক আসত বিভিন্ন আসরে। কোনো কোনো আসরে প্রথমে কীর্তন ও রাত বারোটোর পরে অন্য ধরনের অশ্লীল গান। এই কথাটাই যেন পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, নাচে পারদর্শী বা সুগায়িকা হলেও শেষ অবধি তাঁদের পরিচয় তাঁরা দেহপেশারিনী, কামজ-সম্পর্কই তাঁদের জীবনের শেষ সত্য যেন। তবে সুকণ্ঠী হওয়ায় এবং থিয়েটারে অভিনয় দক্ষতার জন্য কাঞ্চনের নাম হয়। পতিতাবৃত্তি ত্যাগের পরে তার ‘প্রেমিকপ্রবর’-এর বদান্যতায়

কীর্তনের দলে ‘দোয়ারকি’, গানের রেকর্ডিং ইত্যাদি সম্ভব হয়েছিল। যদিও ‘নটী বিনোদিনী’, ‘ক্ষেত্রমণি’ প্রমুখেরা বঙ্গথিয়েটারে অভিনয়ের সূত্রে যথেষ্টই খ্যাতিলাভ করেছিলেন^{৭৭}।

৪) কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি উপন্যাসটি আগাগোড়াই যেন বিষাদসুরে বাঁধা। প্রেমিকমনের বিরহবেদনে নিভুতে যে গান লেখা হয় সেটিই মিশে রয়েছে কাহিনীর গভীরে। ‘কবি’ -এই আখ্যায় অভিহিত হয়ে থাকেন যাঁরা, তাঁরা যেন এই জগতের নন। জাগতিক সুখদুঃখ, পাওয়া না পাওয়ার তুচ্ছ, জটিল হিসেব তাঁদের জন্য নয়। ‘সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি’- যাঁর দেখার চোখ আলাদা, বোঝার মন আলাদা, সূক্ষ্মতার বোধে যাঁদের জীবনের উদযাপন হয়, তাঁরাই তো কবি।

কিন্তু তারাশঙ্করের কবি প্রথম থেকেই ভিন্ন। কবিরিয়াল নিতাইয়ের পরিচয়- ‘চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল’^{৭৮}। সমাজের নিদারুণ নিষ্ঠুর পরিহাস। যে বংশে চুরিডাকাতির মতো দুস্প্রভৃতিমূলক কাজ হয়, যাদের মনের মধ্যে দয়া-মায়া ইত্যাদি অনুভূতির কোনো স্থান নেই, সেই বংশের কারোর মনে কবিসুলভ কোমল হৃদয়বৃত্তি থাকতে পারে এটাই পরম বিস্ময়।

‘কবি’ নিতাই এর কবিরিয়াল জীবনের কথা, তার প্রেমিকজীবনের কথা লেখক বলেছেন। জীবনের গান গেয়েছে সে আর সেই প্রাণখোলা গানের টানে তার সাথে আলাপ হয়েছিল এক ঝুমুর দলের^{৭৯}। ঝুমুর গ্রামবাংলার লোকসঙ্গীতের বহু প্রাচীন একটি আঙ্গিক। তারাশঙ্কর তাঁর লেখায় গ্রামীণ সভ্যতা, সংস্কৃতি, দেশীয় আচার ইত্যাদির বিশ্বস্ত উল্লেখ যেমন করেছেন, তেমনি মানবমনের আনাচ-কানাচের সাথে প্রকৃতির সমন্বয়ে এক অনবদ্য মিলন-সঙ্গীত হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টি। নিতাই জাতে ডোম, কিন্তু সে তার পূর্বপুরুষের জীবিকা ত্যাগ করে রেলস্টেশনের ধারে কুলির কাজ করতো। পরিবার-পরিজনের থেকে পেশাত্যাগের কারণে বহু অপমান, আঘাত সহ্য করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু সে স্বভাবে একজন ‘কবি’- পড়াশোনা করা, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, পুঁথি পড়া ও সেগুলি নকল করা তার অবসরবিনোদনের মাধ্যম। নিজের মনে গান তৈরি করে সে মুখে মুখে, সুরে বেঁধে দরাজ গলায়

গান গায়। সে যেন এই গানে গানেই বেঁচে থাকতে চায়। কবিগানের লড়াইতে আচম্বিতে এক সুযোগ তাকে পরিচিতি দেয়, শহরের বাবু অবাক বিস্ময়ে বলেন, “তুই বেটা কবি—a poet!”^{৬০}।

নিতাইয়ের অঞ্চলে বুমুরের একটি দল আসে। এই বুমুরের দলের মেয়েদের পেশা হল দেহব্যবসা, দেহব্যবসাই তাঁদের আয়ের আসল উৎস। বুমুরগানের বায়নার আসর থাক বা না থাক, শরীরী আসঙ্গের আসর প্রায় প্রতিদিনের অঙ্গ। এই দলের সবথেকে রূপবতী, অহংকারী মেয়েটির নাম বসন্ত বা বসন। সে যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। প্রতিমুহূর্তে এক অদ্ভুত রুঢ় ব্যবহারে সবাইকে বিদ্ধ করতে চায়, বিশেষ করে পুরুষজাতিকে। নিজের সৌন্দর্য আর নৃত্যকলার দক্ষতা সম্পর্কে আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস তার। বিলোল কটাক্ষ আবার দরকারে মধুর কথা, কিংবা অল্প একটু দৃষ্টি-প্রসাদ - পুরুষকুল তাতেই ধন্য হয়ে যায়, দলের ‘মক্ষীরানি’ সে। কিন্তু পুরুষদের প্রতি ঘৃণামাখা তার আচরণ।

প্রথম পালাগানে সাময়িক পরাজয় এবং বসনের কাছে অপমানিত নিতাই জীবনে প্রথম মদ্যপান করে, নিজের ভিতরে সুষুপ্তির আড়ালে চলে যাওয়া বীরবংশী জাতির উগ্র, নারকীয় স্বভাবকে জাগিয়ে তোলে সে। চলতি চটুল অশ্লীল, খেউর গানে আসরের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, সঙ্গে যোগ্যসঙ্গতকারিণী বসন। যাদের জীবনে মনের মানুষের কোনো অস্তিত্ব নেই, ভালোবাসা শব্দের উচ্চারণে যারা হেসে ওঠে, সেই বাররামা বসন ভালোবেসে ফেললো নিতাইকে। কবিয়াল নিতাই তার স্বভাবগুণে বসনের বাইরের রুঢ়তার প্রাচীর ভেঙ্গে বের করে আনলো প্রেমের ফল্গুধারা। বসনের জীবনে তার জীবিকা যে কতোখানি সত্যি তা জেনেই নিতাই ভালবেসেছিল তাকে, সে বিষয়ে দুজনের মধ্যে কোনো মনোমালিন্যের সামান্যতম ইঙ্গিত কোথাও নেই। যে সময়ে অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়ে যখন গ্রাহক আসতো, সবকটি ঘরের বাতাস ভারী হয়ে যেত হাসি-গান, মদ্যপান-চটুলতা আর অশ্লীলতায়, নিতাই তখন দূরে তার বই ও পুঁথির ‘দগু’টি নিয়ে নতুন গান রচনায় বিভোর হয়ে থাকতো।

বসন আর নিতাই, স্বভাবগত দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুটি মানুষ পরস্পরকে আশ্রয় করতে চেয়ে ভালবাসার বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় গান্ধর্ববিবাহ বলা চলে যেভাবে গিঁট বেঁধে তারা অঙ্গীকার করেছিল পাশে থাকার-

“গিঁট আগেই পড়ে গিয়েছে বসন। টেনো না। আমি যদি আগে মরি, তবে তুমি সেদিন খুলে নিও এ গিঁট; আর তুমি যদি আগে মর, তবে সেই দিন আমি খুলে নোব গিঁট”^{৬১}।

যদিও বসনের ক্ষয়রোগের কথা নিতাইয়ের মন কিছুটা দ্রব করেছিল একথাও ঠিক। বেশ্যাবৃত্তির তিক্ত অধ্যায়টুকু ব্যতিরেকে নতুন বিবাহিত দম্পতির মতোই তাদের দিনযাপন। যদিও তা হয়না। যে বসন মৃত্যুকে ভয় পেত না সে নিতাইয়ের মায়ায়, স্নেহে, সেবায় আরও দীর্ঘ জীবন বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। যেদিন নিতাই গাইল-

“এই খেদ আমার মনে মনে।

ভালবেসে মিটল না আশ ---কুলাল না এ জীবনে।

হায়, জীবন এত ছোট কেনে?

এ ভুবনে?”^{৬২}

এক অজানা আতঙ্ক গ্রাস করলো বসনকে। হয়তো তার শেষ ঘনি়ে এসেছে। দুরারোগ্য যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলো বসন, রেখে গেলো ঈশ্বরের প্রতি, সমাজের প্রতি একরাশ ক্ষোভ-অভিমান-প্রশ্ন। যে ভাগ্য কোন দেহপসারিনির সাধারণতঃ হয় না, বসন সেইটুকু পেয়েছিল- তার ভালবাসার মানুষের অক্লান্ত সেবা আর মৃত্যুর পরে তার হাতেই অন্তিমযাত্রার কাজ।

ঝুমুরশিল্পীদের বিশেষ করে মেয়েদের কথা বলেছেন লেখক। এই গান গ্রামাঞ্চলের, তাই গ্রামবাংলার কথাই উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। এই দেহবিলাসিনীদের অবস্থান বিচার তাই হবে গ্রামীণ পরিবেশের প্রেক্ষিতে।

আর্থসামাজিক অবস্থান:

ঝুমুরদলের মেয়েরা প্রায় সকলেই যে আদিমতম পেশার সাথে যুক্ত সেকথা প্রথমেই বলে দিয়েছেন লেখক। তাদের পালাগান, বায়না ইত্যাদির আড়ালে আসল পরিচয় হল তারা বেশ্যা। একেবারেই গ্রামীণ বেশ্যা। ঝুমুরদলের বৈশিষ্ট্য হল, এটি একটি ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠী। কোনো স্থায়ী আবাস বা ঠিকানা

এইধরনের দলের থাকেনা। যখন যেখানে পালাগানের বায়না থাকে সমস্ত দলটি সেখানে উপস্থিত হয়ে অস্থায়ী গৃহস্থালী গড়ে তোলে। দলে একজন প্রৌঢ়া রমণী থাকেন, যাকে সকলে ‘মাসী’ সম্বোধন করে। এই মাসীর সাথে পতিতাপল্লীর মাসীদের বিশেষ পার্থক্য নেই। দলের মেয়েদের খেয়াল বা বলা ভালো নজরে রাখা, সাজপোশাক ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে দেওয়া, নতুন কোনো ‘খরিদার’ এলে তার সঙ্গে দরদস্তুর করা, আবার পালাপার্বণে ব্রতকথা শোনানো, রোগব্যাধিতে ওষুধ দেওয়া এগুলি তার কাজ। মাসী এই মেয়েদের অভিভাবিকাস্বরূপ। পালাগানের আসরেও তার উপস্থিতি থাকে। বিগতশ্রী প্রৌঢ়া এই মাসী অতীতে ছিল এখনকার বসন, ললিতা, নির্মলের মতো যৌবনবতী বেশ্যা। যখন দৈহিক ক্ষমতা কমে আসে, পরিশ্রম করার উপায় থাকেনা, দেহপট জীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে একটি দল তৈরি করে সে। এই মাসী যেমন এই আখ্যানের একটি বিশেষ চরিত্র, তেমনি সে এই পেশার আবহমান পঙ্কিল আবর্তে ভূত ও ভবিষ্যৎ সব ‘মাসী’ দের প্রতিভূও। এই মাসীরাই পুরো দলটির নিয়ন্তা। পেশায় মন্দা দেখা দিলে মেয়েদের যথাযথ সাজসজ্জা করে গ্রামের বাজারে বেড়াতে নিয়ে যায় সে, উদ্দেশ্য তাদের দেখিয়ে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করা। গ্রাম্যবাজারে খন্দের বলতে সাধারণ চাষী, স্থানীয় হাটুরে, বড়জোর মেলায় আসা কোন পথিক। কপাল ভালো হলে আমন্ত্রক গ্রামের কোনো অর্থবান লোক তাদের গ্রাহক হতো এবং রোজগার সেই অনুপাতেই হতো।

মেয়েদের অর্থ উপার্জনের দুটি পথ। ঝুমুরদলে নাচ আর দেহব্যবসা এই দুটির উপার্জনেই মাসীর ভাগ আছে। ভাগের হিসাব স্বয়ং লেখক বলেছেন, বেশ্যাবৃত্তি থেকে যে অর্থ উপার্জিত হবে তার দুই ভাগ মেয়েটির ও একভাগ মাসীর। আবার আসরের রোজগারের ভাগ হয় সদস্যসংখ্যা অনুযায়ী। প্রতিটি মেয়ে পায় একভাগ করে, এক ভাগ প্রৌঢ়ার, কবিরালের দুইভাগ, বেহালাদারের একভাগ। দোয়ারকি আর বাজনদার যথাক্রমে একভাগ, আধভাগ করে পায়^{৬০}। দলের কোনো ব্যক্তি থেকে যদি অর্থ উপার্জন না হয় তাকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, এমনকি মেয়েদের ক্ষেত্রেও নিয়মের হেরফের নেই। পাকা ব্যবসায়ীর মতোই মাসীর ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক লেনদেন। সে জানে যতদিন

দলের মেয়েদের যৌবন আছে ততদিন আশ ও শ্বাস চলবে। তাদের জীবনকথার সার লেখকের মুখেই শুনি-

‘জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার যত জটিল, তত কুটিল। পথচারিণী নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনীর রাত্রির অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতায় নিশাচর হিংস্র জানোয়ারের মত মানুষই সংসারে ষোল আনার মধ্যে পনের আনা তিন পয়সা...।’^{৬৪}

তাদের বেসাতি কখনো কখনো পথেই বসে, কখনো তাদের অস্থায়ী ঘরে। বুমুরের দল যেহেতু ভ্রাম্যমাণ তাই তাদের কোনো নির্দিষ্ট পল্লী নেই, বাঁধা ‘বাবু’ নেই আর সে কারণেই কোনো বাঁধাধরা মাসিক রোজগার নেই তাদের। বুমুরের দল গ্রামীণ মেলায় আসে ভাগ্যপরীক্ষায়, একসাথে কয়েকটি দল আসে। মেলার একপ্রান্তে যেখানে ভিড় বেশি সেইরকম স্থানে তাদের আড্ডা-

‘চতুষ্কোণ আকারের একটা খোলা জায়গায় সারি সারি খড়ের ঘর বাঁধিয়া বেশ্যাপল্লী বসিয়া গিয়াছে। সে যেন একটা বিরাট মধুচক্রে অবিরাম গুঞ্জন উঠিতেছে’।^{৬৫}

পথবেশ্যাদের জীবনের সবটুকুই যেন অনিত্য। স্নেহ-মায়ার স্থান নেই সেখানে, তারা জানে যে কটা দিন তাদের খাতায় লেখা আছে সেই দিনগুলি কোনোভাবে অতিবাহিত করতে হবে। মরণের পরে হয় দেহ পড়ে থাকে পথের পাশে শেয়াল-কুকুরের খাদ্য হয়ে অথবা দলের মেয়েরা দয়া করে সৎকার করে। বসন ব্যতিক্রমী, তার মৃত্যুর পরবর্তী অধ্যায়াটিও ব্যতিক্রমী, তাকে নিতাই নিজের হাতে সৎকার করেছিল। আলাদা করে এটি উল্লেখের কারণ, যে নারী বহুভোগ্যা এবং পথবেশ্যা তার শরীর ভোগ করা যায়, কিন্তু মৃত্যুর পরে তাকে সৎকারের জন্য কোনো বিলাসী পুরুষকে চোখে পড়েনা। অর্থের বিনিময়ে যার দেহের মালিকানা হাতে আসে তখন তার জাত কী সেই প্রশ্ন ওঠেনা, অথচ মারা যাওয়ার পরে তার জাত, তার পেশা “বিপুল আকার” ধরে “গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার”। প্রেমের শিক্ষায় নিতাই সেই তুচ্ছতা অতিক্রম করেছিল, তাই সে নিজেই বসনের শেষ কাজ করেছিল।

বেশ্যাদের জীবনের অনিবার্য সত্য কতোটা নিষ্ঠুর, কতোটা স্বার্থ ও বাস্তবসর্বস্ব তার উদাহরণ ‘মাসী’ চরিত্রটি। চিতায় শোয়ানোর আগে সে বসনের আভরণ খুলে নেয়, সামান্য কানের দুল, হাতের শাঁখা বাঁধা, গলার হালকা বিছেহার। বিস্মিত নিতাইয়ের প্রশ্নে মাসী জানায় সেই মেয়েদের ‘ওয়ারিশান’

তাই এসব তার প্রাপ্য। আসলে উজ্জ্বলিতে যাদের দিন চলে তাদের কাছে মহত্বের আশা করা বিড়ম্বনা কারণ পরের দিন কীভাবে তাদের চলবে তা নিশ্চিত নয়, অতএব পড়ে পাওয়া খুদকুঁড়োটুকুও হাতছাড়া করা যাবেনা।

সাংস্কৃতিক অবস্থান: ‘ঝুমুর’ বহু প্রাচীন গ্রাম্য সংস্কৃতির ধারা। কবির গান ও দলের মেয়েদের নাচ - এই তার উপজীব্য। কবিগানের লড়াইয়ে নিজের দলের কবির গানের তালে তালে নাচ- এটি মেয়েদের কাজ, তবে প্রয়োজনে দোয়ারকি করতে এবং একক গানও গাইতে হয়। মেলা, পালাপার্বণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এই আসর বসতো বলে সেই গান ও নাচে থাকত গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতার চরম তীব্রতা। তাই প্রথম রাতে নিতাইয়ের সুরেলা গলার পরিশীলিত মানসিকতার গান মেলার লোকেদের পছন্দ হয়নি। ঝুমুরে একেবারেই নিম্নরুচির ‘খিস্তি-খেউর’ এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কবিকে তাই গাইতে হয় সস্তা মনোরঞ্জনের জন্য। এর সঙ্গে মেয়েদের নাচের মধ্যে দিয়ে শরীরী মোহজাল বিস্তারের আলো ছায়ার খেলা চলে। নাচে মিশিয়ে দিতে হয় চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি, মুখের ঝিলিক দেওয়া হাসি, বিভঙ্গ। এখান থেকেই তারা তাদের দ্বিতীয় ব্যবসার উপার্জনের জন্য পুরুষ খোঁজে। শুধু নাচ-গান নয়, প্রকাশ্য মেলায় তারা নিজেদের শরীর প্রদর্শন করার জন্য ‘উলঙ্গবাহার শাড়ি’ পরে, যাতে কামনা জাগ্রত হয় সম্পূর্ণমাত্রায়। কারণ তারা জানে শুধু নাচ-গানে তাদের জীবন কাটানো অসম্ভব-

‘নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী; পথে পথে ব্যবসায়ের বিপণি পাতিয়া যাহাদের ব্যবসায় করিয়া ঘুরিতে হয়---লজ্জা তাহাদের থাকেনা, থাকিলে চলেনা। পথে নামিয়া লজ্জাকে প্রথম পথের ধুলায় হারাইয়া দিয়া যাত্রা শুরু করে^{৬৬}।’

সমাজে তাদের সম্মান নেই। নিতাই নিজেও একবার স্বীকার করেছে যে মেয়েগুলি গান-বাজনা বোঝে বলে তাদের সে পছন্দ করে, কিন্তু তারা বেশ্যা বলে ঘৃণায় তার মন সংকুচিত হয়ে আছে।

রূপ এবং দেহসৌষ্ঠব আর যৌবন -এই তিনটি হল এইধরনের মেয়েদের অহংকারের মূল। কিন্তু সেই গর্ব ক্ষণিক। বহু পুরুষ এসে অর্থের বিনিময়ে সেই রূপ-যৌবন ভোগ করে চলে যায়। তাই তাদের জীবনের আসল অহংকার হল ‘নৃত্যগীতের অহংকার’। ভাল নাচ-গানের কদর যে সমাজের

সবস্তরেই আছে তা তারা খুব ভালো করেই জানে। অজস্র মানুষ তাদের গান শোনে, অবাক বিস্ময়ে নিশ্চুপে তাদের নাচ দেখে। দুচোখে থাকে মুগ্ধতা। দুর্বিষহ লজ্জাকর জীবনে এটাই তাদের পরমপ্রাপ্তি।

কেউই সারাজীবনের জন্য তাদের কাছে থাকেনা বা তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে জড়ায় না। সমাজের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি দুরন্ত অভিমানে, ক্ষোভে মৃত্যুশয্যায় বসন প্রশ্ন করেছে, -

“কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কি দিয়েছে? না।”^{৬৭}

তার প্রপ্লেই নিহিত আছে তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি। বসন ব্যতিক্রম তাই সে নিঃস্বার্থ ভালবাসার মানুষের স্পর্শ পেয়েছিল। বাকিদের জন্য সেটুকুও অলীক কল্পনা।

রাজনৈতিক অবস্থান:

এই উপন্যাসে রাজনীতির প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। অল্প যেটুকু রয়েছে তাও নিতাইয়ের জীবনের সাথে জড়িত, সেটিও একান্তই গ্রাম্য রাজনীতি বা সমাজনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার ফল বলা যেতে পারে। প্রান্তিক মানুষদের জন্য সমাজের নিয়মনীতির ক্ষুদ্রতা বড় বেশি চোখে পড়েছে এই উপন্যাসে।^{৬৮}

৫) দৌলতি

মহাশ্বেতা দেবী সারাজীবন সেইসব মানুষের জীবনগাথা লিখেছেন যাদের নিজেদের বলার মত কোনো কথা আছে বলেই সমাজ মনে করে না। সমাজ স্বীকার করেনা সেইসব মানুষের অস্তিত্ব, শুনতে চায় না তাদের স্বর। তিনি সেই মূকীকৃত, ব্রাত্য জনজাতিগুলির কথা শুনিয়েছেন আজীবন।

দৌলতি-তেও সেই প্রান্তিক মানুষদের কথাই বলেছেন তিনি। ‘প্রান্তিক’ শব্দের ব্যাপ্তি বিশাল। পৃথিবীর যে কোনো ধরনের মানুষ, যারা কোনো না কোনো ভাবে দুর্বল বা ‘তথাকথিত’ সবল নয়, সক্ষম নয়, তাঁদেরই সমাজ ‘প্রান্তিক’ বা ‘অন্ত্যজ’-এর তকমা দিয়ে দেয়। ব্রাত্যের তালিকাভুক্ত করে দেওয়া হয় তাদের। অথচ প্রহসন হল, সমাজ যাদের প্রান্তিক করে রেখেছে, ‘অচ্ছুৎ-অন্ত্যজ’ সেই শ্রেণীর মানুষদের কায়িক পরিশ্রম ছাড়া সভ্যতার চাকা এগিয়ে চলেনা, চলতে পারে না। সমাজের অগ্রগতির জন্য উঁচুতলার বাসিন্দারা ‘তথাকথিত’ নীচুতলার মানুষদের উপরেই নির্ভরশীল।

এই শ্রেণীবিভাগ বা ‘প্রান্তিকতা’ বিভিন্নরকম হয়ে থাকে- জাত, ধর্ম, অর্থ আর বংশকৌলীন্য ইত্যাদি যেমন তার মাপকাঠি তেমনিই লিঙ্গবৈষম্যও প্রান্তিকতার আরেকটি দিক। তার সবথেকে পুরানো আর সবথেকে বড় উদাহরণ হল নারী এবং পুরুষের দ্বন্দ্ব। চিরকালই পুরুষ প্রথমশ্রেণীর নাগরিক আর নারী দ্বিতীয়শ্রেণীর। এই বিভাজনের সাধারণ দুটি কারণ আছে বলা যায়। প্রথমতঃ গত শতকেও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারী বিরল, প্রাচীনকালে তো বটেই, বিংশ শতকেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে অন্যের (পিতা-পতি-পুত্র) উপর নির্ভরশীল। এখনও যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টেছে এমন বলা যায় না। অর্থনৈতিক স্বাভাব্য সমাজে প্রাধান্য আদায় করার মুখ্য অস্ত্র তা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ শারীরিক শক্তির নিরিখে পুরুষের তুলনায় নারী দুর্বলতর, অতএব তার স্থান বরাবরই দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে।

এই উপন্যাসের কাহিনীর দুটি ধারা এবং দুটি ধারাই ওতপ্রোতভাবে একে অন্যের সাথে জড়িত। কোনোটিকেই সেভাবে প্রধান বা অপ্রধান বলা চলে না। দৌলতি এই উপন্যাসের নায়িকা, তার নামেই উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে।

এই আখ্যানে পালামৌ অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের কথা রয়েছে, যারা পুরুষানুক্রমে কামিন হয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। তারা নাগেসিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, মনিবের ‘কামিয়া’। তারাই কামিয়া-সেওকিয়া-বেঠবেগার – একাধারে সব। টেড়া নাগেসিয়া বলে,

‘আমি সব, আমি ওর কেনা গোলাম।’^{৬৯} ।

কথোপকথনটি কাল্পনিক কিন্তু সেই কল্পনার পেছনের বাস্তবতা বড় কঠিন, বড় শক্ত। ‘কামিয়াপ্রথা’ বা ‘কামিগতি প্রথা’ যেন এক অনন্ত দাসত্ব, এক অদ্ভুত চক্রবৃহৎ। বিয়ে, সন্তানের জন্ম অথবা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ‘জাতপাত’কে ভোজ দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক কারণে প্রধানতঃ তারা আর্থিক ঋণ নেয় মালিকের কাছ থেকে। এইসব প্রান্তিক মানুষদের সহায়-সম্মল বলতে তাদের শরীরটুকুই কেবল। এছাড়া আর কিছুই নেই। ‘নুন আনতে পান্তা ফুরোয়’... না, সেটুকু সামর্থ্যও তাদের নেই। কায়িক পরিশ্রম করে তারা ধার-কর্জ মেটানর চেষ্টা করে, কিন্তু কি এক আশ্চর্য অঙ্কের

হিসেবে সেই ধার কোনোদিন শোধ হয়না। এমনকি কামিয়ার মৃত্যু হয়ে গেলেও না। সেই ঋণের দায়ভার এসে পরে উত্তরপ্রজন্মের উপরে।

পালামৌ-এ সেওরা গ্রামের মুনাবর চন্দেলার কামিয়া গনোরি নাগেসিয়া, সে তিনশ টাকার কর্জ করেছিল মুনাবরের কাছে, তাদের হিসেবে অনেক টাকা। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই শোধ করতে পারেনি বলেই তাকে কামিয়া হতে হয়েছিল আর সেটা তার বিশেষ দুর্ভাগ্য বলে মনে হয়নি। কারণ ‘সেওরা গ্রামের গরিব ছেলেরা মুনাবরদের কামিয়া হয়, বিধাতার নিয়ম’। লেখকের বর্ণনা অনুসারে কামিয়া-নাগেসিয়ার (ঐ অঞ্চলের নাগেসিয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরাই কামিয়ার কাজ করেন) হাতে নাকি টাকা থাকতে নেই। এখানে এইরকম বক্তব্যের কারণ অনুসন্ধান অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আসলে কোনো দাসের যদি নিজস্ব পুঁজি কিছু হয়, তা বাড়ি বা জমি অথবা গবাদি পশু যাই হোক না কেন, মালিক ছলে বলে কৌশলে তা আত্মসাৎ করে। আবার কখনো বা চূড়ান্ত অত্যাচারের মাধ্যমেও করে। উদ্দেশ্য একটাই- অধীনস্থ কামিয়া যাতে কোনোভাবেই মুক্ত হতে না পারে কারণ আর্থিকভাবে সবল মানুষকে আর যাই হোক দাস বানিয়ে রাখা যায়না।

একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই অত্যাচারের মাত্রা বোঝানো যাবে এবং কামিয়াদের পরিস্থিতি, তাদের জীবনযাত্রা ঠিক কতোখানি দুর্বিষহ তার একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে। মুনাবরের একটি মহিষ, যার সাহায্যে সে চাষের কাজ করতো সেটি গনোরির অসাবধানতায় বাঘের খাদ্যে পরিণত হয়। ক্রুদ্ধ মালিকের ফরমান হয় পশুর বদলে সেই গাড়ি বোঝাই করবে কারণ যেন তেন প্রকারেণ ক্ষতিপূরণ করতে হবে, বুঝতে হবে তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার মাত্রা – সম্ভব কি অসম্ভব তার হিসেব পরে। আধপেটা খাওয়া, রুগ্ন-দুর্বল গনোরির দেহের উপর গাড়ির জোয়াল ভেঙ্গে পড়ে, তিন মাস তোহরির হাসপাতালে থাকা তার অঙ্গবিকৃতি ঘটে, নাম হয়ে যায় ‘টেড়া’ নাগেসিয়া। অর্থাৎ মালিকের হিসেবে একজন কামিয়ার থেকে পশুর দাম অনেক বেশি। এমতবস্থায় যখন তার কাজের ক্ষমতা একেবারেই নেই বললেই চলে তখন তাদের জীবনে আবির্ভাব হয় পরমানন্দ মিশির (মিশ্র) নামে এক ব্যক্তির- জাতিতে ব্রাহ্মণ, মালিকপক্ষের পরিচিত। টেড়ার মেয়ে দৌলতির প্রতি তার অপরিসীম ‘দয়া’ লক্ষিত হয়। একবেলার অন্নসংস্থানই যাদের পক্ষে কষ্টকর, সেই মেয়েকে অটেল ‘পুরি-কচৌরী’ খাইয়ে,

নতুন রঙিন শাড়ি কিনে দিয়ে পূর্বাপর ঘটনাক্রম জেনে নিয়ে টেড়াকে প্রস্তাব দেয় তার মেয়েকে বিয়ে করে শহরে নিয়ে যাওয়ার। পরিবর্তে মালিকের যাবতীয় ঋণ সে শোধ করে দেবে। কামিয়াদের কাছে এ যেন রূপকথার মতো। কিন্তু এ এমনই অত্যাশ্চর্য রূপকথা যে তার বাস্তবতা আর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। দৌলতিকে নিয়ে সে গঞ্জের একটি ঘরে এনে তোলে। সেখান থেকে তার স্থান হয় রামপিয়ারীর বাড়িতে, শুরু হয় তার ‘নরকের জীবন’। রামপিয়ারি গঞ্জে বিক্রি হয়ে আসা মেয়েদের বাড়ির বাড়িওয়ালী। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা ভাবে মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে এনে পরমানন্দ মিশ্র তাদের ব্যবহার করতো দেহব্যবসার কাজে অর্থাৎ ‘বিয়ে’ হল টোপ, যার সাহায্যে সে নিচু হরিজন সম্প্রদায়ের মেয়েদের শহরে নিয়ে আসত।

দৌলতিকে আনার কারণ একজন বাবু- ‘লাটিয়াজির’ চাহিদা- হরিজন ও কুমারী। পরমানন্দের প্রকৃত পরিচয় সে ‘দালাল’, নারীদেহ কেনা বেচাই যার পেশা। রেওতী, সোমমী, কলাবতী- এদের একমাত্র পরিচয় এরা ‘রেঙী’। কিন্তু সেটাই আসল নয়, তাদের আরো দুর্দৈব তারা ‘কামিয়া’, পরমানন্দের কামিয়া। লাটিয়ার বাঁধা হয়ে তিনবছর অতিবাহিত হল দৌলতির, সন্তান এল গর্ভে, তাকে নষ্টও করা হল, কেননা এই অবাঞ্ছিত সন্তান যৌনক্ষুধা মেটানোর পথে প্রধান অন্তরায়। সেই মুহূর্তেও বিশ্রাম নেই তাদের। যেন যন্ত্রের মতো শুধু এক অনন্ত শ্রমদান। বাঁধাবাবুর কাছে শরীরের প্রয়োজনে নতুনের চাহিদা তৈরি হলে পুরনো কামিয়া-রেঙীদের স্থান হয় অন্যত্র, দালাল-মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী ধারশোধ করার জন্য দিনে ‘বিশ থেকে ত্রিশজন গাহক’ ‘বসাতে’ হয় তবু কামিয়ৌতির সেই পুরনো নিয়মে আসল আর সুদ মিলিয়ে ধার কোনোদিন শোধ হয়না।

এই কাহিনীর আরেকটি অন্যতম পর্ব হল স্বাধীনতার যুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধী এবং ‘হরিজন’ সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য লড়াই। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস, যার চেউ এসে পৌঁছায় ভারতের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে। চরমতম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষদের কাছে সে এক অলীক গল্পকথা। কারণ তারা যে আদতেই মানুষ সেকথাটাই এত যুগ অজানা ছিল তাদের কাছে। সারা ভারত জুড়ে কিংবা গোটা পৃথিবী জুড়েই এক অবস্থা, নিজের অধিকার সম্বন্ধে অসচেতন

হওয়ার কারণে যাদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা তারা আইনের ফাঁক দিয়ে দাস-প্রথা চালু রেখেছিল। এই কাহিনিতে বারবার তার উল্লেখ রয়েছে-

“আগুন জ্বালাবার লোক নেই। লোক থাকলে পলামুতে কামিয়া সমাজটা এত বড় হয়? আইন করার লোক আছে, জীপ চড়ার লোক আছে, আগুন জ্বালাবার লোক নেই। কামিয়া সমাজটা বাড়ছে যে দেখতে পাচ্ছ না?”^{৭০}

কিন্তু ‘বনডেড লেবার’- এই নারকীয় প্রথা উচ্ছেদের জন্য অনেকে এগিয়ে এলেও কোন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারলো না। আর মালিকের আরও অকথ্য, অমানবিক অত্যাচারের ফলে দৌলতি আক্রান্ত হল দুরারোগ্য যৌনব্যাধিতে। তোহরীর হাসপাতালে তার চিকিৎসা সম্ভব নয় জেনেই জীবনের প্রতি সব আশা হারিয়ে ফেলা সাতাশ বছরের দৌলতি যাত্রা শুরু করল নিজের জন্মভূমির উদ্দেশ্যে। শরীরের সবটুকু যন্ত্রণা উপেক্ষা করে সে হাঁটতে থাকে যদি কোনোক্রমে মা-বাবার স্নেহমাখা ছোট গ্রামে পৌঁছাতে পারে, নিজের তপ্ত শরীরের সবটুকু তাপ শীতলমায়াজুড়িয়ে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু সেই সৌভাগ্যও তার নেই। সে নিজেই বুঝতে পেরেছিল মৃত্যু সমাগত। বড় কষ্টের সেই মৃত্যু, লজ্জারও

-

“আসমুদ্র হিমাচল ভারত-উপদ্বীপের সবটুক জুড়ে হাত-পা চিতিয়ে পড়ে আছে বনডেড লেবার, কামিয়া-রেণ্ডী দৌলতি নাগেসিয়ার নির্ধাতিত, যৌনব্যাধিগলিত শব ঝাঁঝরা ফুসফুসের সবটুকু রক্তবমি করে।

আজ, পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতার পতাকাদণ্ড প্রোথিত করার একটু জায়গাও দৌলতি মোহনদের ভারতবর্ষে রাখে নি। মোহন এখন কী করবে? ভারত জোড়া হয়ে দৌলতি”^{৭১}।

আলোচনা:

এই উপন্যাসের পরতে পরতে রয়েছে এক অন্য ভারতবর্ষের কথা। যে ভারতবর্ষের ভিত্তি গাঁথা হয়েছে অসংখ্য মেহনতি মানুষের শ্রমের উপরে। কিন্তু এই পরিশ্রম স্বেচ্ছাবৃত নয় আদতে দাসপ্রথা। ‘বনডেড লেবার’ প্রসঙ্গটি এই উপন্যাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।^{৭২} এই শ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষ-নারীর পার্থক্য নেই। পুরুষ কায়িক পরিশ্রম করে আর নারীর ক্ষেত্রে সেই বিষয়টি একটু অন্যরকম, সে কেবলমাত্র কায়িক পরিশ্রম করে মুক্তি পায়না। তার সঙ্গে যুক্ত হয় যৌননিগ্রহ, শারীরিক অত্যাচার,

যা ধর্ষণের নামান্তর। মালিক বা মালিকের সঙ্গী অথবা কোনো পুরুষ সহকর্মী আবার কখনো ক্ষমতাদারী সরকারী কর্মচারীকে সন্তুষ্ট করার জন্য অধীনস্থ কোনো মহিলা শ্রমিককে তার কাছে ‘ভেট’ হিসেবে পাঠানো হয়। এই সমাজেরই একজন প্রতিনিধি হল দৌলতি। যার জন্ম রক্ষ পালামু অঞ্চলের সেওরা গ্রামে এক কামিয়া-নাগেসিয়া পরিবারে আর জীবনের শেষ কামিয়া-রেণ্ডী হয়ে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে।

আর্থসামাজিক অবস্থান: দাসপ্রথা বহু প্রাচীন এক প্রথা। মানবসভ্যতার ইতিহাসের এক লজ্জাকর অধ্যায় যেখানে একজন মানুষ অন্য মানুষের সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে। মানুষই বোধহয় একমাত্র জীব যে এত নির্মম হয়ে উঠতে পারে। কাহিনীর বুননের মধ্যে দিয়েই জানা যায় দৌলতির বাবা মা এমনকি গোটা গ্রামই আসলে ‘কামিয়া’ অর্থাৎ কোনো একজন মালিকের দাস। যে মালিকের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ কোনোভাবেই শত পরিশ্রমেও শোধ করা যায়না। মালিকের ইচ্ছে হলেই নির্বিচারে তারা যে কোনো মহিলাকে জোর করে তুলে এনে যৌনসংসর্গ করতে পারে এবং এটাকে তারা তাদের একপ্রকার জন্মগত অধিকার বলেই মনে করে। অর্থাৎ স্থান-কালের বিচার তো নেইই, পাত্রের বা বলা ভাল পাত্রী-বিচারেও আগ্রহ খুব কম। এখানেও সেই দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচার বলা যায়, তবে সেই সকল বিষয় কিন্তু কোনোভাবেই ‘বেশ্যাবৃত্তি’ নয়, কারন অন্ত্যজ মহিলাদের পেশা তা নয়; তা শুধু অত্যাচার-নিগ্রহ।

এই সব জনজাতির মানুষেরা পুরুষানুক্রমে নিজেরদের আর্থিক-সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন দেখেনি। তারা জানে এই দাসবৃত্তিই তাদের বিধিলিপি এমনকি কিছু কিছু জায়গা পড়ে মনে হয় অশিক্ষিত এই মানুষগুলি নিজেদের মানুষ বলেই ভাবতে পারেনা, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের অধিকার নিয়ে সচেতন নয়। এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করে পরমানন্দ মিশ্রের মতো লোকেরা। যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বয়স্থা, কুমারী মেয়েদের সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া। সেইরকম মেয়ের সন্ধান পেলে বিয়ের টোপ দেখিয়ে ভুল বুঝিয়ে শহরে নিয়ে এসে বিক্রি করে দেওয়া। বেশ কিছু কারণ রয়েছে যার জন্য তাদের পক্ষে এই কাজগুলি করা সহজ হয়-

ক) এই ধরনের পরিবারগুলি মূলতঃ দারিদ্র্যসীমার একেবারে নিচে বাস করে, কোনোভাবেই তাদের পক্ষে মালিকের ঋণ শোধ করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই দুর্বল জায়গা দিয়ে প্রবেশ করে দালালেরা।

খ) পরমানন্দ মিশ্র নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ হয়ে এত নিচুজাতের মেয়েকে বিয়ে করে স্ত্রীর সম্মান দেবে এটি সমাজে বাকিদের চোখে অনেকটা উচুতে উঠে যাওয়ার আকর্ষণ।

গ) যারা নিজেদের পশুর অধম ভেবে এসেছে চিরটাকাল এরকম অযাচিত সৌভাগ্যে তাদের বোধশক্তিও লোপ পেয়ে যায়।

যাকে আজকের আধুনিক ভাষায় আমরা ‘Human-trafficking’ বলে থাকি তারই এক অতিপুরাতন চিত্র এটি। অবশ্য উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সময় এগিয়ে গেছে, অন্ধের হিসেবে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে বাস করি কিন্তু আজও এই একই পদ্ধতিতে নারীপাচারচক্র সমানভাবে উপস্থিত। প্রত্যেকদিন খবরের কাগজ খুললেই এই ধরনের খবর চোখে পড়ে। ঘটনা সেই এক শুধু পন্থায় বদল এসেছে; কখনো বিয়ের নামে গ্রাম থেকে এনে বহু দূরের শহরে বা বিদেশে নারীপাচার, কখনো বা চাকরির কিংবা অন্যের বাড়িতে কাজের প্রস্তাব দিয়ে।^{৭৩}

দৌলতিকেও বিয়ের কথা বলে মিশ্র শহরে নিয়ে আসে। তার পরিবারের কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়না মিশ্রের কথায়। সেখানেই শুরু হয় তার ‘বেশ্যাবৃত্তি’-র। মহাশ্বেতা দেবী খুব সূক্ষ্মভাবে এবং বিশদে এই মেয়েদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। এদের বলা হয় ‘কামিয়া-রেণ্ডী’; যার অর্থ হল এমন বেশ্যা যার স্বেপারজিত অর্থে অধিকার নেই। কেন নেই? কারণ এক মালিকের ধার শোধ করে তাকে আনা হয়েছে ফলে সেই ধার শোধ করতে সে বাধ্য। তার অর্থে কার অধিকার তবে? যে নতুন মালিকের অধীনে তার বৃত্তি চলে, তার। ব্যাখ্যা করে বোঝার জন্য দৌলতির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তার বাবার ছিল তিনশ টাকা ধার সেটি মুনাবরকে দিয়ে দৌলতিকে ছাড়িয়ে এনেছিল মিশ্র, এরপর তাকে নতুন শাড়ি-গয়না, সাবান-চিরুনি ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে তার দামও জুড়ে দেয় সেই আসলের সাথে। একই পেশায় যুক্ত

কিষণলাল আর পরমানন্দের কথোপকথন থেকে বোঝা যায় অধীনস্থ ‘রেণ্ডী’দের রোজগারের অর্থ একেকজন একেক ভাবে নিয়ে থাকে, মালিকের মনোবৃত্তির উপরেই তা নির্ভর। পরমানন্দ বোঝে শুধুই লাভ, সে বাড়িভাড়া-খাইখরচটুকু বাদ দিয়ে আর কিছুই মেয়েদের দেয়না এমনকি এই পেশায় যুক্ত থাকলে যে অল্প পরিমাণ সাজ-সজ্জার প্রয়োজন হয় তাও মেয়েটিকে খদ্দেরের থেকেই জোগাড় করতে হবে না পারলে সে ধার নিতে পারে। যে ধার আবার সেই আদি হিসেবের সাথে জুড়ে যাবে। চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগটুকুও তারা পায়না। নিজের কাছে নিজের রোজগারের কিছুই তাদের থাকেনা; সবটাই মালিকের হাতে যায়। আর এই কারনেই তাদের শরীর ভেঙ্গে গেলে আর গ্রাহক নেওয়ার অবস্থা না থাকলে অর্থাৎ এককথায় তাকে দিয়ে মালিকের আর কোনো কাজ না হলে তাকে ‘ভিখ-মাংনি’ হয়ে বেরিয়ে যেতে হয়, পথের পাশে পড়ে থাকতে হয় বিনা খাদ্যে, বিনা চিকিৎসায়। দুঃসহ ব্যাধির জ্বালায় কোনরকম সেবা-শুশ্রূষা জোটেনা তাদের। এই ব্যবসাও পুরুষানুক্রমিক, পিতার থেকে পুত্র উত্তরাধিকার পায় কিন্তু মালিকানার হাতবদল হয় কেবল, ‘কামিয়া-রেণ্ডী’দের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়না। কোনো বাবুর ‘বাঁধা’ হলে তাকে আর কোনো গাহক নিতে হয়না কিন্তু সর্বজনভোগ্যা হলে গাহক নেওয়ার কোনো উর্ধ্বসীমা নেই বরং যত বেশি গ্রাহক, মালিকের তত লাভ।

খুব ভাল করে বিচার করলে দেখা যায়, আসলে পুরুষ কামিয়া আর কামিয়া-রেণ্ডী এদের বিশেষ তফাৎ নেই। মালিকপক্ষের কাছে এদের দাম ততদিনই যতদিন এরা পরিশ্রমক্ষম। যেহেতু এরা নিজেরাও ভবিষ্যৎ বলেই এই পাশবিক অত্যাচার মেনে নিয়েছে তাই কোনোরকম বিদ্রোহ-বিপ্লব দূর এরা প্রতিবাদটুকুও করতে জানেনা। এরা যেন জন্মগত ভাবেই শ্রমিক। পাওয়া নয় এদের জন্ম শুধু দেওয়াতেই।

কামিয়া-রেণ্ডীদের সামাজিক অবস্থান বা সামাজিক স্বীকৃতি বলে কিছু আছে কিনা সেটাই প্রশ্নযোগ্য। সমাজের সব তলার মানুষেরাই তাদের কাছে আসে যৌনতাড়নায় কিন্তু বন্ধ ঘরের মধ্যে বেচা-কেনাতেই তাদের সম্পর্ক, দরজার বাইরে কিছু নেই। যে সন্তানেরা জন্মায় তারা জারজ, মায়ের পরিচয়েই তাদের পরিচয়-এই পেশাতে সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু তাদের স্থান হয় রাস্তায়। কতক ভিক্ষে

করে, কতক কাজ করে জীবনযাপন করে- কেবলমাত্র জনসংখ্যাবৃদ্ধি ব্যতীত এদের কোনো সামাজিক অস্তিত্ব নেই।

আইনি অবস্থান:

আইনকে ব্যবহার করেও এরা কোনো অধিকার দাবি করতে পারে না। যেভাবে মিথ্যাচার করে, ভুল বুঝিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আদিবাসী মেয়েদের শহরে আনা হতো তার খবর বিভিন্ন সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তির কাছে থাকতো, কিন্তু তা বন্ধ করার কোনো প্রয়াস সমগ্র উপন্যাসে কোথাও চোখে পড়েনা। ‘কামিয়ৌতি প্রথা’ বন্ধ করার জন্য খুব সামান্য হলেও প্রচেষ্টা শুরু করে হয়েছে যখন তখনো সরকারী সহায়তা লক্ষ করা যায়নি। আবার বছরের পর বছর নিরক্ষর বেশ্যার ঋণশোধ না হওয়ার ফলে যে মালিকপক্ষকৃত শোষণ তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেই, সাহায্য চাওয়ার উপায় নেই। কোনরকম আইনি অধিকার নেই তাদের। দিনে কতজন গ্রাহক নিতে পারবে সে ব্যাপারে কোনো স্বাধীনতা নেই। গর্ভপাতের পরবর্তী সময়েও বিশ্রাম নেই, তাছাড়া জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন বা প্রহার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাদের আইনি সাহায্য নেওয়ার উপায় নেই। মৃত্যুই এদের মুক্তির একমাত্র উপায়।

রাজনৈতিক অবস্থান: এই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। মহাত্মা গান্ধী এবং হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষদের অধিকারের জন্য আন্দোলন। যাদের জন্য এই আন্দোলন তারা যদিও সে ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। দুইবেলা খাবার জোটেনা যাদের তাদের কাছে অন্নসংস্থানই একমাত্র সত্য। নিজেদের মুক্তি তাদের কাছে এক অলীক কল্পনা। সুতরাং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হওয়া তাদের কাছে বাতুলতা। ভোট দেবার অধিকার আছে তাদের, কিন্তু কাকে দেবে সেই ব্যাপারে তারা মালিকের ইচ্ছার দাস। সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে এরা কোনোভাবেই যুক্ত নয়। আবার ‘কামিয়ৌতি প্রথা’ উচ্ছেদের ব্যবস্থা করছে দিল্লিসরকার, তাও তারা শুনেছে কিন্তু বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। কারণ তারা এটুকু বোঝে,-

“ধনী লোকেরা কামিয়া রাখে আর গোরমেন তো ধনী লোকের”^{৭৪}।

যে দেশের জনসংখ্যা বিপুল ‘অত্যন্ত শস্তা লেবার, অত্যন্ত শস্তায় ভাঁওতা মেরে উধাও করা যায় গরিব মেয়েদের’।

নাগেসিয়া সমাজের ব্যতিক্রমী চরিত্র বনো নাগেসিয়া, তোহরির স্কুলমাস্টার মোহন শ্রীবাস্তব, হরিজন সেবা-সংঘের ‘সোসালিস্ট’ প্রসাদ মাহাতো, গান্ধী মিশনের পূরণচাঁদ আর ফাদার বমফুলার আসেন ‘রেণ্ডী-হাভেলী’তে। কথায় কথায় জানতে পারেন প্রকৃত অবস্থা। ফাদার বমফুলার ‘ইনসিডেনস অফ বনডেড লেবার’ বিষয়ে সমীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন, যাতে যথেষ্ট পরিমাণে উদাহরণ তুলে ধরে সরকারকে বাধ্য করা যায় আইনের মাধ্যমে এই ন্যাকারজনক প্রথা উচ্ছেদ করা যায়, কেননা একমাত্র উচ্ছেদই এর উপায়। আইন তৈরি আর জনমতের দ্বারা তার মান্যতা এক সুদীর্ঘ পথ। যতদিনে তার সাহায্যে মুক্তি মিললো ততদিনে যে কত শত-সহস্র কামিয়া-রেণ্ডী মৃত্যুতে মুক্তি পেয়েছিল তার কোনো পরিসংখ্যান নেই।

সাংস্কৃতিক অবস্থান: সাধারণতঃ বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে যে সকল মহিলারা যুক্ত থাকেন তাঁরা কোনো না কোনো শিল্পকলায় দক্ষ হয়ে থাকেন। এই বৃত্তির প্রাচীন ইতিহাস সেকথার সাক্ষ্যবহন করছে। আগত অতিথি অর্থাৎ ‘বাবু’ বা ‘খদ্দের’ মনোরঞ্জনই তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই কাহিনী তার ব্যতিক্রম। নিজেদের জনজাতির পালা-পরবে গান বা নাচ করা ছাড়া আর দেহব্যবসার জন্য কোনোরকম নাচ-গান বা অন্যান্য শিল্পকলার শিক্ষা ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়না। তবে সাজ-সজ্জা করা এই পেশার অন্যতম শর্ত আর তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সে সুযোগ সীমিত কারণ আর্থিক সচ্ছলতা তাদের নেই, যেটুকু বা রয়েছে তাতে সাজ-সজ্জার বিলাসিতার থেকে ক্ষুধানিবৃত্তির প্রয়োজন অনেক বেশি। আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে এক জান্তব ছবি, রক্তাক্ত বলাৎকারের বিভীষিকা, কোনরকম সূক্ষ্ম শৈল্পিকবোধের স্থান নেই সেখানে।

৬) উত্তর-ফাল্গুনী

পেশায় চিকিৎসক নীহাররঞ্জন গুপ্ত তাঁর লেখা উপন্যাসে বিবিধ সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেছেন। যে ধরনের উপন্যাস তিনি লিখেছেন তাতে নানা জটিল সামাজিক সমস্যা রয়েছে এবং সেই সমস্যাকে

কেন্দ্র করেই উপন্যাসের চরিত্রগুলি ঘূর্ণিত হয়েছে। এমনই একটি সামাজিক সমস্যার কথা বলেছেন তিনি এখানেও। সময়ের নিরিখে ও ঘটনার পারস্পর্যে এবং অবশ্যই উপস্থাপনার গুণে উপন্যাসটিকে ব্যতিক্রম বলা যায়।

উত্তর-ফাল্গুনী উপন্যাসের কাহিনীতে সম্পর্কের দুটি প্রবাহ পাশাপাশি বহমান। ‘মাতা-কন্যা’ (দেবযানী-সুপর্ণা) এবং ‘প্রেমিক-প্রেমিকা’ (দেবযানী-মনীশ, সুপর্ণা-ইন্দ্রনীল)। অর্থাৎ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে প্রেমিক ও প্রেমিকার সম্পর্কটি রয়েছে দুজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে। তবে আলাদা করে যে কথাটি উল্লেখ করতে হয় সেটা হল এই তিনটি সম্পর্কের মধ্যেই একটি চরিত্রের সাধারণ উপস্থিতি, সে দেবযানী।

দেবযানী এই কাহিনীর নায়িকা। নারীত্বের সবকটি পর্যায় তার জীবনে এসেছে- কন্যা, প্রেমিকা, পত্নী এবং জননী। কিন্তু তার জীবনপথ অন্য আর পাঁচজন মেয়ের মতো স্বাভাবিক ছন্দে চলেনি। মদ্যপ, জুয়াড়ি, দুশ্চরিত্র স্বামীর লাম্পট্য আর নির্মম, কদর্য অত্যাচারে সন্তানসম্ভবা দেবযানী গৃহত্যাগ করে আত্মহত্যার কথা ভাবে। কিন্তু তার নিজের দিদি রত্নমালা তাকে বেঁচে থাকার এক পন্থা জানায়। তথাকথিত ভদ্রসমাজোচিত পেশা নয় তা। কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজের গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা দেবযানীকে বাধ্য করেছিল এই পেশাকে বেছে নিতে।

প্রথম জীবনে একেবারে সরাসরি পতিতাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত ছিল সে; নিতান্তই ‘শরীর বেচা-কেনা’- বলা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে তার পরিচয় ^{৭৫}। এই নির্মোকের আড়ালে চাপা রয়ে যায় ফেলে আসা অতীতের যাবতীয় পরিচয়। পেশার পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, পেশার বহিরঙ্গের কিছু পার্থক্য এসেছে মাত্র। এই পেশায় দেবযানী কোনোদিন অভ্যস্ত হতে পারেনি, কোনো মেয়েই তা পারেনা। কিন্তু কেবলমাত্র সন্তানের জন্য সে অবলীলায় বিষপান করে চলেছে। মিশনারি স্কুলে পালিতা হয় তার মেয়ে সুপর্ণা, যদিও নিজেকে সে অনাথা বলেই জানে।

কোন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে একজন নারী জীবনধারণের জন্য এই বৃত্তি বেছে নেয় তা আমরা দেখেছি। নারীর বহু পরিচয়, সে কখনো মেয়ে, কখনো কারো স্ত্রী আবার কখনো মা আর এই প্রত্যেকটি

পরিচয়ই সমাজমান্য। আদর্শ নারীর প্রতিরূপ এইগুলি। কিন্তু এই একই পরিচয়ের সাথে জুড়ে যায় ‘গণিকা’ বা ‘বেশ্যা’ পরিচয়, এক নিমেষে বদলে যায় সবকিছু। তার বাকি সমস্ত পরিচয় ব্যর্থ হয়ে যায়, এই একটিমাত্র পরিচয় তখন সত্যি হয়ে থেকে যায়।

দেবযানীর প্রেমিক ব্যারিস্টার মনীশ পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী মাতা-কন্যার পরিচয়ের ব্যবস্থা করেন। মায়ের প্রকৃত পরিচয় জানার পরে তীব্র ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় সুপর্ণা। কিন্তু বারবার মায়ের অনুরোধে তার জীবনের প্রকৃত সত্য জানার পরে স্নেহে-মমতায়-ভালবাসায়-সহমর্মিতার সাহচর্যে মাকে আগলে রাখে সে।

এই উপন্যাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল দেবযানীর বাধ্য হয়ে নিজের স্বামীকে হত্যা আর সেই হত্যার দায় স্বীকার করে নেওয়া। তার হয়ে কোর্টে সওয়াল করতে আসে মেয়ে সুপর্ণা। শুধুমাত্র হত্যার দায় থেকে বাঁচাতে নয়, ডলি রায় ওরফে দেবযানীকে লাঞ্ছনার জীবন থেকে সসম্মানে মুক্তি দিতে তার এই প্রয়াস। নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে উন্মাদ প্রতিপন্ন করে দেবযানী মানসিক রোগী এই পরিচয়ের আড়ালে বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দিতে চায় যাতে সুপর্ণার জীবনে অতীতের ঘটনার কালিমা না লাগে। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ তার একমাত্র প্রার্থিত।

আর্থসামাজিক অবস্থান: দেবযানী বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছে। বিবাহ-পরবর্তী জীবনেও সেই দৈন্য তার দূর হয়নি। কিন্তু আর্থিক দুরবস্থা তাকে ততটা লাঞ্ছিত করেনি যতটা করেছে স্বামী রাখালের নৈতিক অধঃপতন। তারই কারণে দেবযানী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে গেলেও দিদির কথায় গর্ভের সন্তানকে রক্ষার জন্য বেছে নেয় ‘পতিতাবৃত্তি’ যা একরকম আত্মহত্যারই নামান্তর। শরীরের মৃত্যু নয়, এ হল আত্মার মৃত্যু। পেশার প্রথম জীবনের কথা না হলেও বেশ কিছুকাল পরে সমাজে সে ‘ডলি রায়’ নামে পরিচিত হয়। তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়।

একজন পতিতার সামাজিক অবস্থান কী হতে পারে সেকথা তার নিজের দিদির মুখে শুনে নেওয়া যেতে পারে, যিনি নিজেই ভাগ্যের পাকেচক্রে এই পেশায় এসেছেন-

“মেয়েদের দেহটা কি মাটির পাত্র যে ছোঁয়া লাগলেই ফেলে দিতে হবে আস্তাকুঁড়ে। যে সমাজে চোরের মতো লুকিয়ে নারীদেহ ভোগ করতে নীতিতে বাধে না, দিনের আলোয় যাদের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় নাসা কুণ্ঠিত করে বলে—অস্পৃশ্যা, কুলটা, স্বৈরিণী,—আর রাতে তাদেরই পায়ে ধরে সাধে—তারা কি মানুষ? কোনো অর্থ হয়, তাদেরই তৈরি সে সমাজের? কোনো নীতি আছে সে সমাজের?”^{৭৬}

নিজের সন্তানের ঘৃণাভরা দৃষ্টি তাকে বাধ্য করেছে সমাজের ক্লেদাক্ত রূপটি তুলে ধরতে। আবার সেই মেয়েই মায়ের সম্মান প্রতিষ্ঠায় লড়াই করেছে। আবার দেবযানীর প্রাক্তন প্রেমিক মনীশ তাকে বধূরূপে বরণ করতে চেয়েছে, সসম্মানে গৃহলক্ষ্মীর মর্যাদা দিতে চেয়েছে, কিন্তু দেবযানী তা মেনে নিতে পারেনি, কারণ তার কাছে শারীরিক অশুদ্ধি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। শরীর ব্যতিরিক্ত কেবলমাত্র মনের ভালোবাসা গ্রহণ করার মতো মানসিক জোর তার ছিলো না।

রাজনৈতিক ও আইনি অবস্থান:

আইনের সাহায্য নিয়ে হত্যায় অভিযুক্ত মাকে মুক্ত করতে চেয়েছে তার সন্তান। ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে যাবতীয় সম্মান শ্রদ্ধা। সর্বসমক্ষে নিজের মাতৃপরিচয় স্বীকার করে তার মায়ের সমাজ নিন্দিত পেশা সবকিছু নিয়েই সে সোচ্চার হয়েছে।

সাংস্কৃতিক অবস্থানঃ

সমগ্র উপন্যাসে বেশ কয়েকবার ডলি রায়ের পেশাগত দক্ষতার প্রসঙ্গে তার অপূর্ব সুরেলা গলা এবং গায়কীর কথা বলা হয়েছে^{৭৭}। সমাজে তার যে উঁচু স্থান রয়েছে সেকথা বারবার এসেছে। নিচু স্তরের পতিতাপল্লী থেকে বেরিয়ে এসে যখন সে নিজেকে অন্যরূপে প্রদর্শন করলো তখন সাংস্কৃতিক জগতে তার পরিচিতি ও খ্যাতি হল।

৭) জন-অরণ্য

শংকরের বিখ্যাত ‘কলকাতা-ট্রিলজি’র প্রথম উপন্যাস *জন-অরণ্য*। এই উপন্যাসে এমন এক সময়ের কলকাতার কথা বলা হয়েছে যে সময়ে বেকারত্বের সমস্যা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা এবং তার পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের জন্ম হয়। অসংখ্য

মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি, জমি-জমা ফেলে রেখে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বাধ্য হয়ে এদেশে এসেছিলেন^{৭৮}। উদ্বাস্তু-সমস্যা, জনবিস্ফোরণ ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের যুবক-সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ সেই সময় উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যে কোনোভাবে একটি চাকরির ব্যবস্থা করা।

সোমনাথ এরকমই এক মধ্যমেধার যুবক। অবসরপ্রাপ্ত বাবা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী দুই দাদা আর দুই বৌদি- এই নিয়ে তার পরিবার। সোমনাথ মাতৃহীন, তার জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সে মায়ের অভাববোধ করেছে, যে অভাব কিছুটা হলেও তার বড়বৌদি কমলা পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সোমনাথের প্রেমিকা লতা ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা শেষ করে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সোমনাথ কলেজের ডিগ্রি লাভের পরে হন্যে হয়ে একটি কাজ খুঁজে চলেছে, সঙ্গে বন্ধু সুকুমার। গোটা উপন্যাসের পরতে পরতে তুলে ধরা হয়েছে এরকম যুবকদের কথা। সুকুমারের বন্ধু সোমনাথকে বলা একটা ছোট কথা এক লহমায় বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয় তাদের পরিস্থিতি,-“...তাকে বলেছি না,-

‘বিধবার’ মতো ‘বেকার’ কথাটা আমার খুব খারাপ লাগে”।

এই একটা বাক্যই যথেষ্ট ‘বেকার’দের সামাজিক অবস্থান, লোকসমাজে তাদের পরিচিতি বোঝানোর জন্য। তাই সুকুমার নিজেদের ‘চাকুরী-প্রার্থী’ বলতে স্বচ্ছন্দবোধ করে। একেকটি সরকারী চাকরির পরীক্ষায় কয়েক লক্ষ আবেদনকারী। বেশ কয়েকবার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে সোমনাথ ব্যবসা করতে উদ্যোগী হয়। এখান থেকেই সোমনাথ আর সুকুমার দুজনের ভবিষ্যৎ পস্থা আলাদা হয়ে গেলো। সোমনাথের পারিবারিক অবস্থা সুকুমারের তুলনায় অনেক ভালো, নিজেদের দোতলা বাড়ি, বাবার পেনশন আর দাদাদের চাকরি -দুই বেলা অন্নসংস্থানের অভাব নেই। অন্যদিকে সুকুমার থাকে যাদবপুরের কলোনি এলাকায়, বাড়িতে অবসরপ্রাপ্ত বাবা, মা, অনেকগুলি অবিবাহিত ভাইবোন- এতজনের অন্নসংস্থান করার দায়িত্ব তার উপরে। কিন্তু বারবার নানা চাকরির পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে সুকুমারের মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিলো।

ব্যবসা সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ সোমনাথ একরকম খড়কুটোর মতোই নিজের শেষ সম্বলটুকু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জীবনযুদ্ধে। আর সেখানেই জীবনের সবথেকে বড় সত্যিটা একেবারে নগ্ন হয়ে ধরা দিলো তার সামনে। সোমনাথ জানতে পারলো শুধুমাত্র সততা দিয়ে জীবনে বড় হওয়া যায়না, অন্ততঃ আর্থিক দিক দিয়ে তো বটেই। অতিপ্রাচীন কিন্তু চিরকালীন সেই পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে তাকে। কী সেই পন্থা? ব্যবসার ‘পার্টি’কে দিতে হবে নারীদেহের ‘ভেট’। তবেই সে তরতর করে উঠে যেতে পারবে অনেক উঁচুতে, ছুঁতে পারবে কাক্ষিত সাফল্যের চূড়া। আর এই কাজে তার সহায়ক মিস্টার নটবর মিত্রের, নিজেকে ‘পি.আর. ম্যানেজার’ বলেন যিনি। আধুনিক পরিভাষার মোড়কে যিনি জনসংযোগকারী, আদতে তিনি অন্য অনেক কিছুর পাশাপাশি নারীদেহের ‘দালালি’করেন। তিনি একজন ‘পিম্প’। জীবনের যৌবনকাল পর্যন্ত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সংস্কারে পালিত সোমনাথের বিশ্বাসের ভিত আলগা হয়ে যায়, নড়ে যায় তার সযত্নলালিত মূল্যবোধ যখন সে নিতান্তই প্রয়োজনে এসে উপস্থিত এক সম্পূর্ণ অন্য জগতে।

শহর কলকাতার এক অজানা, অদেখা ছবি ফুটে উঠে আস্তে আস্তে সোমনাথের সামনে। তার চোখ দিয়েই পাঠক দেখতে থাকেন কল্লোলিনীর এক ভয়ঙ্কর রূপ। প্রতিদিন কত অগুনতি মেয়ে এই শহরে আসে নিজের দেহের বিনিময়ে বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করতে। সাত-আটের দশকের কলকাতায় বিশেষ করে বাঙ্গালী সমাজে ‘দেহব্যবসা’-র বিস্তার কতটা গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তার একটি উদাহরণ শংকরের এই উপন্যাস। সোমনাথের সাথে সাথে পাঠকও চলতে থাকেন আর গন্তব্যে পৌঁছানোর পথে তাঁদের আলাপ হয় মিসেস গাঙ্গুলী, উড স্ট্রীটের মিসেস চক্রবর্তীর সাথে, পরিচয় হয় মিসেস বিশ্বাসের সঙ্গেও। সে যেন এক আশ্চর্য দুনিয়া। শহরের বুকে যে এইভাবে রমরমিয়ে দেহব্যবসা চলে তার কোন আন্দাজ সোমনাথের ছিল না, পাঠকেরও ছিল কি! শেষ পর্যন্ত নিজের পার্টিকে দেওয়ার জন্য সে একবারেই নতুন একটি মেয়েকে ‘জোগাড়’ করতে পারল। ‘গেরস্ত ঘরের মেয়ে’, বাঙ্গালী অল্পবয়সী শিউলি দাসকে নিয়ে সোমনাথ হাজির হল গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেলে। তার বিবেক-বুদ্ধি যতবার তাকে তার ভুল পদক্ষেপের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছে, ততবার এক নিষ্ফল ক্ষোভে, আক্রোশে সোমনাথ নিজের শুভবোধকে থামিয়ে দিয়েছে।

নিজের সঙ্গে দ্বৈরথে ক্ষতবিক্ষত সোমনাথ যে মুহূর্তে জানতে পারলো তার সাফল্যের কথা, যেটুকু দ্বন্দ্ব তার বাকি ছিল সেটুকুও মুছে গেলো। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন তার জীবন-দর্শন বদলে দিলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সোমনাথ জানতে পারলো শিউলি দাস নামী যে মেয়েটিকে সে ‘উপহার’ হিসেবে এনেছিল, যার দেহকে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করে আজ সে সাফল্যের চূড়ায়, সেই মেয়েটি তারই বন্ধু সুকুমারের বোন কণা। অবসরপ্রাপ্ত উপার্জনহীন বাবা, অসুস্থ উন্মাদ দাদা, চিররুগ্মা মা- এই সবাইকে রক্ষা করার জন্য, শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য কণা আজ বাধ্য হয়ে এই পেশায় এসেছে। কণা সোমনাথকে চিনতে পেরেছিল কিনা পাঠক জানতে পারেনা, কিন্তু গল্পের শেষে সোমনাথের কান্নায় ভেঙ্গে পড়া আর নিজের উপার্জনে বৌদিকে দেওয়া উপহারের শাড়ী পরতে বারণ করা - এই দুটি ঘটনা বুঝিয়ে দেয় সোমনাথের ভিতরের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি। শুধু বেঁচে থাকার জন্য, বাঁচিয়ে রাখার জন্য কণার এই পদক্ষেপ সমাজের ভিতরের স্থাপদসঙ্কুল ‘জনঅরণ্য’র কথাই মনে করিয়ে দেয়।

আলোচনা:

আমাদের গবেষণার বিষয় ‘গণিকাবৃত্তি’ তাই সোমনাথের কথা নয়, আমরা খুঁজে দেখবো সেইসব মেয়েদের কথা যারা এই পেশার সাথে যুক্ত। আলোচনা অংশে প্রবেশ করার আগে যে বিষয়টিতে অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হল এই কাহিনীতে দু’ধরনের দেহব্যবসায়ী মহিলার উল্লেখ রয়েছে-

ক) যাঁরা বিবাহিতা, মধ্যবয়সী, এই পেশায় বহু পুরনো। এঁদের অনেকের সন্তান রয়েছে, কেউ আবার নিজের মেয়েদের এই পেশায় নিয়োগ করেছেন। সবথেকে বিস্ময়ের বিষয় হল যখন জানা যায় এই ধরনের অনেক মহিলাদের স্বামীর সম্মতি রয়েছে এই পেশাগ্রহণে, কোনোরকম ছুঁৎমার্গ নেই তাদের।

খ) অন্যদিকে রয়েছে তুলনায় কমবয়সী মেয়েরা। মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে তারা। বিলাস-ব্যসন নয় নিতান্তই নিরুপায় হয়ে নিজের দেহ এবং যৌবনকে মূলধন করে এরা এই

পেশায় এসেছে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য কোনোক্রমে অর্থ উপার্জন করে নিজেকে আর নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখা। তার জন্যই নিজেদের লজ্জা, আত্মসম্মান সব বিসর্জন দিয়েছে তারা।

আর্থসামাজিক অবস্থান:

শুরুতে আলোচনার সুবিধার্থে যে বিভাগদুটি করা হয়েছে তার কারণ হল সত্তরের দশকের কলকাতায় গণিকাবৃত্তির একটি দ্বিমুখী চিত্রগঠনের প্রয়াস। সামান্যজ্ঞান হলেও এখানে একটু বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ের অন্যতম প্রধান দুটি সমস্যা হল -১) উদ্বাস্তসমস্যা ও ২) বেকারত্ব। লেখক এই দুটি সমস্যা আর তার সাথে কসমোপলিটান কালচারে অভ্যস্ত মহানগরীর আনাচে কানাচে রয়ে যাওয়া সেইসব মহিলাদের কথা, যারা স্বেচ্ছায় এই পেশা বেছে নিয়েছে তাঁদের কথা তুলে ধরেছেন।

ওপার বাংলা থেকে আসা অসংখ্য পরিবার তখন চরম অর্থকষ্টে ভুগছে। বেশ কিছু বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের জীবনযাত্রায় দেশভাগের দগদগে ক্ষত রয়ে গেছে। যেসব পরিবারের সদস্য বেশি তাদের দুর্দশা আরও বেশি। এরমধ্যে চাকরির উপযোগী বিপুলসংখ্যক যুবক একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম লিখিয়ে অনন্ত অপেক্ষা কবে ডাক আসবে। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু চাকরির কোনো খবর নেই। এমতাবস্থায় পরিবারের হাল ধরতে বাড়ির মেয়েটিকে বেরোতে হয় চার দেওয়ালের বাইরে। যাদের কোনোরকম ডিগ্রি আছে তাদের ছোটখাটো চাকরি জুটে যায় আর যাদের সেটুকু নেই তাদের ভরসা নিজেদের শরীর। আর মেয়েদের শরীরের চাহিদা বা সেই অনুযায়ী মূল্য পাওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে মেয়েরা নিজেরা যথেষ্ট সচেতন। ভদ্র, শিক্ষিত, রুচিশীল পরিবারের কোনো মেয়ের পক্ষেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয় কিন্তু এছাড়া সমাজ বোধহয় তাদের জন্য আর অন্য রাস্তা খোলা রাখেনি। অবশ্য চাকরিরতা মেয়েদেরও এরকম অভিজ্ঞতা হতো।

ব্যবসার কাজে পার্টির মনোরঞ্জন করে নিজের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ‘মেয়ে-সাপ্লাই’-এর রীতি বহু পুরনো। এখানে সেটিকেই নতুন করে উপস্থাপন করা করা হয়েছে। এই ব্যাপারে একেবারেই

অনভিজ্ঞ সোমনাথের কাছে বিষয়টি প্রথমে খুব অপমানজনক মনে হয়েছিলো, কিন্তু একদিনের অভিজ্ঞতা তাকে বাস্তবজগত দেখিয়ে দিয়েছিল।

মিসেস গাঙ্গুলীর মতো ভদ্র পরিবারের গৃহবধূ এই পেশার সাথে যুক্ত। স্বামী কর্পোরেশন ক্লার্ক কিন্তু স্বামীর মদ্যপানের অভ্যেস যা সামাল দেওয়ার জন্য তিনি এই পেশায় এসেছেন এবং স্বামীর সম্মতি আছে সেই ব্যাপারে। তাঁরা ভদ্রপাড়ায় বাস করেন সেই কারণেই পাড়া-প্রতিবেশী জানাজানির ভয়ে থাকেন। মিসেস গাঙ্গুলীর কথাবার্তা, প্রসাধন এবং গৃহসজ্জা বুঝিয়ে দেয় তাঁদের আর্থিক অভাব নেই, তবে আরও উন্নত জীবনযাত্রার বাসনা ও স্বামীর নিত্যদিনের নেশার দ্রব্যের জোগান দিতে তিনি এই পেশায় আছেন। উপার্জনের অঙ্ক নিয়ে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার- এক শাড়ি দ্বিতীয়বার পরেন না, তাঁর একবারের সজ্জার খরচ উনিশ-কুড়ি টাকা, অঙ্কটা তখনকার দিনের হিসেবে যথেষ্ট বেশি। নিজের যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব নিয়ে সচেতন তিনি এবং নিজের পেশা নিয়ে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন। বরং প্রচ্ছন্ন গর্ব অনুভব করেন। সমাজে বিভিন্ন উঁচু তলার মানুষের সাথে তাঁর যোগাযোগ এবং অনেকের ব্যক্তিগত পছন্দের তালিকায় তিনি থাকেন। আজকের দিনের ‘এসকট সার্ভিস’ এর এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

এরপরে উড স্ট্রীটের মিসেস চক্রবর্তী। প্রৌঢ়া, সুদর্শনা মিসেস চক্রবর্তীকে তুলনা করা যায় সেই সব মধ্যবয়সী মহিলাদের সাথে যাদের নিজেদের যৌবন অস্তাচলে, তাই তাঁরা নিজেরা এই পেশায় সরাসরি যুক্ত নেই, কিন্তু নিজেদের বাড়িতে (আধুনিকযুগে ফ্ল্যাট) এই ব্যবসা চালান। এঁদের ‘বাড়িওয়ালী মাসী’-র আধুনিক সংস্করণ বলা যেতে পারে। তিনি জানিয়েছেন পুলিশ হানা দিয়ে তাঁর মেয়েগুলিকে তুলে নিয়ে গেছে, ইনিই জানিয়েছেন যে, কলেজ-ছাত্রীরাও এই পেশায় আসছে। সময়টা লক্ষণীয়।

এরপরের চিত্রটি বোধহয় পাঠকের অন্তরের সমস্ত সংস্কার, বিশ্বাস সবকিছুকে নাড়িয়ে দেয়। মিসেস বিশ্বাস নিজের দুই মেয়েকে দেহব্যবসায় যুক্ত করেছেন। এখানে তিনি কন্যা গর্বে গরবিনী মা, যাঁর মেয়েরা নিতান্ত কম বয়সে এই পেশায় দক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনে তিনি মেয়ের ঘরের দরজার ফুটো দিয়ে দেখে তাড়া দেন- এ যে কি বিভীষিকা বলাই বাহুল্য! এই চরিত্রটির অর্থ ও প্রতিপত্তি

দুয়ের প্রতি আকর্ষণ আছে। নিজের চোখের সামনে মেয়েদের এই কাজ তাকে মানসিক পীড়া দেয়না। ‘হাই সোসাইটি’, ‘স্ট্যাটাস মেইন্টেইন’ ইত্যাদি বিষয় অনেক বেশি জরুরি। রুঢ় বাস্তব শোনা যায় নটবর মিত্তিরের মুখে-

“... টাকা দিয়ে মায়ের কাছ থেকে মেয়েকে, ভায়ের কাছ থেকে বোনকে, স্বামীর কাছ থেকে বউকে, বাপের কাছ থেকে বেটীকে কতবার নিয়ে এসেছি- টাকার অ্যামাউন্ট ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে গার্জেনদের একটুও উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি”^{৭৯}।

অর্থাৎ অর্থই যাবতীয় অনর্থের মূল। কেউ জীবনধারণের জন্য, আবার কেউ সেই মান উন্নত করা জন্য টাকার পেছনে ছুটে চলেছে। মিসেস বিশ্বাস রীতিমত পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন গল্পে। প্রত্যেক ‘কাস্টমার’দের ঘরে ফ্রেস বেডশিট, তোয়ালের ব্যবস্থা, ট্যালকম পাউডার, নতুন সাবান ইত্যাদি। গ্রাহকের পরিষেবা বিষয়টিতে কোথাও যেন অতীত আর বর্তমান মিলেমিশে যায়। এছাড়াও কাস্টমার সন্তুষ্ট হলে নির্দিষ্ট চার্জের বাইরেও কখনো অন্যান্য জিনিস প্রাপ্তি ঘটা সম্ভব কিংবা তাঁদের সাথে বিদেশভ্রমণ ইত্যাদির বিলাসিতা।

এঁদের অবস্থান সামাজিকভাবে মান্য কারণ বোঝাই যাচ্ছে সেই সময়ের বহু মহিলা এই পেশায় যুক্ত ছিলেন। সমাজের বেশ কিছু সম্মাননীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ অবশ্যই পেশার খাতিরে। তাই যাঁরা নিজেরা এই পেশায় থাকতেন তাঁদের পরিচয় প্রকাশ পেত না আর যাঁরা নিজেদের বাড়িতে অনেক মেয়েকে এইধরনের কাজে লাগাতেন মাঝেমাঝে পুলিশী হেনস্থা ব্যতীত তাঁদের বিশেষ কিছুই ক্ষতি হত না।

আর যে মেয়েরা নিতান্তই পেটের দায়ে এই পেশায় এসেছে তাঁদের আর্থিক অবস্থার কথা বলার মতো নয়। এক কণার উদাহরণটিই যথেষ্ট পরিস্থিতি বোঝার জন্য। যাবতীয় লজ্জা, সংস্কার, ভয় সব ত্যাগ করে সে আজ এই পেশা বেছে নিয়েছে। তাই যার কাছে নিজের শরীর তুলে দিতে এসেছে সেই মানুষটিকেও সে নিজের দাদার একটা চাকরির জন্য অনুরোধ করেছে, যাতে পরিবারের অবস্থার উন্নতি হয় এবং সে নিজে এই নিত্য লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পায়। এরকমই অজস্র কণা ছড়িয়ে রয়েছে সবখানে। এদের সামাজিক সম্মান ততক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকে যতক্ষণ না তাদের চাকরির প্রকৃত

স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে। বাঁচিয়ে রাখার দায় সমাজের নেই, কিন্তু তিলে তিলে অপমানকে আশ্রয় করে মৃত্যু বেছে নিতে সমাজই এদের বাধ্য করে।

আইনগত অবস্থা: এই বইয়ের কিছু তথ্য থেকে সেসময়ের ‘পতিতাবৃত্তি’ ও আইনিব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে বোঝা যায়। ভদ্রপাড়ায় অর্থাৎ যে পাড়াটি ‘বেশ্যাপল্লি’ হিসেবে নির্দিষ্ট করা নয়, সেখানে কিছু কিছু মহিলা নিজে বা নিজের বাড়িতে অন্য মেয়েদের এই পেশায় লিপ্ত করতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা উচ্চবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত। জীবনযাত্রার মান আরও একটু উন্নত করে নেওয়া তাদের লক্ষ্য। ঘর বা রুমভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত। বেশ কয়েকবার পুলিশি ঝামেলা এবং মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়ারও উল্লেখ রয়েছে। এই পেশায় যে সব মেয়েরা আসতো তাদের অনেকেই হয়তো সাবালিকা নয় কিংবা এই পেশায় আসার লাইসেন্স তাদের ছিল না; সেই কারণেই এই ধরপাকড়। আবার চরনদাসের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি দিক উঠে আসে। ‘বলরুম ডান্স’ শেখানো বা ‘টেলিফোন অপারেটর’ এর চাকরি দেওয়ার আড়ালে এই ব্যবসা চলে। তাতে ‘বাজারের বেশ্যা’ যেমন আসে তেমনি ‘বাঙালী গেরস্ত বাড়ির’ মেয়েরাও আসে। যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল দেহের বিনিময়ে অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা। পুলিশ মাঝে মাঝে এইসব হস্টেল, বোর্ডিং বা মেস ইত্যাদিতে হানা দিয়ে থাকে। ফলে ব্যবসায় যারা জড়িত তাদের কিছুদিনের জন্য জেল হয়। শাস্তির মেয়াদ বা পরিমাণ কোনোটাই খুব বেশি না হওয়ার কারণে ছাড়া পেয়ে তারা আবার এই ধরনের কাজ শুরু করে। শুধু স্থানবদল ঘটে আর পেশার আড়ালটা বদলে যায়।

রাজনৈতিক অবস্থান: রাজনীতির সাথে এই পেশার মেয়েদের সরাসরি সম্পর্কের কথা এই উপন্যাসে নেই। তবে রাজনৈতিক বদল এবং সরকারের নীতি তথা পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে সমাজে বদল এসেছিল এবং সরকারী বেশ কিছু প্ল্যান ব্যর্থ হওয়ার কারণে উত্তরোত্তর দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি বহু মানুষ চলে এসেছিল। দেশভাগ, বেকারত্ব বাড়ার ফলে অনেক মেয়ে এই পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়, ফলে তাদের ভাগ্যবিড়ম্বনার দায় দেশের সরকার ও রাজনীতির উপর খানিকটা হলেও বর্তায়^{৮০}।

সাংস্কৃতিক অবস্থান: কোনোরকম সংস্কৃতির কথা এই গল্পে বিশেষ নেই। তবে এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালী জাতির কথা, তাদের রুচি-সংস্কৃতির কথা বলা যেতে পারে। নটবর পালের মুখ দিয়ে লেখক বলিয়ে নিয়েছেন সেই কথা,

“মেয়েমানুষকে ব্যবসার কাজে লাগাতে বাঙালীদের যত আপত্তি...”^{৮১}।

তিনি ‘জাপানী গেইসা’ পদ্ধতির কথা বলেছেন, কিন্তু মনে রাখা দরকার প্রতিটি জাতির শিক্ষা-সংস্কার স্বতন্ত্র। কিন্তু সবথেকে বড় সত্যি হল জীবন আর সেই বেঁচে থাকার জন্যই বাঙ্গালী মেয়েদের এই আদিমতম পেশাকেই বেছে নিতে হয়। আবার এমন তথ্যও রয়েছে-

“বাঙালী মেয়েদের ব্যবসায় লাগিয়ে কত শেঠজী এই কলকাতা শহরে লাল হয়ে যাচ্ছে!...”^{৮২}।

অর্থাৎ চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

প্রাচীনকালে গণিকাদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো, তার মধ্যে রাজনীতির গূঢ় তত্ত্ব, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয় থাকতো, এর কারণ ছিল যাতে রাজা অথবা কোনো রাজপুরুষ তাদের সাথে অবসরবিনোদন কালে এসব বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। আর এই ১৯৭৬ সালে কলকাতায় বসে মিসেস গাঙ্গুলীর মতো একজন পেশাদার মহিলার মুখেও একই উক্তি শোনা যায়-

“মুড়ি-মিছরির তফাত যারা বোঝে তারা আমার কাছে আসে। আপনি তো জানেন, শুধু মুচমুচে গতর থাকলেই এ-লাইনে কাজ হয়না। আজকালকার মানুষের কত উদ্বেগ, মাথায় তাঁদের কত দুশ্চিন্তা। এইসব মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেওয়া, আদর আপ্যায়ন করে দু দণ্ডের শান্তি দেওয়া, একটু প্রশ্রয় দিয়ে খেলায় নামানো কি সোজা কাজ! পেটে একটু বিদ্যে না থাকলে, এসব লাইনে নাম করা যায় না”^{৮৩}।

অতএব সময় বদলেছে মাত্র; পরিস্থিতি সেই একই।

৮) শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত

মানদা দেবী লিখিত *শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত* আসলে তাঁর নিজের জীবনের কাহিনি, আত্মকথন বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থটি গবেষণার কাজে নির্বাচনের কিছু কারণ রয়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত যে যে গ্রন্থগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেইগুলি লেখকের কল্পনাপ্রসূত। কাহিনির বিষয়বস্তু এবং ঘটনাক্রম অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবনির্ভর, কিন্তু চরিত্রগুলির বাস্তবতার কোনো তথ্যসূত্র নেই বা সেরকম ইঙ্গিতও পাওয়া যায়না। কিন্তু মানদা দেবী স্বয়ং এই বইকে ‘আত্মচরিত’-এই অভিধায় অভিহিত করেছেন আর সেই কারণেই বইটি অন্যান্য বইয়ের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। বইটির বিষয়বস্তু এবং নামকরণ এই দু’দিক থেকেই স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। প্রথমতঃ একজন ‘পতিতা’ নিজের আত্মকথন করছেন, নিজের কালিমালিগু জীবনেতিহাস নিজের মুখেই বর্ণনা করছেন যা একেবারেই সহজ কাজ নয়। আর দ্বিতীয়তঃ নামকরণে ‘শিক্ষিতা’ শব্দের ব্যবহারে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি কোথায় এবং কেন অপরাপর সাধারণীদের থেকে আলাদা। শুধু তাই নয় এই বইটি পড়তে গিয়ে যে কথাটি মনে হয়েছে সেটি হল একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারী যার জীবনে আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছিল কীভাবে তাঁর পদস্থলন হল সেই বিষয়টিও তিনি বলতে চেয়েছেন।

মানদা দেবীর আত্মকথন থেকে তাঁর জীবন সম্বন্ধে সব তথ্য জানা যায়। পাঠশেষের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যে কথাটি বলা যায় তা হল, নিজের জীবনের যাবতীয় বৃত্তান্ত অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলেছেন তিনি। বইটি পড়তে পড়তে প্রতিটি পদক্ষেপে পাঠক হিসেবে সেই অনুভূতি হয়। গবেষক হিসেবে তাঁর লেখার মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ এবং সেই অনুযায়ী বিশ্লেষণ করাই আমাদের কাজ, শুধু উল্লেখ্য হল প্রাপ্ত তথ্যগুলি আমরা মানদা দেবীর বর্ণিত ক্রমানুযায়ী করবো কারণ তিনি লেখায় ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন।

শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত শুরু হয়েছে ‘আমার কৈফিয়ত’-এই শীর্ষক দিয়ে। তিনি স্বয়ং গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন,

“আমি পাপী, কলঙ্কিনী, যশের প্রার্থী নহি- সুতরাং আমার জীবনের খাঁটি কথাগুলি আমি যেমন অকপটে বলিতে পারিব, কোনো মহতই তাঁহার জীবনের ঘটনা তেমন অকপটে বলেন না

বলিতে পারেন নাই। পাপের স্বরূপ চিনিয়া রাখা প্রয়োজন। পাপ জিনিসটা যে কি কৈশোরে তাহা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই আজ আমি-আমি কেন-আমার মতো সহস্র সহস্র নারী পতিতা”^{৮৪}।

শুধু পাপের স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়াই নয়, তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃত পাপীদের স্বরূপ প্রকাশ করতে-

“কিন্তু যে সকল সাধুবেশী লম্পট আমাদের সংস্পর্শে থাকিয়াও সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন, আমার জীবনীতেও তাহাদের কতিপয় চিত্র দেখিয়া সমাজটাকে চিনিয়া রাখিতে পারিবেন। এই ভণ্ডের দল কি প্রকারে অবোধ বালিকার সর্বনাশ করে, তাহার চিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন”^{৮৫}।

তিনি সমাজ-সংসার বিষয়ে এমনকি দেশের রাজনীতি, পতিতাদের জন্য আইন-প্রস্তুতি বিষয়ক যাবতীয় সমকালীন বিষয়ে রীতিমত সচেতন ছিলেন। তাঁর শিক্ষা, রুচি এবং আত্মমর্যাদাবোধ বইটিতে ফুটে উঠেছে। ‘বাল্যে’-এই শিরোনাম থেকে অধ্যায়টিতে বর্ণিত বিষয় স্পষ্ট। প্রথমেই বলা হয়েছে মানদা দেবী প্রদত্ত তথ্যক্রমানুযায়ী আমরা বক্তব্য বিষয় পর্যালোচনা করবো। তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, ১৯০০ সালে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি পিতার প্রথম সন্তান এবং কন্যা সন্তান বলে তাঁর বাড়িতে কোনরকম বিরূপ মন্তব্যের সম্মুখীন তাকে হতে হয়নি। যে সময়ে তিনি এই বইটি লেখার জন্য মনস্থির করেছিলেন তাঁর পিতা এবং অন্যান্য পরিজনেরা জীবিত থাকায় অতিরিক্ত আর কোনো তথ্য তিনি উল্লেখ করতে পারেননি। তবে বোঝা যায় যে আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার ছিল তাঁর। বাল্যকালের যে বর্ণনা তিনি করেছেন তার থেকে ধারণা করা যায় তিনি স্পষ্টবক্তা (outspoken), কিছুটা বহির্মুখী (to some extent extrovert) প্রকৃতির ছিলেন। অবাধ মেলামেশা এবং কথাবার্তা ইত্যাদিতে স্বচ্ছন্দ হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, জন্মাবধি অত্যন্ত রুগ্ন হওয়ায় তাঁর মায়ের অদ্ভুত, অন্ধ-অপত্য স্নেহ ছিল তাঁর প্রতি আর সেই কারণেই সেই যুগে মেয়ে হিসেবে আলাদা করে কোনো নিয়মাদি তাকে মানতে হয়নি। এই উদারতার কারণ হিসেবে তিনি আরেকটি কথাও বলেছিলেন, তাঁর পিতা ব্রাহ্ম ছিলেননা কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের মতোই পর্দাপ্রথার বিরোধী ছিলেন। সেকারণেই যথেষ্ট মেলামেশা কিংবা বাইরে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে কোনো বাধার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়নি। আরেকটি তথ্য এখানে আলোচনা করা

প্রয়োজন, অনেক আত্মীয় মেয়েকে পাত্রস্থ করার উপদেশ দিলেও তিনি মেয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার দিকে বেশি আগ্রহী ছিলেন। নারীশিক্ষার সময়োপযোগিতা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি।

মাত্র ১০ বছর বয়সে মানদা দেবীর মাতৃবিয়োগ হয়। এই ঘটনাটি তাঁর জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নিজের আত্মচরিত লিখতে গিয়ে বহুবার তিনি এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। গভীর শোক পেয়েছিলেন, কিন্তু যে কারণে বারবার তিনি মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন তা হল কিশোরী বয়সে মায়ের অবর্তমানে তাঁকে শাসন করার, ঠিক-ভুলের পাঠ দেওয়ার, প্রকৃত জীবনদর্শন শেখানোর কেউ ছিল না, যার জন্য তিনি বিপথে পা বাড়িয়েছিলেন।

বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। পড়াশোনায় স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল এবং একই সঙ্গে মামাতো দাদার সাথে স্বদেশী বক্তৃতা শুনতেও যেতেন। প্রকৃতিগত ভাবেই তিনি বহির্মুখী হওয়ায় সেই যুগের মেয়েদের মতো ব্রীড়াবনতা একেবারেই ছিলেন না। এই অংশে তিনি নিজের সঙ্গীত পারঙ্গমতার কথা বলেছেন। পরবর্তী কালে প্রায়শই থিয়েটারে যাওয়া এবং অভিনয়ের প্রতি আকর্ষিত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের কথা যেমন বলেছেন ঠিক সেরকমই যেকোনো গান শুনে তা তুলে নেওয়া, সুর-তাল-জ্ঞানের অনায়াস দক্ষতার কথাও বলেছেন^৬। এমন কি ছোরাখেলাও আয়ত্ত করেছিলেন। যেটুকু বর্ণনা বা আত্মবিবরণ আমরা জানলাম তাতে একটি বিষয় সহজেই বোঝা যাচ্ছে, ১৯০০-১৯১১ এই সময়ের নিরিখে খুব উদারভাবেই মানদা দেবীর বাবা তাকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। মেয়েদের জন্য সমাজ নির্ধারিত নিয়মের বেড়াজালে তাঁকে আটকে রাখেনি।

বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখে তাঁকে পড়ানো হত। মূলতঃ কাব্য-উপন্যাসের প্রতি ভাললাগা ছিল, আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রায় প্রতিদিন থিয়েটারের অভিনয় দেখে সেই জগতের প্রতি মোহ। আসলে বাস্তববোধ এবং বাস্তব জগতের জ্ঞান একেবারেই ‘মানু’র ছিলোনা। ইতিমধ্যে তাঁর বাবা পুনর্বিবাহ করেন, কন্যাকে না জানিয়ে। পরিস্থিতির কারণে তাঁর সাথে বাবার যে স্বাভাবিক ভালবাসা, ভরসার সম্পর্ক ছিল তা বদলে গেলো অভিমানে, দূরত্ব তৈরি হল। বিমাতা মাত্র একবছরের বড় হওয়ায় তিনি সঙ্কোচ কাটিয়ে এগিয়ে আসতে পারলেন না। পারস্পরিক এই যে যোগাযোগ তা যত ক্ষীণ

হতে শুরু করলো ততই ঘরের প্রতি টান কমতে লাগলো। এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়, তাঁর তীব্র অসুখে গৃহশিক্ষক মুকুলদাদা সেবা করছেন। এই বিষয়টি তৎকালীন যুগের হিসেবে বেশ ব্যতিক্রমী কারণ একজন অবিবাহিতা মেয়ের রোগশয্যায় একজন পরপুরুষ, যতই তিনি শিক্ষক হন, যত সহজই সম্পর্ক হোক না কেন, তিনি সেবা করছেন, অঙ্গস্পর্শ করছেন, অন্তরমহলে প্রবেশ করছেন, আর আরও লক্ষণীয় হল মানুর অভিভাবিকা তার পিসিমা সমস্তটাই দেখছেন কিন্তু কোনোরকম আপত্তি করছেন না। এই ঘটনাটি সময়ের সঙ্গে, যুগের সঙ্গে একেবারেই মানানসই নয়।

এই আত্মচরিতে কোথাও মানদা দেবী প্রবঞ্চনা করেননি, নিজের অনুভূতির প্রতিও নয়, পাঠকদের সাথেও নয়। নিজের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি অবলীলায় তুলে ধরেছেন। নিজের প্রবৃত্তির কথা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের বাড়িতে চাকরিপ্রার্থী, বিবাহিত, দূরসম্পর্কের আত্মীয় রমেশদা এবং নিজের নিষিদ্ধ প্রেমের কথা বলেছেন। একজন পুরুষের স্পর্শ কীভাবে তাঁর নারীসত্তা জাগিয়ে তুলেছে তা তিনি বলেছেন। তাঁর মধ্যে দৈহিক প্রেম বা আরও স্পষ্ট করে বললে জৈবিক চাহিদাপূরণের আকাঙ্ক্ষা সুতীব্র ছিল কারণ প্রবৃত্তিকে কীভাবে শান্ত করতে হয় বা কী ভাবে সংযমী হওয়া যায় এই সব বিষয় তাঁর আয়ত্ত ছিলোনা এবং আয়ত্ত করার ইচ্ছেও বিশেষ ছিলোনা।

যেহেতু বাড়ির মধ্যে কোনো শাসন ছিলো না বা লক্ষ করার মতো অভিভাবকও ছিলো না ফলে উদ্দাম, অসংযমী মেলামেশার ফলে মানদা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন। এখানে আবার আরেকবার তাঁর মাতৃহীন হওয়ার প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক। পিতা নিজের নববিবাহিতা স্ত্রীর সাথে ব্যস্ত, ফলে মেয়ের এহেন পদস্থলন তাঁর গোচরে আসেনি, যদি মানদার মা জীবিত থাকতেন অথবা মাতৃস্থানীয়া কারোর স্নেহমিশ্রিত শাসনের মধ্যে তাঁর কিশোরীবেলা কাটতো তাহলে এতো কম বয়সে এতো বড় ভুল করতে তিনি করতে পারতেন না।

রীতিমত পরিকল্পনা করে সন্তানসম্ভবা মানুষকে নিয়ে রমেশ গৃহত্যাগ করে, অফিস থেকে তিনহাজার টাকাও তহরুপ করে। এই পরিকল্পনা সার্থক করে মানদার শিক্ষক মুকুলদা এবং বেথুন স্কুলে তার সহপাঠিনী কমলা, যারা নিজেরাও বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিল। এইখানে একটু আলোচনার পরিসর তৈরি হয়। মানুষ বা মানদার লেখা ঘটনাগুলি পড়লে খুব সহজেই বোঝা যায়, তাঁর জগতটা একেবারেই

কল্পনার রঙিন ফানুসের মতো। কোনোরকম বাস্তবতার স্থান সেখানে ছিলনা। প্রথমতঃ তিনি সবকিছু জেনেশুনেই একজন বিবাহিত পুরুষের সাথে ‘প্রেমের’ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর বান্ধবী কমলার স্বামী তাঁকে ‘রক্ষিতার কন্যা’ বলে ত্যাগ করেন, কিন্তু মুকুল তাঁকে বিবাহ করতে চান। এটি মানদা লক্ষ করেননি। সামাজিক স্বীকৃতি, বিবাহ ইত্যাদির প্রয়োজন এবং জ্ঞান তাঁর ছিলোনা। আসলে শারীরিক সম্পর্ক, যৌন-কামনা এগুলি পূরণ করার তাগিদে শুভাশুভের বোধ তাঁর একেবারেই ছিলোনা, সেইরকমই ছিলোনা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাবোধ। সেকারণেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া বা একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করে একজন সদ্যপরিচিত পুরুষের সাথে বেরিয়ে পড়া সবটাই তিনি খুব অবলীলায় করেছেন। কোনো পিছুটান অনুভব করেননি।

রমেশের সঙ্গে মানদা সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন, তীর্থভ্রমণ করেছেন কিন্তু সবজায়গায় ছদ্মনামে, মিথ্যে পরিচয়ে। মানদার বাবা পুলিশে খবর দিয়ে খোঁজখবর নিলেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেননি। এর পেছনে সমাজে তাঁর সম্মান রক্ষাই কারণ বলে মনে হয়। মেয়ে গৃহত্যাগিনী হয়েছে, অতএব ‘কুলটা’, তাই যতসম্ভব কম প্রচারের দ্বারা তাঁকে উদ্ধারের প্রয়াস করেছেন তিনি। মানদার অভিজ্ঞতা এতটাই কম ছিল যে রমেশের স্বরূপ চেনা তাঁর পক্ষে একেবারেই সম্ভব হয়নি। রমেশ আরেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল। মানদার দেশভ্রমণের প্রতি আকর্ষণ ছিল। তার পিতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর সাথে দেশভ্রমণে গেলেও তিনি কন্যাকে নিয়ে যাননি। কৈশোর এক অদ্ভুত, জটিল মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাময় সময়কাল। কোনোরকম শাসন-বারণ-নিষেধ ইত্যাদিকে এই সময়ের ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিকভাবে মান্যতা দেয়না। বয়ঃসন্ধিকালের মন খুবই অনুভূতিপ্রবণ এবং অভিমানী হয়। মানদার বাবার তাঁকে একসঙ্গে না নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি মানদার পক্ষে গভীর দুঃখের ছিল, বাবার এই অবহেলা সহ্য করা তাঁর পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে আর সেই সুযোগ নিয়ে রমেশ তাঁকে নিয়ে দেশভ্রমণের অছিলায় নানা স্থানে আত্মগোপন করে।

কাশীতে এসে মানদা প্রকৃত তথ্য জানতে পারলেন। এই অংশটিতে বাংলাদেশের মেয়েদের দুর্দশা, তাদের পদস্থলনের চিত্র ব্যাখ্যা করেছে রমেশ-

“মেয়েলি বুদ্ধি নিয়ে কি এই শর্মারাম কাজ করে? জানিস্ এই কাশীতে যত বাঙ্গালী আছে তার অধিকাংশই তোর রমেশ-দার দলের। কেহবা কারো ঘরের বউ বের করে এনেছেন--কেউ বা বিধবা পোয়াতি খালাস করতে এসেছেন-- কেহ আপন রক্ষিতা নারীর হাওয়া বদলাচ্ছেন- আবার এমন কেহ আছেন যাঁহারা নিজের আত্মীয় দ্বারা পাপ ব্যবসায় করাচ্ছেন। বাঙ্গালার কলঙ্কের এই তিনটি স্থান- নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন। ভয় কচ্ছিস্ কাকে? কে কাকে নিন্দা করবে? এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ”^{৮৭}।

তৎকালীন সামাজিক চিত্র একেবারেই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে।

এই কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন মানদা দেবী তাঁর “আমার কৈফিয়ত” অংশে। অবিবাহিতা কিশোরী, বিধবা, এঁদের স্থান হয় কাশী-বৃন্দাবনে; যাঁরা এঁদের ভুলিয়ে সমাজচ্যুত করে, দৈহিক কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়ে গেলে সেই সব পুরুষপুঙ্গবেরা সমাজে ফিরে যেতে পারেন এবং আবার হয়তো অন্য নারী-শিকারে লিপ্ত হন। কিন্তু এই মেয়েদের স্থান হয় সমাজের একেবারেই বাইরে, পতিতা পরিচয়ে। গর্ভিণী, অসুস্থ মানদাকে কপর্দকশূন্য পরিত্যাগ করে রমেশদা পালিয়ে যায়। পরে তাঁর ঠাই হয় সাধু মোহান্তজীর আশ্রমে।

প্রবৃত্তিগত কারণে মানদা একজন শিষ্যের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করেন। এইখানে তাঁর মনোবৃত্তি একটু বোঝা দরকার। সাধারণতঃ জীবনে ভুল করলে মানুষ নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে। অন্তত সাময়িকভাবে ধৈর্যশীল হয়, নিজের জীবনযাপনে পরিবর্তন আনায় প্রয়াসী হয় অথবা চেষ্টা করে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে (অবশ্য যদি সে নিজেকে পাপী বলে মনে করে)। কিন্তু মানু বা মানদার মধ্যে এগুলির একটিও লক্ষ করা যায়না। বয়স কম থাকা এর অন্যতম কারণ। তবে এখানে একটা কথা বলা যেতে পারে, অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরদৃষ্টি জাগিয়ে দেয়; সেক্ষেত্রে বয়স বাধা হয় না। মানদা প্রথমজীবনে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাতে দ্বিতীয়বার এই একই ভুল করা তাঁর উচিত হয়নি। কিন্তু নিজের জীবনী লেখার সময় তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন, শুভবোধের থেকে ক্ষণিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের আহ্বান তাঁর কাছে সেই সময় প্রবল ছিল যার আকর্ষণী ক্ষমতা তিনি এড়াতে পারেননি।

এরপরে কলকাতায় নারী উদ্ধার আশ্রমে তাঁর স্থান হল। তাঁর মতো বহুসংখ্যক মহিলা ওখানে আশ্রিতা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রৌঢ়া বিধবা যেমন ছিল তেমনি ছিল তের-চোদ্দ বছর বয়সী কিশোরীরাও। এরা প্রলোভনের শিকার। নানা রকমের শিল্পকর্মের দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম ছিল তারা। কিন্তু জীবনযাপনের বিষয়ে বা বলা ভালো জীবিকানির্বাচনের ক্ষেত্র সম্বন্ধে মানদা প্রশ্ন তুলেছেন। ‘অন্নবস্ত্রের সংস্থান’ হওয়াটাই মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, কীভাবে মানুষ তার জীবনবোধ গড়ে তোলে বা ঠিক-ভুলের পার্থক্য করে, সমাজে তার নিরিখেই প্রকৃত মানুষের মর্যাদা দেওয়া মেলে। এইখানে মানদা সমাজের অবক্ষয় দেখিয়েছেন-

‘পানওয়ালি, মেস-বেডিং-হোটেলের বা গৃহস্থ বাড়ির ঝি-চাকরানি, বাজারের মাছ-তরকারি-ফলমূল প্রভৃতি বিক্রয়কারিণী, রাঁধুনি, কারখানার মজুরানি, মশলা-ঝাড়াইওয়ালি, থিয়েটারের অভিনেত্রী, কীর্তনওয়ালি, শুশ্রূষাকারিণী, সংগীত-শিক্ষিকা, প্রসবকারিণী দাই, মেয়ে ডাক্তার, রেলের টিকিট-অফিসে ও টেলিফোনের মেয়ে কেরানি- ইহারা সকলেই স্থায়ী জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে; কিন্তু তাহা সকল সময়ে হয় না’^{৮৮}।

এই না হওয়ার কারণ ও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি এই ভাবে যে, এই মহিলারা কেউই কোনোদিন সংযমী হওয়ার শিক্ষা পান নি। বিবাহিত হননি, তাই বিবাহিত জীবনের নিয়ম-নীতি, সামাজিক শৃঙ্খলা প্রভৃতির অনুশাসন না থাকায় সহজেই প্রবৃত্তির পথে ‘পা বাড়িয়ে দেন’।

এই উদ্ধার-আশ্রমে থাকা-খাওয়ার অভাব না থাকলেও অন্যরকম বিপদ দেখা দিল। কয়েকজন কর্তব্যাক্তি মানদা, রাজবালা, কালিদাসী, এছাড়াও আরও রূপবতী কয়েকটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রেম নয়, সেটি কেবলমাত্র যৌনসম্পর্ক স্থাপনহেতু আকর্ষণ। আসলে সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী কোনো মেয়ের একবার পদস্থলন হলে তাকে সকলে সহজলভ্য মনে করে। তার পছন্দ বা মতামতের গুরুত্ব আছে সেটাই কেউ মনে করেনা। এইক্ষেত্রেও সেকথাই প্রযোজ্য। তাই বিয়ের প্রস্তাব তারা গ্রাহ্য করেনি। পতিতা মেয়েদের দেহভোগ করতে অসুবিধে নেই, কিন্তু তাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে সুস্থ, সামাজিক সম্মানসহ জীবনে প্রতিষ্ঠা দেওয়া- নৈব নৈব চ। এঁরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উদ্ধারপ্রাপ্তির আশায় গেলেও পতিতা বলেই তাদের

শুদ্ধিকরণ হয় না। সবরকম ভাবেই মুক্তি বা উদ্ধারের পথ বন্ধ দেখে তারা সিদ্ধান্ত নেয় দেহব্যবসা শুরু করার। রূপযৌবনকে মূলধন করে তারা ব্যবসা শুরু করে। যদি সেই সময় কোনোরকম ছুঁৎমার্গ না রেখে ব্রাহ্মসমাজ এঁদের উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতেন তাহলে এঁদের জীবন অন্যথাতে বইতে পারতো।

‘দেহ বিক্রয়’ ও ‘সমাজচিত্র’- এই অধ্যায় দুটি থেকে শুরু মানদা দেবীর বেশ্যাজীবনের আখ্যান। কিশোরীবেলায় যে ভুল তিনি করেছিলেন পরবর্তী জীবনের সবটুকু জুড়েই তার মাশুল দিয়ে গেছেন। ভুলের বৃত্তে জড়িয়ে তিনি পরপর আরও ভুলই করেছেন, কখনো স্বেচ্ছায় আবার কখনো পরিস্থিতির পাকেচক্রে। মানদা দেবী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিজের জীবনের কাহিনী বিবৃত করেছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যেটুকু তথ্য আমরা পেয়েছি তাকে বিশ্লেষণ করে কিছু বিষয় আমরা বুঝতে পেরেছি। ইংরাজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে পর্দাপ্রথা উঠে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ গড়ে ওঠে এবং বহু ক্ষেত্রেই তা অন্তরমহল অঙ্গি গড়িয়ে যায়। ফলতঃ নিষিদ্ধ যৌনসম্পর্ক বাড়তে থাকে। একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অল্পবয়সী বিধবাদের সংখ্যাবৃদ্ধি যারা সংসার বোঝার আগেই স্বামীহারা হয়েছিল অতএব অতৃপ্ত যৌনবাসনার বশে খুব সহজেই পরপুরুষের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়তো। শুধু এটাই একমাত্র কারণ নয়, এর পেছনে আরও কারণ রয়েছে। সদ্য বিধবা বা কমবয়সী বিধবাদের সমাজ এতোটাই কঠিন, কঠোর অনুশাসনে আবদ্ধ করে রেখেছিল যে তারা সহজেই মিথ্যে প্রেমের জালে আটকা পড়তেন। অনেকে পুনরায় বিয়ে এবং সংসারের স্বপ্ন দেখতেন কারণ তখন বিধবা-বিবাহ প্রচলন হয়েছে। আবার কুমারী মেয়েদের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্যরকম। অভিভাবকহীন অবস্থা অথবা অভিভাবকদের যথাযথ শাসন না থাকার জন্য তারা সহজেই দূরসম্পর্কের আত্মীয় কিংবা শিক্ষকস্থানীয় কোনো পুরুষের সাথে স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করতো। ভবিষ্যতের ন্যূনতম চিন্তা তারা করতো না কারণ জীবন তাদের তখনও পর্যন্ত ততটা অভিজ্ঞ করে তোলেনি আর পরে যখন তাদের বাস্তবজ্ঞান হয়, ফিরে যাওয়ার উপায় থাকেনা।

মানদা দেবীর পরবর্তী জীবনকথা আমরা পড়বো সাধারণ বেশ্যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মূলতঃ যারা এই পেশার সাথে যুক্ত এবং পতিতাপল্লীতে থাকে তাদের কথা বলেছেন মানদা। তাঁর জবানীতেই খোদ কলকাতার বৃকে হয়ে চলা দেহব্যবসা সম্বন্ধে পরিষ্কার তথ্য পাব। এই তথ্য ভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ নেই, কারণ এখানে পতিতাপল্লীতে বসবাসকারী এক পতিতাই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই এই পরবর্তী পর্যায় থেকে আমরা একজন সাধারণ কিন্তু শিক্ষিতা পতিতার পতিতাপল্লীর জীবনচর্যা ফিরে দেখব, বোঝার চেষ্টা করবো কেমন ছিল সেই সময়ের কলকাতার বেশ্যাদের দিনযাপন।

মানদা দেবীর প্রথম পেশাদারী বেশ্যালয় দেখার অভিজ্ঞতা হয় হাড়কাটা গলিতে^{৯৯}। এই হাড়কাটা গলি কলকাতা শহরের অন্যতম কুখ্যাত পতিতাপল্লী। যে মহিলার বাড়িতে তাঁরা আশ্রয় পান তিনি ‘ভিন্ন ভিন্ন ঘরে বেশ্যা ভাড়াটে’ রেখে অর্থ উপার্জন করতেন এছাড়াও নিজেও একই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। মানদা জানিয়েছেন, ‘এই প্রকার স্ত্রীলোককে পতিতা নারী সমাজে ‘বাড়িওয়ালি’ নামে অভিহিত করা হয়’^{১০০}। পরিবেশ একেবারেই অস্বাস্থ্যকর। মানদা যে যে পাপাচরণ করেছেন তার সাথে বেশ্যাপল্লীর বৃত্তিগত কোনোরকম সাযুজ্য নেই, থাকার কথাও নয়, কারণ তিনি সেগুলিকে অর্থ রোজগারের উপায় করেননি। উপরন্তু ভদ্র, উচ্চবিত্ত পরিবারের কন্যা হওয়ার জন্য যে সূক্ষ্ম রুচিবোধ, শিক্ষা ও শৈল্পিক দৃষ্টি তাঁর ছিল সেগুলি সব এখানে এসে ধাক্কা খেয়েছিল। বেশ্যাপল্লির সব কিছুই বড় উঁচুতারে বাঁধা, সেখানে সূক্ষ্ম কিছু স্থান নেই বললেই চলে।

বাড়িওয়ালি মাসিরা তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সাহায্যে বিপদগ্রস্ত, অসহায় মেয়েদের কখনো কথায় ভুলিয়ে আবার কখনো জোর করে এই পেশায় আসতে বাধ্য করতেন। কারণ নিত্যনতুন ‘নারীমাংসের’ চাহিদা প্রবল। তাই শিকার না ধরলে ব্যবসা নষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। মানদার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে, যেহেতু প্রবৃত্তিসংঘর্ষের কোনো প্রয়াস মানদার মধ্যে ছিলোনা তাই তাঁকে নানারকম যুক্তিজালে ভুলিয়ে এই বৃত্তিগ্রহণ করানো খুব সহজ ছিল। যে কোনোরকম সমাজনির্দিষ্ট পাপের প্রতি তাঁর একটা স্বভাবজ আকর্ষণ ছিল, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও দুটি বিষয়। মানদা শিক্ষিতা ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা তাঁর ছিল না।

পুঁথিগত শিক্ষা, বিশেষ করে নাটক-নভেল ইত্যাদি পাঠের ফলে সবসময় একটি কাল্পনিক জগতে বাস করতেন তিনি। বাস্তবের জ্ঞান একেবারেই ছিলনা। আর্থিক সচ্ছলতার কারণে কোনোদিন অন্নবস্ত্রের চিন্তা তাঁকে করতে হয়নি, তাই বাড়ির চার দেওয়ালের সুরক্ষিত স্থান থেকে একা একটি কিশোরী মেয়ে পরপুরুষের সাথে গৃহত্যাগ করলে কী দুর্দশা হতে পারে তার আন্দাজ তাঁর ছিলোনা। অভিভাবকের স্নেহপূর্ণ শাসন না পাওয়ায় রমেশের মিথ্যে প্রেমের জালে আবদ্ধ হওয়াও খুব স্বাভাবিক ছিল। আর দ্বিতীয় কারণ ছিল একান্তই জৈবিক। শারীরিক সম্পর্কের প্রতি তাঁর যে তীব্র তৃষ্ণা ছিল তাও বহুবার উল্লেখ করেছেন।

মাসির কাছ থেকে ধার নিয়ে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে তাঁরা আরমহারস্ট স্ট্রীটের বস্তিতে খোলার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। এখানে যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে কিছু সাধারণ বিষয় পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে-

প্রথমতঃ মানদা ছাড়া যাঁরা ঐ বস্তিতে বাস করত তারা কেউ লেখাপড়া জানত না, সেই ব্যাপারে কারো আগ্রহও ছিল না, তাদের মূল আলোচনার বিষয় ছিল কার কতজন ‘বাবু’ আছেন, কার কত উপার্জন হল ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ অনেকে ঘরের অন্যান্য কাজ করার জন্য চাকর রাখত, সেই আর্থিক সচ্ছলতা তাদের ছিল। তৃতীয়তঃ বেশ্যারা যেকোনো মন্দিরে সহজেই প্রবেশাধিকার পেত আর সেই সুযোগে তারা ‘বাবু’ ‘ধরত’। চতুর্থতঃ সেই সময়ের পতিতাদের সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে নাম নথিবদ্ধ করাতে হতো। পঞ্চমতঃ রানিমাসির নিজের বয়ানে আমরা আসল সমাজচিত্র দেখতে পাই, যেখানে পিতার সামনে কন্যা এই পেশায় যুক্ত অর্থাৎ পিতার অনুমতি আছে। আবার গর্ভধারিণী মা নিজের মেয়েকে নিজের হাতে প্রস্তুত করে খদ্দেরের কাছে পাঠাচ্ছে। একজন বেশ্যার উপার্জনের টাকায় সমস্ত সংসারের খরচ চলছে। সহজেই বোধ্য কন্যার উপার্জিত অর্থ নেওয়া যায় কিন্তু কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়া যায়না। ষষ্ঠতঃ গর্ভনিরোধক ওষুধ নিয়মিত সেবনের জন্য কারো কারো শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা যেত, হাসপাতালে চিকিৎসা হলেও কারো কারো মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

বেশ্যাপল্লীর বিশদ বিবরণে কিছু সামাজিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে যেগুলি আদতে যৌনবিকৃতির উদাহরণ। অংশটি হুবহু এইরকম-

“আর কি বলব মা, সেদিন যে একটি স্ত্রীলোক রামবাগান থেকে আমার বাড়িতে এসেছিল, তাকে ত তোমরা দেখেছ। তার ইতিহাস শুনবে? তার পিতা.....ভট্টাচার্য; কলিকাতার কোনো কলেজের খুব বড় অধ্যাপকের কাজ করতেন। বেশি বয়সে কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন রামবাগানে আপন রক্ষিতার গর্ভজাত কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়ে শেষকালটা কাটাচ্ছেন- এই তো অবস্থা”^{১১}।

রানিমাসির এই উক্তি বুঝিয়ে দেয় শিক্ষার মোড়ক থাকলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়না আর যৌনপল্লীর আনাচেকানাচে এই ধরনের বিকৃত যৌনতার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে।

পেশাগত কিছু তথ্য মানদা দেবী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ‘মাসি’ ‘কাপড় পরিবার ফ্যাশান, দাঁড়াইবার ভঙ্গি, কথা বলিবার কায়দা, চলিবার রীতি’- এইসব বিষয় শিখিয়ে দিতেন, শিখিয়ে দিতেন ‘বাবু’দের মনোরঞ্জননের নানারকম উপায়। বেশ্যাদের সম্পর্কে প্রচলিত আছে তারা প্রতারণাপটু আর সেই কথাটি সত্যি বলেই মনে হয় মানদার কথায়। মদ্যপানের অভিনয়, ছলা-কলা এবং অতি অবশ্যই ভালবাসার অভিনয় শিখতে হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল লোকচরিত্র-শিক্ষা। কোন ব্যক্তি ভালো, কে রোগাক্রান্ত অথবা কার চুরির পরিকল্পনা আছে এগুলি তাঁদের বুঝতে হতো মুখ আর ভাবভঙ্গী দেখেই। কিছু লোক ডাকাতির মতলবে গ্রাহক সেজে লুটপাট করতো আবার কখনো পতিতার সন্ধিতে অর্থ ও গয়নার লোভে বন্ধ দরজার ওপারে খুন করতেও পিছুপা হতোনা কেউ কেউ। উল্লেখ্য হল এই ধরনের অপরাধীদের কোনোরকম শাস্তি বা পুলিশি ব্যবস্থার কথা কিন্তু মানদা কোথাও বলেননি, ফলে এটুকু অনুমান করে নেওয়াই যায় যে সেই সময় আইনী সুযোগসুবিধা বেশ্যাদের পক্ষে বিশেষ ছিলোনা।

সমাজের প্রায় সব স্তরের মানুষেরই এই পল্লিতে অবাধ যাতায়াত। দিনের আলোয় এই পল্লী নিদ্রিত থাকে; আর যত রাত গভীর হয় এই অঞ্চলের প্রাণচঞ্চলতা বাড়তে থাকে। মানদার এক সহকর্মী রাজবালার কথায় যারা ধনী জমিদার গোষ্ঠীর লোক তারা বন্ধুবান্ধবদের সাথে মদ্যপান, আনন্দ, গান-বাজনা এই সব উপভোগ করতে বেশ্যালয়ে আসে। এরা নিজেদের পরিচয় প্রকাশিত হলেও তা নিয়ে লজ্জিত নয়। তারা যা করে সর্বসমক্ষে। মূলতঃ রামবাগান-সোনাগাছি এলাকাতে এদের আসা যাওয়া। আর একদল-

“....লম্পট আছে, যাহারা সমাজের নিন্দার ভয় করে, যাহারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলিয়া সম্মানিত, তাহারা একাকী গোপনে বেশ্যাগৃহে আসে। কেবলমাত্র তাড়নাই ইহাদের আসিবার কারণ। গান বাজনা বা অপর কোনো আমোদপ্রমোদ ইহারা চাহে না। লুকাইয়া লুকাইয়া ইহারা চলিয়া যায়, এদিকে লোকসমাজেও নিজেদের মানমর্যাদা ও সুনাম রক্ষা করে। কবি, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক, নামজাদা উকিল, স্কুলের মাস্টার, কলেজের প্রফেসর, রাজনীতিক নেতা-উপনেতা, গভর্নমেন্ট অফিসের বড় কর্মচারী, ব্রাহ্ম, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বিদ্যাভূষণ, তর্কবাগীশ- প্রভৃতি উপাধিধারী অধ্যাপক, পুরোহিত, মহান্ত, গুরুগিরি-ব্যবসায়ী এইসকল লোক এই শ্রেণীর”^{৯২}।

বেশ্যারমণীদের আর্থিক অবস্থা সর্বদাই পরিবর্তনশীল। উচ্চবিত্ত ‘বাবু’-র রক্ষিতা হয়ে থাকলে অথবা সেই স্তরের বেশ কয়েকজন খদ্দের থাকলে তাঁদের আনুকূল্যে আর্থিক সচ্ছলতা থাকতো। তাদের দক্ষিণে বিভিন্ন ভালো হোটেলে, সর্বসমক্ষে লোকসমাজে মেলামেশা করতে পারতেন এবং সেই বাবদও বেশ কিছু আয় হত। এছাড়াও বহুমূল্য আসবাবপত্র, দামী শাড়ী, গয়না, গ্রাহকের মনোরঞ্জনের জন্য সুস্থ রুচির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আয়না, বুক কেস ইত্যাদি দিয়ে অন্তরসজ্জা করা হত। তবে এই সবটাই নির্ভর করতো যিনি বাবু তিনি কত খরচ করছেন তার উপরে। মদ্যপান আর রেসের খেলায় সর্বস্বান্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই সেই খরচ কমে যায়। এছাড়া যে সকল পতিতা ভালো গায়িকা তাদের রোজগারের আরেকটি উৎস ছিল জমিদারদের বাগানবাড়িতে অথবা মজলিশে গানের মুজরো। পতিতাদের সমাজের নিজস্ব কিছু নিয়ম আছে, তার মধ্যে অন্যতম হল কোনো বেশ্যার বাঁধা বাবুর বন্ধু বা পরিচিত জনের সাথে শারীরিকভাবে জড়িয়ে পড়া নিষিদ্ধ। কিন্তু নিয়মের ব্যত্যয় হয়। ‘দালাল’-দের কথা বলেছেন তিনি, নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি থেকে ‘ভদ্রলোক’ বলে পরিচিতি ব্যক্তিরও বেশ্যাদের দালালি করতেন^{৯৩}। এইগুলি সাধারণ বেশ্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। আর মানদা দেবীর ব্যক্তিগত জীবনী অনুযায়ী তিনি নিজের পুরনো সব পরিচয় লুকিয়ে নতুন বাড়ি ভাড়া নিয়ে নতুন পরিচয়ে নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করেন। টিপার্টি, গার্ডেন পার্টি ইত্যাদির আয়োজন করে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতেন। নিজের ত্যাজ্য সম্পত্তি মৃত্যুর পরে সমাজের নিম্নশ্রেণীর উদ্ধারকাজে ব্যয় করার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন।

নিজেকে ঘৃণ্য পতিতা বলে মনে করলেও মানদা দেবী যে রীতিমত সমাজসচেতন ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর আত্মচরিতের বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে আছে। শিক্ষিতা হওয়ার কারণে এবং নিজের জীবনে ভুল পদক্ষেপের কারণে তিনি সমাজ এবং সমাজ-নির্দিষ্ট নিয়মকে পরবর্তী জীবনে যথেষ্ট মান্যতা দিয়েছেন। সমাজে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মেয়েদের অত্যন্ত নিচু চোখে দেখা হতো। প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকেরা এই ভাবধারাকে বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই সময়ের আধুনিক সাহিত্যিকেরা এই চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করেছে বলেই কোনো মেয়ের মধ্যে মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়না। এই প্রসঙ্গে মানদা দেবী কিন্তু সহমত পোষণ করেননি। তিনি মনে করেছেন এই ‘রিয়্যালিস্টিক আর্ট’ এর কারণে সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়, ভদ্র কন্যাদের নৃত্যশিক্ষণ এবং প্রদর্শন এই সমস্ত কারণগুলির সমন্বিত প্রভাবে সমাজে পতিতা মেয়েদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এছাড়াও ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, উকিল, জমিদার, নবাব গোত্রের ধনাঢ্য ব্যক্তির এক বা একাধিক বেশ্যার জন্য লাগামহীন অর্থব্যয় করতেন। ফলে শেষপর্যন্ত তাঁরা নিজেরা তো দেউলিয়া হতেনই, সেইসঙ্গে সরকারী ও জনগণের সম্পত্তি নষ্ট করতেন। নিজে একই পেশার হলেও মানদা দেবী এই কাজের তীব্র সমালোচনা করেছেন। খোদ কলকাতার বৃক্ক বাসকারী দুশ্চরিত্র জমিদার প্রতিবেশী কুলবধূদের জোর করে নিয়ে এসে অত্যাচার করত। এ ব্যাপারে প্রশাসনের কোন ভূমিকার কথা তাঁর লেখায় পাওয়া যায়না। সমাজের বিভিন্ন দিক নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি, তাঁর পেশার প্রতি সৎ থেকেই।

তিনি সেই সময়ের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কথা লিখেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী বহু পতিতার উদ্ধার করেছিলেন^{৯৪}। আবার দেশবন্ধু শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ দেশের কাজের জন্য পতিতাদের উপার্জিত অর্থ গ্রহণে মত দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ সমাজের সবস্তরের মানুষের সাথে আলাপ-পরিচয়, দেশের কাজ করার জন্য তাদের এগিয়ে আসা এবং উৎসাহী হয়ে দেশসেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা -এই সব দেখে সাধারণ লোকের মনে যে ঘৃণার ভাব ছিল তা অনেকটা দূর হয়েছিল। কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী ফল ছিল বিষময়। স্বভাবগত এবং পেশাগত অভ্যাস অনেকেই ত্যাগ করতে পারেননি, সেইজন্য পুরুষকর্মীদের অনেকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কর্তব্যে অবহেলা শুরু করেছিল। অনেক ‘কুলবধূ’ প্ররোচনায়

পরিবার ত্যাগ করেছিলেন। ভারতে যে সময় অসহযোগ আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে এগুলি সেই সময়ের ঘটনা। উত্তরবঙ্গের প্লাবনকালে তারা মিছিলের মতো শোভাযাত্রা করে গান গেয়ে ভিক্ষা করে অর্থসংগ্রহ করে তা তহবিলে দান করে। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূর করতে চেয়েছিলেন আর তারই কয়েকজন শিষ্য এর মধ্যে পতিতাদের সমাজের মূলস্রোতে আনার প্রয়াস করেছিলেন, ফলে নানা স্থানে ‘পতিতা নারীসঙ্ঘ’ ইত্যাদি গঠিত হল, কিন্তু তাদের মধ্যে সংযম, দৃঢ়তা না থাকায় বেশিদিন কোনটিই টিকে থাকতে পারেনি। মানদা দেবী বারবার যে কথাটি খুব জোরের সাথে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, নিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম এবং অনুশাসন – সমাজে বসবাসের জন্য এগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মানুষের হৃদয় প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল, অসংযমী তাই প্রাথমিকভাবে পারিবারিক ও পরে সামাজিক আইন ও নীতিশিক্ষার দ্বারা সবসময় তাকে প্রবৃত্তিকে শান্ত ও সংযমী করে তুলতে হবে। আসলে দীর্ঘকালীন অভ্যাস হিসেবে এটিকে তৈরি করতে হবে, তবেই সমাজ কলুষমুক্ত করা সম্ভব।

মানদা দেবীর নিজের আত্মচরিতে ১৯০০-১৯ খ্রিস্টাব্দের কথা লিখেছেন। তাঁর লেখার ভঙ্গী সাবলীল এবং বিষয়বস্তু বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি কোনোরকম মিথ্যাচার করেননি বলা যেতে পারে। একজন ভদ্র পরিবারের শিক্ষিতা কন্যা বয়ঃসন্ধিকালে করে ফেলা ক্ষণিকের ভুলের মাশুল দিয়েছেন সারা জীবন জুড়ে, অন্তত নিজের জীবনের যে সময়ের কথা তিনি লিখেছেন সেখান থেকে এইকথাই মনে হয়। যে পরিস্থিতিতে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন সেই অবস্থা তখনকার বহু ভদ্র, শিক্ষিত পরিবারে একরকম নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তার কারণ ছিল উনিশ শতকীয় মুক্ত আবহাওয়া যেখানে নারীপুরুষের মেলামেশায় বিশেষ বাধা ছিলোনা। তৎকালীন অনেক খ্যাতনামা লেখকের রচনায় সেকথা পাওয়া যায় আর সত্যি উদাহরণ মানদা নিজে। বিধবা, অভিভাবকহীন মেয়েরা মিথ্যে প্রেমের জালে পড়ে সমাজচ্যুত হতেন। অনেকে সন্তানসম্ভবা হয়ে আত্মহত্যা করতেন আবার অনেকে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য দেহব্যবসা বেছে নিতেন। তবে এখানে মানব মনস্তত্ত্বের একটি দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন। সমাজের সব মেয়েরাই যে অসহায় বা প্রলোভনে পড়ে এই পেশায় আসতেন এই তথ্যটি কিন্তু সর্ব অংশে সত্যি নয়, এমন বহু মেয়ে ছিলেন যাঁরা যৌনসুখ ভোগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন বলেই

নিজের দেহকে ব্যবহার করে অর্থ রোজগার করা পাপ তাঁদের মনে হয়নি। ‘গণিকা’দের মধ্যে এমন অনেকে থাকেন যাঁরা ভাবেন শুধু পুরুষ নয়, নারীরও সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে দৈহিকসুখ ভোগ করার। মানদা নিজেও নিজের এই প্রবৃত্তির কথা বলেছেন, পুরুষকে আকর্ষণ করার যে ক্ষমতা এবং দক্ষতা (প্রধানতঃ শরীরী ভাবে) তা একরকম উত্তেজকের মতো কাজ করতো যেন। কয়েক প্রজন্মের পতিতা আর কোনো কারণবশতঃ বাধ্য হয়ে এই বৃত্তি বেছে নিয়েছেন এই দুই ধরনের মেয়েদের কথা এসেছে তাঁর লেখায়। নিজে পতিতার জীবন কাটিয়েছেন বলে এই সমাজ, তাদের নিয়ম-নীতি, তাদের আচার-বিচার কিংবা একান্ত দিনযাপন সব লক্ষ করেছেন তিনি।

এই ধরনের জীবনী লেখা বা লেখার স্পর্শ দেখিয়েছিলেন মানদা। একজন পতিতা যিনি সমাজনিন্দিত তিনি সমাজের ভয় না পেয়ে পতিতাবৃত্তির যাবতীয় তথ্য লিখেছেন। সমাজের তথাকথিত সম্মাননীয় ব্যক্তিবর্গের স্বরূপ দেখিয়েছেন। অনেকের নাম স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন আবার অনেকের পরিচয় দিয়েছেন গূঢ়ভাবে। নিজের চরিত্রের প্রতি কোনরকম সহানুভূতি রাখেননি তিনি, যাবতীয় নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন।

সাহিত্যের চরিত্র থেকে বিচার আর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার কিছু মিল থাকলেও পার্থক্য থাকেই। এই ধরনের স্মৃতিকথা বা জীবনচরিত্রের সাহায্যে আসল পরিস্থিতির অনুধাবন করা সহজ হয়। সেই যুগে পতিতা সমাজে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা খুব বেশি ছিলোনা বা থাকলেও তারা কেউ এইধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহী ছিলেন না বলেই মনে হয়। তাই ব্যতিক্রমী এই বইটি আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশক হয়ে রয়েছে।

১০) বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ

পাঁচটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রচনার সংকলন এই বইটি। প্রত্যেকটি রচনার প্রকৃতি আলাদা। তাহলে কোন্ সাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য এগুলিকে একত্রিত করা সম্ভব হয়েছে? ‘বেশ্যা’ ও ‘বেশ্যাবৃত্তি’ এই দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সাথে কালের স্বাভাবিক নিয়মে আরও বহু বিষয় সংযুক্ত হয়েছে, আইনী পরিবর্তন হয়েছে, সমাজচিত্রও কিছুটা বদলেছে। উনিশ শতকেই খুব দীর গতিতে হলেও

বেশ কিছু সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক পরিবর্তন আসছিল যেগুলি পতিতাপঙ্কীর অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, তাদের পেশা এবং ব্যবসায় বিপুল ব্যাঘাতের সৃষ্টি করছিল। এই অধ্যায়টিতে আমরা এই পাঁচটি রচনা সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব, বিশেষ করে প্রথমটি সম্পর্কে, কারণ তার বর্ণিত বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশদ আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা/সঙ্কলক	প্রকাশ কাল
বেশ্যা গাইড	শ্রী গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৮৬৮
বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি	কোন নাট্যানুরাগী ব্যক্তি	১৮৬৩
পাঁচালী কমলকলি	শ্রী অঘোরচন্দ্র ঘোষ	১৮৭২
বেশ্যাই সর্বনাশের মূল	চণ্ডিচরণ ঘোষ	১৮৭৩
এলোকেশী বেশ্যা	বিবি মিশ লেসলি	১৮৭৬

‘বেশ্যা গাইড’: শ্রী গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগ্রহীত এই বইটির মূল বিষয় সম্পর্কে লেখা রয়েছে, ‘স্পর্শক্রামক রোগ নিবারণার্থে ১৮৬৮ সালের ১৪ আইন তথা এই আইন সংক্রান্ত আফিস বন্দোবস্ত ও বিধি বিষয়ক’। এই বইটির আলোচ্য বিষয় হল ১৮৬৮ সালে ‘Contagious Diseases Act, XIV of 1868’ বা ‘চোদ্দ আইন’^{৯৫} ইংরেজ সরকার এই বৃত্তি অবলম্বনকারী মেয়েদের সরকারী তালিকাভুক্ত করতে চেয়েছিল। তাদের স্বাস্থ্যবিধি, পেশাগত সুরক্ষা ইত্যাদি সরকারের লক্ষ্য ছিল, যদিও আইন এবং নিয়ম বাস্তবায়িত হলে পতিতাদের পক্ষে সবটাই খুবই দুর্বিষহ অত্যাচারের নামান্তর ছিল। বেশ্যাদের কী কী করণীয় সেই সবার তালিকা, সরকারী দরখাস্ত সমস্ত কিছু সংবলিত এই বইটি আদতেই একটি গাইড বা সহায়ক বই।

‘বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি’: চারটি অঙ্কের একটি প্রহসন যার লেখক নিজের পরিচয় দিয়েছেন ‘কোন নাট্যানুরাগী ব্যক্তি কর্তৃক’। প্রহসনটির মাধ্যমে সমাজে বেশ্যাদের প্রতিপত্তি এবং ‘বাবু’সম্প্রদায়ের

তাদের প্রতি আসক্তি, সেই আসক্তির ফলে ‘বাবুদের’ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়া- এইটি দেখাতে চাওয়া হয়েছে। যে সময়ে এই প্রহসনটি লেখা হয়েছে তাতে একথা পরিষ্কার বোঝা যায়, সমাজের ‘নব্য যুবা’-দের সচেতন করা, সাবধান করাই মূল উদ্দেশ্য। শুধু বেশ্যারাই নয়, কিছু মধুলোভী বন্ধুবেশী মোসায়েব যারা ধনী লোকেদের অর্থে পরস্পরপদী আনন্দের ভাঙার খোঁজে আর সেই ধনী ব্যক্তির মগজধোলাই করে পাপের দিকে ঠেলে দেয়, সেইসব বন্ধুবেশী শয়তানদেরও চিনিতে দেওয়ায় প্রয়াসী ছিল এই প্রহসন।

হেমলতা নাম্নী প্রিয়বাবুর রক্ষিতা কীভাবে তাঁকে প্রতারিত করে তাঁরই বন্ধু কেদারবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে আগ্রহী ছিল; কীভাবে দিনবাবু-শ্যামবাবু ও মোহনবাবু -এই তিনজন প্রিয়বাবুকে কেবলমাত্র তাঁর অর্থের জন্য ব্যবহার করেছেন এই প্রহসনের এটি বক্তব্য বিষয়। বেশ্যাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণাটি কেদারবাবুর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে-

“...সামান্য বেশ্যাদের উপর লভ্ (Love) কি ফেৎ (Faith) রাখা উচিত নয়, স্ত্রী জাতি মাত্রেই অবিশ্বাসিনী, তাতে বেশ্যা, ওরা অর্থের লোভে সকলি কত্তে পারে, এমন কি ধন পেলে জীবন পর্যন্ত বিনাশ করে।”^{৯৬}

কিন্তু ধূতা হেমলতা যখন নিজের পেশার কথা বলেন তখন বিশ্বাসঘাতিনী, পাপিষ্ঠা মনে হলেও কোথাও যেন সামান্যতম দয়ার উদ্বেকও হয় তাঁদের প্রতি-

“.. বিশেষ আমাদের এপেশার গতিকি এই, চিরকাল একজনের কাছে কখনই কাটেনা আমরা সুজগ পেলে দুটাকা উপরি রোজকার কত্তে কখনই ছাড়িনা, তা বাবু দশবার কত্তে কত্তেই একবার ধরা পড়তে হয়...”^{৯৭}

‘পাঁচালী কমলকলি’: পাঁচালীর আকারে এই রচনাটি লেখা হয়েছে। ‘চোদ্দ আইন’-এর ফলে বেশ্যাদের জীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, কীভাবে তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সরকারী আইনের ফলে তাদের বহুরকম বিড়ম্বনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে (যে কারণে এই পল্লীর মেয়েদের মধ্যে একটা পেশাকেন্দ্রিক ভয় দেখা দিয়েছিল) - বেশ্যাদের এই সব

অনিশ্চয়তার কথাই প্রচলিত পাঁচালীর মাধ্যমে বলা হয়েছে যাতে মেয়েরা খুব সহজে নিজেরাই তা মনে রাখতে পারে-

“এইরূপেতে যত খানকী ভেবে আকুল খান কি,
হান্ কি বলে কেউ বা সান্‌কি ধরে
এদিকেতে হলুস্থূল, ভেবে আকুল খানকি কুল,
আকুল পাথার দেখছে পরস্পরে।।
ধরাধরির ভারি ধূম, কারো চক্ষে নাহি ঘুম,
গুম হয়ে ভেবে পায় না দিশে।
বলে কিসে হব পার, এ পাপে এড়ান ভার
সজনী লো রক্ষা পাব কিসে।।”^{৯৮}

‘বেশ্যাই সর্বনাশের মূল’: নামকরণ থেকেই বিষয়বস্তু পরিষ্কার। দ্বিতীয় গ্রন্থটির মতো এখানেও বেশ্যাদের পাপিষ্ঠা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ‘কুহকিনী’ এবং তাদের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ‘সুশীল’ বালকদের জীবন নষ্ট হয়। প্রতারিত ও নিঃস্ব হয়ে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে, সংসার ধর্মে প্রবেশ করে। রচয়িতা শ্রী চণ্ডিচরণ ঘোষ বলেছেন তিনি বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিদের ভ্রান্তি দূর করার জন্য এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন^{৯৯}।

‘এলোকেশী বেশ্যা’: উনিশ শতকে মিশনারিরা এসে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নিম্নবর্ণের, অন্ত্যজশ্রেণির মানুষদের পাশাপাশি বিপথে আসা অল্পবয়সী বিধবাদের, বিশেষ করে যাঁরা দেহব্যবসায় এসেছিলেন, তাঁদের ‘মুক্তি’র পথ দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁরা, অবশ্যই নিজধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তবেই যীশুর কৃপায় তাঁদের পাপমুক্তি হবে।

গল্পের নায়িকা এলোকেশী নামের একটি বিধবা বালিকা, যে প্ররোচিত হয়ে এই পেশায় এসেছিল তাকে এক খ্রিস্টান মিশনারি মহিলা ধর্মান্তরিত করায় প্রয়াসী হন^{১০০}।

এই সংগ্রহগ্রন্থটি নির্বাচনের কারণ এই পাঁচটি রচনা উনিশ শতকের বেশ্যাদের জীবননির্ভর। তাদের নৈতিকতা, পেশার প্রকৃতি, ধর্মান্তরিতকরণ এবং চোদ্দ আইন এগুলি তাদের জীবনে কী রকম পরিবর্তন এনেছিল তা যেমন জানা যায় তেমনিই সমাজের চোখে সবসময় পতিতাদের দোষী সাব্যস্ত করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে সেই কথাও এখানে রয়েছে। এগুলি উনিশ শতকের পতিতাদের দিনলিপি উদাহরণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে যা আমাদের কাজে সাহায্য করবে।

১০) বারবনিতাদের গল্প

আমাদের গবেষণা কাজের জন্য গৃহীত অন্তিম বইটি একটি ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থ। *বারবনিতাদের গল্প*- এই বইটিতে সাকুল্যে ২৮টি ছোটগল্প রয়েছে। প্রতিটি গল্পের নায়িকা একজন বারবনিতা। কোনো কোনো গল্পে একজন চরিত্র আবার কোনো গল্পে বহু। ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের এই গল্পগুলিকে একত্রে সংকলন করেছিলেন শ্রী বারিদবরণ ঘোষ এবং দুই মলাটের মধ্যে এই ধরনের গল্পসংকলন আমাদের কাজের ক্ষেত্রটিকে আরও বিস্তৃতি যেমন দিয়েছে, তেমনি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণেও সাহায্য করেছে।

নীচের তালিকাটিতে অতিসংক্ষেপে গল্পগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে-

গল্পের নাম	লেখক	প্রধান চরিত্র/নায়িকা
বিচারক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ক্ষীরোদা(হেমশশী)
ডালিম	চিত্তরঞ্জন দাশ	ডালিম
আঁধারে আলো	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বিজলী
রসাভাস	জগদীশ গুপ্ত	সূর্যমুখী
আদরিণী	প্রেমাক্ষর আতরথী	আদরিণী

তরুণ	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	বিনোদিনী
কুসুম	হেমেন্দ্রকুমার রায়	কুসুম
চিরকালিনী	জ্যোতির্ময়ী দেবী	মল্লিকা, যুঁই
বিপদ	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	হাজু
মেলা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কমলমণি
পতিতার পত্র	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	সুলোচনা
তারপর	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	হাবো, ফুল
মহানগর	প্রেমেন্দ্র মিত্র	চপলা
উৎসর্গ	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	নীলিমা
বারবধূ	সুবোধ ঘোষ	লতা
বাঈজী	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	আনোয়ারীবাঈ, মোতি বাঈ
বিদ্যুৎলতা	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	বিদ্যুৎলতা, সুখদা, বুঁচী প্রমুখ
একজিবিশন	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	চম্পা(চাঁপা)
মাণ্ডুল	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	নীলা
নিষিদ্ধ পল্লী গৃহে গমন	সমরেশ বসু	‘দী’
দেহদানী	আবুল বাশার	খুরপি
চিত	কবিতা সিংহ	তানী
পটের বিবি	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	ভামরী
শেষ পারানি	প্রফুল্ল রায়	পদ্ম
স্পর্শ	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বপ্না
পহেলি পেয়ার	বুদ্ধদেব গুহ	জহর
নিরুদ্দেশ-প্রাপ্তি-হারানো	সমরেশ মজুমদার	পদ্মা
আঙ্গুরলতা	বিমল কর	আঙ্গুরলতা, হিমু, বেদানা প্রমুখ

বাংলা সাহিত্যে এমন অসংখ্য কাহিনী রয়েছে যার মুখ্যচরিত্র একজন গণিকা। আমরা যে সময়সীমা বেছে নিয়েছি তার মধ্যে এই গল্পগুলি রয়েছে যেখানে তাঁদের পেশাগত জীবন, সেই সংক্রান্ত টানাপোড়েন রয়েছে। কিছুক্ষেত্রে পেশাগত জীবনকে পেরিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে এই গল্পগুলিতে। খুব সংক্ষেপে আমরা এই গল্পগুলির মূল সুরটি নিয়ে আলোচনা করেছি আর সেই প্রসঙ্গে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক গল্পের কথা এসেছে এই আলোচনায়।

১) ‘বিচারক’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নায়িকা- হেমশশী

প্রকৃতি- বাল্যবিধবা

কারণ- প্রতারণা

মনস্তত্ত্ব- বাল্যবিধবা হওয়ার কারণে প্রেম-সংসার ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ। মোহ ও প্রকৃত ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষমতা। সেইসঙ্গে শারীরিক আকর্ষণ, দৈহিক অতৃপ্তি একটি অন্যতম কারণ।

আর্থ-সামাজিক অবস্থান- বিধবাদের জন্য পারিবারিক-সামাজিক নিয়মকানুন অত্যন্ত কড়া হওয়ায় বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ খুব স্বাভাবিক আর ঠিক এই কারণেই অগণিত বিধবা(বাল্যবিধবা, যুবতী) মোহের ফাঁদে পড়ে গৃহত্যাগ করতেন। যদিও তাঁদের স্বপ্নপূরণ হতো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে পুরুষটির জন্য তাঁরা ঘর ছাড়তেন তাঁরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের ত্যাগ করতেন আর এই গৃহত্যাগী মেয়েগুলির সামনে বেছে নেওয়ার জন্য থাকতো দুটি পথ – আত্মহত্যা কিংবা পতিতাবৃত্তি। হেমশশী ওরফে ক্ষীরোদা দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছিলেন যদিও কাহিনীক্রম আমাদের জানায় যে, পরবর্তী সময়ে তিনি আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে মুক্তি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন।

বিশেষত্ব- যে বিশ্বাসঘাতক পুরুষটির জন্য হেমশশী বাধ্য হয়েছিলেন দেহবৃত্তি অবলম্বন করতে; তাঁর স্বরূপ জানা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত তিনি সেই পুরুষটির ছবি ও নাম খোদাই করা আংটিটি চূড়ান্ত দারিদ্র্য সহ্য করেও রক্ষা করেছেন, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।

২) ‘ডালিম’ – চিত্তরঞ্জন দাশ

নায়িকা- ডালিম,

প্রকৃতি- অনাথা, আশ্রিতা, দোজবরে বিবাহ।

কারণ- প্রতারণা

মনস্তত্ত্ব- পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত, আত্মীয়ের ‘গলগ্রহ’ স্নেহবঞ্চিত মেয়েটি জগৎসংসার সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য তাই সামাজিক বাধ্যবাধকতার নিয়ম, তার সীমারেখা তাঁর অজানা। বন্দীর জীবন থেকে মুক্তি খুঁজে পাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

আর্থসামাজিক অবস্থান- একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তির প্রথমপক্ষের সন্তানদের লালনপালন, বিবাহপরবর্তী জীবনে শ্বশুরবাড়ির নিত্য গঞ্জনা, দাসীতুল্য ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে ডালিম একজন অপরিচিত পুরুষের সাহায্যে নিজের মামার বাড়ি ফিরে যেতে যায় কিন্তু অন্য পুরুষের কারণে মামার বাড়ি-শ্বশুরবাড়ি কোনখানেই তাঁর স্থান হয়না। নিরাশ্রয়, নিরুপায় ডালিম সেই স্বপ্নপরিচিত পুরুষটিকে বিশ্বাস করে কোলকাতায় আসেন এবং ঘটনাচক্রে তিনি পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেন।

বিশেষত্ব- ডালিমের যেটুকু পরিচয় কাহিনিকার দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট যে, ডালিম পেশায় পতিতা হলেও ভালোবাসার জন্য উন্মুখ। উন্মুখ একটু স্নেহ, মায়াভরা ব্যবহার পাওয়ার জন্য কিন্তু তাঁর বৃত্তি সেই স্বপ্নপূরণের অন্তরায়। সেকারণেই সুখীজীবনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিজের পঙ্কিল জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি।

৩) ‘আঁধারে আলো’ – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নায়িকা- বিজলী

প্রকৃতি- বাইজি

কারণ- বংশগত

মনস্তত্ত্ব- বংশপরম্পরায় এই বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকায় বিজলী প্রেম, ভালোবাসা ইত্যাদি অনুভূতি সম্পর্কে একান্তই বোধশূন্য ছিলেন। তাঁর কাছে সবটুকুই ভোগবিলাস আর ক্ষণিকের আনন্দ। তাঁর এহেন মানসিকতার জন্য দায়ী তাঁর পারিপার্শ্বিক এবং কিছুটা ভবিতব্য মেনে নেওয়ার অসহায়তা।

আর্থসামাজিক অবস্থান- বাঈজী বিজলী তাঁর অভিনয়, বচনবিলাসের সাহায্যে পুরুষদের স্বচ্ছন্দে ধরাশায়ী করেই থাকেন। সরল, সাদাসিধে, অনভিজ্ঞ সত্যকেও তিনি সেই দলভুক্ত করেছিলেন। তাই নিজের দাসীকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়ে সত্যকে নিজের বাড়িতে আনা করিয়েছিলেন। যদিও সত্যের মনে রূপসী, শিক্ষিতা, রুচিশীলা ও সর্বোপরি প্রায় কাছাকাছি বয়সী বিজলীর প্রতি প্রেমজ আকর্ষণের জন্ম হয়ে থাকলেও প্রকৃত পরিচয় জানামাত্র তিনি তীব্র ঘৃণায় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

বিশেষত্ব- প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিজলী উপলব্ধি করেছিলেন ভালোবাসার মহত্ত্ব, তার উদারতা। পুরুষও যে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং সেই প্রত্যাখানের অন্যতম কারণ বিজলীর পেশা; পেশাগত মিথ্যাচারণ। কিন্তু সত্যের প্রতি বিজলীর মনে ভালোবাসার জন্ম হয়েছিল বলেই এক লহমায় তাঁর পক্ষে নিজের পেশা ত্যাগ করা সম্ভব হয়েছিল। শেষদিন পর্যন্ত ভালোবাসায়, ত্যাগে, তিতিক্ষায় বিজলী তাঁর অন্ধকার জীবনে আলো জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। প্রকৃত প্রেমের স্পর্শ-দয়িতের ঘৃণা ও দয়িতকে ঈশ্বরজ্ঞান তাতেই তাঁর মুক্তি।

৪) 'রসাতাস'- জগদীশ গুপ্ত

সংকলনের এই গল্পটি ব্যতিক্রম কারণ এখানে স্পষ্ট করে গণিকাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত এমন কোনো চরিত্রের উল্লেখ নেই। কিন্তু গণিকাবৃত্তির একটি অন্যতম শর্ত হল অর্থ অথবা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে যৌনসম্পর্ক স্থাপন। সূর্যমুখী চরিত্রটি এই প্রকৃতির।

নায়িকা- সূর্যমুখী

প্রকৃতি- গ্রামীণপল্লীর গৃহস্থবধূ কিন্তু সৈরিণী।

কারণ- প্রবৃত্তির বশবর্তী। নিজস্ব স্বভাবের কারণে একাধিক পুরুষের প্রতি আকর্ষণ।

মনস্তত্ত্ব- সূর্যমুখী সেই প্রকৃতির রমণী যাঁরা কখনো কোনো পুরুষের প্রতি একমুখী হয়ে থাকতে পারেননা। কখনও অর্থের লোভে কখনও দ্রব্যের লোভে আবার কখনও বা নিছক শরীরী চাহিদা পূরণ করাই এই ধরনের নারীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

আর্থসামাজিক অবস্থান- যেহেতু গৃহবধূ তাই সেই কারণে তাঁকে ‘পতিতা’ বলা যায়না। স্বামী; সংসার ত্যাগ করে অনায়াসে একের পর এক পুরুষের সংসর্গ করেন তিনি। চারিত্রিক অশুদ্ধির জন্য পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছে ছিছিষ্কার শুনলেও দ্রুত ক্ষেপহীন। তাই সমাজের চোখে তাঁর কোনো সম্মানই নেই।

বিশেষত্ব- এই গল্পের নায়িকার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি মূলতঃ তুলে ধরেছেন লেখক। তিনি এমন একটি নারী চরিত্র এঁকেছেন যাঁর কাছে প্রেম, বিশ্বাসযোগ্যতা, এক অর্থহীন। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল জীবন যাপন করাই নয় প্রতিবেশীদের কাছে নিজেকে সেইভাবে উপস্থাপিত করতে চাওয়ার তীব্র বাসনা সূর্যমুখীর ছিল যে কারণে পুরুষদের ‘বয়স’ ইত্যাদি বিষয় তুচ্ছ। মানবমন অত্যন্ত জটিল। পুরুষদের কাছে নিজের ‘আকর্ষণী-ক্ষমতা’ যাচাই করা, সেই স্বাদ ভোগ করার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাও ছিল তাঁর। এই ধরনের রমণীরা কোনোদিন কাউকে প্রকৃত ভালবাসতে পারেননা।

৫) আদরিণী – প্রেমানুরাগ আতর্ষী

নায়িকা- আদরিণী

প্রকৃতি- মাতৃহীন কন্যা,

কারণ- সৎ মায়ের অত্যাচার ও নিজের ভাইকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়ার স্বপ্ন সফল করার জন্য পতিতাবৃত্তিগ্রহণ।

মনস্তত্ত্ব- পতিতাবৃত্তি গ্রহণের কারণ বিচার করলেই বোঝা যায় আদরিণী চরিত্রটি আদতে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ একটি মেয়ে। নিজের পুত্রসম ভাইকে “মানুষের মত মানুষ” করার জন্য দেহব্যবসাও তাঁর কাছে শ্রেয় আবার অন্যদিকে লেখককে পিতৃজ্ঞানে ‘বাবা’ সম্বোধন করেছেন তিনি। সবসময় একজন অভিভাবক পেতে চেয়েছেন তিনি। দেহব্যবসা তাঁর জীবিকা হলেও আদরিণীর প্রবৃত্তির সাথে এর কোনো মিল নেই।

আর্থসামাজিক অবস্থান- আদরিণীর সৎ মা তাঁকে একপ্রকার বাধ্য করে এই পেশাটি বেছে নিতে। শুধু তাইই নয় পরবর্তী সময়ে নিজে পতিতাপল্লীর একজন মাসীতে (নিস্তার-মা) পরিণত হয়েছিলেন। লেখক খ্রিস্টান পরিবারে আদরিণীর আশ্রয় লাভের ব্যবস্থা করে দিলেও তিনি জাত যাওয়ার ভয়ে রাজি হননি কিন্তু নীচু জাতের ‘হাড়ি’ একজন পুরুষকে বিবাহ করতে তাঁর অসম্মতি ছিলোনা ^{১০১}।

বিশেষত্ব- আদরিণী স্নেহপ্রবণ, বাৎসল্য রসে সিঞ্চিত। নিরুপায় হয়ে এই পেশা বেছে নিলেও নিজের সুস্থ, স্বাভাবিক পুনর্বাসনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল। বিবাহিত স্ত্রীর সম্মান এই গোত্রের মেয়েদের কাছে অনেকখানি তাই নিজের সন্তানসম ভাইয়ের কাছে শারীরিক আঘাত পেয়ে মানসিকভাবে চূড়ান্ত বিপর্যস্ত আদরিণী হেমার প্রেমের প্রস্তাবে তাঁকে বিয়ে করে মেথরের চাকরী নিয়ে অন্যত্র চলে যান। ভাইয়ের জন্য এই বৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হওয়া আদরিণী শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন নিয়ে ভেবেছেন, বিবাহ করে সংসারী হয়েছেন। একজন পতিতার প্রেমিকা ও স্ত্রীত্বে উত্তরণের গল্প এটি।

৬) তুরূপ – মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

নায়িকা- বিনোদিনী

কারণ- বংশগত

প্রকৃতি- নামজাদা গণিকা

মনস্তত্ত্ব- গণিকা বিনোদিনী নিজের অর্থের অহংকারে মত্ত ছিল। প্রভূত বিলাস-ব্যসন, উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে নিজের সমাজের তথাকথিত উঁচুতলার বাসিন্দা প্রতিপন্ন করার সূক্ষ্ম বাসনা তাঁর মনের মধ্যে ছিল কেননা সমাজে তাঁর পরিচয় খুব সম্মানজনক নয়। অথচ এই চরিত্রটির আমূল

বদল দেখি যখন একটি শিশুকন্যা তাঁকে ‘মা’ বলে সম্বোধন করে। তখন ঐ শিশুটি, তার সঙ্গলাভ বিনোদিনীর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। তাঁর সুগু মাতৃহৃদয় জাগরিত হয়।

আর্থসামাজিক অবস্থান- বিনোদিনীর আর্থিক অবস্থা, প্রতিপত্তি যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। প্রতিবেশী জমিদার পরিবারের সঙ্গে তাঁর নিত্য নানা বিষয়ে রেষারেষি লেগেই থাকতো- যুযুধান দুইপক্ষ যেন। কিন্তু চৌধুরীদের শিশুকন্যাটির প্রতি অমোঘ মাতৃসুলভ আকর্ষণে তিনি এসমস্ত বন্ধ করে দেন। কিন্তু সত্য উদ্ঘাটিত হলে শিশু চুরির অপবাদে বিনোদিনীকে দোষী সাব্যস্ত কড়া হয়, তাঁর চরিত্রে কালিমালেপন করা হয়। গল্পের পরিণতিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে একজন গণিকার একমাত্র পরিচয় তিনি গণিকাই। ‘নহ মাতা, নহ কন্যা’ – তাঁর আর অন্য কোনো পরিচয় নেই।

বিশেষত্ব- এই পতিতা চরিত্রটির অন্যতম বিশেষত্ব হল বাৎসল্য, মাতৃত্বের বোধ। জমিদার বাড়ির শিশুকন্যাটির প্রতি তাঁর অপত্যস্নেহ চরিত্রটিকে মহত্ব দান করেছে। ‘মা’ ডাক শোনার জন্য, শিশুটিকে জড়িয়ে ধরার জন্য তাঁর যে আকুতি তা ব্যতিক্রমী।

৭) কুসুম – হেমেন্দ্রকুমার রায়

নায়িকা- কুসুম

কারণ- বংশগত

প্রকৃতি- পতিতা

মনস্তত্ত্ব- এই কাহিনীতে একজন পতিতার ‘কন্যাসত্ত্ব’ পরিচয় ফুটে উঠেছে।

আর্থসামাজিক অবস্থান- কুসুম পতিতা। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। তাঁর খদ্দেররা সমাজের সর্বস্তরের বাসিন্দা। তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা যে খুব ভালো নয় সেকথা তাঁর মায়ের কথা থেকেই স্পষ্ট কিন্তু পেশাগত ক্ষতিস্বীকার করেও তিনি সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হয়ে, নিজের সমস্তরকমের ক্ষতিস্বীকার করেও একজন অসহায়, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বৃদ্ধকে নিজে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা করেছিলেন তিনি কুসুমের প্রকৃত পরিচয় জেনে তাঁকে অপমান করেন। জীবনদাত্রীর পরিচয় মুছে কুসুমকে তিনি

অর্থলোভী বলেন, জাত চলে যাওয়ার আক্ষেপ করেন। এর থেকেই পরিষ্কার একজন পতিতাকে সমাজ কখনই ভালোভাবে, উদারতার সাথে গ্রহণ করতে পারেনা।

বিশেষত্ব- কুসুম চরিত্রটির বিশেষত্ব তাঁর আত্মসম্মানবোধ। সুস্থ রোগীর গুশ্রমা, ডাক্তার দেখানো এমনকি হাসপাতালে ভর্তি করা সমস্তই তিনি করেছেন। একটু স্নেহ, একটু সম্মান এটুকুই তাঁর কাম্য ছিল কিন্তু অপমানিত কুসুম বুঝতে পারেন একজন পতিতার পরিচয় অত সহজে মুছে ফেলা যায়না। যে কাজই করুন না কেন; তাঁর বিচার কিন্তু হয় অর্থমূল্যেই।

৮) চিরকালিনী – জ্যোতির্ময়ী দেবী

নায়িকা- যুঁই, মল্লিকা প্রমুখ

কারণ- উপায়ান্তর না পেয়ে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ

প্রকৃতি- পতিতাপল্লীর পতিতা

মনস্তত্ত্ব- দেহোপজীবিনীর পঙ্কিল, অসম্মানের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার দুর্বীর আকাঙ্ক্ষা। নিজেকে সুস্থ, স্বাভাবিক, সমাজমান্য পরিচয় দেওয়ার আশ্রয় প্রয়াস।

আর্থসামাজিক অবস্থান- পতিতাপল্লীর বাসিন্দা, অর্থনৈতিকভাবে নিতান্তই অস্বচ্ছল দুটি মেয়ে। তাঁদের মধ্যে যুঁই নামি মেয়েটি অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ। তাঁর বয়স অল্প সেইকারণেই অপরিচিত পুরুষের নিছক কৌতূহলে করা প্রশ্নকে ধ্রুবসত্য ধরে নিয়ে নিজের জীবন বদলে দেওয়ার সাধ হয় তাঁর। দাসীবৃত্তিও তাঁর কাছে শ্রেয় কিন্তু পতিতাকে গৃহস্থবাড়িতে দাসীর কাজেও কেউ রাখতে ইচ্ছুক নন। তাই জীবনের জন্যই, বেঁচে থাকার জন্যই তাঁকে আবার ঐ পেশাই বেছে নিতে হয়।

বিশেষত্ব- সামান্য কথোপকথন থেকে আশার আলো দেখে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করার জন্য যুঁই আবার পড়াশোনা শুরু করতে চান। তিনি নিজের সংসার-স্বামী, সন্তানের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পতিতাবৃত্তি ত্যাগ করে গৃহস্থের ঘরের দাসীবৃত্তি করতেও রাজি ছিলেন। যদিও একথা স্পষ্ট যে নিতান্তই বয়স কম আর অভিজ্ঞতা কম বলে তিনি এইধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৯) বিপদ- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নায়িকা- হাজু

কারণ- ক্ষুধা, অন্নকষ্ট

প্রকৃতি- গ্রামীণ গৃহবধূ, পতিতাবৃত্তি গ্রহণ

মনস্তত্ত্ব- এই গল্পের মূল চরিত্র হাজুর জীবনে মনের বৃত্তি কতোখানি ছিল লেখক তা স্পষ্ট করেননি। তিনি মনুষ্যচরিত্রের এক অন্য চিত্র তুলে ধরেছেন। হাজুর কাছে ক্ষুধা সহ্য করা এক প্রকার অসম্ভব। তার জন্য চুরি অন্ধি তিনি করেছেন। আসলে হাজুর মানসিক প্রবৃত্তি এমনই যে একটু ভালো করে অন্ন সংস্থানের জন্য তিনি পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করাকেও সহজ বলে মনে করেছেন।

আর্থসামাজিক অবস্থান- দেহবৃত্তি গ্রহণের আগে পিতৃকূল, পতিকূল উভয়তঃ আর্থিক অবস্থা একেবারেই নিম্নবিত্তের মত ছিল। হাজুর ক্ষুধাবোধ গ্রামবাংলার সাধারণ মহিলাদের থেকে একটু বেশি কিংবা বলা যেতেই পারে ক্ষুধা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিলোনা। তাই বিভিন্নভাবে উজ্জ্বলতা করতেন তিনি। দুর্ভিক্ষ আর মনস্তত্ত্বের কারণে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়^{১০২}। পরবর্তীকালে শহরে গিয়ে এই পেশায় ‘নাম লেখানো’-র ব্যাপারে তাঁর কোনোরকম দ্বিধাবোধও ছিলোনা এমনকি তাঁর পেশাটি যে সমাজের চোখে ঘৃণ্য তা নিয়েও হাজুর বিশেষ চিন্তা ছিলোনা।

বিশেষত্ব- এই চরিত্রটি নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন। নিজেকে ভালো রাখার দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। যদিও সেই পদ্ধতি সমাজমান্য নয়। স্বামী, পরিবার কিছুই ত্যাগ করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। সামান্য অন্নের জন্য একজন নারী এহেন পেশা বেছে নেবেন ভাবতে অবাক লাগলেও এটিই বাস্তব। নিজের উপার্জনের অর্থ মাকে পাঠালেও তা কোনোদিনই মায়ের হাতে পৌঁছাত না। সামান্য উপার্জনের অর্থ আত্মসাৎ করতেও তাঁর গ্রামের লোকেদের বাঁধেনি।

১০) মেলা- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নায়িকা- কমলমণি

কারণ- বংশগত অথবা বিপদগ্রস্ত হয়ে (কাহিনীতে স্পষ্ট উল্লেখ নেই)

প্রকৃতি- ভ্রাম্যমাণ বেশ্যা (মেলা ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে যাঁদের মনোরঞ্জননের জন্য আনা হয়ে থাকে)

মনস্তত্ত্ব- বাৎসল্য, স্নেহশীলতা

আর্থসামাজিক অবস্থান- কমলমণি পতিতাবৃত্তির সাথে যুক্ত কিন্তু স্বাধীন নন। নিজস্ব উপার্জনের অংশ ‘মাসি’ কে দিতে হয়। এঁরা পতিতাপল্লীর বাসিন্দা নন, ভ্রাম্যমাণ জীবন এঁদের।

বিশেষত্ব- কমলমণি চরিত্রটি মায়ায়, বাৎসল্যে ভরপুর। মেলায় হারিয়ে যাওয়া শিশুকন্যা মণিকে আশ্রয় দিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করেন। মাতৃস্থানীয়া কমলকে মণি ‘মাসীমা’ সম্বোধন করে। কিন্তু কমলদের মাসী যিনি তিনি হারিয়ে যাওয়া বালিকাটিকে দেখে ভবিষ্যতে তাকেও এই পেশাতে আনার পরিকল্পনা করছেন একথা বোঝা মাত্র কমল ছোট্ট মণিকে কোলে নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে। সদ্য পরিচিত ছোট্ট শিশুকন্যাটির জন্য নিজের পেশা ছেড়ে অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যেতে তাঁর মুহূর্ত লাগেনি।

১১) পতিতার পত্র- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নায়িকা- সুলোচনা

কারণ- দেশসেবার লক্ষ্যে পতিতাবৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে আত্মত্যাগ

প্রকৃতি- হিন্দুবিধবা,

মনস্তত্ত্ব- নিজের মনোবৃত্তির উপরে সংযমের অভাব। নিজের কামনা-বাসনাকে সংজ্ঞাত করতে না পারা এবং সেই কারণেই নিজের বিড়ম্বিত ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়েছিল তাঁকে।

আর্থসামাজিক অবস্থান- উচ্চবিত্ত পরিবারের মাতৃহীন বিধবাকন্যা। অবাধ মেলামেশা এবং কোনোরকম শাসন অথবা বিধিনিষেধ না থাকার কারণে পুরুষের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। এই আকর্ষণের মূল কারণ অনেকটাই ছিল যৌন-আকর্ষণ।

বিশেষত্ব- সুলোচনা যেমন নিজের মনকে সংযত করতে সক্ষম হননি কারণ তিনি একই সাথে দুজন পুরুষকে সমানভাবে কামনা করেছিলেন। ঠিক সেইরকমভাবে দেশোদ্ধারের কাজে নিরত যে পুরুষটি তাঁকে দেশসেবার নামে পতিতাবৃত্তির পাঁকে নিমজ্জিত হতে বাধ্য করেছিলেন তিনি সমান দোষী কিংবা বলা যায় তাঁর অপরাধ অনেক, অনেক বেশি। একজন নারীর সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সুলোচনা কতকটা নিজের ভবিতব্য মেনে নিলেও কোনদিন সেই দুজন পুরুষের নামচরণ করেননি।

১২) তারপর- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নায়িকা- ফুল

কারণ- স্পষ্ট উল্লেখ নেই তবে তিনি পরিচিত দেহোপজীবিনী

প্রকৃতি- পেশাদার বেশ্যা

মনস্তত্ত্ব- ফুল চরিত্রটি এই কাহিনীতে বিশদে আলোচিত হয়নি তাই তাঁর মনস্তাত্ত্বিক দিক পাঠকের কাছে খুব পরিস্ফুট নয়। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে, পেশাদার বেশ্যা বলেই কাণকালি গ্রামের নাবালিকা, সধবা সববয়সী মেয়েদের মিথ্যা কথা বলে দেহবৃত্তিতে নিযুক্ত করার বিষয়ে তিনি উৎসাহী। এই বিষয়ে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব নেই কারণ পরিবর্তে অর্থলাভ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। ‘নারীপাচার’ এর মতো অপরাধের কথা আছে এই গল্পে।

আর্থসামাজিক অবস্থান- ফুল কটিবাজারের একজন নীচু শ্রেণীর বেশ্যা। অর্থের জন্য শুধু যৌনসংশ্রব স্থাপন নয়; প্রয়োজনে অন্যান্য অপরাধের সাথে যুক্ত থাকতেও তাঁর কোনো সমস্যা নেই।

বিশেষত্ব- নানাবয়সী মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে দেহব্যবসায় নিযুক্ত করা এমনকি তাঁদের পাচারের কাজে গজেনকে সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে ফুল পটু। অন্যায়ের সাথে তাঁদের নিত্য সংযোগ।

১৩) মহানগর – প্রেমেন্দ্র মিত্র

নায়িকা- চপলা

কারণ- দুর্ভাগ্যবশতঃ অপহৃতা হওয়ায় নিতান্ত নিরুপায় হয়ে জীবনযাপনের জন্য পতিতাবৃত্তি গ্রহণ

প্রকৃতি- গ্রাম্য গৃহবধূ,

মনস্তত্ত্ব- চপলা একজন গৃহবধূ। অবস্থা গতিকে ভাগ্যের ফেরে তাঁকে এই পেশা গ্রহণ করতে হয়েছে কিন্তু ছোট ভাই তাঁকে অচেনা কলকাতা মহানগরে সম্পূর্ণ একার চেষ্টায় খুঁজে বের করেছে জেনে বিস্মিত, আপ্লুত চপলা স্নেহপ্রবণ হয়ে পড়েন। পরিবারের প্রতি অপরূদ্ধ অভিমান থাকলেও রতনের প্রতি চপলার স্নেহের কোনো খামতি হয়নি।

আর্থসামাজিক অবস্থান- গ্রামীণ গৃহবধূ থেকে মহানগরীর পতিতাপল্লিতে ঠাঁই হয় চপলার। পরিবার-পরিজনদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে একরকম বাধ্য হয়েই এই পেশা বেছে নিতে হয়েছিল। সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার দাম দিতে হয়েছিল তাঁকে।

বিশেষত্ব- চপলা চরিত্রটির বিশেষত্ব হল তাঁর স্নেহ, বাৎসল্য। ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে অনন্য করেছিল আর অন্যদিকে পরিবারের তথাকথিত পরিজনের প্রতি অভিমান থাকলেও নিজের পেশার সঙ্কুচিত হয়ে থাকতেন তিনি।

১৪) উৎসর্গ-গজেন্দ্রকুমার মিত্র

নায়িকা- নীলিমা

কারণ- অন্নকষ্ট, দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণা

প্রকৃতি- গৃহস্থঘরের গৃহবধূ থেকে জনৈক ব্যক্তির রক্ষিতা

মনস্তত্ত্ব- প্রাক্তন স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর ভালো করার চিন্তা এবং সর্বোপরি শুধু চিন্তা করাই নয় তাকে বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনার মূল কাণ্ডারী তিনিই।

আর্থসামাজিক অবস্থান- প্রথম জীবনে তুলনামূলক স্বচ্ছল অরুণবাবুর বিবাহিতা পত্নী ছিলেন নীলিমাদেবী। ভাগ্য বিড়ম্বনায় স্বামী সম্বলহীন হয়ে পড়লে দীর্ঘদিন অন্নকষ্ট সহ্য করেছেন তিনি এমনকি কোনো কোনো সময়ে লজ্জারক্ষা করার ন্যূনতম উপায় ছিলোনা তাঁর কাছে। সহ্য করতে

করতে তিনি বাধ্য হয়ে বিপথে চলে যান। আত্মহত্যা করার থেকে দেহকে মাধ্যম করে জীবনধারণ করাই তাঁর কাছে গ্রহণীয় হয়েছিল।

বিশেষত্ব- যে স্বামী তাঁর অল্প-বস্ত্রের কোন উপায় করতে সমর্থ হননি, দিনের পর দিন অমানুষিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল যার জন্য সেই স্বামির প্রতি নীলিমার ক্ষোভ নেই বরং দুর্বলতা রয়েছে। রয়েছে প্রেম, তাঁর প্রতিটি লেখা তিনি পড়েন এমনকি একরকম তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশক মোহিতবাবু আনকোরা একজনের উপন্যাস ছাপতে রাজি হয়েছিলেন। এই প্রেম নীলিমাকে মহান করেছে। আসলে পরিস্থিতি তাঁকে আজ এইখানে নিয়ে এসেছে অন্যথায় আজও তিনি তাঁর স্বামীর কথা স্মরণ করেন শ্রদ্ধার সঙ্গে।

১৫) বারবধু- সুবোধ ঘোষ

নায়িকা- লতা ওরফে পঞ্চীবীবি

কারণ- বংশগত

প্রকৃতি- পেশাদার বেশ্যা

মনস্তত্ত্ব- গল্পের প্রথমে পেশাদার বেশ্যার মত কথাবার্তা, আচার-আচরণ হলেও কাহিনী যত এগিয়েছে তত যেন লতা নিজেকে একজন আদর্শ গৃহবধূতে রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন।

আর্থসামাজিক অবস্থান- প্রসাদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী তারকেশ্বরের পঞ্চী বিবি ওরফে লতা প্রতিবেশিদের সামনে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীর মত আচরণ করেন। কেউই প্রকৃত সত্য বুঝতে পারেননি। কিন্তু প্রসাদ অন্য একটি মেয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লে লতা বিপদগ্রস্ত হন কারণ তিনি বুঝতে পারেন এই মেকি ‘বর-বউ’ সাজার সময় এবার শেষ হতে চলেছে।

বিশেষত্ব- অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা লতার বিশেষত্ব। ভাড়াবাড়ির বালকটির সাথে খুনসুটি হোক বা অন্যদের সাথে ব্যবহারে লতা কক্ষনও নিজের প্রকৃত পরিচয় বুঝতে দেননি। কাহিনীর শেষে এসে

মনে হয় একজন পতিতা; অভিনয়ের করে হলেও যে ‘বধূ’-র সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছিলেন তা তাঁর কাছে অনেকখানি।

১৬) বাঈজী- হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

নায়িকা- আনোয়ারীবাঈ

কারণ- বংশগত

প্রকৃতি- বাঈজী

মনস্তত্ত্ব- মাতৃত্ব, সন্তানের সুস্থ পরিবেশে লালন-পালনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের শিশুকন্যাকে ত্যাগ করেছিলেন। কোনোরকম অধিকার প্রয়োগ করেননি। সম্পূর্ণরূপে সত্ত্ব ত্যাগ করে মেয়ের পালক পিতামাতার সাথে যোগাযোগ রাখেননি যাতে তাঁর বা তাঁর পেশার কুপ্রভাব মেয়ের উপরে না পড়ে।

আর্থসামাজিক অবস্থান- - আনোয়ারীবাঈ -এর সামাজিক অবস্থান রীতিমত ঈর্ষনীয় ছিল। অন্ততঃ লখনউ এর বাঈজী সম্প্রদায়ের মধ্যে তো অবশ্যই। সমাজের নানা স্তরের, নানা অর্থনৈতিক অবস্থানের মানুষ তাঁর কাছে আসতেন। আর্থিক অবস্থাও যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিল কিন্তু নিজের বালিকা কন্যাকে তিনি নিজের কাজে রাখতে চাননি।

বিশেষত্ব- একজন বাঈজী জানেন যে তাঁর বয়সকালে তাঁর একমাত্র অবলম্বন হবে তাঁর মেয়ে। ভবিষ্যতে মেয়ের উপার্জন থেকে যে তাঁকে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে হবে সেই রুঢ় বাস্তব জেনেও তিনি মেয়েকে সুস্থ, শিক্ষিত পরিবেশে, ভদ্র পরিবারের পিতামাতার সাহচর্যে পালন করতে, মেয়েকে সংসারী করতে চেয়েছিলেন – এটাই তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব। তবে বিবাহ পরবর্তী জীবনে মোতির আচারব্যবহার, সাজপোশাক তাঁকে অত্যন্ত দুঃখিত করেছিল।

১৭) বিদ্যুৎলতা – নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নায়িকা- বিদ্যুৎলতা

কারণ- স্পষ্ট উল্লেখ নেই

প্রকৃতি- পতিতাপল্লির পতিতা

মনস্তত্ত্ব- শিক্ষিতা, সুন্দরী বিদ্যুৎলতা তাঁর প্রতিবেশিদের মধ্যে অন্যতমা। বিদ্যুৎ সবার থেকে আলাদা কারণ বস্তির অন্যদের মত তাঁর জীবন শুধু মোটাদাগের ভোগবিলাস কিংবা যৌনগন্ধী চটুল কথাবার্তায় অতিবাহিত হয়না। তিনি বই পড়েন, তাঁর কাছে সমাজের নানা উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তির আসেন সঙ্গলাভের জন্য। উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে বিপদের সময় পরিকল্পনা করা, সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং গৃহীত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা—সমস্তই বিদ্যুৎ নিজে করেছেন।

আর্থসামাজিক অবস্থান- অন্যদের তুলনায় তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল কিন্তু পরিস্থিতি বিশেষ অনুকূল ছিল। বিপদগ্রস্ত হয়ে উকিলবাড়ি গেলে সেখানেও পেশার কারণে অপদস্থ হতে হয় অথচ ঐ একই ব্যক্তি বলেন কাজের শুরুতে বেশ্যা-দর্শনে সদর্থক ফল লাভ হয়। মেয়ের পূর্ণ চৌধুরী তাঁদের শহরের মধ্যস্থল থেকে উৎখাত করতে চান কারণ সমাজের উন্নতির পক্ষে পতিতার বিষয় অথচ তাঁরাই যে সমস্ত গরল ধারণ করে সমাজের গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ান সেকথা অনস্বীকার্য।

বিশেষত্ব- বিদ্যুতের বিশেষত্ব তাঁর স্বাতন্ত্র্যে। যখন পেশায় ছিলেন তখন তাঁর চাল চলন, কথা এমনকি তাঁর কাছে আগত বাবুদের সাথে পল্লীর অন্যদের মেয়েদের মিল ছিলোনা। আবার বিপদের সময় সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া, মিছিল করে মিউনিসিপ্যালিটি যাওয়া, অনুরোধ- উপরোধ সমস্ত কিছু তিনি করেছেন এবং বলতে গেলে প্রায় একার জোরে অথচ চাইলে তিনি নিজের ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্তে অন্যত্র চলে যেতে পারতেন; যে উপায় তাঁর ছিল কিন্তু তিনি তা করেননি। সাময়িকভাবে সমস্যা সমাধানের পরে যখন তিনি উপলব্ধি করলেন কেন পতিতার সমাজে সম্মান পান না, কেন তাঁদের সকলে ব্রাত্য করে তখন তিনি একবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

১৮) একজিবিশন- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নায়িকা- চম্পা

কারণ- আত্মীয়ের আশ্রিতা আর তাঁর অত্যাচারে বাড়ি থেকে পলায়ন। ভুল লোকের সঙ্গে আলাপ এবং শেষে যৌনব্যবসায় আসতে বাধ্য হওয়া।

প্রকৃতি- নির্দিষ্ট নয়। কখনো ভ্রাম্যমাণ, কখনো রক্ষিতা হয়ে আবার কখনো একসাথে অনেক পুরুষের মনোরঞ্জন করতে হতো তাঁকে।

মনস্তত্ত্ব- চম্পার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত ভালনারেবল্ হয়ে উঠেছিল। একদিকে নিজের ভুলে প্রায় পাচার হয়ে যৌনপেশায় আসতে বাধ্য হওয়া আবার অন্যদিকে দিনের পর দিন নিত্যনতুন পুরুষসঙ্গ-নিয়তিকে মেনে নিয়েছিলেন তিনি। কথা থেকে বোঝা যায় কোথাও যেন সমগ্র পুরুষজাতির প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন চম্পা ওরফে চাঁপা কারণ তিনজন ব্যক্তি তাঁকে বিবাহ-সংসারের স্বপ্ন দেখিয়েও শেষপর্যন্ত কথা রাখেননি।

আর্থসামাজিক অবস্থান- চম্পার সামাজিক অবস্থান একান্তভাবেই নিম্নবর্গীয়। তাঁর সাজপোশাকের উগ্রতা যেন তাঁর পেশাগত জীবনের চিহ্ন বহন করে চলেছে। রাস্তায় ঘুরে অথবা উৎসব-অনুষ্ঠানে গিয়ে পুরুষ ‘শিকার’ করাই যে তাঁর পেশা বোঝা যায়।

বিশেষত্ব- চম্পা চরিত্রটির বিশেষত্ব হল, স্বামী-সংসারের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও, অন্যান্য মেয়েদের মত ইচ্ছা থাকলেও পাশাপাশি তিনি নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন, প্রতি রাতের সঙ্গী বদল হয় যাঁর তাঁর কোনোমতেই একজনমাত্র পুরুষে মন বা শরীর তৃপ্ত হবে না। আর এই কারণেই পতিতাবৃত্তি ত্যাগ করে তিনি অন্য চাকরি করতেও ইচ্ছুক নন। তবে একথাও সত্যি, সবকিছুর পরেও মেয়েটি সংসারী হয়ে থিতু হতে ইচ্ছুক।

১৯) মাসুল-আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

নায়িকা- নীলা

কারণ- বংশগত

প্রকৃতি- পারিবারিক পেশা

মনস্তত্ত্ব- নীলার চরিত্রের যেটুকু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, নিজের অসুস্থ শিশুকন্যাটির চিকিৎসা করার জন্য তিনি এই উপায় বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রে অসহায়তা ফুটে উঠেছে।

আর্থসামাজিক অবস্থান- গল্পে এমন কোনো ইঙ্গিত লেখক দেননি যাতে তাঁদের সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট বোঝা যায় কিন্তু এটুকু জানা যায় একটি বাড়িতে নীলার বাস করেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা এতখানি খারাপ যে, অসুস্থ সন্তানের ওষুধ জোগাড়ের জন্য তীব্র শীতের মধ্যে তাঁকে বাইরে রেখে জনৈক পুরুষের মনোরঞ্জন করতে হয়।

বিশেষত্ব- ‘মাতা-কন্যা’ এই পারস্পর্যের উল্লেখ রয়েছে কাহিনীতে। দেহপশারিনীর কন্যাও এই পেশাতেই এসেছেন আবার তাঁর কন্যাসন্তানও কালক্রমে এই পেশাতেই আসবে- এটাই যেন ভবিষ্যৎ হয়ে দাঁড়ায়। স্নেহ-মায়া-মমতা-বাৎসল্য কিংবা ভালোবাসা এসব অনুভূতির বোধ তাঁদের নেই কারণ সমাজ তাঁদের শুধু শরীর বলে দেখেছে।

২০) নিষিদ্ধ পল্লী গৃহে গমন -সমরেশ বসু

নায়িকা- দী

কারণ- পিতার মৃত্যু পড়ে মায়ের অর্থকষ্ট ও দেহবৃদ্ধি গ্রহণ। মায়ের বাধ্যবাধকতায় তিনি ভাগ্যচক্রে এই পেশায় এসেছিলেন।

প্রকৃতি- পেশাদার বেশ্যা

মনস্তত্ত্ব- নিজের বিড়ম্বিত ভাগ্যকে মেনে নেওয়া, মায়ের প্রতি তীব্র ক্ষোভ। সংসার জীবনের আকাজক্ষা রয়েছে তাঁর।

আর্থসামাজিক অবস্থান- ভদ্র পরিবারের কন্যা পাকেচক্রে এই ঘৃণ্য পেশায় এসে পড়েছিলেন। দীর্ঘদিন বেশ্যাপল্লিতে কষ্ট সহ্য করলেও কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে জানা যায় একজন সম্ভ্রান্ত, স্বচ্ছল ব্যক্তি দীকে বিবাহ করেছেন ফলে সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে তিনি বিবাহিতা গৃহবধূর মর্যাদা পেয়েছিলেন।

বিশেষত্ব- পতিতাপল্লিতে অবস্থান হলেও অন্যান্য পতিতাদের থেকে তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন। যদিও নিজের মায়ের কারণে তাঁর কপালে এরকম দুর্ভোগ নেমে এসেছিল তবু নিজের শিক্ষা-সম্ভ্রম ও মর্যাদা ভোলে ননি তিনি।

২১) দেহদানী- আবুল বাশার

নায়িকা- খুরপি

কারণ- স্বামী পরিত্যক্তা

প্রকৃতি- মাঠবেশ্যা^{১০০} (লেখকের কল্পনায়)

মনস্তত্ত্ব – স্বামী পরিত্যক্তা খুরপি নিজের আব্বার কাছে ফিরে আসে। সংসারের কাছে সাহায্য করে, ছাগল চরায়। এক পুত্রসন্তানের জননী খুরপি মুখে তালাক চাইলেও শেষ চেষ্টা করে নিজেকে স্বামীর সামনে সজ্জিত করার নতুন করে মোহ সৃষ্টি করার যাতে অন্ততঃ দৈহিক, যৌন আকর্ষণের বশে তাঁকে গ্রহণ করে, তাঁর কাছে ফিরে আসে। খুরপি আসলে মনেপ্রাণে সংসার চেয়েছিলেন যার অন্যতম ভিত্তি অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা। এই চরিত্রটির মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায় গল্পটিতে।

আর্থসামাজিক অবস্থান- দরিদ্রসীমার একটু উপরে থাকা খুরপির পিতৃকূলের তুলনায় পতিকূলের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ। জনের কাজ করতে এসে মাদারী সেখ খুরপিকে বিবাহ করলেও সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে রেখে যাওয়ার নাম করে আসলে ত্যাগ করেন। গর্ভপাত করাতে গিয়ে ধর্মিতা হন তিনি কিন্তু সবকিছুর পরেও ধীর লয়ে জীবন অতিবাহিত করেন তিনি।

বিশেষত্ব- কাহিনীতে লেখক বহুবার যৌন অনুষঙ্গ, যৌনস্থান এবং সেই সম্পর্কিত প্রচলিত গ্রামীণ রীতিনীতির কথা বলেছেন। যৌনবুভুক্ষু অপদেবতা, মাঠবেশ্যা সবই এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। খুরপিকেও এই দলভুক্ত করা হয়েছে। খুরপি চুরিসুদ্ধ করেছেন নিজেরই বিবাহিত স্বামীর মন ফিরে পাওয়ার জন্য আবার এই খুরপি চুরি করা দুটি টাকা এনায়েতকে ফিরিয়ে দেননি কারণ এনায়েত তাঁর সাথে যৌনসম্পর্ক নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ সংসার পেলে ভালো অন্যথা পছন্দের পুরুষের সাথে সম্পর্ক তৈরিতে খুরপির কোন আপত্তি দেখতে পাওয়া যায়নি।

২২) চিত - কবিতা সিংহ

নায়িকা- পুতুল, পুলিনের মা

কারণ- পেশাদার বেশ্যা কারণ উল্লেখ নেই

প্রকৃতি- অবিবাহিতা কুমারী

মনস্তত্ত্ব- পুতুল একজন সরল কিশোরী। মফস্বলের বাসিন্দা পুতুলকে অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাটি তাঁর মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ও মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়। উপরন্তু তাঁকে নিজের দিদি-জামাইবাবুর কাছে কোলকাতায় নিয়ে এলে সেখানেও তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত (যৌন ইঙ্গিত) করা হতে থাকে এমনকি নিজের জামাইবাবু হারানও একই অপরাধ করেন। পুতুল ভেতরে ভেতরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে নিজের আশেপাশে এক কল্পনার জগৎ নির্মাণ করে নেন। সেখানে কেউ তাঁকে কোনভাবেই বিব্রত করেননা। অন্যদিকে পুলিনের মা রংপুরের বাসিন্দা। পেশায় বারবনিতা কিন্তু তার বাইরে বিশদ বর্ণনা নেই।

আর্থসামাজিক অবস্থান- পুতুল ও তাঁর দিদির পারিবারিক-অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে তাঁদের সামাজিক অবস্থান খুব সাধারণ। একেবারেই ছাপোষা নিম্নবিত্ত বলা যেতে পারে তাই পুতুলের সাথে এই দুর্ঘটনাটি সবাইকে আমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল। একই ভাবে পুলিন ও তার মায়েরও দিন আনি দিন খাই -এর থেকেও দুর্দশা ছিল।

বিশেষত্ব- পুতুল নিজের শারীরিক, মানসিক যাবতীয় কষ্ট-যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার জন্য খোলামকুচি নিয়ে এক নতুন খেলায় মেতে ছিলেন। পুলিন তাঁকে সেই খেলা শেখান- এক নতুন কল্পনার জগত তৈরি করে তার মধ্যে বাস করা যায়। আর সেই কল্পনার পৃথিবীতে পুতুল স্বামী-সংসার-রাজা খোকার স্বপ্ন দেখেন।

২৩) পটের বিবি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

নায়িকা- ভামরী

কারণ- এই গল্পে দুই ধরনের বেশ্যাবৃত্তির কথা আছে। পট দেখানোর জন্য বেরিয়ে গ্রাম/শহরের বিজাতীয় পুরুষদের আকর্ষণ করে তাঁদের সাথে অর্থের বিনিময়ে যৌনসম্পর্ক স্থাপন। দ্বিতীয় হল দলের কর্তাব্যক্তির ইচ্ছেমত তার শয্যাসঙ্গিনী হওয়া, যদিও এটি দলের কর্তাব্যক্তির ক্ষমতার অপব্যবহার ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

প্রকৃতি- আদিবাসী পটুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, বিবাহিত

মনস্তত্ত্ব- আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার গল্প এটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভামরী দলের সদস্য গণশীর স্ত্রী। তাঁদের সমাজে স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি সম্পর্কের বাঁধন বিশেষ বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে চলেন। কিন্তু ভামরী পেশার জন্য অন্য অচেনা পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করলেও গণশীর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে থাকেন।

আর্থসামাজিক অবস্থান- আদিবাসী পটুয়া সম্প্রদায় তথাকথিত সমাজবহির্ভূত জাতি। কিন্তু তাঁদের নিজস্ব সমাজ এবং সেই সমাজের নিজস্ব কিছু নিয়ম কানুন আছে যার সাথে বাইরের পৃথিবীর বিশেষ কোন যোগসূত্র নেই। এঁরা অর্থনৈতিকভাবে ভীষণ দুর্বল অনগ্রসর জাতি। পট দেখিয়ে, নানারকম জড়িবিটি দিয়ে, জঙ্গলের পশুপাখি-তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি দিয়ে এবং মহিলারা অবাধ যৌন সম্পর্ক করে অর্থ উপার্জন করে।

বিশেষত্ব- তাঁর চরিত্রের মধ্যে পতিতাবৃত্তির অনুষ্ণ এসেছে ঠিকই কিন্তু সবটাই মূলতঃ তাঁদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিয়মের মধ্যে থেকে কারণ তাঁদের অর্থ উপার্জনের এটা অন্যতম উপায়। দলের কর্তার শয্যাসঙ্গিনী হতে হবে জেনেও তিনি কিন্তু মনে মনে নিজের পুরুষটির সঙ্গ কামনা করেছেন। আদিবাসীদের নিজের কোনো ঘর হয়না জেনেও ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছেন, দেখেছেন সংসার করার স্বপ্ন।

২৪) শেষ পারানি- প্রফুল্ল রায়

নায়িকা- পদ্ম

কারণ- স্পষ্ট উল্লেখ নেই তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে বংশগত

প্রকৃতি- পতিতাপল্লির পতিতা ও পরবর্তীকালে একজনের রক্ষিতা

মনস্তত্ত্ব- পদ্ম নিজের পতিতাবৃত্তি নিয়ে অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন, ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করে নিজের ভবিষ্যৎকে মেনে নিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম করেন তাঁর প্রতি, তাঁর নামগানের প্রতি পদ্মের তীব্র ক্ষোভ ছিল আর শুধু তাই নয়, নানা ভাবে সেই মানুষটিকে বিপর্যস্ত করেও আনন্দ পেতেন তিনি।

আর্থসামাজিক অবস্থান- পদ্মের সামাজিক অবস্থান বলতে গিয়ে বলা যায় তিনি পতিতাপল্লির বাসিন্দা ছিলেন কিন্তু পতিতা বলেই তাঁদের সামাজিক স্বীকৃতি থাকেনা। রূপসী ছিলেন তাই কিছু বছর পরে বিদ্রোহী, ক্ষমতাবান ব্যক্তি তাঁকে নিজের রক্ষিতা করে রাখেন ফলে পতিতাবৃত্তির মধ্যে তাঁর স্থান কিছুটা হলেও উন্নত হয়েছিল।

বিশেষত্ব- পদ্ম সুন্দরী ছিলেন হয়তো কিছুটা অহংকারীও ছিলেন কিন্তু এই সবটাই ছিল তাঁর বাইরের শক্ত খোলস। ঈশ্বরের প্রতি রাগ, অভিমান, ক্রোধ ছিল তাঁর অসহায়তার নামান্তর। পতিতাপল্লির বাসিন্দারা কিছুটা হলেও নির্লজ্জ হয়ে থাকেন পেশার খাতিরে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা অন্তঃসারশূন্য বা অনুভূতিহীন ছিলেন।

২৫) স্পর্শ- শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নায়িকা- স্বপ্না

কারণ- স্পষ্ট উল্লেখ নেই

প্রকৃতি- পতিতাপল্লির বেশ্যা

মনস্তত্ত্ব- বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা কম আর সেকারণেই কল্ললোকের সাথে বাস্তবের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা। পতিতাবৃত্তিতে এলেও তাঁর মন পড়ে আছে সিনেমায় অভিনয় করার দিকে। পতিতাবৃত্তির নিষ্ঠুর বাস্তব মেয়েটির মন থেকে সব স্বপ্ন মুছে দিতে পারেনি।

আর্থসামাজিক অবস্থান- পতিতাপল্লির বাসিন্দা প্রায় সব মেয়েদেরই অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো স্থায়িত্ব থাকেনা। একে অন্যের থেকে নিয়ে তাঁদের দিন গুজরান হয়। সামাজিক সম্মানের প্রশ্নই নেই সেইভাবে। স্বপ্না বলে মেয়েটির চোখে সিনেমায় অভিনয়ের স্বপ্ন রয়েছে এবং তাঁর কারণ দুটি – সামাজিক পরিচিত, সম্মান ও অর্থনৈতিক উন্নতি।

বিশেষত্ব- স্বপ্না এখনও নিজের বৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী রুঢ় বা নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারেনি। তাই পথচলতি, বৃষ্টিভেজা পথচারীকে অনায়াস সারল্যে ঘরে আশ্রয় দিতে পেরেছেন নিজের উপার্জনের কথা না ভেবে। এছাড়াও যেটুকু উল্লেখ রয়েছে বোঝাই যায় স্বপ্না অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ একটি মেয়ে।

২৬) পহেলি পেয়ার বুদ্ধদেব গুহ

নায়িকা- জহরবাঈ

কারণ- বংশগত

প্রকৃতি- বাইজি

মনস্তত্ত্ব- বিশুদ্ধ প্রেম। লেখকের সারল্য, জগত সংগসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। নিত্য যেসব পুরুষদের সঙ্গে তাঁকে করতে হত সেই স্বপ্ন বয়সে প্রেমের লেশমাত্র ছিলোনা। তাই প্রথম ভালবাসাকে জহর নিজের মনের মণিকোঠায় রেখে দিয়েছিলেন।

আর্থসামাজিক অবস্থান- মীর্জাপুরের বাঈজীপল্লীর একটি বাড়িতে তিনি থাকতেন। সেটাই তাঁর পেশা এবং তার জীবন সেখানেই আবদ্ধ। বয়স কম হওয়ায় তাঁর আকর্ষণ হয়তো একটু বেশি ছিল।

বিশেষত্ব- জহরবাঈ ও লেখক দুজনেই সমবয়স্ক। কিন্তু লেখকের থেকে জহরের বাস্তববোধ অনেক বেশি। তাই লেখক বুঝতে না পারলেও জহর নিজের ‘পহেলি পেয়ার’ অনুভাব করেছিলেন। তিনি জানতেন এই ভালোবাসার কোনো স্বীকৃতি নেই, তা সমাজমান্য নয় কিন্তু শত দুঃখেও নিজের মুখে ভালোবাসার কথা উচ্চারণ করেছিলেন তিনি।

২৭) নিরুদ্দেশ-প্রাপ্তি-হারানো – সমরেশ মজুমদার

নায়িকা- পদ্মা

কারণ- বংশগত

প্রকৃতি-পতিতাপল্লিতে বাস, পেশাদার বেশ্যা

মনস্তত্ত্ব – পদ্মা একজন পুরুষের রক্ষিতা হলেও স্বাধীনভাবে ব্যবসাও তিনি করতে পারতেন। পদ্মার চরিত্রটির মধ্যে একধরনের প্রতিশোধস্পৃহা রয়েছে। নিজের ‘বাঁধাবাবু’র সাথে আর ঠিক দেনাপাওনার সম্পর্ক ছিলোনা, স্বর্ণকমল সেনকে পদ্মা ভালোবাসতেন। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে পদ্মা চরিত্রটির প্রতিশোধলিপ্সু হয়ে পড়ার কারণ অনুধাবন করা যায়। তিনি তাঁকে বাড়ি ফিরে পাঠাতেন জোর করে এরকম উল্লেখও আছে।

সামাজিক অবস্থান- পতিতার কোনো সমাজমান্যতা নেই আর সেই কারণেই তাঁর সামাজিক অবস্থান একেবারেই জোরালো নয়। শুধুমাত্র কুখ্যাত এক ব্যক্তির রক্ষিতা হওয়ার কারণে তাঁর নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে হয়তো একটু মান্যতা ছিল।

বিশেষত্ব- ভালোবাসা, প্রতিশোধস্পৃহা ইত্যাদি এই চরিত্রটির বিশেষত্ব। একধরনের মমত্ব লক্ষ্য করা যায় তাঁর মধ্যে। নিজের বাবুকে অন্যান্য বদভ্যাসের থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন; সাবধান করেছেন। এমনকি পুলিশের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়েছেন যাতে স্বর্ণকমল সেনের নিরুদ্দেশ রহস্যের সমাধান করা যায়।

২৮) আগুরলতা- বিমল কর

নায়িকা- আগুরলতা

কারণ- প্রতারণা

প্রকৃতি- পেশাদার বেশ্যা

মনস্তত্ত্ব- আগুরলতা তাঁর অসুস্থ, মরণাপন্ন প্রাক্তন প্রেমিক তথা স্বামীকে সেবা করেছেন। মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেও, কখনো কখনো গালিগালাজ করলেও ডাক্তার ডাকা কিংবা ওষুধ-পথ্যাদি করার

ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেননি। আসলে নন্দ সম্বন্ধে আগুরের মনে কিছুটা হলেও মায়া ছিল। একটা সময় মানুষের মনে ভালোবাসা থাকে না; থাকে শুধু মায়া আর সেই মায়ার বশবর্তী হয়েই তিনি সেবাশুশ্রূষা করেছেন। আগুর এতখানি দৃঢ়চেতা ছিলেন যে, মৃত ব্যক্তির সৎকারের অর্থসংগ্রহের জন্য সেই শব বিছানার নীচে রেখে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এইসমস্তটাই তিনি করেছিলেন নন্দের প্রতি টান থেকে।

সামাজিক অবস্থান- আগুর ও নন্দ প্রথম জীবনে বিবাহিত দম্পতির মতো থাকলেও নন্দ তাঁকে ত্যাগ করেন ও আগুর বাধ্য হন দেহবৃত্তি বেছে নিতে। তাঁর ঠাই হয় পতিতাপল্লিতে। তাঁর আর্থিক অবস্থা সঙ্গিন। নন্দের সেবা করতে গিয়ে প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

বিশেষত্ব- আগুরলতা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ নন্দের যথাযথ সৎকারের ব্যবস্থা করার জন্য তা তাঁর চরিত্রটিকে বিশেষ করে তুলেছিল। সমস্ত রকম চেষ্টা-চরিত্র করে বিফল হয়ে শেষপর্যন্ত এই একটিমাত্র উপায় তাঁর সামনে ছিল। হয়তো ভালোবাসার জন্যই তাঁর এই আত্মত্যাগ।

যে সময়সীমা আমরা বেছে নিয়েছি সেই সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার সাথে এই সংকলনের সবকটি গল্প সরাসরি যুক্ত নয়। কিন্তু এই গল্পগুলির নায়িকারা পেশায় প্রত্যেকেই পতিতা। কেউ স্বেচ্ছায় এই পেশায় এসেছেন, কেউ বা প্রতারিত হয়ে কোনোরকম পুনর্বাসনের উপায় না পেয়ে এই পথ বেছে নিয়েছেন। সমাজের বহু বিচিত্র দিক উদঘাটিত হয়েছে গল্পগুলির মাধ্যমে। পতিতাজীবনের নানা সমস্যা, সমাজে তাদের ব্রাত্য করে রাখার প্রয়াস, পেশাগত জীবনের টানাপড়েন সবই রয়েছে গল্পগুলিতে।

এখানে রয়েছে ‘বিচারক’- এর মত গল্প যেখানে বাল্যবিবাহ-বিধবা বিবাহ ইত্যাদির মত স্পর্শকাতর বিষয় রয়েছে। ‘পতিতার পত্র’ গল্পে রয়েছে স্বাধীনতার মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের একটি মেয়েকে বিপথে

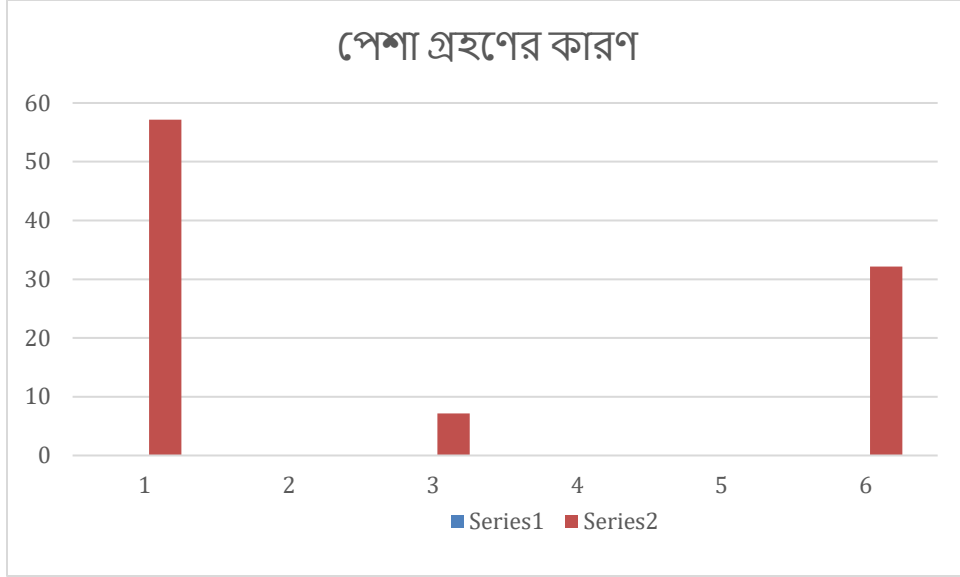
ঠেলে দেওয়ার গল্প এবং এই গল্পেও উঠে এসেছে বৈধব্য-যন্ত্রণার কথা। দেশভাগ আর তার অনিবার্য ফলস্বরূপ ওপার বাংলার মেয়েদের জীবনে যে দুঃসহ যন্ত্রণা নেমে এসেছিল তার উদাহরণ ‘একজিবিশন’ গল্পটি। ‘বিপদ’ গল্পটিতে এমন এক সময়ের কথা তুলে এনেছেন লেখক যেসময়ে গ্রামবাংলায় দেখা গেছিল বুভুক্ষা-খাদ্যসংকট আবার ‘তারপর’ গল্পে এসেছে নারীপাচারের মত গুরুতর অপরাধমূলক বিষয়।

নিচের ছকটির সাহায্যে আমরা প্রাপ্ত ২৮টি গল্পের পতিতাবৃত্তি অবলম্বনকারিনী নারীদের এই পেশা বেছে নেওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেছি। অনুসন্ধান করার পরে বেশ কিছু কারণ পাওয়া গেছে যেগুলিকে আমরা প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করেছি –

পুরুষানুক্রমিক পেশা	স্বচ্ছায় গৃহীত পেশা	দুর্ঘটনাজনিত(প্রতারণা,দেশভাগ ইত্যাদি) কারণে গৃহীত পেশা
-	-	বিচারক
-	-	ডালিম
আঁধারে আলো	-	-
-	রসাতাস	-
আদরিণী	-	-
তরুণ	-	-
কুসুম	-	-
চিরকালিনী	-	-
-	বিপদ	-
মেলা	-	-
-	-	পতিতার পত্র

তারপর	-	-
-	-	মহানগর
-	-	উৎসর্গ
বারবধু	-	-
বাস্তবজী	-	-
বিদ্যুৎলতা	-	-
-	-	একজিবিশন
মাশুল	-	-
-	-	নিষিদ্ধ পল্লী গৃহে গমন
-	-	দেহদানী
-	-	চিত
পটের বিবি	-	-
শেষ পারানি	-	-
স্পর্শ	-	-
পহেলি পেয়ার	-	-
নিরুদ্দেশ-প্রাপ্তি-হারানো	-	-
আঙ্গুরলতা	-	-

এই সমীক্ষার ফলাফল নিচে দেওয়া হল -



সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট বংশানুক্রমিক পেশাগ্রহণের সংখ্যা অন্য দুটি কারণের তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

খুবই সংক্ষিপ্ত একটি সমীক্ষা। কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি বেছে নিয়েছেন যাঁরা, তাঁরা ঠিক কী কী কারণে দেহব্যবসায় এসেছেন সেই বিবিধ কারণগুলি বোঝা যাবে এর মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, তাঁদের সামাজিক অবস্থান, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অবস্থান এগুলি সম্বন্ধেও একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে। যদিও এই ধারণালাভের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, এমন একটি গল্পগ্রন্থে সঙ্কলিত গল্পগুলিকে কেন্দ্র করে এই সমীক্ষা করা হয়েছে যেখানে গল্পগুলির রচনাকাল বিভিন্ন, কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলির পটভূমি বিচিত্র - কেউ বালবিধবা, কেউ উচ্চস্তরের বাইজি, আবার কেউ বা একেবারেই পল্লী অঞ্চলের দেহপসারিনি আবার কেউ অপহৃতা গৃহবধূ যে নিতান্তই অপারগ হয়ে এই পেশা বেছে নিয়েছে তার ‘তথাকথিত’ পরিবার-পরিজন এবং সমাজ তাকে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার উদারতা দেখাতে পারেনি বলে। মাত্র দুটি গল্প এমন আছে যেখানে লেখক বর্ণনা করেছেন এমন দুটি চরিত্রের যারা স্বেচ্ছায় এই পেশা গ্রহণ করেছে। তবে আলাদা করে জগদীশ

গুপ্তের ‘রসাভাস’ গল্পের উল্লেখ এখানে করতেই হবে, যেখানে দেহব্যবসার কথা নেই, কিন্তু যে গল্পের নায়িকা তার প্রকৃতিগত কারণে একের পর এক পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। কোনোরকম মানসিক বা প্রেমজ আকর্ষণ থেকে নয়, কেবলমাত্র যৌনচাহিদা এবং জাগতিক বিলাসিতার সুখভোগ -এই কারণের জন্য তার এহেন আচরণ যাকে বেশ্যাবৃত্তির তকমা দেওয়া যায়।

এই অধ্যায়টি সাহিত্যনির্ভর। সাহিত্যের ‘পতিতা’ চরিত্রগুলির সাহায্যে আমরা তাঁদের অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস করেছি। সমসাময়িকতার প্রেক্ষিতে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান ফিরে দেখার চেষ্টা করেছি, চেষ্টা করেছি সংস্কৃতি-চারুকলার জগতে তাঁদের উপস্থিতি ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বিচারের। এই পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য সুপ্রাচীন এই পেশা এবং পেশালম্বনকারিণীদের বিবর্তনের গতিপথ নির্ধারণ করা। ভিন্ন সময়পর্ব, ভিন্ন আর্থসামাজিক পরিবেশনির্ভর সাহিত্যের দ্বারা নির্মিত একটি বৃত্ত, সেই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি মেয়ে, যার পেশা ‘গণিকাবৃত্তি’, যার ইতিহাসকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে বিচার করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

অন্ত্যটীকা ও তথ্যসূচি

১। ভারত ছাড়ো আন্দোলন- ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ- ১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ, ভারত পাকিস্তান দেশভাগ(১৯৪৭), বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষ- ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ ইত্যাদি।

২। মুক্তিযুদ্ধ- ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তান ও তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের মধ্যে মূলতঃ ভাষাগত ভিন্নতার কারণে যুদ্ধ হয় যা ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধ’ বা ‘মুক্তিযুদ্ধ’ নামে ইতিহাসের পাতায় লিখিত আছে।

বার্ণা বসু (সংকলন ও সম্পা.), *ভাগফল ৭১ মেয়েদের কথা*, ব্লার্ব:

“জন্মসূত্রে নারী পরিযায়ী। গার্হস্থ্য জীবনে মানবাধিকারের অভাব মেয়েদের জীবনকে অহরহ পীড়া দেয়। শ্বশুরের ভিটেয় এমনিই সীমিত অধিকার; সেই স্থিতিশীলতাটুকুও বিঘ্নিত হয়ে পড়ে রাষ্ট্রশক্তির তাড়নায়। দেশভাগ,

স্বাধীনতায়ুদ্ধ—রাষ্ট্রবিপ্লবে মেয়েদের জীবনে নেমে আসে করাল ছায়া। তিরিশ লক্ষ শহীদ, চার লক্ষেরও বেশি ধর্ষিতা মেয়ের চোখের জলে মুক্তি কিনেছে স্বাধীন বাংলাদেশ।”

৩। Bede Scott, *Partitioning Bodies: Literature, Abduction and The State, Interventions*, vol. II, no. I, p.35.

৪। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড।। প-হ, পৃ.১৫০৭:

‘বারবধু’- বেশ্যা ।

৫। প্রমথনাথ বিশী, *কেরী সাহেবের মুঙ্গী*, ‘লেখকের বক্তব্য’।

৬। উইলিয়াম কেরী - উইলিয়াম কেরী আনুমানিক ১৭৯৩ খ্রি. কলকাতায় আসেন। তিনি মূলতঃ খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্যই এসেছিলেন কিন্তু শিক্ষাদরদী এই মানুষটি ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে শ্রীরামপুরের ‘থিওলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি’ প্রতিষ্ঠা করেন, ‘ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি’ নির্মাণ করেন। বাংলা ভাষা শিক্ষা ও প্রসারের জন্য তিনি রীতিমত আগ্রহী ছিলেন। অনুবাদক হিসেবেও তাঁর কাজ যথেষ্ট প্রশংসায়োগ্য। তিনি বেশ কিছু সমাজসংস্কারের কাজও করেছিলেন।

৭। রামরাম বসু - ‘কেরী সাহেবের’ এদেশীয় মুঙ্গী ছিলেন শ্রী রামরাম বসু। উইলিয়াম কেরীর আগে তিনি আরও দুজন বিদেশির মুঙ্গী পদে কাজ করেছিলেন। তিনি একদিকে যেমন ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত’ নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ঠিক সেইরকমই তিনি ‘খ্রিষ্টোৎসব’ ও লিখেছিলেন। ১৮০০ সালে কেরীর শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেসে ও তারপরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

৮। প্রমথনাথ বিশী, *প্রাগুক্ত*, ‘লেখকের বক্তব্য’।

৯। অরুণ নাগ(সম্পা.), *সটীক হতোম প্যাঁচার নকশা*, পৃ.১২৭।

১০। প্রমথনাথ বিশী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫৪।

১১। *সেইলরস্ হোম(Sailors’ Home)* -

As cited by Manikarnika Dutta, ‘The Sailors’ Home and moral regulations of white European seamen in nineteenth- century India,’ TJSJS vol.18, Issue 2:

Baptist clergy built Sailors’ Homes in Major port cities across the world. These establishments recreated an amiable social structure usually absent from seamen’s everyday life and sought to transform the lives of white seamen (and rarely of non-white seamen)

১২। রাম বসু – রামরাম বসু।

১৩। প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

১৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), সংবাদ সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, ‘আমোদ প্রমোদ’ পৃ.১২১:
‘শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত
সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন’। (১৬ই অক্টোবর ১৮১৯। ১ কার্তিক
১২২৬)।

১৫। প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮।

১৬। কলিঙ্গাবাজার – মধ্য-দক্ষিণ কলিকাতায় ‘কলিঙ্গা-ফেনুইক বাজার’ যেখানে শিশু ও নারী পাচার করা হত। এদের
মধ্যে কিছু জনকে দাস হিসাবে কাজে লাগানো হত আর অল্প বয়সী মেয়েদের দেহব্যবসায় নিযুক্ত করা হতো।

১৭। প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩।

১৮। তদেব, পৃ. ২৩৯।

১৯। তদেব, পৃ. ২৭৫।

২০। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নববাবুবিলাস, পৃ.৪১:

“মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
খোষ পোষাকী যশমী দান,
আড়িঘুড়ি কানন ভোজন,
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।।”

২১। প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।

২২। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরচনা/সমগ্র, পৃ.৪৩:

“যবনী বারান্দাদিগের বাই বলিয়া থাকে, তাহাকে সম্ভোগ করিবা, কারণ পলাণ্ড অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রসুন যাহারা
আহার করিয়া থাকে তাহারদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোন রাঁড়েই পাইবা না।”

২৩। অরুণ নাগ (সম্পা.), সটীক হতোমপ্যাঁচার নকশা, পৃ.৯৪ :

‘আজব শহর কলকাতা

রাড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।

হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারী ঐক্যতা—’

যত বক-বিড়ালি ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদ পাতা—’

২৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.১২।

২৫। বিমল মিত্র, *সাহেব-বিবি-গোলাম*, পৃ.১৩।

২৬। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫১।

২৭। মেঘনাদ গুপ্ত, *রাতের কলকাতা*, পৃ.৩২-৩৩।

২৮। বিমল মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭১।

২৯। *তদেব*, পৃ.১৯৭।

৩০। *তদেব*, পৃ.৭১।

৩১। *তদেব*, পৃ. ১৪১।

৩২। *তদেব*, পৃ.৮২।

৩৩। *তদেব*, পৃ.১৬১।

৩৪। *তদেব*।

৩৫। *তদেব*, পৃ.১০১।

৩৬। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড।। প-হ, পৃ.১৮৮১:

রক্ষিতা – (বাঙলায়) স্বীয় উপভোগার্থ পালিত।

৩৭। মেঘনাদ গুপ্ত, *রাতের কলকাতা*, পৃ.৫৬:

“বাবুদের মধ্যে প্রণামী নিয়ে বেশ টক্কারা টক্কারিও লেগে যায়। ইনি পাঁচ টাকা দিলে উনি দেন দশ টাকা এবং তাই দেখে আর এক মহাত্মা হয়তো বিশ টাকা ছেড়ে বসেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব যতই বেড়ে ওঠে, গণিকাদের ততই মজা।

৩৮। বিমল মিত্র, প্রাগুক্ত। পৃ.১৯১।

৩৯। তদেব। পৃ.২৩১।

৪০। তদেব। পৃ.২৪৩।

৪১। তদেব। পৃ. ১৯২।

৪২। তদেব। পৃ. ১৯৫।

৪৩। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিপদ্ম, পৃ.১।

৪৪। তদেব, পৃ. ১।

৪৫। তদেব, পৃ.৩।

৪৬। রামবাগান- কলকাতার অন্যতম পতিতাপল্লি। উৎত্র কলকাতার রাজা গুরুদাস স্ট্রীট-বিডন স্কোয়ার, মানিকতলা থেকে রামবাগান দত্তবাড়ি পর্যন্ত এলাকা।

৪৭। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড।। অ-ন, পৃ. ১০০৫।

ঢপকীর্তন – মধু কানের কীর্তনগানবিশেষ।

৪৮। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৪।

৪৯। তদেব, পৃ.৬।

৫০। বিশ্বনাথ জোয়ারদার, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২.

৫১। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫।

৫২। তত্রৈব।

৫৩। তদেব, পৃ.৮।

৫৪। তদেব, পৃ.৫১:

“খানকী কসবীর জীবন—পদ্মপত্রের জল। এই আছে এই নেই।”

৫৫। তদেব, পৃ.৫৭।

৫৬। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণ্ডু, পৃ.৫।

৫৭। বিশ্বনাথ জোয়ারদার, প্রাণ্ডু, পৃ. ১৩০-১৩১।

৫৮। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, পৃ.৩।

৫৯। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণ্ডু, প্রথম খণ্ড।। অ-ন, পৃ.৯৭১:

“ঝুমুর - শৃঙ্গারবহুল রাগিণীর গীত; ঝুমুরগান। [এই গান প্রায় অশ্লীল। ইতরজাতীয়া স্ত্রীলোকে এই গান করে]”

৬০। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, পৃ.১৫।

৬১। তদেব, পৃ.১১৮।

৬২। তদেব, পৃ.১৩১।

৬৩। তদেব, পৃ.১৩৫।

৬৪। তদেব, পৃ.৭৮।

৬৫। তদেব, পৃ.৯৪।

৬৬। তদেব, পৃ.১১০।

৬৭। তদেব, পৃ.১৪৫।

৬৮। তদেব, পৃ. ৪২-৪৩।

৬৯। মহাশ্বেতা দেবী, দৌলতী, পৃ.১০।

৭০। তদেব, পৃ.১০৮।

৭১। তদেব, পৃ.১১৬।

৭২। Devin Finn, ‘Bonded Labor in India’, Topical Research Digest: Human Rights and Contemporary Slavery, p.6:

“Bonded labor, which is characterized by a long-term relationship between employer and employee, is usually solidified through a loan, and is embedded intricately in India’s socio-

economic culture—a culture that is a product of class relations, a colonial history, and persistent poverty among many citizens.”

৭৩। <https://www.voanews.com/a/in-india-human-traffickers-target-tribal-women-and-girls/7235083>, Sarah Aziz, voanews.com, ‘In India, Human Traffickers Target Tribal Women and Girls’, on Aug.22, 2023:

“According to India’s National Crime Records Bureau(NCRB), over 6,500 human trafficking victims were identified in the country during 2022—60% of them women and girls. Expert believe the actual numbers are much higher, due to acute underreporting.”

Accessed on 20.10.2023, 06.30 p.m.

৭৪। মহাশ্বতা দেবী, প্রাণ্ডু, পৃ.৮৯।

৭৫। নীহাররঞ্জন গুপ্ত, উত্তর ফাল্গুনী, পৃ.৭।

৭৬। তদেব, পৃ.১৭২।

৭৭। তদেব, পৃ.১৬২।

৭৮। শংকর, জন অরণ্য, পৃ.১১২।

৭৯। তদেব, পৃ. ১০৮।

৮০। তদেব, পৃ.১১৩।

৮১। শংকর, প্রাণ্ডু, পৃ.৯৯।

৮২। তদেব।

৮৩। তদেব, পৃ.১০৩।

৮৪। মানদা দেবী, শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত, ‘আমার কৈফিয়ৎ’।

৮৫। তদেব।

৮৬। তদেব, পৃ.২৩।

৮৭। তদেব, পৃ.৬৪।

৮৮। তদেব, পৃ.৮৫।

৮৯। হাড়কাটা গলি- উত্তরও কলকাতা অন্যতম পতিতাপল্লি।

৯০। মানদা দেবী, প্রাণ্ডু, পৃ.৯২।

৯১। তদেব, পৃ. ৯৭।

৯২। তদেব, পৃ.১০৬।

৯৩। তদেব, পৃ.১৫৫-১৫৬।

৯৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ.৫৫।

৯৫। ১৮৬৮ সালে ‘Contagious Diseases Act, XIV of 1868’ বা ‘চোদ্দ আইন’:

এই আইনটিতে বেশ্যাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও নাম নথিভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ব্রিটিশ পুলিশ যেন কোনোরকম যৌনরোগাক্রান্ত না হয় সেই কারণেই এই ব্যবস্থা। বেশ্যাদের বেশকিছু নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করার নিয়ম জারি হয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এতে বেশ্যাদের ক্ষতিই হয়েছিল।

৯৬। মৌ ভট্টাচার্য, বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ, ‘বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি’, পৃ.৩৩।

৯৭। তদেব, পৃ.৬৮।

৯৮। তদেব, ‘পাঁচালী কমলকলি’, পৃ.৮৭।

৯৯। তদেব, ‘বেশ্যাই সর্বনাশের মূল’, ভূমিকা:

‘ইহা যদিও সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনীয় নয়, কিন্তু বেশ্যাপ্রভৃতি মহাত্মাদিগের মূর্খতা দূরীকরণের মহৎ উপদেশ।’

১০০। তদেব, ‘এলোকেশী বেশ্যা’, পৃ.১৩৭।

১০১। বারিদবরণ ঘোষ, বারবনিতাদের গল্প, ‘আদরিনী’ পৃ.৫৮।

‘বিবাহিত স্ত্রী’র পরিচয় পাওয়া সমাজে অনেক সম্মানের। অবমাননাকর ‘পতিতা’র মুখে দেওয়ার জন্য নীচু জাতে বিয়েও শ্রেয়।

১০২। তদেব, ‘হাজু’, পৃ.৯৪।

১৩৫০ বঙ্গাব্দ (১৯৪৩ খ্রি.) -এ অবিভক্ত বাংলায় দেখা যায় মস্বন্তর যা ‘পঞ্চাশের মস্বন্তর’ নামে পরিচিত। অসংখ্য মানুষ স্থানচ্যুত হয়ে, অল্পকষ্টে ভুগে কলকাতা বা নিকটবর্তী শহরাঞ্চলে আসেন। বুড়ুক্ষা ও মৃত্যুমিছিল যেন নিত্যসঙ্গী হয়ে পড়েছিল।

১০৩। বারিদবরণ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা.২৩৮-২৩৯:

মাঠবেশ্যা- লেখক বেশ্যাদের প্রকারভেদের কথা বলেছেন, এঁরা মূলতঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বী-

“মধ্যবিত্তের সকল মূল্যবোধের বাইরে ঘর-ভাঙা বা ঘর পালানো বা ঘর-খ্যাদানো কিংবা তালাকী অথবা তালাক-কল্ল নারীদের এটা উন্মুক্ত বেশ্যালয়।’

পঞ্চম অধ্যায়

অভিব্যাপ্তির সন্ধানে: পেশাগত অভিব্যাপ্তি

ভূমিকা:

আমাদের গবেষণার মূলতঃ তিনটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে আমরা সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা করেছি, যদিও আরো সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত আলোচনার জন্য সেই পর্যায়টিকে আমরা দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করেছিলাম – সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্য। সম্পূর্ণ পৃথক দুটি অধ্যায়ে আমরা এই উপবিভাগদুটিকে নিয়ে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের আলোচনার উপজীব্য ছিল নির্বাচিত কয়েকটি বাংলা সাহিত্যগ্রন্থ।

গবেষণার এই তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ে আমরা আমাদের গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি বা বলা ভালো মূল বক্তব্য বিষয়টি উপস্থাপনে প্রয়াসী হবো।

আমাদের গবেষণায় আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি গণিকাচরিত্রের অভিব্যাপ্তি। আদতে এই গবেষণাটি দ্বিমুখী অর্থাৎ এর যে দুটি দিক রয়েছে তা শিরোনাম-বিচারের মাধ্যমেই বোঝা যায়। আমাদের গবেষণা আসলে একপ্রকার অনুসন্ধান। কালের গতিময়তার সাথে সাথে সংস্কৃত ভাষার শাস্ত্র তথা সাহিত্য থেকে বাংলা ভাষার সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্রের অভিব্যাপ্তি এবং প্রভাব, যাকে আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার গণ্ডিতে আবদ্ধ করেছি- এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ নির্মাণ করাই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এ যেন ‘কালের যাত্রা’, বা আরও সূক্ষ্মভাবে বললে ‘গণিকা’ চরিত্রের যে সমস্ত ‘বাঁধাধরা’, ‘তথাকথিত’ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সময়ের সাথে সাথে সেগুলির বিবর্তন-পরিবর্তন তুলে ধরতে চেয়েছি আমরা। পরিবর্তন আছে কিনা সে কথা ক্রমশঃ বিচার্য। কোনো চরিত্র এই বৈশিষ্ট্যগুলির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়ে থাকলে সেটিও তুলে ধরায় প্রয়াসী হয়েছি আমরা।

সংস্কৃত থেকে বাংলা সাহিত্যে গণিকা চরিত্রের অভিব্যাপ্তি যে হয়েছে সেকথা অনস্বীকার্য কারণ তা অবশ্যসম্ভাবী। কিন্তু সেই অভিব্যাপ্তি একদিনে হয়নি, তা হওয়া সম্ভবও নয়। সময়ের হিসেবে বিচার করতে গেলে তা এক সুদীর্ঘ সময়সীমার যাত্রাপথ অতিক্রম করেছে। যদিও একে অভিব্যাপ্তির পাশাপাশি গণিকাবৃত্তির আবর্তনও বলা যেতে পারে। ‘আবর্তন’ শব্দটি আমরা সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছি কারণ গণিকাবৃত্তি যেমন পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশাগুলির মধ্যে অন্যতম ঠিক সেইরকমভাবেই পেশা হিসেবে এটি আজও সমভাবে প্রাসঙ্গিক। এ যেন মানবসভ্যতার এক উন্মুক্ত গোপনীয়তা।

যে অভিব্যাপ্তি আমরা নির্মাণ করতে চেয়েছি, আমাদের গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছি সেই নির্মাণের কতগুলি ধাপ রয়েছে। পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং পরিশেষে আমাদের গবেষণার অস্বিষ্ট বিষয়বস্তুর একটি পর্যায়ের উপস্থাপন এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

সংস্কৃত সাহিত্যকে ভাষাগত এবং বিষয়বস্তুগত উভয়দিক থেকেই আড়ম্বরপূর্ণ - বলা চলে। সম্পূর্ণ না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো অবশ্যই। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুগত বিচার করার কারণে আমাদের গবেষণাকেন্দ্রিক আলোচনার পরিসর অনেকখানি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তার একমাত্র উদ্দেশ্য গবেষণাপত্রের কলেবর সংক্ষেপীকরণ।

সাধারণতঃ দেখা যায় ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে রাজা-রাজপরিবার-রাজ্য-রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে প্রেম-বিরহ, বিচ্ছেদ-মিলনের কাহিনী এবং সেই সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাহিনী। সাধারণ মানুষের কথা, তাঁদের জীবনযাত্রা বা জীবনচর্যার কথাকে উপজীব্য করে লিখিত কাব্য আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে থাকলেও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তুলনায় কম। একেবারেই নেই সেকথা বলা যায়না কিন্তু একমাত্র বিষয় হিসেবে তাঁরাই উপস্থাপিত হয়েছেন সেরকম উদাহরণও কম বললেই চলে। আসলে সাধারণ মানুষ, তাঁদের প্রাত্যহিক জীবন- এই বিষয়গুলি বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরাই প্রধান স্থান নেবেন কিনা সেই বিষয়টি একান্তভাবেই রচয়িতার উপর নির্ভর করে।

সময় যত এগিয়েছে, সমাজে দেখা গেছে পরিবর্তন আর সেই পরিবর্তনের ছাপ স্বাভাবিকভাবেই লক্ষিত হয়েছে সাহিত্যে। বাংলা ভাষা সংস্কৃতির থেকে তুলনায় অর্বাচীন তাই বিষয় নির্বাচনের নিরিখে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার ছাপ লক্ষ করা যায়। অবশ্য ‘আধুনিকতা’- এই শব্দটি বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে কারণ আধুনিকতার বোধ সম্পূর্ণভাবে আপেক্ষিক।

পূর্ববর্তী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ যথাক্রমে সংস্কৃত শাস্ত্র এবং সংস্কৃত সাহিত্য এই দুটি ধারাতেই গণিকাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁদের কথা বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্তি কিন্তু কাব্যরচনাকার নিজের সৃষ্ট চরিত্রকে যাবতীয় অনুভূতি দিয়ে রক্তমাংসের মানুষের মতো করেই গড়ে তোলেন। তিনি শাস্ত্রের ছায়া অবলম্বন করেন ঠিকই কিন্তু নিজের সৃষ্টিকে নিজের মতো করে নির্মাণের স্বাধীনতা তাঁর রয়েছে। শাস্ত্রে যেমন আলোচিত হয়েছে গণিকাদের পেশা, পেশাগ্রহণ, পেশাগত দায়বদ্ধতা এবং সেই পেশায় ক্রমোন্নতি-সাধনের প্রয়াস, তাঁদের পেশাগত স্তরবিভাজন সেরকমই আলোচিত হয়েছে পেশার বাইরে গিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের কথাও। তাঁদের পরিবার-পরিজন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, প্রেম, বিবাহ, সন্তানাদি বিষয়। তবে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে, শাস্ত্রে অধিকাংশ সময়ে তাঁদের কর্তব্য-অকর্তব্যের উল্লেখ রয়েছে যেগুলি তাঁদের পেশাগত এবং ব্যক্তিগত উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু সাহিত্যে শাস্ত্রবর্ণিত জ্ঞান এবং উপদেশের পাশাপাশি কোনো গণিকার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত অনুভূতির বর্ণনা রয়েছে। এমনও হতে পারে কাব্যের নায়িকা নিছক কবির কল্পনা নন, তিনি বাস্তবের কোনো চরিত্রের আদলমাত্র।

যদি আমরা নিতান্ত তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, সাহিত্যে প্রাপ্ত চরিত্রগুলির বাস্তব অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার সম্মুখীন বা সেই চরিত্র অথবা ঘটনাগুলি শুধুমাত্র কবির কল্পনানির্ভর তাহলে তা অর্ধসত্য বা খণ্ডিত সত্য হবে। কারণ সেই একই। সাহিত্য বিশেষতঃ যে সাহিত্যের মূল আধার সাধারণ মানুষ তা কখনই শুধু রচয়িতার কল্পনার দ্বারা নির্মিত হতে পারেনা। তাকে লেখক নিজের মনন-দর্শন, বোধ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে সিদ্ধিগত করেছেন। শাস্ত্রনিষ্পত্ত পণ্ডিতবর্গের প্রদত্ত জ্ঞানকে আধাররূপে গ্রহণ করে কবি নিজের ‘মনের মাধুরী মিশায়ে’ নির্মাণ করেন সাহিত্য, ফলে তা শুধুই কল্পনা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

কালের অগ্রগতির সাথে সাথে অন্যান্য সমস্ত কিছুর মত সাহিত্যেও যুগোপযোগী পরিবর্তন এসেছে। আরও বেশি করে সাধারণ মানুষের কথা লেখা শুরু হয়েছে। অনেক বেশি জীবনমুখী, বর্তমানের সঙ্গে অনেক বেশি সঙ্গতিপূর্ণ সেই লেখা। তাই ভিন্ন সময়কালের, ভিন্ন আঙ্গিকের এমনকি সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ভাষায় রচিত সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করা দুষ্কর হলেও সেই কাজে আমরা এগিয়েছি। এই অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়বস্তুকে আমরা কয়েকটি ছোট ছোট পর্বে বিভক্ত করে নিয়েছি, চেষ্টা করেছি পুনরাবৃত্তিদোষদুষ্ট না হওয়ার।

যেহেতু শাস্ত্রে কোনো ব্যক্তিবিশেষের উল্লেখ থাকেনা তাই আমরা সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকা চরিত্রগুলিকে প্রধানতঃ শাস্ত্রের আলোকে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

এই অধ্যায়ে রয়েছে তাঁদের পেশাগত অভিব্যক্তি অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে তাঁদের জীবিকায় কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা এবং এসে থাকলেও কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে এবং সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাঁরা নিজেদের অভিযোজনে সমর্থ হয়েছেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা। আর এর পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিচার করেছি কন্যা-বধূ-জননীরূপিণী গণিকাকে অর্থাৎ তাঁদের পারিবারিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। একজন গণিকার পেশাগত পরিচয়ের বাইরে আরও অন্য পরিচয় থাকে; কখনো তিনি কারো কন্যা, কখনো জায়া আবার কখনো বা জননী। হ্যাঁ, এমন অনেক চরিত্রের সন্ধান আমরা পেয়েছি যিনি একই সঙ্গে এই তিনটি রূপেই বিরাজমানা। আবার কেউ হয়তো যেকোনো একটি অথবা দুটি রূপে অবস্থান করছেন।

সম্বন্ধনির্ণয়/ সম্পর্ক স্থাপন করার সময়ে আমাদের মনে হয়েছে পেশাগত অভিব্যক্তির তুলনায় গণিকাচরিত্রের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি অনেক বেশি জটিল এবং সেটাই স্বাভাবিক।

আগের অধ্যায়েই আমরা দেখেছি যে, বাংলা সাহিত্যের যে সময়সীমাটিকে (১৯৪০-১৯৭৫ খ্রি.) আমরা বেছে নিয়েছি তার সূচনাপর্বে রয়েছে ব্রিটিশ শাসনের আওতাধীন ভারতবর্ষের কথা। সেই সময়ে ‘ব্রিটিশরাজ’ চলছে সুতরাং এক অর্থে তাঁরাই রাজা এবং তাঁদের হাতেই দেশপরিচালনার ভার। অষ্টাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী – এই সময়ে বাংলাদেশ দেখছে জমিদার-জোতদার-অত্যাচারী নীলকর ইংরেজ শাসকদের। আর ঠিক এই সময়েই তৈরী হচ্ছে ‘বাবু-কালচার’। ‘বাবু’

এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন সম্প্রদায়; যাঁদের একমাত্র কাজ ছিল বিলাসিতা করা। প্রবল আর্থিক অপচয় এবং সেই অর্থের জোরেই সমাজে প্রতিপত্তি লাভ আর সামাজিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার গর্বে অন্ধ হয়ে ন্যায়নীতি, ধর্মাদর্ম সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁরা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ভোগসুখে নিমগ্ন থাকতেন। তবে ব্যতিক্রমী কয়েকজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা বাবু-সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েও বেশ কিছু সমাজসংস্কারমূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন।

আমাদের আলোচনায় এসেছে দেশভাগ, বঙ্গভঙ্গের সময়পর্ব কারণ বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত ‘দেহবৃত্তি’ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এই দুটি সময়খণ্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকায় আমরা এই অধ্যায়ে বিশদ ব্যাখ্যা এবং তার পুনরাবৃত্তি করছি না। কিন্তু এই দুটি রাজনৈতিক ঘটনার জটিলতা কীভাবে একটি দেশের বিশেষ করে সীমান্তবর্তী একটি রাজ্যের জনগণের যাপনে চিরকালীন যন্ত্রণা-দাগ এঁকে রেখেছে তা আমরা দেখেছি। এই ঘটনাগুলি সেই সময়ের বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বসবাসকারী জনগণের জীবনযাপন এবং জীবনবোধকেও আস্তে আস্তে পালটে দিতে সক্ষম হয়েছিল সে কথা আমরা জেনেছি।

আসলে জীবনের থেকে বড় সত্য কিছু নেই তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে মানুষের কাছে অনেকসময় জীবনধারণ করার প্রশ্নটাই আসল হয়ে দেখা দেয়।

এই অধ্যায়ে আমরা গণিকাদের পেশাগত অভিব্যক্তি আলোচনা করবো। এই পেশাগত অভিব্যক্তিকে আমরা কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি-

- পেশাগ্রহণের কারণ
- শিক্ষা
- চৌষটি কলা এবং তার চর্চা
- গণিকাবৃত্তি ও অপরাধপ্রসঙ্গ: আইনের ব্যবহার
- কুটনী অথবা মাতৃকা: তখন এবং এখন

- শারীরিক স্বাস্থ্য: সচেতনতা, প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব
- গ্রাহক সন্তুষ্টি: সেকাল – একাল
- পেশাগত অভিব্যক্তি:

“ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী,

চরণপদ্মে নমস্কার।

লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা,

লও ফিরে তব পুরস্কার।

স্বাস্থ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে

পাঠাইলে বনে যে কয়জনা

সাজায়ে যতনে ভুষণে রতনে,

আমি তারি এক বারাগনা।

দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন,

দেবতা জাগিলে মোদের রাতি--

ধরার নরক- সিংহদুয়ারে

জ্বালাই আমরা সন্ধ্যাবাতি।”

সমাজে এমন অসংখ্য পেশা রয়েছে যেগুলি সমাজস্বীকৃত কিন্তু সমাজমান্য নয়। ‘স্বীকৃত’ এবং ‘মান্য’ এই শব্দদুটিকে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে ব্যবহার করেছি। ‘স্বীকৃত’ অর্থাৎ সমাজ এবং তার তথাকথিত সামাজিকেরা এই ধরনের পেশাকে কেবলমাত্র গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন কারণ তাঁরা জানেন শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে বহু মানুষ অনিচ্ছুক হয়েও নিন্দনীয় বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়, এইধরনের পেশাবলম্বনকারীদের সমাজ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না কিন্তু তাঁরা সমাজে বিদ্যমান। আর অন্যদিকে রয়েছে সমাজমান্য পেশা; এই ধরনের পেশাবলম্বনকারী ব্যক্তিদের জীবিকা বিষয়ে কেউ কোনো বিরুদ্ধ মত অথবা অবমাননাকর মন্তব্য পোষণ করেননা এবং সমাজে তাঁদের যথেষ্ট সম্মানজনক অবস্থান। ‘গণিকাবৃত্তি’ হল এমনই একটি পেশা, যা সমাজস্বীকৃত কিন্তু সমাজমান্য

নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ তাঁদের উপস্থিতি, অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত কিন্তু সম্মান নয় তাঁদের জন্য বরাদ্দ থাকে ঘৃণার দৃষ্টি।

আমরা আগেই বলেছি ‘দেহবৃত্তি’ অর্থাৎ যে বৃত্তির মাধ্যম হল দেহ। দেহকে পণ্যরূপে ব্যবহার করে অর্থাৎ উপার্জন এবং জীবিকানির্বাহ - খুব সংক্ষেপে বৃত্তিটি সম্পর্কে এটুকুই বলা চলে। যখনই ‘দেহ’ উপার্জনের মাধ্যম হয়ে যায় তখনই জনমানসের চিন্তাধারায়, ভাবনায় বদল আসে। যদি অন্যান্য কায়িক শ্রমের মতো শুধু শারীরিক পরিশ্রমে বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে এই বদল আসতো না কিন্তু এই পেশাটির ক্ষেত্রে রয়েছে যৌন-আসক্তির ইঙ্গিত। এখানে ‘দেহ’ কেবল কঠোর পরিশ্রম করেনা তাকে যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে ‘খদ্দের’ কে সন্তুষ্ট করে তবে অর্থ উপার্জন করতে হয়। তাই যৌনতার কারণে সমাজে ছিছিঙ্কারের ঢঙ্কানিনাদে ঢাকা পড়ে যায় এঁদের জীবনসত্য।

শুধু যে নারী যৌনকর্মী হন তা নয়; পুরুষও যৌনকর্মী হন। হন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরাও। যদিও আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন নারী যৌনকর্মীরা।

এক যুগের ‘গণিকা’, ‘রূপাজীবা’রা কীভাবে কালের স্পর্শে আজকের যুগের ‘যৌনকর্মী’র পরিচয়ে পরিচিত হলেন, কীভাবে ‘কর্মী’ শ্রমের এই চিহ্নটিকে নিজেদের নামের পাশে ব্যবহারে সমর্থ হলেন সেই লড়াইকে খুঁজে দেখতে চেয়েছি আমরা। যদিও স্মরজিৎ জানা^১ তাঁর ‘যৌন কাজ কি কাজ?’ শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক গভীরে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য পড়লে কিছুটা হলেও আন্দাজ পাওয়া সম্ভব-

“আমাদের মূল বিতর্ক ‘যৌন কাজ কি কাজ?’- সে প্রশ্নে আসা যাক, কোন কাজে আনন্দ উচ্ছ্বাস থাকলে তাকে কাজ বলা যাবে না- এমন নীতি কেউ চাপাতে চাইলে অন্য কথা— নতুন বা যৌনকাজে কী পরিমাণ পরিশ্রম, দক্ষতার প্রয়োজন হয়, তা নিয়ে সাধারণের মনে কোন বিতর্ক আছে কি? যে দেশে বাৎস্যায়নের জন্ম—যে দেশে যৌনকাজকে একটি উন্নত শিল্পকর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে—সেই অতীতকালেও এবং পরবর্তীকালে যা সারা বিশ্বে নন্দিত হয়েছে—সেখানে যৌনকাজ কি কাজ? এ প্রশ্ন তোলা শুধু অবাস্তবই নয়, হাস্যকরও বটে।”^২

আমাদের অনুসন্ধান আধুনিক সময়সীমা পর্যন্ত নয় তবুও কালের যে পরিবর্তন আমরা দেখতে পেয়েছি তাতে সেই সময়ের মধ্যেও পরিবর্তনের সূচনাই আমরা পেয়েছি।

● পেশাগ্রহণের কারণ:

আমাদের গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছি, এই বৃত্তির একেবারে প্রাথমিক সূচনালগ্ন জানা সম্ভব না হলেও এর প্রাচীনত্ব নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। একটিমাত্র নির্দিষ্ট কোনো কারণের জন্য নারীরা এই বৃত্তি গ্রহণ করেন তা কিন্তু নয়, তার নানাবিধ কারণ থাকে। সেই কারণগুলিকে আমরা আগের অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

একেবারে প্রাচীনযুগে নারীরা কতোখানি স্বেচ্ছায় এই পেশায় আসতেন সে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। একেবারেই নগণ্য সেই সংখ্যা এটুকু বলা যেতে পারে। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যায় যৌনসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা আর দেহবৃত্তি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়। সেরকমই ব্যভিচারিতা ও দেহবৃত্তিও এক পঙ্ক্তিতে বসার তুল্য নয়।

১। যদিও আমরা শিরোনামে ‘গণিকাবৃত্তি’ শব্দটি ব্যবহার করেছি কিন্তু আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটি অধ্যায়েই দেখেছি দেহবিলাসিনীদের অনেক বিভাগ রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম একটি বিশেষ বিভাগ হল ‘গণিকা’। এছাড়াও ‘রূপদাসী’, ‘বেশ্যা’, ‘বারাঙ্গনা’, ‘পণ্যাঙ্গনা’, ‘বাররামা’ ইত্যাদি নানা নাম রয়েছে তাঁদের এবং তাঁরা শুধু নামেই নয়; প্রত্যেকের কাজ আলাদা এবং সেই অনুযায়ী পদমর্যাদাজনিত স্থানও আলাদা।

সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে (অবশ্যই নির্বাচিত সাহিত্যে) তার পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবর্তন অর্থাৎ বিভাজনের প্রসঙ্গ তাঁদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দবন্ধগুলির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য; একইভাবে তাঁদের কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সময় যত এগিয়েছে আমরা দেখেছি প্রাচীন যুগে গণিকাদের অবস্থান যতখানি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ছিল ক্রমশঃ তাতে যেন অবনতি এসে পড়ছিল। গণিকাবৃত্তি আদতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ফসল। কারণ যতই এই বৃত্তির আধার যৌনসম্পর্ক হোক না কেন, কোনোভাবেই মেয়েটির যৌনতৃপ্তির প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়না। আবার অনেকেই যে কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্যই এই পেশাটি বেছে নিতেন তাও নয়, কারণ একটি বিপুল সংখ্যক মেয়েই বাধ্য

হয়ে এই পেশায় আসতেন এবং আমরা যদি সেই ‘বাধ্যতার’ কারণগুলি ফিরে দেখি তাহলে দেখবো অতীত এবং বর্তমান কোথাও যেন মিলেমিশে গেছে।

সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর ‘Prostitution in Ancient India’ গ্রন্থে গণিকাবৃত্তির প্রাচীনত্ব ও পেশাগ্রহণের কারণগুলি অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর ভাষায়-

“Gradually, there arose a section of women who, either because they could not find suitable husbands, or because of early widowhood, unsatisfactory married life or other social pressures especially of they had been violated, abducted or forcibly enjoyed and so denied an honourable status in society, or had been given away as gifts in religious or secular events- such women were frequently forced to take up prostitution as a profession. And when they did so, they found themselves in a unique position: they constituted the only section of women who had to be their own bread winners and guardians. All the others—maiden daughters, sisters, wives, widows and maidservants—were wards of man: fathers, brothers, husbands, masters or sons. So, women who took up prostitution had to be reasonably sure of an independent livelihood; their customers had to make it a viable proposition for them.”⁸

প্রাচীন যুগে যেভাবে একজন সুন্দরী, রূপবতী, যুবতীকে কখনো রাজা অথবা সমাজের উচ্চ পদাধিকারী কোনো ব্যক্তির কাছে উপহার হিসেবে পাঠানো হতো, কখনো তাঁদের দেবতার পূজার নৈবেদ্য হিসেবে ‘দেবদাসী’ তে পরিণত করা হতো, কখনো বা তাঁরা হতেন সমাজের অন্যতম সম্মাননীয় ‘জনপদকল্যাণী’ আবার কখনো তাঁদের পরিচয় তাঁরা ‘নগরবধূ’। যতরকম গালভরা সম্বোধনেই তাঁদের সম্বোধন করা হোক না কেন তাঁদের প্রকৃত সত্য যেন নিহিত থাকে শরীরের ভাষায়। তাঁদের বিদ্যা-শিক্ষা-বুদ্ধি সমস্ত কিছু ছাপিয়ে তাঁদের দেহ এবং দেহগত সৌন্দর্যটুকু যেন একমাত্র সত্য হয়ে যায়, অন্ততঃ সমাজনির্ধারিত মাপকাঠিতে। সেই একই পরিণতি আমরা লক্ষ করি কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও বাংলা সাহিত্যে দেখি --“বিনা সুপারিশে সে নিজেই পয়সা রোজগার করতে পারে।”^৯(বা.গ./ পৃ.৫৪) কারণ সে মেয়েটিকে বোঝানো হয়েছিল যেখানে নিতান্ত অল্প বয়সে বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কোনো মেয়ে কুলত্যাগ করেছিলেন Usha Chakraborty তাঁর *Condition of Bengali Women around the 2nd Half of The 19th Century* গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন^{১০}। বিধবা মেয়ের গণিকাবৃত্তিতে আসার উদাহরণ আমাদের নির্বাচিত সাহিত্যে কয়েকটি পেয়েছি।^{১১}

আবার কখনো একেবারেই কপর্দক শূন্য অবস্থায়, বেঁচে থাকার জন্যই হয়তো উপায়ান্তর না পেয়ে এই পথ বেছে নিতে হয়, যে কথা জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর ‘চিরকালিনী’ গল্পে বলেছেন- “তাদেরও হয়তো সেদিন চাল ছিল না ঘরে, পয়সা ছিল না হাতে।”^৮(বা.গ./পৃ.৯০)

পেশাগ্রহণের দিক থেকে বিশেষ কোন পার্থক্য দুটি ভাষার সাহিত্যে নেই বললেই চলে।

শিক্ষা:

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত উচ্চশ্রেণীভুক্ত গণিকাদের প্রথাগত শিক্ষার বিষয়টি আমাদের আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের আলোচনায় বহুবার চৌষট্ঠিকলা, নানাবিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যে সমস্ত কলাবিদ্যাগুলিতে শিক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল তাঁদের জন্য। এখন যে প্রসঙ্গটি বারবার ঘুরে ফিরে আসছে সেটি হল এই কলাগুলিতে জ্ঞানার্জন এবং সেগুলির নিরন্তর অভ্যাস তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অন্যথায় তাঁরা পেশায় উন্নতিসাধন করতে পারবেন না। কিন্তু এই কলাচর্চার বিষয়টি থেকে গণিকাদের শিক্ষা সংক্রান্ত অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি উঠে আসে সেটি হল প্রথাগত শিক্ষাবিষয়ক।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে *কামসূত্রের* আলোচনায় আমরা গণিকাদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু, পাঠগ্রহণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পুনরায় সেইগুলির অবতারণা না করে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। বাৎস্যায়ন *কামসূত্রের* ‘সাধারণমধিকরণম্’ অধিকরণের ‘বিদ্যাসমুদ্দেশ’ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁদের শিক্ষাপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে চৌষট্টি কলার কথাই আলোচনা করেছেন এবং সেই সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত প্রকার তথ্যই তিনি দিয়েছেন আর সেই বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখেছি গণিকাদের বিবিধ শাস্ত্র, কলা প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো, কিন্তু সেই শিক্ষাদানের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের পুরুষের শরীর ও মনের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা। পেশায় ক্রমোন্নতি করা অথবা আরও স্পষ্ট করে বললে টিকে থাকার লড়াই-এর কারণেই তাঁদের এই বিষয়গুলি শিক্ষা করতে হতো। গৃহস্থ পরিবারের বিবাহিতা পত্নীদের নানাবিধ দায়িত্ব-কর্তব্য ছিল যেগুলি পালন করতে সমাজ তাঁদের বাধ্য করতো। সেখানে সংসারধর্ম-পতিসেবা-সন্তানপালন ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম ছিল কিন্তু স্বামীসন্নিকাশে শাস্ত্রচর্চার উদাহরণ খুব বেশি দেখা যায় না। তার মানে কিন্তু এই নয় যে তাঁরা শিক্ষিত ছিলেন না বা শাস্ত্রজ্ঞ

ছিলেননা। তাঁরাও শিক্ষালাভ করতেন, কিন্তু বিবাহের পর সংসারধর্মই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো ফলে নিজেদের অর্জিত শাস্ত্রজ্ঞান চর্চা করার বিশেষ অবকাশ বা সুযোগ তাঁদের থাকতো না।

এছাড়াও রাজনীতি-কূটনীতি-সমাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে রাজতন্ত্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সাথে এমনকি রাজার সাথে কথোপকথন দুষ্কর হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের রাজনৈতিক সৌজন্যমূলক উপটৌকনরূপে বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করা হত। কখনো শুধুই উপহার হিসেবে আবার কখনো নিজ রাজ্যের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য গুপ্তচররূপেও গণিকাদের নিয়োগ করা হত^{১০}। অতএব একথা পরিষ্কার যে, বিবিধ বিষয়ে বিশদ জ্ঞান, ক্ষুরধার বুদ্ধি, এবং রূপ-শারীরিক সৌন্দর্যের জালে আবদ্ধ করে তাঁদের জন্য নির্ধারিত কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা গণিকাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন ছিলোনা।

কিন্তু এখানে আসে বৈষম্য বা শ্রেণীবিভাজনের প্রশ্ন। সংস্কৃত হোক অথবা বাংলা ভাষার সাহিত্য সবক্ষেত্রেই দেখা যায় উচ্চস্তরভুক্ত, ঐ পেশাবলম্বিনী হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা সম্মাননীয়, আর্থিক সম্ভতিসম্পন্ন তাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল। *মৃচ্ছকটিক*-এ পঞ্চমাস্ত্রে আমরা এই বিষয়ের উল্লেখ পেয়েছি।^{১১} বসন্তসেনা প্রমুখ চরিত্রের বক্তব্য থেকে। বসন্তসেনা যেভাবে নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন কখনো শকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, কখনো বিটের সাথে প্রকৃতির বর্ণনায় আবার নিজ দয়িত চারুদত্তের সাথে প্রেমালাপের মুহূর্তে রীতিমত শিক্ষা না থাকলে, রুচিবোধজনিত স্বকীয়তা না থাকলে এগুলি সম্ভবপর নয়। নিজের বাগ্‌বেদন্য দিয়ে পাঠককে মুগ্ধ করেছেন। তিনি সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেছেন। এবং এই প্রসঙ্গে বলতেই হবে তাঁর শিক্ষা-রুচি-কলানুরাগই তাঁকে সাধারণ থেকে অসাধারণে উন্নীত করেছে। হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি ‘নগরনটী’, ‘নগরবধূ’ অতএব তিনি যে ‘সাধারণী’ নন তা স্পষ্ট। কিন্তু একজন গণিকার যে ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকার কথা স্বাভাবিক বলে ধরা হয়; সেই সীমাবদ্ধতা তাঁর ছিল না। তিনি দৃষ্ট কণ্ঠে নিজের পছন্দের পুরুষকে কামনা করেছেন।

প্রকৃত শিক্ষা ঠিক-ভুলের পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখায়। একজন গণিকার কাছে অর্থ-সম্পদই কাম্য হওয়া উচিত, স্বয়ং বাৎস্যায়ন সেই কথা বলেছেন। আর তার কারণ হল এই পেশার কোনোরকম বৃত্তিগত নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু বসন্তসেনা অর্থ-সম্পদ-প্রতিপত্তি ইত্যাদির আকর্ষণ পরিত্যাগ করেছেন। নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চাননি উপরন্তু এমন একজন পুরুষকে

প্রেমিকের আসন দিয়েছেন বর্তমানে যাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। এমনকি শকার তাঁকে অলংকারাদি দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চাইলেও তাকে তীব্র ভাষায় অপমান করতেও বসন্তসেনার বাধেনি। তিনি স্থূল চটুলতা পছন্দ করেননি। একজন গণিকা হয়েও স্পষ্ট উচ্চারণে নিজের পছন্দের কথা জানিয়েছেন কারণ তিনি মনে করেছেন তাঁর জন্য উজ্জয়িনীতে একমাত্র চারুদত্তই যোগ্য। নিজের গণিকা পরিচয়ের জন্য কোনরকম দ্বিধা বা হীনমন্যতা তাঁর মধ্যে লক্ষ করিনা।

কুটনীমতম-এ আমরা অসংখ্য গণিকাচরিত্রের উল্লেখ পেয়েছি, তার মধ্যে মালতী, হারলতা এবং মঞ্জরী এই তিনটি মুখ্য চরিত্র রয়েছে। তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রথাগত বিদ্যাশিক্ষার কোনো উল্লেখ নেই। প্রথাগত শিক্ষা অর্থে শুধুমাত্র বিবিধ শাস্ত্র এবং সেই সম্পর্কিত জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। নিজেদের পেশার জন্য প্রয়োজনীয় কলায় তাঁরা নিপুণ ছিলেন এবং মঞ্জরী চরিত্রটিকে আমরা নাট্যাভিনয়ে অত্যন্ত দক্ষ একজন অভিনেত্রী হিসেবে পাই। মঞ্জরীর কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকে এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন।”

সংস্কৃত শাস্ত্রই হোক অথবা কাব্য গণিকাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যে দিকটিতে আমরা আলোকপাত করতে চাইছি তাতে বারংবার বেশ কিছু সাধারণ দিকই উঠে আসছে এবং সেগুলি হল-

প্রথমতঃ গণিকাদের যাবতীয় শিক্ষা তাঁদের নিজের গৃহে অথবা যে ব্যক্তির (প্রাক্তন গণিকা) তাঁরা বসবাস করতেন তাঁর গৃহে সম্পন্ন হতো।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা কোনো গুরুগৃহে যেতেন না; পাঠদানের জন্য স্বয়ং গুরু তাঁদের গৃহে আসতেন। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় তাঁদের শিক্ষাদানের দায়িত্বে যাঁরা থাকতেন তাঁরা গণিকাগৃহেই অবস্থান করতেন। প্রাচীনযুগে অধ্যাপনার কাজ নির্দিষ্ট ছিল ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু গণিকারা অস্পৃশ্য না হলেও সমাজে তাঁদের স্থান খুব উচ্চ ছিলোনা ফলে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগোষ্ঠী তাঁদের শিক্ষাদান করতেন কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে মনে রাখতে হবে এটি সেই স্তরের কথা বলা হচ্ছে যাঁদের দায়ভার রাষ্ট্রের হাতে থাকতো না

তৃতীয়তঃ তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবেই তাঁদের পেশাকেন্দ্রিক ছিল। কামসূত্রে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে; সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

চতুর্থতঃ অর্থশাস্ত্র আমাদের জানাচ্ছে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুসারে রাষ্ট্র এঁদের প্রতিপালন করার এবং যথাযথ শিক্ষাদানের দায়ভার গ্রহণ করতো এবং সেই শিক্ষা হতো সর্বাঙ্গীণ যাতে একজন যথার্থ গণিকা হয়ে তিনি ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালনে সমর্থ হন। সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে রাষ্ট্র এই দায়িত্বপালন করতো – যার থেকে একথাও স্পষ্ট যে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র এই পেশার উৎখাতের ব্যবস্থা তো গ্রহণ করেইনি, উপরন্তু গণিকাবৃত্তি বন্ধ করা সম্ভব নয় একথা উপলব্ধি করে তাঁদেরকে অস্ত্রের মতো প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যবহার করেছে।

পঞ্চমতঃ একজন গণিকা নিজের সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ায় অধিকারী ছিলেন কিনা পরিষ্কার নয়। কিন্তু একজন প্রাক্তন গণিকা যিনি বর্তমানে কুটনী পেশার সাথে যুক্ত বা ‘গণিকা-মাতা’ রূপে পরিচিত হতেন তিনি নিজের অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিতেন নিজে সন্তানকে; উদ্দেশ্য তাঁকে নিজের পেশায় প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে কেবলমাত্র কন্যাসন্তানদের এই শিক্ষাদান করা হতো, পুত্রসন্তানদের শিক্ষার উল্লেখ নেই। তার অন্যতম কারণ হতে পারে, কন্যারাই ভবিষ্যতে এই পেশায় থেকে মাতার দায়িত্বগ্রহণ করতেন।

এরপরে বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত চরিত্রগুলি এবং তাঁদের শিক্ষার বিষয়টি আলোচনা করবো আমরা। আমাদের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যের সময়সীমা ১৯৪০ থেকে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই দীর্ঘ সময়সীমার মধ্যে বহু বহু পরিবর্তন হয়েছে। সেই পরিবর্তন যেমন সমাজে-রাজনীতিতে এসেছে তেমনি এসেছে অন্দরমহলে, যে অন্দরমহল নিয়ন্ত্রণ করেন মহিলারা। তবে ব্যতিক্রম থাকে অবশ্যই।

আমাদের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত চরিত্রগুলিকে সময়সীমার নিরিখে বিচার করলে এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভবপর হবে। এই ধারণা নির্মাণের জন্য আমাদের চরিত্র অনুযায়ী তথ্যসংগ্রহ করা এবং তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নির্মাণ করা সম্ভব।

ইংরাজ শাসনের সময়ে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে নারীশিক্ষার ধারা ফিরতে আরম্ভ করলো। প্রাচীন যুগে নারীরা বিদুষী ছিলেন সেই বিষয়ে মতান্তর নেই কিন্তু মধ্যযুগে অন্যান্য সব বিষয়ের মতই স্ত্রীশিক্ষার সংক্রান্ত মুক্তচিন্তার দ্বারটিও রুদ্ধ হয়ে গেছিল। আধুনিক যুগে বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীতে নারীশিক্ষার প্রচলন নতুন করে শুরু হল, যার কাভারী ছিলেন এই বাংলারই কয়েকজন মনীষী। কিন্তু কোনো বিষয় সমাজে নতুন করে প্রচলন করতে চাইলেই তা খুব সহজে হয়না

আর যদি তা স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের মতো স্পর্শকাতর বিষয় হয় তবে তো কথাই নেই! প্রবল বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বঙ্গে নারী জাগরণ এর সূচনা হয়েছিল। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জনমানসে এরকম ধারণা প্রচলিত ছিল যে, মেয়েদের অক্ষরজ্ঞান থাকলে কিংবা তাঁরা বিদ্যাচর্চা করলে পতিনাশ হয় অর্থাৎ বৈধব্য অনিবার্য।^{১২} আবার এরকম ধারণাও প্রচলিত ছিল যে, মেয়েরা কেবলমাত্র ঘরের কাজ করবে, শিক্ষার আলো তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এই সমস্ত প্রচলিত ধ্যানধারণা ভেঙ্গে ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রচলন হল। যদিও সেই শিক্ষা প্রথম থেকেই সমাজের সব স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত এবং ব্যতিক্রম হিসেবে কয়েকটি মধ্যবিত্ত পরিবার মেয়েদের শিক্ষিত করায় আগ্রহী হয়। তাঁরা মেয়েদের স্কুলেও ভর্তি করেন এবং বাড়িতেও গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই শিক্ষার ফল যে সর্বথা সুখকর হল তা কিন্তু নয়।

একটি তালিকার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রাপ্ত প্রধান গণিকা চরিত্রগুলির শিক্ষার একটি সাধারণ অনুপাত নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। শিক্ষা ও অশিক্ষা বলতে ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞান ও অক্ষরজ্ঞানহীনতাকেই এখানে বুঝতে হবে। এই তালিকা থেকে *শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত* আত্মকথার মানদা দেবী চরিত্রটিকে বাদ দেওয়া যেতে পারতো কারণ এটি একটি আত্মকথা এবং শিরোনামেই মানদা দেবী জানিয়েছেন যে তিনি শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থ্য বজায় রাখার জন্য আমরা এই গ্রন্থটিকে তালিকাভুক্ত করেছি।

নিচের তালিকা থেকে আমরা আমাদের গৃহীত গল্প, উপন্যাসের নায়িকাচরিত্রগুলির অক্ষরজ্ঞান বিষয়ে ধারণা করতে পারবো-

কাহিনী	চরিত্রের নাম	শিক্ষিত(অক্ষরজ্ঞানযুক্ত)	অক্ষরজ্ঞানহীন
<i>কেরী সাহেবের মুঙ্গী</i>	টুশাকি	না	
<i>সাহেব-বিবি-গোলাম</i>	চুনী, হাসিনী	না	
<i>নিশিপদ্ম</i>	কাঞ্চনমালা	না	
<i>কবি</i>	বসন্ত	না	
<i>উত্তর-ফাল্গুনী</i>	দেবযানী	হ্যাঁ	
<i>জন-অরণ্য</i>	কণা	হ্যাঁ	

দৌলতী	দৌলতী	না	
শিক্ষিতপতিতার আত্মচরিত	মানদা	হ্যাঁ	
এলোকেশী বেশ্যা	এলোকেশী	হ্যাঁ	
বিচারক	ক্ষীরোদ (হেমশশী)	হ্যাঁ	
ডালিম	ডালিম	হ্যাঁ	
আঁধারে আলো	বিজলী	হ্যাঁ	
রসাভাস	সূর্যমুখী	না	
আদরিণী	আদরিণী	না	
তুরূপ	বিনোদিনী	না	
কুসুম	কুসুম	না	
চিরকালিনী	মল্লিকা, যুঁই	যুঁই	মল্লিকা
বিপদ	হাজু	না	
মেলা	কমলমণি	না	
পতিতার পত্র	সুলোচনা	হ্যাঁ	
তারপর	ফুলমণি	না	
মহানগর	চপলা	না	
উৎসর্গ	নীলিমা	হ্যাঁ	
বারবধূ	লতা(পঞ্চগীববি)	না	
বাঈজী	আনোয়ারীবাঈ	না	
বিদ্যুৎলতা	বিদ্যুৎ	হ্যাঁ	
একজিবিশন	চম্পা	হ্যাঁ	
মাণ্ডল	নীলা	না	
নিষিদ্ধ পল্লীগৃহে গমন	দী	হ্যাঁ	
দেহদানী	খুরপি	না	
চিত	পুতুল	না	

পটের বিবি	ভামরী	না	
শেষ পারানি	পদ্মা	না	
স্পর্শ	স্বপ্না	হ্যাঁ	
পহেলি পেয়ার	জহরবাঈ	না	
নিরুদ্দেশ-প্রাপ্তি-হারানো	পদ্মা	না	
আঙ্গুরলতা	আঙ্গুরলতা	না	

এই তালিকাটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং আমাদের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্রগুলিকে নিয়ে এটি নির্মিত। তালিকাটি থেকে যাতে যথাযথ ফল নির্ণয় সম্ভব হয় সেই কারণে একটি উপন্যাস বা কাহিনীর এক এবং প্রয়োজনে একাধিক প্রধান চরিত্রকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তবে অপ্রধান চরিত্রগুলিকেই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়েছে; অপরাপর তুলনামূলকভাবে অপ্রধান চরিত্রগুলিকে নয়।

একটি সাধারণ চিত্র আমাদের সামনে উঠে আসছে- তা হল যত সময় এগিয়েছে তত মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে এবং ক্রমশঃ শিক্ষিত মেয়েরাও এই পেশায় এগিয়ে এসেছেন। স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে যে কোনো কারণেই হোক না কেন তাঁরা এই পেশাকে বেছে নিয়েছেন। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে *জন-অরণ্য* উপন্যাসে দেখেছি একদিকে যেমন চাকরির অভাবে পরিবার প্রতিপালনের জন্য শিক্ষিত মেয়েরা নিতান্ত বাধ্য হয়ে এই পেশায় এসেছেন এমন তথ্য রয়েছে। কারণ ‘শিক্ষিত বেকার’ নামের একটি প্রজন্ম তৈরী হয়েছে তখন। যেখানে বাড়ির ছেলেটির পক্ষে কোন চাকরি পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠলেও শিক্ষিত মেয়েটির পক্ষে কিন্তু চাকরি একেবারে অসম্ভব ব্যাপার ছিলোনা। তার কারণ মেয়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তার শরীর। কমবয়সী শিক্ষিত মেয়েদের চাকরির টোপ দিয়ে শেষপর্যন্ত দেহব্যবসায় ‘নামতে’ বাধ্য করা হতো আর শত দৈন্য-অন্যভাব থেকে পরিবারকে একটু হলেও রক্ষা করতে পেরে সেই মেয়েটিও এই নরকবাসকে একরকম মেনেই নিত। একটি শব্দ লক্ষ্য করার মতো ‘দেহব্যবসায় নামা’ অর্থাৎ এই পেশা আসা মানে যেন আক্ষরিক অর্থেই পতিত হওয়া।

এরকমই একটি উদাহরণ রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *প্রতিদ্বন্দ্বী* উপন্যাসে। সেখানে নায়ক কোন চাকরি জোগাড় করতে না পারলেও তাঁর বোন একটি কোম্পানিতে অনেক অল্প শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে চাকরি পায়^{১৩}। কাহিনী যত এগোয় পাঠক বুঝতে পারে মেয়েটির জীবনযাত্রা স্বাভাবিক বা বলা ভালো তথাকথিত ভদ্র বাড়ির মতো নয় এবং সেই নিয়ে তাঁর পরিজনের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ রয়েছে। কিন্তু যেহেতু সে রোজগারে তাই তাকে চাকরি বন্ধ করতে বলার ক্ষমতা পরিবারের কারো নেই।

ঠিক তার পাশাপাশি তথাকথিত সচ্ছল, উচ্চ মধ্যবিত্ত বেশ কিছু পরিবারের কথাও রয়েছে। এই সব পরিবারের মেয়েদের উল্লেখও রয়েছে যাঁরা নিজেদের জীবনযাত্রাকে আরও উন্নত, আরও সচ্ছল করে তোলার জন্য এই পেশা গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় থেকে যেন সমাজে এক অদ্ভুত পরিবর্তন হল। বাঙালি উচ্চবিত্ত সমাজ কেবল নয় এই সময়ে উচ্চমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনধারায় এক অভূতপূর্ব বদল এসেছিল, মনে রাখতে হবে এই বদল এসেছিল শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে। যদিও একে একপ্রকার সামাজিক অবক্ষয় হিসেবে মনে করা যেতে পারে। এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের উদাহরণ কারণ অর্থনৈতিকভাবে পরিবারের হাল ফেরানোর উদ্দেশ্যে কেউ এই পথ অবলম্বন করলে তাঁর প্রতি সহানুভূতি থাকে, কিন্তু জীবনযাত্রাকে আরও উন্নত করার জন্য, আরও ভোগসুখের জন্য কেউ এই পথ অবলম্বন করলে তাঁর প্রতি কোনরকম সহানুভূতি থাকেনা, উপরন্তু সমাজ তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করে।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে যে বইটির উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে সেটি হল মানদা দেবীর লিখিত *শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত*। মানদাদেবীকে তাঁর পিতা প্রথমে বেথুনস্কুলে তারপরে বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার আলো পেলেও নিজে মাতৃহারা, বিড়ম্বিত শৈশবের কারণে তিনি সহজেই আত্মীয়সম্পর্কিত রমেশদার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন সেইসময়ের শিক্ষায় সংযমের তুলনায় রোম্যান্টিসিজম-এর প্রভাব ছিল অনেক বেশি।^{১৪} যদিও সমগ্র বইটি থেকে মানদার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে তিনি প্রবৃত্তিগতভাবে যৌন-আকর্ষণের জন্য পুরুষের সংসর্গ কামনা করতেন, কারণ বেশ কয়েকবার নিজের জীবনে এই পেশাত্যাগ করে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার কিন্তু নিজের চরিত্রগত কারণের জন্য তিনি সেটা পারেননি অর্থাৎ শিক্ষার আলো তাঁর প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়নি।

আমাদের নির্বাচিত গল্পসংকলনের ‘আদরিনী’^{১৫}, ‘চিরকালিনী’^{১৬} প্রভৃতি বেশ কয়েকটি গল্পে আমরা তাঁদের শিক্ষা, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হতে দেখেছি, ‘শিক্ষিত’ হলে চাকরী পাওয়া যেতে পাওয়া যেতে পারে আর তার ফলে এই কালিমাময় জীবন থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব – এই ধারণার জন্য দুটি গল্পের নায়িকাই নতুন করে লেখাপড়া করতে চেয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গটি অবতারণা করার কারণ হল শিক্ষা যে সবসময়, সবক্ষেত্রেই ভালো-মন্দ বা ন্যায়নীতির বিচার করার ক্ষমতা দেবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু শিক্ষিত হলে নিজের পেশা ও সেই সংক্রান্ত অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকা যায়। এমন অনেক মানুষ আছেন যারা প্রথাগত ভাবে শিক্ষিত না হয়েও দৈনন্দিনের হিসাব সম্বন্ধে অবগত। আসলে নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে নিজেকে অন্যের হাতে সম্পূর্ণ সঁপে দিলে শিক্ষা কাউকে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারে না।

পেশায় উন্নতি করার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করা থেকে শিক্ষিত হয়ে এই পেশাটি গ্রহণ করা – এ যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল।

চৌষট্ঠিকলা এবং তার চর্চা:

লক্ষণীয় বিষয় হল, সংস্কৃত শাস্ত্র তথা সাহিত্যে গণিকাবৃত্তির প্রসঙ্গ এত স্বাভাবিকভাবে এসেছে এবং এতোটাই সাবলীলভাবে আলোচিত হয়েছে যে কোনোরকম অস্বস্তি বা সামাজিক ট্যাবু এই পেশার প্রতি পাঠক অনুভব করেননা। কিন্তু একথাও সমানভাবে সত্যি, ‘নগরবধূ’ বা ‘জনপদকল্যাণী’ পদমর্যাদাভুক্ত গণিকা ব্যতীত অপরাপর যাঁরা ছিলেন তাঁদের জন্য সমাজে ততখানি সম্মানের স্থান ছিল না। কিন্তু প্রাচীন ভারতের নগর তথা নাগরিক সভ্যতার প্রেক্ষিতে গণিকাদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় শিল্পকলার চর্চা, সংস্কৃতিমনস্কতা ও বুদ্ধিবৃত্তি এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে দৈহিক আনন্দলাভের সঙ্গীরূপে তাঁদের কল্পনা করা হত। অত্যন্ত অল্প বয়স থেকে বিবিধ কলায় পারদর্শিতা অর্জন, সেগুলির অভ্যাস এই বৃত্তির জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কামসূত্র ও অন্যান্য কামশাস্ত্র থেকে আমরা গণিকাদের শিক্ষণীয় চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যার একটি তালিকা পেয়েছি যার মধ্যে- ^{১৭}

বাৎস্যায়ন তাঁর *কামসূত্রে* গণিকাদের তাঁদের বৃত্তিসংক্রান্ত উপদেশ দিয়েছিলেন। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে বলা যায় বাৎস্যায়ন আদতে পেশাদারিত্বের পাঠ দিয়েছিলেন তাঁদের। কীভাবে তাঁরা নিজেদের বৃত্তিকে ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারেন সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর গ্রন্থে। *কামসূত্র* অথবা যেকোনো কামশাস্ত্র পাঠের অভ্যাস যে গণিকাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তার উল্লেখ আমরা পাই *মৃচ্ছকটিকম্*-এ।^{১৮} আবার *শুকসপ্ততি*র তেইশতম কাহিনিতে দেখেছি -

“বৈশিকীং কৃত্রিমাং বাণীং ব্যলীকান্ শপথাংস্তথা।

কৌটিল্যং কৃত্রিমং ভাবং কৃত্রিমং রুদিতং তথা।।১৫০।।

হাস্যং চ কৃত্রিমং দুঃখং সুখং চৈবমপার্থকম্।

যাচনং বিনয়োপেতং স্নেহভাবো নিরীহতা।।১৫১।।

সমত্বং সুখদুঃখেষু ধর্মাধর্মসমক্রিয়া।

ভুজঙ্গপুরতশ্চৈব কৌটিল্য ক্রমদর্শনম্।।১৫২।।”^{১৯}

কুটনীমতে দেখতে পাই কিছুটা একরম দৃশ্য দেখি^{২০} স্বাভাবিকভাবেই সময়ের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যে যে গণিকা বা বেশ্যাদের আমরা দেখতে পাই তাঁদের শিক্ষানবিশ হয়ে থাকার পর্বে আমরা এই ধরনের কোনো গ্রন্থপাঠ এবং সেখান থেকে কর্তব্য-অকর্তব্যাদি বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান আহরণ প্রভৃতি বিষয় লক্ষ করিনা। কিন্তু আমরা উপন্যাস এবং গল্পের চরিত্রগুলিকে অনুপূজ্য বিচারের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি প্রাচীন শাস্ত্রাদি সরাসরি পাঠ না করলেও এই পেশার সঙ্গে জড়িত প্রাক্তন বেশ্যাদের থেকে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় শিক্ষা করতেন তাঁরা।

এই পর্যায়ে এসে আমরা শেখার বিষয়টি নিয়ে আরও একটু গভীর বিশ্লেষণে যাবো। একজন নারী বা বলা ভালো একটি মেয়ে যখন বুঝতে পারে যে নিজের শরীরটাই হল তার বেঁচে থাকার, জীবনধারণের একমাত্র উপায় তখন সে যতরকম ভাবে সম্ভব নিজের শরীরকে কাজে লাগাতে চায়। কারণ সে জানে জীবনযুদ্ধে এটাই তার একমাত্র অস্ত্র, এটাই তার একমাত্র মূলধন। পার্থক্য

হয়ে যায় যাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে এই পেশায় আসেন আর যাঁরা কোনো দুর্ঘটনা বা বিপদের কারণে এই পেশায় আসেন তাঁদের মধ্যে। যদিও এই প্রসঙ্গে সেই সব মেয়েদের কথাও মনে রাখতে হবে যাঁরা স্বেচ্ছায় এই পেশায় এসেছেন। যে সমস্ত মেয়েরা বংশপরম্পরায় এই পেশায় আসেন এবং তুলনায় উঁচু শ্রেণীভুক্ত তাঁদের অল্প বয়স থেকেই এই পেশার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় শেখানো হতো। তার মধ্যে সাজ-সজ্জা, দৈহিক আকর্ষণ তৈরি করা, শরীরী বিভঙ্গ ইত্যাদি বিষয় যেমন থাকতো ঠিক তেমনি বিভিন্ন কলায় শিক্ষিত করা হতো এবং সেগুলির চর্চা করানো হতো। আমাদের নির্বাচিত সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্রগুলির এই কলাবিদ্যার অভ্যাসের কিছু উদাহরণ আলোচনা করবো।

মৃচ্ছকটিকে আমরা বসন্তসেনাকে সংস্কৃতে কথা বলতে দেখি। উক্তি-প্রতুক্তি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয়না এই বাকবৈদগ্ধ্য রীতিমত অভ্যাসের ফল। গণিকাদের বাকপটু হতে হয়। বসন্তসেনা নিজেই চতুর্থ অঙ্কে সখী মদনিকাকে একই কথা বলেছিলেন।^{২১} কতকটা যেন একই কথার পুনরাবৃত্তি শোনা যায় আমাদের নির্বাচিত ‘স্পর্শ’ গল্পের নায়কের মুখে- “জানেন না বুঝি? কথায় আমরা ওস্তাদ।”^{২২} (বা.গ./পৃ.৩১৪)

মৃচ্ছকটিকেই আমরা দেখেছি বসন্তসেনা ছবি আঁকায় ক্রমশঃ পারদর্শিতা অর্জন করছেন।^{২৩} দামোদরগুপ্তের তাঁর কুটনীমতে গণিকাদের চিত্রাঙ্কনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে তাঁরা চিত্রাঙ্কন করেন কলাভ্যাসের জন্য; নিজেদের গুণাবলী প্রদর্শন করার জন্য। বিকল্প পেশা হিসাবে নয়।^{২৪} P. K. Gode আরও পরিষ্কার করে বলেছেন, গণিকারা চিত্রকলা অভ্যাস করতেন অতিথিদের কাছে নিজেদের পেশাকে আরও আকর্ষক করে তোলার জন্য।^{২৫}

দামোদর গুপ্তের কুটনীমতের তৃতীয় কাহিনীতে আমরা দেখেছি গণিকা মঞ্জরী ‘রত্নাবলী’ নাটিকার অভিনয় করছেন এবং সেটা তিনি করছেন পারিশ্রমিকের জন্য।^{২৬} কিন্তু এই অভিনয় তাঁদের উপার্জনের একমাত্র পন্থা নয়। Ajay Mitra Shastri গণিকাদের প্রাচীন কলাবিদ্যার ধারক-বাহক রূপে মনে করেছেন^{২৭}। ‘পদ্মপ্রাভৃতক’র অন্যতম নায়িকা দেবসেনা কুমুদ্বতী নাটকের অভিনয় করেছিলেন^{২৮}। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দেখি বাংলা সাহিত্যে নিশিপদ্ম উপন্যাসে কাঞ্চন ও তার বোন চম্পা দুজন বারাজনাই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতেন^{২৯}। শুধু তাইই নয় বাস্তবে উনিশ শতকের বাংলায় মঞ্চে অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী আনা হতো গণিকালয় থেকেই। বিনোদিনী,

প্রমুখেরা তার উদাহরণ। আচার্য ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* অভিনেত্রীর প্রসঙ্গে ‘নটী’, ‘বেশ্যা’ এঁদের কথাই বলেছেন^{৩০}।

চতুর্ভাগীর অন্তর্গত ‘উভয়াভিসারিকা’য় একজন গণিকার বিষ্ণুমন্দিরে ‘সঙ্গীতিকা’ উপস্থাপন করেছিলেন^{৩১}। তবে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য গণিকা ও দেবদাসীবৃত্তির মূল সুর একই হলেও বহিরঙ্গে তাঁদের কাজের পার্থক্য ছিল। গণিকারা যখন কোন অনুষ্ঠানে তাঁদের নৃত্য-গীত ও অভিনয়াদি প্রদর্শন করতেন তখন তাঁদের দর্শকমণ্ডলীতে শুধুমাত্র জনসাধারণ নন; রাজা বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরাও থাকতেন। যেমন মঞ্জরীর ‘রত্নাবলী’ নাটিকায় অভিনয় দেখেছিলেন রাজা সমরভট, আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি তাঁর প্রতি^{৩২}। *নিশিপদ্মে*ও কাঞ্চন-চম্পা এই দুজনের অভিনয় ও সঙ্গীতকুশলতার জন্যই লালপাহাড়ির রাজা ও কুমার তাঁদের রক্ষিতা করে নিয়ে গেছিলেন^{৩৩}। উত্তরফাল্গুনীর দেবযানী ‘ডলি রায়’ পরিচয়ের আড়ালে সমাজের উঁচুতলার ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করতেন তাঁর অপূর্ব গানের গলা ও সঙ্গীতদক্ষতার জন্য^{৩৪}। আরও অজস্র উদাহরণ ও তুলনা উভয় ভাষার সাহিত্যেই যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

গণিকাদের অভিব্যক্তি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যে বিষয়ের আলোচনা অত্যাবশ্যিক সেটি হল তাঁদের সাজসজ্জাসংক্রান্ত। দেহবৃত্তি বলেই বোধহয় তাঁদের দেহকে সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপন করতে হয়। বাস্তবিকই তাঁদের উদ্দেশ্যপূরণের জন্য নিজেদের ব্যক্তিত্বকে নিখুঁতরূপে এবং প্রায় সচেতন হয়েই তৈরি করতে হয়। সম্পূর্ণ বিষয়টির মধ্যে কৃত্রিমতা রয়েছে সেকথা ঠিক, কিন্তু দক্ষতা অর্জনের জন্য গণিকাদের যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হতো তা প্রশংসার্হ।

সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁদের বর্ণনা আমরা পেয়েছি তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই সুন্দরী, বিদুষী ও অবশ্যই এমনকি সকলেরই অঙ্গসৌষ্ঠব অসাধারণ। কিন্তু আমাদের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে এই শারীরিক সৌন্দর্যের, নিখুঁত দৈহিক গঠনের বিষয়ে বর্ণনা সে তুলনায় কম। তাঁদের সাজ সজ্জার বর্ণনা বেশ কিছু পাওয়া যায়, রূপসী হলেও তার উল্লেখও লেখক করেছেন কিন্তু বিশদ বর্ণনা বা সেটিকে মুখ্যরূপে উপস্থাপন করা হয়নি।

আমরা আগেই বলেছি এই পেশায় অবস্থানগত অনুক্রম থাকলেও আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা সকলের উদ্দেশ্যে ‘গণিকা’ শব্দটিই ব্যবহার করেছি। যাঁদের আর্থিক অবস্থা উন্নত তাঁদের

পোশাক বা সাজসজ্জার উপকরণ স্বাভাবিকভাবে বহুরকম। বাৎসরিক কামসূত্রে বলেছেন গণিকারা সন্ধ্যায় উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও অলংকার পরে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন-‘নিত্যমলঙ্কারযোগিনী রাজমার্গাবলোকিনী দৃশ্যমানা ন চাতিবিবৃতা তিষ্ঠেৎ, পণ্যসধর্ম্মত্বাৎ।’^{৩৫} বাংলা সাহিত্যে আমরা পেয়েছি পতিতা ‘কুসুম’ এর কথা-

‘ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিবার আগেই, পথের ধারের বারান্দায় কুসুম তাহার রূপের প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া থাকিত।’^{৩৬}

একজন গণিকার পেশাগত জীবনে প্রবেশ হয় আনুষ্ঠানিক স্নান ও দেবপূজার মাধ্যমে যার উল্লেখ রয়েছে মৃচ্ছকটিকে^{৩৭}। এছাড়াও তাঁদের দৈনন্দিনের কাজের সূচনা হয়ে থাকে স্নানের পরে। ‘পাদতাড়িতকে’ দেখি গণিকাবাসের গণিকারা তাঁদের বয়স, আর্থিক সংগতি এবং সর্বোপরি নিজেদের আঞ্চলিক পরিচয় অনুসারে সাজসজ্জা করতেন। অঙ্গরাগ-মালা-সুগন্ধি দ্রব্য তাঁদের সজ্জার অন্যতম উপকরণ^{৩৮}। নিত্যনতুন কেশবিন্যাস, রূপচর্চা, বস্ত্রপরিধানের পদ্ধতি, মাল্যরচনা এমনকি গৃহসজ্জাও এই চৌষট্ঠিকলার অন্যতম ছিল, উদ্দেশ্য অবশ্যই পুরুষের চিত্তাকর্ষণ। এমন উদাহরণও দেখা যায় যেখানে সহচরীরা, দাসীরা তাঁদের সাজসজ্জায় সাহায্য করতেন^{৩৯}।

স্বাভাবিকভাবেই গণিকাদের পরিধেয় বস্ত্র, অলংকার, সাজসজ্জা গৃহবধূদের তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল এবং তাঁদের ‘গণিকা’ পরিচয় যে পৃথক সেটা তাঁদের সাজসজ্জায় বোঝা যেত। মৃচ্ছকটিকে উজ্জয়িনীর রাজপথে বসন্তসেনা তার উদাহরণ^{৪০}। অবশ্য এই ব্যাপারে সমাজের বেঁধে দেওয়া অলিখিত নিয়মের উপস্থিতি অসম্ভব নয় বরং সেই সম্ভাবনাই প্রবল। আবার কুটনীমতমে বলা হয়েছে জনসমক্ষে কোন অনুষ্ঠানের আগে পুষ্পাদি ও কুমকুম দিলে গণিকার সাজ সম্পন্ন করা হতো। বাংলা সাহিত্যে আমরা পেয়েছি ‘বিদ্যুৎলতা’, ‘আঙুরলতা’, জন-অরণ্য, শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত, কবি ইত্যাদি উপন্যাসে এঁদের সাজসজ্জার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাজায়। Feldman আর Gordon এর ব্যাখ্যায় গণিকারা শুধুমাত্র চর্চা বা আত্মপ্রচারের জন্য এই সমস্ত কলাগুলি অভ্যাস করতেন তা নয়, বাস্তবে অনেক সময়ে এগুলি তাঁদের অন্যদের থেকে পৃথক একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতো^{৪১}। একদিকে স্বাধীন আবার একই সঙ্গে পরাধীনতার বেড়াজালে আটকে পড়া গণিকাদের এইসব গুণাবলীর সাহায্যে আগত অভ্যাগত এমনকি সমাজ ও রাষ্ট্রের নানান্তরে তাঁদের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করা হত। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক রক্ষণাবেক্ষণে

এঁদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে মনে করতেন। সংস্কৃত কামশাস্ত্রে চৌষট্ঠিকলা শিক্ষা এবং তার প্রতিটিতে নৈপুণ্য গণিকাবৃত্তির অন্যতম শর্ত ছিল। একেবারে নিম্নস্তরীয় বেশ্যা ব্যতীত প্রায় সকলেই কিছু কিছু সংখ্যক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন আর উচ্চস্তরের গণিকাদের তো একপ্রকার বাধ্যতামূলকভাবে এই কলাগুলি শিক্ষা করতে হতো। আসলে প্রাচীনকালেও নিন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও গণিকাদের এই সমস্ত গুণের খ্যাতি প্রবল ছিল এবং শুধু তাইই নয় সেই সময় অনেকক্ষেত্রেই আতিথেয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। বিশেষ করে রাজনৈতিক – কূটনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য খ্যাতনামা গণিকাদের ব্যবহার করা হতো। আর ঠিক সেই কারণেই রাষ্ট্র তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় কলাচর্চা সামগ্রিকভাবে পালনের দায়ভার গ্রহণ করতো। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থে একটি মেয়েকে রাষ্ট্র তৈরী করছে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। রাষ্ট্রের জন্য বলিপ্রদত্ত সে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এই চৌষট্টি কলাবিদ্যার শিক্ষা করার বিষয়টি যে এই বৃত্তির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একরকম অনস্বীকার্য হলেও সেই বিষয়টি কিন্তু ততখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

সংস্কৃত শাস্ত্র এবং সাহিত্য দুই ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি এই সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা অন্যতম শর্ত কারণ যাঁরা এঁদের কাছে আসতেন তাঁরা যে শুধুমাত্র দৈহিক কারণে গণিকাসঙ্গ করতেন এমন নয় বরং এমন ভাবলে তা খণ্ড-সত্য হবে। অনেকক্ষেত্রে তাঁরা শুধুমাত্র নৃত্য-গীতাদি কলার চর্চা করার কারণে অথবা যন্ত্রসঙ্গীত শোনার জন্যও এঁদের কাছে আসতেন। বাংলা সাহিত্যে আমরা এমন বেশ কিছু চরিত্র পেয়েছি যাঁরা নাচে গানে রীতিমত পটু ছিল। তার মধ্যে বাবুদের ‘বাঁধা মেয়েমানুষ’ অর্থাৎ রক্ষিতা যেমন ছিলেন (নিশিপদ্মের কাঞ্চনমালা) তেমনি আমরা বাইজি সম্প্রদায়ের উল্লেখও পেয়েছি যেমন ‘আঁধারে আলো’ কাহিনীর বিজলী, ‘বাঁজী’ গল্পের আনোয়ারীবাঈ, ‘পহেলি পেয়ার’ গল্পের জহর - যাঁরা নৃত্যগীতের কুশলতার কারণেই সমাজে বিখ্যাত ছিলেন।

অর্থাৎ যে বিষয়টি আমাদের সামনে উঠে আসছে তা হল এই পেশায় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই ধরনের নাচ-গান প্রভৃতি বিষয় জানা প্রয়োজন কারণ আমরা আগেই বলেছি যৌনচাহিদা-পূরণের

পাশাপাশি মানুষ মনোরঞ্জনর জন্যও বেশ্যাসঙ্গ করে। তাই অতি সাধারণ বেশ্যা যারা তাঁদেরকেও আমরা নাচ-গান ইত্যাদি করতে দেখতে পাই।

আবার আরও একটা কারণ হল বাড়িতে বিবাহিত স্ত্রী এই ধরনের চারুকলার চর্চা করলেও তা দিয়ে মনোরঞ্জন করা যায়না। এমনকি বাৎস্যায়নের *কামসূত্রে* যে সমাজব্যবস্থা ও সামাজিকদের কথা আমরা দেখতে পাই তাতে বিবাহিত পুরুষদের গণিকাসঙ্গ খুবই স্বাভাবিক এবং সাধারণ একটি বিষয় অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রীরা স্বামীদের এই অভ্যাসের কথা জানতেন এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে তাঁরা তাঁদের স্বামীদের এই অভ্যাস মেনে নিয়েছিলেন। স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়ার মতো উদারতা তাঁদের ছিল কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। লক্ষণীয় হল এটি কিন্তু সপত্নীপ্রসঙ্গ নয় যে বিবাহ সম্বন্ধ থাকবে; এটি একেবারেই গণিকাসঙ্গের কথা বলা হচ্ছে। যেখানে প্রকৃত প্রেম রয়েছে কিনা জানা যায়না, বিবাহের উদাহরণও একেবারেই নগণ্য। কিন্তু গৃহী ব্যক্তি নিজের দারা-পুত্র সংসার সময় ইত্যাদি ত্যাগ করে গণিকাসঙ্গ করলে তা নিন্দনীয় তো নয়ই বরং অনেকসময়েই তা সমাজে প্রতিপত্তির পরিচায়ক হতো।

এই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দেখা যায় বাংলা সাহিত্যে। ভবানীচরণের ‘নববাবুবিলাস’ -এ ‘বাবু-সম্প্রদায়’ এর বিলাসিতার অন্যতম মাধ্যম ছিল বেশ্যালয়ে গমনের অসংখ্য ছবি পাওয়া যায় ^{৪২}। সেই সময়ে অধিকাংশ বাবুর এক বা একের অধিক ‘রক্ষিতা’ থাকতো এবং এই রক্ষিতা রাখার বিষয়টিকে চলতি ভাষায় বলা হতো ‘বাঁধা মেয়েমানুষ রাখা’, ‘বাঁধা মেয়েমানুষ পোষা’ ইত্যাদি। অতএব সমাজ-প্রতিপত্তি-অর্থ এবং ক্ষমতা কী বোঝাচ্ছে? যে একটি মেয়েকে এবং যদি সেই মেয়েটির পেশা দেহব্যবসা হয় তবে তাকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি নিজের আওতাধীন করে রাখতে পারে। কোনো ব্যক্তিমানুষকে জীব-জন্তুর পোষার মত পোষা যেতে পারে; এই চিন্তাধারাটি মানবসমাজে পক্ষে কতোখানি অবমাননাকর! সেই সমস্ত বাবুসম্প্রদায়ের মানুষের কাছে মদ্যপান এবং মহিলাসক্তি হল বিলাসিতা ও সামাজিকভাবে নিজেকে উচ্চক্ষমতাসীন বোঝানোর চাবিকাঠি। এই প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশে তখনও বহুপত্নীক ব্যবস্থা প্রচলিত। তারপরেও কেউ নিজের স্বভাবজ মৌলিক প্রবৃত্তি (সহজাত প্রবণতা), কেউ কৌতূহলবশে আবার কেউ সমাজে নিছক নিজের ক্ষমতা জাহির করার উদ্দেশ্যে এই অভ্যাস বজায় রাখতেন। তাঁদের অনেকের স্ত্রীদের এই বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিমত কী ছিল তার উল্লেখ

স্পষ্ট নেই। কখনো দেখা যাচ্ছে বাড়ির গৃহিণী তাঁর স্বামী-পুত্র অর্থাৎ পরিবারের কর্তব্যজ্ঞদের এই বেশ্যাগমনের অভ্যাস তাঁরা মেনে নিয়েছেন অনায়াসে আবার কখনো এমনও উদাহরণ দেখতে পাই যেখানে অন্দরমহলে দিনের পর দিন স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শুধু তাইই নয়, সাহেব-বিবি-গোলাম উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই ‘ছোটবৌঠান (পটেশ্বরী)’-এর মতো স্ত্রীচরিত্রকে যিনি স্বামীকে গৃহস্থ-জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য নিজে নিজের যাবতীয় আজন্মলালিত সংস্কার, নীতি-নৈতিকতা ত্যাগ করে মদ্যপান করেছেন; শুধু যেন স্বামী ঘরে থাকেন, রাত্রিবাস করেন সেই কারণে। বিয়োগান্ত এই উপন্যাসের ছোট বৌঠান চরিত্রটি কেবলমাত্র একটি উদাহরণ। এরকম অজস্র উদাহরণ বাংলা সাহিত্যের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে।

এরপরে আসা যাক পেশাগত অভিব্যক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের আলোচনায়। আমরা আগে বহুবার বলেছি এই বৃত্তিতে যাঁরা আসেন তাঁদের প্রত্যেকের এই পেশায় আসার কারণ কিন্তু এক নয়। আমাদের পক্ষে প্রত্যেকটি চরিত্রকে তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের সাথে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় অবশ্য কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। সে কারণেই আমরা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চরিত্রগুলিকে ভাগ করার চেষ্টা করেছি।

পেশার নিরিখে বিচার করতে গিয়ে দুটি ভাষার সাহিত্যের লিখিত গণিকা চরিত্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আমরা পাইনি। পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সংক্রান্ত যে ধরনের পার্থক্য লক্ষিত হয়েছে সেগুলি সরাসরি পেশাকেন্দ্রিক নয়; তবে পেশাসম্পর্কিত ঠিকই। সেই চরিত্রটি কীভাবে ঐ পেশায় এসেছে, বর্তমানে সে কীভাবে ঐ পেশার সাথে অভ্যস্ত হয়েছে বা আদতেও হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বেশ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

আমাদের আলোচনায় প্রথমে এই পেশার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য চৌষট্টিকলা, তার চর্চা এবং বাংলা সাহিত্যে সেই বিষয়ক পরিবর্তনের কথা এসেছে। তারপরে আলোচনা করেছি তাঁদের প্রতি সংঘটিত অপরাধের।

যেহেতু আমরা বিশেষ করে শুধুমাত্র গণিকাদের নির্বাচন করেছি আমাদের গবেষণাকাজের জন্য তাই সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য পেশার নারীদের বাদ দিয়েছি সচেতনভাবেই।

এমন মহিলাদের কথা যাঁরা প্রত্যক্ষে গণিকা না হলেও পরোক্ষে এই পেশার সাথে যুক্ত। এখানে ‘যুক্ত’ অর্থে আমরা বোঝাতে চাইছি আসলে তাঁদের একটি অন্য মূল পেশা রয়েছে যার আড়ালে তাঁরা এই বৃত্তির সাথে যুক্ত। অর্থের বিনিময়ে শারীরিক সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে। অবশ্য গণিকাদের মধ্যে একেবারে নিম্নস্তরভুক্ত যাঁরা এখানে তাঁদের কথা বলা হচ্ছেনা। একেবারেই ভিন্ন পেশাগত প্রেক্ষাপট, পরিবেশ যাঁদের তাঁদের কথা বলা হয়েছে। যাঁরা হয়তো বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসাধনের (গুপ্তচরবৃত্তি, অধিক অর্থোপার্জন, যৌনাকাঙ্ক্ষাপূরণ ইত্যাদি) জন্য এই বৃত্তিগ্রহণ অথবা পালন করছেন। এদের মধ্যে একমাত্র গুপ্তচরবৃত্তি হল রাজনৈতিক কারণ।

বাংলা সাহিত্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। ঝুমুর, কীর্তন ইত্যাদি গানের দলের সঙ্গে জড়িত মেয়েরা একইসঙ্গে দেহব্যবসার সাথেও যুক্ত। ঝুমুর গানের দল তো ভ্রাম্যমাণ দেহবিলাসিনী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁদের এই গানের দলের আয় থেকে অনেক বেশি পরিমাণ আয় হয় পতিতাবৃত্তি থেকে^{৪০}। আবার কীর্তনগানের আসরে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে যে অন্য ধরনের গান গাওয়া হতো সে কথার উল্লেখ আমরা পাই *নিশিপদ্ম* উপন্যাসে। অন্য ধরনের গান বলতে চটুল এবং অশ্লীল ইঙ্গিতমূলক গানের কথা বলা হচ্ছে। যারা এই সমস্ত গানের দলকে বায়না দিয়ে নিয়ে যেতেন তাঁদের ফরমায়েশ পূরণের জন্য এই ধরনের গান গাওয়া হতো। শুধু তাইই নয় অনেকক্ষেত্রেই বিষয়টি শুধুমাত্র গানে থেমে থাকতো না। বাবুদের ইচ্ছেয় তাঁদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক অবধি করতে বাধ্য থাকতেন তাঁরা। এছাড়া ‘ডালিম’ গল্পের প্রধান চরিত্র ডালিমের গানের প্রসঙ্গ এসেছে, এসেছে ‘তুরূপ’ গল্পে বিনোদিনীর কথাও। অভিনয়-নাচ-গান ইত্যাদি তাঁদের জীবন ও পেশার অন্যতম অঙ্গ।

গণিকাবৃত্তি ও অপরাধপ্রসঙ্গ: আইনের ব্যবহার

গণিকাবৃত্তি এমন একটি পেশা যে পেশার সাথে অপরাধের প্রসঙ্গ যেন স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। আসলে এই পেশার সাথে প্রতারণা-প্রবঞ্চনার যোগ এত গভীর যে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। সময়ের সাথে সেই অপরাধের প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছে এই অংশে আমরা সেগুলি নিয়ে আলোচনা করবো।

কাউকে মিথ্যে ভালোবাসার মোহে জড়িয়ে, তাকে কার্যতঃ সর্বস্বান্ত করা এক ধরনের অপরাধ যদিও সেই অপরাধের কোনো শাস্তি হয়না কারণ স্বেচ্ছায় যারা গণিকাসঙ্গ করেন তাদের সর্বস্বান্ত হওয়ার দায় অন্যদের উপরে বর্তায় না। আবার যেহেতু ছলে-বলে-কৌশলে তাঁদের অর্থ আদায় করা হচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে ‘তছরূপ’ বলা যায়না কারণ গণিকারা কৌশল অবলম্বন করেন একথা সত্যি; সেই কারণে তাঁদের রূপ-গুণ-অভিনয়ের মূল্য দিতে হয় আগত ব্যক্তিদের। এবিষয়ে অপরাধী তাঁদের বলা যায়না।

এই পেশার ক্ষেত্রে প্রথম যে অপরাধের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয় তাহলো ক্ষমতাসীন, উচ্চকুলোদ্ভূত সমাজের ধ্বজাধারী ব্যক্তির অনেকসময়েই জোর করে কোনো নারীকে ভোগ করার জন্য বলপ্রয়োগ করে নিয়ে আসতেন। তাঁদের লালসা চরিতার্থ করার পরে সেই মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করে থাকতো অন্ধকার ভবিষ্যৎ। রাজতন্ত্র থাকার সময়ে এই সমস্ত মেয়েদের স্থান হতো রাজা অথবা কোন রাজপুরুষের ব্যক্তিগত মহলে। আরও পরবর্তী সময়ে সেই ধর্মিতাদের দেহবৃত্তি অবলম্বন করতে হতো একপ্রকার নিরুপায় হয়ে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একই বিষয়ের অবতারণা দেখি। সময়ের সাথে সাথে স্থান আর পাত্রের পরিবর্তন হয় কিন্তু অপরাধের কোনো পরিবর্তন নেই। বাংলার জমিদার, বাবুগোষ্ঠী এই একরকম ভাবে অত্যাচার করতেন। শেষে সেই মেয়েদের ‘রক্ষিতা’ পরিচয় হতো।

এবার ‘রক্ষিতা’ প্রসঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি অবশ্য উল্লেখ্য সেটি হল শুধুমাত্র জনৈক বেশ্যাকে কোনো একজন বাবু নিজের করায়ত্ত করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে রাখতেন তেমন নয়। যে কোনো ভদ্র, গৃহস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারের অনুঢ়া কন্যা অথবা বিবাহিতা বধূ কিংবা পথচলতি মহিলা কাউকেই ক্ষমতাবান, অর্থবান পরিবারের পুরুষেরা জোর করে তুলে নিয়ে এসে ধর্ষণ করতেন এবং বাধ্য করতেন তাঁকে নিজের বাগানবাড়ি বা অন্য কোনো বিলাসের জায়গায় থাকতে^{৪৪}। সেই মেয়েটিও তখন সেই বাবুর ‘রক্ষিতা’ পরিচয়ে পরিচিত হতো। তার দোষ না থাকা সত্ত্বেও। সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফেরার রাস্তা তার সারাজীবনের মত বন্ধ হয়ে যেত। প্রায় এই রকম একটি ঘটনার উল্লেখ আমরা দেখতে পাই *কেরী সাহেবের মুঙ্গী* উপন্যাসে^{৪৫}। অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে হোক কিংবা জোর করে হোক যৌনতার প্রসঙ্গে পুরুষ বলপ্রয়োগ করতেই অভ্যস্ত এবং সেই বিষয়ে নতুন-পুরাতনের কোন বিভেদ নেই। এই বলপ্রয়োগের ঘটনাটি আমরা

মুছকটিক প্রকরণেও দেখতে পাই। প্রথমবার (প্রথমাক্ষে) রাজশ্যালক শকার গণিকা বসন্তসেনার পশ্চাদ্ধাবন করছে এবং নরমে-গরমে নানাভাবে তাঁকে তুষ্ট করার চেষ্টা করছে; উদ্দেশ্য তাঁর সঙ্গলাভ। সেখানে শকারের কিছু বক্তব্য এই কথার প্রমাণ করে যে সে ক্ষমতালোভী এবং রাজনৈতিক পদাধিকার বলে প্রয়োজনে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটাতে পারে কারণ সে-নিজেই বলে –

“অহং রাষ্ট্রীয়শ্যালঃ।^{৪৬}”

পরে দেখতে পাই প্রথম অক্ষে শকার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে ধরণের কথা বলেছিল সেগুলি বাস্তবায়িত করার যথাসম্ভব চেষ্টাও সে করেছিল। অর্থ-অলংকারের প্রলোভন দেখিয়ে বসন্তসেনাকে প্রলুব্ধ করতে না পেরে ত্রুদ্ব ও হতাশ শকার তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল যদিও শেষপর্যন্ত বসন্তসেনা মারা যাননি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল একজন স্বনামধন্যা, অর্থ-প্রতিপত্তিসম্পন্ন গণিকাকে জোর করে যৌনসংসর্গে লিপ্ত করানোর চেষ্টা এবং তাঁর আপত্তিতে অন্যায়, অত্যাচার এমনকি হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত শকার করেছে আর তাঁর এই চেষ্টার পেছনে একমাত্র জোর ছিল তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়। শুধু এতেই সে ক্ষান্ত হয়নি, নিজের করা অপরাধ নিরীহ চারুদত্তের উপরে চাপিয়ে দিতে তার বাধেনি। মনে রাখতে হবে বসন্তসেনা রীতিমত পালিয়ে বেঁচেছেন তাঁর হাত থেকে, আশ্চর্য্যকর অর্থেই! তিনি শকারের হাতে ধরা পড়লে তাঁর কি কি দুর্দশা হতে পারতো ভাবলে ভয় হয়। এছাড়াও পশ্চাদ্ধাবন-বলপ্রয়োগের প্রয়াস-হত্যার চেষ্টা ইত্যাদি অপরাধ করার চেষ্টা শকার করেছে তার ক্ষমতাবলে, যদি সেই সময় রাজনৈতিক পালাবদল না হতো তাহলে শকারের আদতে কোনো শাস্তি হতো কিনা সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

কিন্তু অপরাধ সংঘটিত হলে শাস্তির বিধান যে ছিল সে কথা কিন্তু অর্থশাস্ত্র জানাচ্ছে^{৪৭}। বিশদ বিবরণের পুনরাবৃত্তিতে না গিয়ে এটুকু অন্ততঃ বলা যায় যে গণিকাদের প্রতি অপরাধ সংঘটিত হলে যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল ঠিক তেমনি গণিকারাও তাঁদের কাছে আগত কোনো ব্যক্তির সাথে অন্যায় করলে বা কোনো অপরাধ করলে তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি পেতেন। অপরাধের ইতিহাস দুই তরফের ক্ষেত্রেই ছিল। তবে একথাও ঠিক যে কোন একজন যদি এই বৃত্তির সাথে

যুক্ত থাকেন তবে তার প্রতি ঘটে যাওয়া অপরাধ এবং তার ব্যবস্থা করার অনেকখানি দুষ্কর হয়ে ওঠে।

কেরী সাহেবের মুগ্ধীতে আমরা এরকমই অপরাধের কথা জেনেছি যেখানে বলপূর্বক একটি মেয়েকে খোঁজার জন্য ভদ্র পরিবারের গৃহস্থ ঘরের গৃহবধূদের জোর করে তুলে এনে ধর্ষণ করার উল্লেখ রয়েছে এবং তাঁদের কোনোরকম শাস্তির উল্লেখ নেই। নিশি'পদ্ম উপন্যাসে দেখি কাঞ্চনমালাকে রক্ষিতা করে রেখেছিলেন যে বাবু তিনি কাঞ্চনের প্রেমের খবর জানতে পেরে শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে মেরে তাঁকে রক্তাক্ত করে দিয়েছেন।^{৪৮} শুধু তাই নয় কাহিনীর সূত্র থেকেই জানা যায় এর আগের একজন রক্ষিতাকে লুকিয়ে প্রেম করার শাস্তি দিতে তাকে খুন করে নিজের জমিদারিতে পুঁতে তার দেহ লোপাট করে দিলেও অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি তার হয়নি। এ প্রসঙ্গে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে বলেছেন-

“ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ‘বাঁধা’ বারান্দা, বা রক্ষিতা হত্যা করার এই প্রবণতার মধ্যে সে যুগের পুরুষমনের একটা বিচিত্র দিকে সন্ধান পাই। অনেকের কাছেই কোনো বহু-অভিলষিত বারান্দা (অভিনেত্রী, নর্তকী বা গায়িকা)-কে রক্ষিতা রাখা একটা সামাজিক পদমর্যাদার প্রতীক বলে মনে হত। এরকম কোনো রক্ষিতা হাতছাড়া হয়ে অন্যের কবজায় চলে যাওয়ায়, তার রক্ষক মনে করত মর্যাদাহানি হয়েছে। যেহেতু এই ধরনের পুরুষেরা রক্ষিতাদের নিজেদের অধিকৃত পণ্যদ্রব্যের মতো দেখত, এই মহিলারা যদি তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য কোনো প্রেমিক/আশ্রয়দাতা নির্বাচন করতেন, তা হলে তা বিশ্বাসঘাতকতা বলে বিবেচিত হত।”^{৪৯}

আবার এই জীবন থেকে মুক্তি চাওয়াকে দুরাশা, অন্যায় বলে তাঁকে শারীরিক ভাবে উৎপীড়ন করেছেন নিজের গর্ভধারিণী মা। এই সব অপরাধের কোনো সমাধান আমরা দেখিনা।

‘নারীপাচার’ এর মতো অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর *দৌলতী* উপন্যাসে। বস্তুতঃ এই উপন্যাসে দুটি আলাদা অপরাধের কথা আছে- ১) নারীপাচার ও ২) কামিযৌতি প্রথা। ‘Human trafficking (specially women trafficking)’^{৫০} আর ‘Bonded labour’^{৫১}- মত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিভীষিকা বর্ণনা করেছেন তিনি।

দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে, অভাব এবং অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কমবয়সী মেয়েদের বিয়ের নাম করে দূরের শহরে নিয়ে এসে তারপর তাঁদের এই ব্যবসায়

ব্যবহার করা হতো। ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় এঁদের নেই অথচ পুলিশ-প্রশাসনের কর্তব্যজ্ঞরা এই তথ্য জানেন; তাঁরা আসেনও নিজেদের যৌনক্ষুধা পূরণ করার জন্য কিন্তু ক্রমান্বয়ে ঘটে চলা এই অপরাধের প্রতিকার তাঁরা করেননি। আবার ফাদার বম্ফুলার যখন এই প্রথা বন্ধ করতে চাইলেন তখন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি।^{৫২}

আসলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে এই প্রথা উচ্ছেদ করা বা অপরাধের প্রতিকার করা সম্ভব হয়না। এছাড়াও একজন দেহপসারিনিকে অসুস্থ শরীরে সর্বাধিক গ্রাহক নিতে বাধ্য করাও একধরনের অপরাধ, অপরাধ অন্যায়ভাবে তার গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করার চেষ্টা করার – এগুলিও অমানবিক অপরাধ কিন্তু তার কোনো প্রতিকার নেই।

‘নারীপাচার’ এর কথা রয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তারপর’ গল্পটিতেও। দারিদ্র্যকবলিত মানুষের কাছে সাময়িক স্বস্তি, আর্থিক-সংগতি আসে যখন বাড়ির মেয়ে বৌরা কটিবাজারে কাজে যান। কিন্তু কী সেই কাজ? আসলে গঞ্জে নিয়ে গিয়ে কাজের নাম করে নারীপাচার চক্রের হোতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁদের। এর আড়ালে দেহব্যবসায় আনা হয় তাঁদের। পরিবারের লোকেদের টোপ দেওয়া হয় ‘পেট- ভরা খাওয়া, ভালো ভালো কাপড় আর দামী দামী শাড়ি গয়না’ ইত্যাদির। এই কাজে জড়িত কাণকালি গ্রামের পনের বছরের বালক গজেন। তাকে নারীপাচার চক্রের সাথে যুক্ত দালাল বলে সন্দেহ করেনা কেউ আর এই কাজের জন্য সে টোপ হিসাবে একজন মহিলাকে নিয়ে আসে যার অবস্থার উন্নতি দেখিয়ে গ্রামের মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে আসা যায়। রীতিমত ব্যবসায়িক তার বুদ্ধি-“মাগী ছাড়া মাগীরা ভরসা পায় না।”^{৫৩}(বা.গ./পৃ.১২৫) গল্পে লেখক নারীসেবা সংঘের উল্লেখ করেছেন, যাঁরা পাচার-বিরোধী সচেতনতা প্রচার করতে এসেছিলেন। আসলে সচেতনতা অনেক গভীর সমস্যা রোধে সক্ষম হয়। একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কতো আয়াস! আর তার জন্যই প্রতিনিয়ত কতো অপরাধ ঘটে চলে যার লেখাজোখা নেই। K.Sudha তাঁর *Prostitution Laws An Enigma And Some Dilemmas* গ্রন্থে বলেছেন-

“The Legal regulation of Prostitution in India is governed primarily by the ITPA ,The Immoral Traffic (Prevention) Act,1956 . Some related provisions are found in Indian Panel Code,1860 (herein referred as IPC), which contains general sections against the trafficking and slavery of women and children, besides State level police,

railway, beggary, health and public order statutes. The Constitution also contains certain provisions that address the issue of trafficking in human beings.”^{৫৪}

এরপরে দেখি *উত্তর-ফাল্গুনী* উপন্যাসে দেবযানী দিনের পরে দিন যে স্বামীর অত্যাচারে বাধ্য হয়ে নিজের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এই পেশা বেছে নিয়েছিলেন সেই দুশ্চরিত্র স্বামী ব্ল্যাকমেল করে তার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন। নিজের সন্তানকে সুরক্ষিত করার জন্য দেবযানী বাধ্য হয়ে নিজের হাতে আইন তুলে নেন, হত্যা করেন প্রাক্তন স্বামীকে। কন্যা সুপর্ণা আইনজীবী হয়ে মাকে কালিমামুক্ত করেন। মানবিকতার প্রশ্নে দেবযানী অপরাধমুক্ত হন। আরও কিছু অপরাধের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করে যাক। ‘বিচারক’ গল্পে হেমশশীকে ভুলিয়ে এনে প্রতারণা করেছিলো যে যুবকটি তার কিন্তু কোন শাস্তি হয়নি অথচ ক্ষিদের জ্বালায় নিজের শিশুপুত্রকে নিয়ে আত্মহত্যা করতে চাইলে পুত্রটি মারা যায় আর সেই অপরাধে শাস্তি পান তিনি আর তাঁকে দণ্ড দেন সেই প্রতারক যুবক যে কিনা বর্তমানে জজসাহেবের পেশায় রয়েছে। ‘তুরূপ’ গল্পে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে বিনোদিনীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় অথচ সত্যাসত্য বিচার করেনা কেউ। ‘বিদ্যুৎলতা’ গল্পে রয়েছে বেশ্যাপল্লি উৎখাতের কথা। একটি শহরের মধ্যস্থলে বাসকারী বেশ্যাদের অন্যত্র সরে যাওয়ার আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানে গেলে তাঁদের পেশাগত সুবিধা হবে কিনা, বাস করার জন্য সেই স্থান আদতেও স্বাস্থ্যসম্মত, সুবিধাজনক কিনা সেইসব সমস্যা নিয়ে শহরের পতিতারা মিছিল করেন। সাময়িক উপায় একটি পাওয়া গেলেও তা স্থায়ী সমাধান ছিলোনা। আবার এই গল্পেই এসেছে বেশ্যাপল্লিতে ঘটা অন্যান্য অপরাধের কথাও। প্রতারণা-চুরি-ছিনতাই নিত্যকার ঘটনা এমনকি এক-দেড় মাসের ব্যবধানে পরিত্যক্ত, মৃত শিশুর দেহ দেখে শিউরে ওঠে সভ্যসমাজ। জানা যায় সমাজের সমস্ত হর্তাকর্তা বিধাতারা রাতের অন্ধকারে ঐ বেশ্যাপল্লিতেই আসেন তবু ঐ পল্লির বাসিন্দাদের কোন উন্নতি হয়না। ‘মেলা’ গল্পে দেখি ভ্রাম্যমাণ পতিতাপল্লীর মাসী হারিয়ে যাওয়া শিশুকন্যাটিকে পাচার করা ও ভবিষ্যতে এই পেশাতে কাজে লাগাতে চান। সুদূর পরিকল্পনা তাঁর। এরকম ঘটনা যে বিরল ছিলনা তার কথা সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে পাওয়া যায়।^{৫৫} গণিকাদের জীবনে ঘটে যাওয়া আরও নানা অপরাধ ও সেই সংক্রান্ত শাস্তি ইত্যাদির উল্লেখ পাই বটতলা সাহিত্যগুলিতে আর সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন যেহেতু অনেকেই গণিকাদের অপরাধীর চোখে দেখতেন সেই কারণে তাঁদের কোনরকম নেতিবাচক খবরে খুশি হতেন, যেন কিছুটা হলেও সমাজ কলুষমুক্ত হল।^{৫৬}

বর্তমানে যখন এই পেশা স্বীকৃতি পেয়েছে তখন এই পেশাবলম্বনকারিনিরা প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যায় আর তা হল এই জগতের বাসিন্দাদের কাছে আসলে পুরো সাদা অথবা পুরো কালো বলে কিছু নেই; হয়ও না। তাঁদের জগতটা ধূসর রঙের। যেখানে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, উচিত-অনুচিতের মতো অপরাধ আর নিরপরাধের মধ্যকার পার্থক্যটুকু সূক্ষ্মভাবে একে অন্যের সাথে মিলে মিশে যায়। আর তাই ‘আঙ্গুরলতা’ গল্পের শেষে আঙুরের চিন্তার মধ্যেই যেন সবটুকু বাস্তব ফুটে ওঠে-

‘আঙ্গুর পারছিল না। ওই চিতা দেখছিল নন্দর। আর মনে মনে ভাবছিল সব—সব তোমরা সমান। সবাই। তুমি, হিমু, বেদানামাসি, হাসপাতাল, ডাক্তার, আতা, বিশু, মানিকবাবু, প্রভুলাল—সবাই। তেমনি তোমাদের গঙ্গা। সবই তো এ-সংসারেরই কাদা, মাটি, জল। এক ছাঁচ, একই নকশা।’^{৫৭}

কুটনী অথবা মাতৃকা: তখন এবং এখন

গণিকাবৃত্তির ইতিহাস এবং এই পেশাগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করার সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি অনেকে বংশানুক্রমিকভাবে এই পেশা গ্রহণ করতেন। তার প্রথম এবং প্রাথমিক কারণ হল একবার দেহব্যবসায় প্রবেশ করলে মুক্তির সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। যাঁরা স্বেচ্ছায় (অর্থোপার্জন অথবা যৌনস্বাধীনতা ভোগ বা দুর্ঘটনাবশতঃ) এই পেশাগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রসঙ্গ বাদ দিলে এই পেশায় বর্তমান বাকিদের অধিকাংশই কোনো না কোনো বাধ্যবাধকতার জন্য, উপায়ান্তর না পেয়ে নিজের দেহকে অবলম্বন করে এই পেশায় এসেছেন। নারীদেহের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রতিটি মেয়েই একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে সন্তানবতী হয়; গণিকাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

আমরা এখন যে পর্বটি নিয়ে আলোচনা করছি তার শিরোনাম “কুটনী অথবা মাতৃকা: তখন এবং এখন।” শিরোনামের ‘কুটনী’ ও ‘মাতৃকা’ শব্দদুটি সম্বন্ধে আমরা প্রথমে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। তারপরে বিচার করবো অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তার কী কী পরিবর্তন হয়েছে। গণিকার পেশাগত অভিব্যক্তি বিচার করতে গিয়ে কুটনী বা মাতৃকা এঁদের বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কেন? ব্যাখ্যা করার আগে এই শব্দদুটির অর্থ দেখে নেওয়া যেতে পারে তাহলে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হবে।

বঙ্গীয় শব্দকোষে ‘কুটনী’ শব্দের অর্থ করা হয়েছে-

যে বাক্‌প্রপঞ্চঃ স্ত্রীপুরুষের বৈমত্য ছেদন করে; বাক্‌প্রপঞ্চিকা, বেশ্যা; পরপুরুষের সাথে পরস্ত্রীর সং যোগ কারিকা নারী; কুটনী।^{৫৮}

এছাড়াও ‘মায়াবিনী’ শব্দটিরও প্রয়োগ আছে।

‘মাতৃকা’ শব্দটির অর্থ- মাতা হইতে আগত, মাতৃসম্বন্ধী ^{৫৯}।

স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে বর্তমানে যিনি কুটনীবৃত্তির সাথে যুক্ত রয়েছেন তিনি আসলে অতীত জীবনের গণিকা। আবার যিনি এখন গণিকাবৃত্তির সাথে যুক্ত তিনি ভবিষ্যৎ-এ জীবিকা হিসাবে কুটনীবৃত্তি গ্রহণ করতেই পারেন।

এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার আগে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন। আমরা এই অধ্যায়ে কেবলমাত্র গণিকাদের পেশাগত অভিব্যক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। এর ঠিক পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক ও পারিবারিক অভিব্যক্তি বিষয়ে এবং সেই অধ্যায়েও আমাদের এই কুটনীসম্বন্ধীয় আলোচনাটি আবশ্যিকভাবেই রাখতে হয়েছে আর তার কারণ হল অনেকক্ষেত্রেই একজন বয়স্কা গণিকা নিজের কন্যাসন্তানকে একই পেশায় নিযুক্ত করতেন। তাই এই পর্বটি আমাদের দুটি অধ্যায়ের আলোচনার ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তবে একথা পরিষ্কার যে, পেশাগত এবং পারিবারিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে আলোচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে হবে।

একজন গণিকার পেশাগত জীবনে কুটনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি তিনি নিজের মা হন তাহলেও আবার যদি তাঁর সাথে রক্তের সম্পর্ক না থাকে সেক্ষেত্রেও। পেশায় প্রবেশের পরে আরও উন্নতিসাধনের জন্য, পেশাগতভাবে সাফল্যলাভ করার জন্য একজন গণিকা কুটনীর সহায়তা নিয়ে থাকেন। কারণ এই কুটনী হলেন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মহিলা যিনি সবরকমভাবে সেই গণিকাকে সাহায্য করবেন, তাঁকে কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেবেন। তবে অনেকক্ষেত্রে তিনি যে শুধু নৈর্ব্যক্তিকভাবে উপদেশমাত্র দিতেন না নয়; প্রয়োজন হলে তিনি নিজে নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন।

এই দুই ধরনের চরিত্রের উদাহরণই আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পেয়েছি। প্রথম মুচ্ছকটিকে দেখি গণিকা বসন্তসেনার মাতাকে। বসন্তসেনা এবং তাঁর বাড়ির যে বর্ণনা আমরা বিশদে তৃতীয়াঙ্কে দেখেছি তাতে মনে হতে পারে তিনি নিজেও গণিকা ছিলেন। কন্যার মতো তিনিও ‘নগরনটী’ ছিলেন কিনা শূদ্রক সেকথা সরাসরি উল্লেখ করেননি তবে তাঁর আচরণ তুলনামূলকভাবে অভিজাত্যপূর্ণ ছিল তা বলাই বাহুল্য। তিনি পেশাগত কারণে নিজের কন্যাকে বলেছেন তিনি যেন শকারকে (রাজার শ্যালক) ভজনা করেন; উদ্দেশ্য পরিষ্কার। অর্থ-অলংকার-সম্পদ ইত্যাদির প্রাপ্তিযোগ্য। একজন গণিকার জীবনে এগুলিকে মূল বলে ধরা হয়। বসন্তসেনার মাতা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই এই সার বুঝেছিলেন বলে তিনি নিজের কন্যাকে একই পথে চলার উপদেশ দিয়েছিলেন; একবার নয় বেশ কয়েকবার। কিন্তু তাঁকে কখনই সাধারণ কুটুণীর মত নিষ্ঠুর আচরণ করতে দেখিনা উপরন্তু বিচারালয়ে ঘটনাবলি, কথোপকথন থেকে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে তিনি মনে মনে নিজের কন্যার প্রেমিকরূপে উত্তরণে আনন্দিত এবং কোথাও যেন নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁর কন্যা চারুদত্তের মতো একজন পুরুষকে প্রেমিকরূপে পছন্দ করেছিলেন।

সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে কুটুণীরূপে যে চরিত্রগুলিকে আমরা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে ক্রুরতা, শঠতা, প্রবঞ্চনা এতো বেশি যে মাঝে মাঝে মনে হয় গণিকাবৃত্তির পুরোটাই যেন অভিনয়, ঠিক যেমনটা আচার্য বাৎসর্যয়ন বলেছেন।

আসি বিক্রালার প্রসঙ্গে। কুটুণীমতমের বিক্রালাই সেই প্রসিদ্ধ কুটুণী যাঁকে কেন্দ্র করে এই কাব্য রচিত হয়েছে; তিনিই প্রধান চরিত্র বলা চলে। নগরীর প্রসিদ্ধ কুটুণী তিনি। তাঁর কর্মদক্ষতা এবং দেয় উপদেশাবলির গুণে নগরীর সমস্ত গণিকারা তাঁকে গুরু মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর এতো প্রভাব-প্রতিপত্তি যে, অন্যতম প্রসিদ্ধ রূপবতী গণিকা মালতী তাঁর কাছে এসে নিজের পেশায় উন্নতিসাধনের জন্য উপদেশ প্রার্থনা করেন। বিক্রালা তাঁকে যথোচিত উপদেশ দেন এবং শুধুমাত্র উপদেশ দিয়েই তিনি নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করেননি; মালতী যেন সেগুলিকে ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারেন সেকারণে তিনি প্রাসঙ্গিক দুটি কাহিনীও বলেছেন এবং সেখানেও কুটুণী হিসেবে দূতী ও তাঁর কার্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

একজন কুটুণী হিসেবে নিজের পেশার প্রতি সৎ থেকে তিনি মালতীকে সমস্ত কর্তব্যকর্ম বুঝিয়েছেন। বারবার বলেছেন কখন, কোথায়, কী ধরনের ব্যবহার করা সমীচীন। যদিও

দামোদরগুপ্ত এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন বাৎস্যায়নের *কামসূত্র* অবলম্বনে তা তাঁর অধ্যায় বিভাগ দেখে বোঝা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে ক্ষেমেন্দ্রের *সময়মাতৃকা* গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে সাহিত্যে যে সকল কুটনী চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁদেরকে আমরা কুটনীরূপেই দেখেছি কিন্তু *সময়মাতৃকা*য় উল্লিখিত কঙ্কালী চরিত্রটির ক্ষেত্রে বর্ণনায় কুটনীবৃত্তির পাশাপাশি তাঁর প্রাক্তনজীবনের গণিকাবৃত্তির আদ্যোপান্ত বর্ণনা রয়েছে। *সময়মাতৃকা* এমন একটি গ্রন্থ যে কাহিনীতে আমরা একজন কুটনীকে স্বয়ং নিজের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে দেখি^{৬০}। যদিও পরবর্তী সময়ে রচিত *শুকসপ্ততি* গ্রন্থের বহু গল্পে আমরা কুটনীপেশার সাথে যুক্ত অসংখ্য চরিত্র পেয়েছি। কখনো তাঁরা শুধু উপদেশ দিয়েছেন, আবার কখনো ভদ্র পরিবারের গৃহবধূকে পরকীয়া সম্পর্ক, অবৈধ যৌনতার স্বাদ নিতে সাহায্য করেছেন^{৬১} আবার কখনো বণিকপুত্রকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর শিক্ষয়িত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তেইশতম কাহিনীর চরিত্র ধূর্তমায়া তার উদাহরণ^{৬২}। কখনো পরোক্ষে আবার কখনো প্রত্যক্ষ তাঁদের উপস্থিতি। নানারকম ছলা-কলায়, শরীরী প্রদর্শনে, প্রেমের অভিনয়ে, ক্রুরতায়, প্রতারণায় অর্থ-সম্পদাদি নিজের কুক্ষিগত করা এবং সেই পুরুষটিকে কপর্দকহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করার যাবতীয় পন্থা তাঁরা গণিকাদের দিয়ে থাকেন।

যদি তিনি গণিকামাতা হন তবে তিনি সেই গণিকার সঙ্গে একত্র বসবাস করবেন, তাঁর কন্যাই তাঁর ভরণপোষণাদির দায়িত্ব নিতেন। এছাড়াও গণিকাপত্নীতে তিনি নিজস্ব স্বতন্ত্র গৃহে থাকতেন এবং তাঁর কাছে যে সমস্ত গণিকারা উপদেশগ্রহণের জন্য আসতেন; তাঁদের দেয় উপহার, অর্থের সাহায্যে তাঁদের দিন অতিবাহিত হত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য সব প্রাক্তন গণিকাই যে এই পেশায় আসতে পারতেন তা নয় অথবা সকলের পসার সমান নাও হতে পারতো। সেই কারণেই তাঁরা বারংবার গণিকাদের উপদেশ দিয়েছেন যে, রূপ-যৌবন এবং শারীরিক ক্ষমতা যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ী থাকে তাই সেই সময়ের মধ্যে যত বেশি সম্ভব উপার্জন করে নেওয়াই প্রতিটা গণিকার কর্তব্য কারণ তাঁদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত।

এরপরে আমরা দেখি বাংলা সাহিত্যে এই কুটনী চরিত্রগুলি রয়েছে কিভাবে রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে আমরা এই চরিত্রটিকে ‘কুটনি’ রূপে দেখেছি। কাজের ধরন প্রায় এক। কিন্তু নাম আলাদা।

কখনো মা নিজের কন্যাসন্তানকে এই পেশায় আসতে বাধ্য করেছেন। যেমন- *নিশিপদ্ম*, ‘বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি’, ‘মাশুল’, ‘নিষিদ্ধ পল্লী গৃহে গমন’ ইত্যাদি।

কখনো আবার তাঁরা ‘মাসি’ সম্বোধনেও পরিচিত হন। যেমন - *কবি, দৌলতী, শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত*, ‘বিদ্যুৎলতা’, ‘মেলা’। এক্ষেত্রে রক্তসম্বন্ধ থাকেনা এবং তাঁরা নিজেদের পূর্ব জীবনে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। অতএব কুটনীপেশায় আগমনের হেতুর বিশেষ পার্থক্য আমরা পাইনি। সূচনাতেই বলেছি কেবলমাত্র পেশাগত অংশ নিয়েই আমরা এই পর্যায়ে আলোচনা করবো তাই এরপরে আমরা সেইসব বিষয়ে আলোকপাত করবো।

অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রে একজন কুটনিমাসি কতোখানি নিষ্ঠুর হতে পারেন তা আমরা দেখেছি *কবি* উপন্যাসে। বুমুরের দলের আড়ালে বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জনের একটি অংশ দলের কত্রী হিসেবে সেই মাসির হাতে তুলে দিতে বাধ্য থাকতো মেয়েরা। এছাড়া বুমুরের অনুষ্ঠানের থেকে পাওয়া একটি অংশও তাঁর বরাদ্দ থাকতো। এখানেই শেষ নয়। দলের কোনো মেয়ের মৃত্যু হলে তাঁর যাবতীয় সঞ্চিত অর্থ, পরিধেয় বস্ত্র এমনকি অঙ্গের অলংকারটুকুও তাঁদের প্রাপ্য ছিল। এই উপন্যাসে আমরা দেখেছি বসনের মৃত্যুর পরে দলের মাসি যেন প্রায় ‘ছিনিয়ে নেয়’ তাঁর সর্বস্বটুকু। আসলে এই উজ্জ্বলতার অন্যতম কারণ ভয়। লোভ নয় শুধু, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে মাসি শেষটুকু সম্বলও নিজের করে রাখতে চেয়েছিলেন। অবশ্য বুমুরের দলের মেয়েদের, পথবেশ্যাদের মৃত্যুও বড় দুঃখের, অপমানের তাই মাসি নিজের জন্য সঞ্চয় করতে চেয়েছিলেন তাঁর মৃত সদস্যের অন্তিম সম্বল। অবশ্য নিজেকে মাসি ‘ওয়ারিশান’ বলেই প্রতিপন্ন করে।^{৬০}

দৌলতীর কাহিনী একটু অন্যরকম। সেখানে তাঁকে একজন মহিলার দায়িত্বে রাখা হয়, যার নাম । কিন্তু সেই মহিলাটির নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল না। পরমানন্দ মিশির এবং লাটিয়াজীর ইচ্ছানুসারে তাঁকে চলতে হতো। তাঁর বাড়িতে থাকা মেয়েদের দেহব্যবসা থেকে উপার্জিত টাকার কিছু ভাগ তাঁর প্রাপ্য ছিল। আবার মেয়েদের অবাঞ্ছিত গর্ভাধান হলে সেই গর্ভপাতের ব্যবস্থা করে দেওয়াও কাজের তালিকায় ছিল। খুব নিষ্ঠুর চরিত্রের মনে হয়নি এই মহিলাকে। নিজেও এই পেশার সাথে যুক্ত থাকা এবং অদূর ভবিষ্যতে নিজের বাড়ি নিয়ে তাতে মেয়েদের এনে নিজস্ব দেহব্যবসা শুরুর পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। অন্যদিকে দেখি *নিশিপদ্ম* উপন্যাসে কাঞ্চনমালার মা নিজে ব্রাহ্মণঘরের বালবিধবা তিনি নিজের দুই মেয়েকে এই পেশায়

এনেছিলেন। বেশ্যাপল্লিতে বাসকালীন বিভিন্ন বাবুদের সঙ্গে তাঁদের চাহিদা মতো তিনি মেয়েদের বাগানবাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন আবার পরে যখন দুজন বাবু (কোলিয়ারির জমিদার, কাকা-ভাইপো) তাঁর দুই মেয়েকেই নিজেদের এলাকায় নিয়ে গিয়ে রক্ষিতা করে রাখতে চাইলো তাতেও তিনি রাজি। আবার কাঞ্চন একজনকে ভালোবেসে নিজের ঘৃণ্য জীবিকা ত্যাগ করতে চাইলে সেই মা মেয়েকে হত্যা করতে উদ্যত হন। দিনের পর দিন মেয়ের রোজগারের টাকায় নিজের জন্য বাড়ি-অলংকার-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। একদিকে যেমন আত্মজাকে বাস্তব চেনাতে চেয়েছিলেন যে বেশ্যাদের দেহ-রূপ-যৌবন যতদিন আছে ততদিন উপার্জন করে নিতে হবে। কিন্তু নিজের মেয়ের মনের কথা বুঝতে চাননি কারণ আরও আরও ভালো থাকার লোভ, আরও অর্থের লোভ তাঁকে নিষ্ঠুর,লোভী করে তুলেছিল।

বাস্তব কতোখানি নিষ্ঠুর হয়ে সব সীমারেখা পেরিয়ে যেতে পারে তাঁর উদাহরণ আমরা পেয়েছি ‘মাশুল’ গল্পে। এ এক ভয়ঙ্কর চক্রব্যূহের কাহিনী, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ক্ষুধা - বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে চলেছে নারীদেহ। মাতা থেকে কন্যা আবার কন্যা থেকে মাতা - এই সমস্ত পরিচয় মুছে গিয়ে শুধু নারীদেহটুকু অবশিষ্ট হয়ে পড়ে থাকে^{৬৪}। এক লোলচর্মসার বৃদ্ধার কোলে অর্ধমৃত, অচেতনপ্রায় শিশুকন্যা। তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগাড় করার জন্য সেই শিশুকন্যার মা বাধ্য হন ঘরের দরজা বন্ধ করে একজন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে। আর বন্ধ দরজার বাইরে অপেক্ষারত সেই বৃদ্ধা আসলে তাঁরই মা, যিনি নিজের উত্তরপ্রজন্মকে শুইয়ে রেখেছেন নিজের কোলে যাতে তাঁর মেয়ের দেহবৃত্তিতে কোনরকম বাধা না আসে। এই সন্তানের কোন পিতৃপরিচয় নেই। মায়ের পরিচয়েই তাঁর পরিচয় এবং হয়তো বা মায়ের পেশাই হয়ে উঠবে তাঁর পেশা, যেমনটা ঘটেছে তাঁর মায়ের ক্ষেত্রে। একজন মা হয়ে সেই বৃদ্ধা নিপুণ সহায়িকার মতো মেয়ের অর্থ উপার্জনের পথ সুগম করতে চেয়েছেন হয়তো তাঁর বিবেক আর কথা বলেনা। কারণ বেঁচে থাকার মতো মায়া আর কিছুতে নেই আর তার জন্য ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের বোধ অবশিষ্ট থাকেনা অনেকেরই।

একইভাবে দেখি ‘বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি’ গ্রন্থসনে একজন মা কিভাবে নিজের মেয়েকে প্রতারণা করতে শিখিয়ে দিচ্ছেন। নিজের ‘বাঁধা’বাবুটির আর্থিক অবস্থা পড়ন্ত বুঝতে পেরে

মেয়েকে অন্য অর্থবান পুরুষের সঙ্গলাভে উৎসাহী করেছে। মিথ্যা কথা বলা - প্রবঞ্চনা করা এই সমস্ত কিছু মেয়েকে কে তাঁর মা শিখিয়ে দিচ্ছেন, নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন-

“আমি এই কায করে মাথার চুল পাকালেম, লোকের চলন বলন কথা বাত্তারায় মনের ভাব বুঝতে পারি।”^{৬৫}

একই সাথে কিভাবে দুজন পুরুষের মনোরঞ্জন করতে হয় সেই কৌশলও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

আবার ‘আদরিণী’ গল্পে দেখি একজন সৎমা বাধ্য করেছেন নিজের পূর্বপক্ষের মেয়েটিকে পতিতাবৃত্তি বেছে নিতে। সবেমাত্র বাল্যকাল পেরিয়েছে যে মেয়েটি তাঁর মা তাকে নিজের ও নিজের ভাইয়ের দায়িত্ব নেওয়ার উপায় হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি ও পরে বেশ্যাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য করেন। যে সম্ভানের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিলেন তারই রোজগারের অর্থ ছিনিয়ে নিতে তাঁর বাধনা। আদরিণীর সারল্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর সৎ মা যেমন তাকে এই পথে আসতে বাধ্য করেছিলেন তেমনি বারবার বাধা দিয়েছেন তার বিবাহে। উপার্জনের একটা অংশ মাসির প্রাপ্য তাই আদরিণীর সংসারজীবন মাসির অভিপ্রেত নয়। যদিও শেষপর্যন্ত তার বিয়ে হয় এবং সামান্যক্ষণের জন্য হলেও তাঁর সুখী দাম্পত্যের ছবি আমরা দেখেছি।

জন-অরণ্য উপন্যাসে আমরা দুই ধরনের চরিত্রই পেয়েছি। উড স্ট্রীটের মিসেস চক্রবর্তী। তিনি নিজের ফ্ল্যাটটিতে কমবয়সী মেয়েদের দেহব্যবসার ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি নিজে আর এই পেশায় সরাসরি যুক্ত নন। আবার আছে মিসেস বিশ্বাসের প্রসঙ্গ। যিনি নিজে এবং নিজের দুই মেয়েকে এই পেশা নিয়ে এসেছেন। নিজের মেয়েদের এই পেশার যাবতীয় খুঁটিনাটি শিখিয়ে দেন তিনি। কোথায়, কোন গুণের কতোখানি প্রয়োগ করলে কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা সব নখদর্পণে তাঁর। কোনোরকম ছুঁমার্গ নেই এঁদের এই বিষয়ে। চোখের সামনে নিজের গর্ভজাতা কন্যার একের পর এক পুরুষের সাথে অর্থের জন্য, বিলাস-ব্যসনের জন্য যৌনসম্পর্ক করাকে তাঁরা উন্নত আধুনিক জীবনযাত্রা মাপকাঠি হিসাবে বিচার করেন।

মানদা দেবী নিজের আত্মকথায় রাণীমাসির উল্লেখ করেছেন-

“রাণী-মাসী আমাকে কতকগুলি কৌশল শিখাইল। কাপড় পড়িবার ফ্যাশান, দাঁড়াবার ভঙ্গী, কথা বলিবার কায়দা, চলিবার রীতি, এসব কিরূপ হইলে লোক আকৃষ্ট হয় সে তাহা দেখাইয়া দিল। মনে দারুণ দুঃখ ও অপ্রীতির কারণ থাকিলেও আগন্তুক পুরুষের সাথে হাসিয়া

কথা কইতে হইবে। এমন ভালবাসা দেখাইবে—তাহা যে কপট, তাহা কেহ যেন ধরিতে না পারে।”^{৬৬}

ফিরে দেখি বাৎস্যায়নের কামসূত্র –

‘তদপি স্বাভাবিকরূপয়েৎ।’^{৬৭}

কুটনীমতমে দেখি বিকরলা উপদেশ দিচ্ছেন গণিকা মালতীকে কীভাবে তিনি সফল হবে। অবশ্য সমস্ত গ্রন্থটি এই বৃদ্ধা কুটনীীর উপদেশাবলম্বনেই লিখিত।^{৬৮}

প্রসঙ্গতঃ Sumanta Banerjee এই পেশার একটি ক্রম পরিবর্তন উল্লেখ করেছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের ‘কুটনি’ চরিত্রে দেখা যায়। সংস্কৃতে বিট, চোট, পীঠমর্দ, দূতী ইত্যাদি ভাগ রয়েছে কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এতো বিভাগ ও তার এতো স্পষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। উপরন্তু ক্রমশঃ এই পেশায় পুরুষদের আধিক্য দেখা যায়।^{৬৯}

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতেই হবে এঁরা কিন্তু স্বেচ্ছায় নিজের শর্তে এই পেশায় এসেছেন। কারো নির্যাতন বা কোনোরকম অর্থকষ্ট, দৈন্য, জীবনসংগ্রাম এর পেছনে নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাপনকে আরও বিলাসবহুল, আরও স্বচ্ছল করে তোলার জন্য এঁরা এই পেশা বেছে নিয়েছেন।

কুটনীমতে, গুরুসঙ্গতির গল্পে আমরা দেখছি এই কুটনীরাই তুলনায় নতুনদের সবারকম প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাই সময়ের সাথে সাথে তাঁদের নাম বদলেছে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আরও আধুনিক হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু আসলে সবকিছু একই রয়ে গেছে। বাইরের চাকচিক্যের পরিবর্তন এসেছে শুধু।

শারীরিক স্বাস্থ্য: সচেতনতা, প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব

সম্পূর্ণভাবে শরীরনির্ভর একটি জীবিকা এবং এই পেশার মূল হল শরীর। এই কথাটি এই পেশা সম্পর্কে রুঢ় বাস্তব। শুধুমাত্র যৌনসংসর্গ এই পেশার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য অন্যান্য বিষয়গুলি

গৌণ। এই ধারণা খুব একটা ভ্রান্ত নয় কারণ অন্যথা হলে একান্তই ‘শরীর বেচে খায়’ যারা তাদের পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব হতো না।

যে পর্বটি নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করতে চলেছি তা হল যৌনপেশায় যুক্ত নারীদের শারীরিক অবস্থা, যৌনব্যাদি ও সেই সংক্রান্ত সচেতনতা। প্রাচীনকাল এবং পরবর্তীতে তার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। যেহেতু এই পেশায় নারী-পুরুষের অবাধ যৌন সংসর্গ হওয়া স্বাভাবিক তাই একজন দেহপসারিনি নিজের শরীর এবং স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতন থাকবেন আশা করা যায়। প্রতিনিয়ত অসংখ্য পুরুষের সংস্পর্শে তাঁদের আসতে হয়; পেশার কারণে। অনেক সময়েই তা বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে কারণ দিনে সর্বাধিক কতজন পুরুষকে তিনি ‘গ্রাহক’ হিসেবে গ্রহণ করবেন সেই স্বাধীনতাটুকুও তাঁদের থাকেনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলি একজন নাগরিকের প্রাপ্য হলেও আর্থিক সঙ্গতিহীন মানুষের কাছে খাদ্যের সংস্থানই প্রধান হয়ে ওঠে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলি তখন কেবলমাত্র অবস্থাপন্নদের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় বলে মনে হয়। যদিও প্রকৃত শিক্ষা পেলেই সুস্বাস্থ্য যে কতোখানি জরুরী মানুষের তা উপলব্ধি করতে পারে।

অতীতকাল থেকেই এই বৃত্তি-অবলম্বনকারিণীদের মধ্যে পেশা সংক্রান্ত একটি ধারণা প্রবল হয়ে থাকে এবং সেটি হল যতদিন পর্যন্ত তাঁদের রূপ-যৌবন আছে, পুরুষ-আকর্ষণের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও দক্ষতা রয়েছে ততদিনই তাঁদের এই পেশায় উপার্জনের সুযোগ রয়েছে। বয়স হলে কিংবা শরীরী আকর্ষণ কমে গেলে অর্থের সংস্থান করার জন্য এই পেশায় টিকে থাকা তাঁদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে ওঠে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই নিজের শরীরের উপর অতিরিক্ত চাপ দিতে থাকেন, লক্ষ্য কমসময়ে বেশি অর্থ রোজগার। প্রতিটি মানুষের কর্মক্ষমতা ভিন্ন সেই অনুযায়ী তার পরিশ্রমের অনুপাতও ভিন্ন কিন্তু মানুষ যখন নিজের সীমা অতিক্রম করে পরিশ্রম করে আরো ভালো থাকার জন্য তখন তার শরীর বিকল হতে শুরু করে। বেশ্যারাও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁদের পেশায় স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করা ও সুস্থ থাকা দুটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সেই সুযোগ কি তাঁরা পেতেন ? সেই বিষয়ক সচেতনতা কি তাঁদের ছিল? তাঁদের চিন্তাধারা ও জীবনযাপনের কোন পরিবর্তন হয়েছিল কি? এই সবই আমরা দেখবো।

The World Health Organization (WHO) Health-এর লক্ষণ এই ভাবে দিয়েছেন-
“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”^{৭০}

শরীরের সুস্থতা বস্তুতঃ মানসিক স্থিতিাবস্থা, মানসিক শান্তি ইত্যাদির উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। এঁদের মানসিক টানাপড়েন স্বাভাবিক মানুষের থেকে অনেক, অনেক বেশি সেই কারণেও তাঁরা অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করেছি। শরীর-স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই একজন মানুষের ভালো থাকাকে বিচার করে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে (শারীরিক ও মানসিক উভয়তঃ) তার কর্মক্ষমতা অনেকাংশেই বেড়ে যায়।

বাংলা সাহিত্যে পতিতাদের যে চিত্র আমরা পাচ্ছি তাতে শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁরা যে খুব সচেতন ছিলেন সেরকম কোনো তথ্য আমরা পাই না। তাঁদের কাছে শরীর হল অল্প-বস্ত্র এবং আশ্রয় জোগাড়ের মাধ্যম, সেকারণে সেটির যত্ন করা, সাজসজ্জা করা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা আগ্রহী হলেও স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়না। তবে এ বিষয়ে বাংলাদেশের অন্দরমহলেই খুব বেশি সচেতনতা ছিলো না। বাল্যবিবাহ, অপরিণত শরীরে গর্ভসঞ্চারণ, অস্বাস্থ্যকর স্থানে প্রসব এবং প্রসবোত্তরকালে যত্ন ইত্যাদি, গর্ভবতী অবস্থায় মা এবং গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু স্বাভাবিক এবং সাধারণ ছিল বলেই মনে হয়।^{৭১} আসলে মেয়েমানুষের প্রাণের দাম সমাজ কবেই বা দিয়েছে! এই বর্বরোচিত ধ্যানধারণার খুব বেশি পরিবর্তন কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতেও হয়নি। কিন্তু থাক সে কথা। আমরা ফিরে আসি পতিতাদের কথায়। তাঁদের কাছে তো অসুস্থ হয়ে থাকাও যেন বিলাসিতা।

একজন বেশ্যার ঠিক কী কী ধরনের শারীরিক অসুস্থতা হতে পারে? এর উত্তরে বলা যায় একজন স্বাভাবিক মানুষের সাধারণতঃ যে যে ধরনের অসুখ হতে পারে সেই সবই একজন বেশ্যার হতে পারে, কিন্তু তা ব্যতীত আরও বেশ কিছু বিশেষ অসুখ পেশাগত কারণে তাঁদের হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হল যৌনরোগ। অসুরক্ষিত যৌনসংসর্গ, বিভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পুরুষের সাথে অবাধ দৈহিক সম্পর্কের ফলে তাঁদের যৌনরোগ হতো, অনেক সময়েই এই রোগ মারণ রোগে পরিণত হতো। এরকম বহু উদাহরণ আমরা আমাদের নির্বাচিত কাহিনিগুলিতে দেখতে

পেয়েছি। দৌলতী^{৭২} ও কবি^{৭৩} দুটি উপন্যাসেই আমরা এঁদের দুর্বিষহ, অবর্ণনীয় নরক যন্ত্রণার বিবরণ পেয়েছি।

যৌনরোগ তো এঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশের মতো। এরপরে স্বাভাবিক নিয়মেই আসে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের প্রসঙ্গ। যে অধ্যায়টি হয়তো যে কোনো নারীর জীবনের অন্যতম আনন্দের উৎস, সেই খবর একজন গণিকার কাছে আদৌ আনন্দের কিনা সে প্রশ্ন রয়ে যায়। অনেকসময়েই এই গর্ভধারণ তাঁদের উপার্জনের পথে দীর্ঘকালীন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বলে তাঁরা বাধ্য হয়ে গর্ভপাত করেন। এই প্রসঙ্গটি এখানে উত্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী কারণ গর্ভপাতের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শে পরিবর্তে প্রচলিত ধারণানুযায়ী কোনো পস্থা ব্যবহার করেন। এই পেশায় যাঁরা বয়স্কা, অভিজ্ঞা তাঁরা তুলনায় অনভিজ্ঞদের গর্ভপাতের নানা ধরনের উপায় দিতেন যেগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানসম্মত (জড়িবিটি, টোটকা ইত্যাদি) না হওয়ার কারণে অনেকক্ষেত্রেই সেই মেয়েটি মৃত্যুমুখে পতিত হতো। *Mothers for Sale women in Kolkata's Sex Trade* গ্রন্থে এঁদের মাতৃত্বকালীন অবস্থার কথা বলা হয়েছে যে, ইচ্ছা থাকলেও শুধুমাত্র আর্থিক কারণেই অনেকে সন্তান নিতে পারেন না।^{৭৪} এছাড়াও অপুষ্টি, অনিদ্রা, অসংযমী জীবন, নিয়মিত মদ্যপান এগুলি এঁদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বেচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় কতকটা বাধ্য হয়েই এই জীবনযাপনে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এহেন অনিয়মের উদাহরণ রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে ক্ষেমেন্দ্রের *সময়ম/তৃকা* গ্রন্থের কঙ্কালী চরিত্রটির (প্রাক্তন গণিকা বর্তমানে কুউনী) শারীরিক অবনতি ও তার ভয়াল পরিণতি বর্ণনায়।

এর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আসে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র। আর্থিকভাবে এতোটাই দুর্বল তাঁরা যে রীতিমত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাঁদের বাস করতে হয়। সেখানেই তাঁদের খাওয়া-শোয়া এবং সেখানেই তাঁদের জীবনধারণের নাটক অভিনীত হয় রোজ। আসলে এখনও সমাজে যাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল তাঁদের কাছে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা বিলাসিতা। একথাও যেমন সত্য, তেমন একথাও ঠিক যে, অনেক চিকিৎসকই পতিতাপল্লিতে গিয়ে তাঁদের চিকিৎসা করায় সম্মত হতেন না, কারণ এই পেশাকে তাঁরা ঘৃণ্য মনে করতেন। সেই কারণে তাঁরা নিজেদের রোগে নিজেরাই চিকিৎসা করতেন। তবে ব্যতিক্রম রয়েছে- ‘পতিতার পত্র’ গল্পে লেখক নিজের পরিচয় দিয়েছেন ডাক্তার বলে যিনি গল্পের নায়িকা সুলোচনার চিকিৎসা করতেন, ‘কুসুম’

গল্পে দেখি ডাক্তার বিনা পারিশ্রমিকে আশ্রিত বৃদ্ধের সেবা করছেন, ‘আঙ্গুরলতা’ গল্পের অম্বিকা ডাক্তার যিনি পতিতাপল্লিতে এসে তাঁদের চিকিৎসা করতেন। মানদা দেবী জানিয়েছেন তাঁর কাছে একজন বাবু আসতেন যিনি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন; যিনি মানদার চিকিৎসাও করতেন।^{৭৫}

গ্রাহক সন্তুষ্টি: সেকাল-একাল

শিরোনাম থেকে সহজেই অনুমেয় যে এই পর্বের আমাদের আলোচ্য বিষয় গণিকাদের পেশাদারিত্ব। যে সমস্ত পর্বগুলি নিয়ে এর আগে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি মূলতঃ একজন দেহপসারিনির পেশাগত সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়। এই পর্বে তাঁদের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে উঠে এসেছে গ্রাহকের প্রসঙ্গ। ‘গ্রাহক’ অথবা ‘ক্রেতা’ কিংবা ‘খদ্দের’ যে শব্দই আমরা ব্যবহার করিনা কেন তার দ্বারা এমন ব্যক্তিদের বোঝানো হচ্ছে যাঁরা নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে গণিকালয়ে আসতেন। এই বিনিময় অর্থ, অলংকার অথবা অন্য কোন সম্পত্তির মাধ্যমেও হতে পারে। একজন গণিকা ও তাঁর গম্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তা আসলে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক। প্রাচীনকালের শাস্ত্রে ‘গম্য’ শব্দটি প্রযুক্ত হতো^{৭৬}। আচার্য বাৎস্যায়ন *কামসূত্রে* এই পদটি প্রয়োগ করেছেন। তারই পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ্য করি দামোদর গুপ্তের *কুটনীমতম্*-এ।

বাৎস্যায়ন তাঁর গ্রন্থে গম্যনির্ণয় থেকে আরম্ভ করে নিক্কাশন পর্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যান্য কামশাস্ত্রগুলিতেও তার বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়না। সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্রোল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের যথাযথ অনুসরণ করার একটা প্রয়াস দেখা যায়। *মৃচ্ছকটিকে* আমরা বিশদ বিবরণ পাইনি, কারণ গণিকালয় বা একজন গণিকার দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিস্তারিত বর্ণনা করা শূদ্রকের উদ্দেশ্য নয়। তবুও সামান্য হলেও আমরা বসন্তসেনার বাসগৃহের বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি যে, আগত অতিথিদের যোগ্য সম্মান দেখানো হতো। যে ব্যক্তি যেমন সমাদরের যোগ্য তাঁকে ঠিক সেরকম সমাদর করা হতো। *কুটনীমতমে* বরং আমরা এই বিষয়ে তুলনায় অনেক বেশি তথ্য পেয়েছি। যদিও তিনটি পৃথক পৃথক কাহিনী রয়েছে এবং চরিত্র - ঘটনার স্থান ইত্যাদি সব আলাদা, তবুও শুধুমাত্র জীবিকা হিসেবে গণিকাদের দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত বহু তথ্য

আমরা পেয়েছি। টুকরো টুকরো এই তথ্যগুলি থেকে আমাদের পক্ষে একটি চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। হয়তো তা পূর্ণাঙ্গ নয়, কিন্তু গবেষণাকাজের জন্য তা অনেকখানি সাহায্য করেছে।

একজন গণিকার কাছে তাঁর কাজটাই একমাত্র মুখ্য বিষয় কারণ তার সাহায্যে তিনি উপার্জন করেন। নিজের ও পরিবারের অন্যান্যদের ভরণপোষণ করতে সমর্থ হন আর আগত পুরুষেরাই তাঁদের উপার্জনের উৎস। এই পেশার নেতিবাচক দিকটি হল কৌশল, প্রতারণার মাধ্যমে অর্থলাভ। ফলে সমাজে নানা কারণে তাঁদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য প্রচলিত থাকে। প্রথমতঃ এই পেশায় অর্থের বিনিময়ে অবাধ যৌনতার ছাড়পত্র রয়েছে; দ্বিতীয়তঃ সর্বস্বান্ত হওয়ার পরেও পুরুষেরা পতঙ্গের মতো এই বহিঃরূপী গণিকাদের কাছে ছুটে যান। তাঁদের প্রেম-ভালবাসা-মধুর বাক্‌চাতুর্যে বারবার প্রতারিত হলেও আবার রূপের মোহে, শরীরী আকর্ষণে একই ভুল করেন তাঁরা।

যদিও শিরোনাম গ্রাহক-সন্তুষ্টি কিন্তু প্রাচীনযুগের শাস্ত্র-কাব্যাদি পাঠ করলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আগত ব্যক্তিদের সন্তোষবিধানের জন্য তাঁরা বিশেষ উৎসাহী ছিলেন বলে মনে হলেও আসলে তা একটি আবরণমাত্র, আরও স্পষ্ট ভাবে বললে একজন গণিকাকে বাল্য বা কৈশোর কাল থেকেই শিক্ষা দেওয়া হতো কিভাবে তাঁকে পেশায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে, কিভাবে কোন্ উপায় অবলম্বন করলে তাঁর পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হবে। তাই তিনি তাইই করতেন যা তাঁকে শেখানো হতো। তার মধ্যে চারুকলা যেমন থাকতো, তেমনি নানা শাস্ত্রের জ্ঞানও থাকতো আর সর্বোপরি থাকতো কামকলায় একজন পুরুষকে তৃপ্ত করার কৌশল। তাই তিনি সেগুলিই আচরণ করতেন যা তিনি শিখেছেন। যে পুরুষের যে রকম চাহিদা তাঁকে সেই অনুযায়ী সমস্ত পরিকল্পনা করতে হতো।

যেহেতু বিভিন্ন আর্থসামাজিক অবস্থানের, ভিন্ন দেশ বা অঞ্চলের এমনকি বিদেশী অতিথিরা এঁদের কাছে আসতেন তাই সেই অনুযায়ী এঁদের ব্যবস্থাপনা পরিবর্তিত হতো। গণিকাদের অর্থ-সম্পদ প্রায় অধিকাংশই নির্ভর করতো আগত ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা, তাঁদের উপহার প্রদান ইত্যাদির উপরে। কামসূত্রে বাৎসর্যয়ন এইসমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা বলেছেন, বলেছেন ‘নাগরক’ সম্প্রদায়ের কথা যাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও শিল্পকলার প্রতি অনুরাগের কথা আমরা এই গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। প্রধানতঃ যৌনসম্পর্ক ও বিবিধ শিল্পের চর্চা করার

উদ্দেশ্যে এই নাগরক ও গণিকারা একে অন্যের পরিপূরক হয়েছিলেন Sonaleeka Kaul মনে করেন।^{৭৭} অধিকংশ সময়ে গণিকালয়েই পুরুষেরা আসতেন এবং তাঁদের বিলাস, বিশ্রামের যাবতীয় উপকরণ রুচি অনুযায়ী সাজানো থাকতো। পুনরাবৃত্তি দেখি *জন-অরণ্য* উপন্যাসে।^{৭৮} কখনো সভায় বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাঁরা মিলিত হতেন। সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্যে বিশেষ করে ভাণ্ডুলিতে আমরা ‘গোষ্ঠী’ শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখতে পাই। আগত অতিথিদের যে ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে মন হয় সমাজের উচ্চবিত্ত পুরুষদের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে বলে মনে হয়। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা, নাগরিক জীবনের বর্ণনাই সংস্কৃত সাহিত্যগুলিতে পাওয়া যায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ‘রাজা’, ‘রাজকুমার’, ‘উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তি’-দের উপস্থিতি এই সব সাহিত্যে লক্ষিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বাবুদের উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে ভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ব্যক্তিদের কথা পাওয়া যায়। *কুটনীমতের* দ্বিতীয় কাহিনীতে ‘সজ্জন’, ‘বিদগ্ধ’ প্রভৃতি গোষ্ঠীর কথা রয়েছে^{৭৯}। অন্যত্রও এধরনের গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও দামোদর গুপ্ত বলেছেন ‘পানক গোষ্ঠী’, ‘সুরত-গোষ্ঠী’র কথা^{৮০}। জুয়াখেলা-অভিনয় দেখতে যাওয়া-বিভিন্ন ঋতুতে পালনীয় উৎসবের উদ্‌যাপন তাঁরা করতেন। এরকম একটি চিত্র পাই ‘ধূর্তবিটসংবাদ’-ভাগে^{৮১}। একই চিত্র পাই *সাহেব-বিবি-গোলামে* – ‘পায়রা ওড়ানো, বাইনাচ, বাজি ওড়ানো কিংবা গানের জলসা ইত্যাদি।

টি পার্টি, গার্ডেন পার্টির উল্লেখ আছে *শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত* বইটিতে^{৮২} অন্যদিকে History of prostitution গ্রন্থে S.N. Sinha N.K. Basu বলেছেন *কামসূত্রের* কথা-

“The Udyanayatras by which these garden-parties were known, were something arranged and taken part in by the ladies and young girls.”^{৮৩}

কখনো পুরুষেরা এসব অনুষ্ঠানের আয়োজক আবার কখনো গণিকারা স্বয়ং। গণিকারা আয়োজন করতেন পুরুষের মনোরঞ্জননের জন্য, অন্যান্য পুরুষদের আকৃষ্ট করার জন্য। আর পুরুষেরা আয়োজন করতেন সমাজে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মানপ্রদর্শনের জন্য।

গণিকা ও তাঁর ‘গম্য’- এর সম্পর্কের প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ লক্ষিত হয়না, সে সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্যই হোক অথবা আমাদের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই হোক। ‘গম্য’ থেকে

‘খন্দের’ বা ‘বাবু’ যে নামেই ডাকা হোক না কেন আর্থসামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক পরিচয় বা সংস্কৃতিমনস্ক ইত্যাদির উপরে নির্ভর করে গণিকারা সঙ্গী নির্বাচন করতেন। যদিও এক্ষেত্রেও বসন্তসেনা ব্যতিক্রমী, তিনি অর্থ বা প্রতিপত্তির কারণে রাজশ্যালক সংস্থানককে নয়, চারুদত্তকে পছন্দ করেছিলেন।

সময় পেরিয়ে গেলেও কামনা ও ভোগের যুগপৎচিত্রের ব্যতিক্রম বিশেষ হয়নি। একই ভাবে আমরা দেখি বাংলা সাহিত্যের দেহবৃত্তি অবলম্বনকারিণী মেয়েরা কিভাবে একের পর এক পুরুষকে নিজেদের দিকে আকর্ষিত করছে। সময় বদলেছে তাই পদ্ধতিগুলিতে আধুনিকতার প্রলেপ লেগেছে শুধু। এ ব্যতীত ব্যতিক্রম বিশেষ নেই। যুগে যুগে পুরুষের আকাঙ্ক্ষার বলি হয়েছে এই মেয়েরা। এই পেশায় দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা একরকম আর যাঁরা দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পেশায় এসেছেন তাঁদের নতুন করে সব কৌশল শিখে আসতে হয়। তাঁদের নিজেদের মধ্যেও প্রতিনিয়ত লড়াই চলতে থাকে, বেঁচে থাকার লড়াই। অবশ্য যদি একে বেঁচে থাকা বলে তবে। এঁদের দিনের শেষ হয় লাভের হিসাবে আর জীবন ক্রমশঃ এগিয়ে চলে অনিশ্চয়তার দিকে।

এই অধ্যায়ে আমরা গণিকাদের পেশাগত অভিব্যক্তি বিচার করার প্রয়াস করেছি। একেবারে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বৃত্তি হিসেবে আমরা এই বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। প্রতিটি পেশারই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। কোনো ব্যক্তি যে পেশাটির মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করেন তাঁর কাছে সেই পেশার গ্রহণযোগ্যতা এবং গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে সেই পেশার সমান গুরুত্ব না থাকতেই পারে এমনকি অনেক সময়ে তা থাকেও না যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষয়টি অর্থ উপার্জনের উপর নির্ভর করে।

আমরা আগেই বলেছি প্রতিটি পেশারই কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে; সেরকমই প্রতিটি পেশার কিছু পেশাগত সীমাবদ্ধতা থাকে। কোনো কাজ অর্থাৎ বৃত্তি বা জীবিকা, যার সাহায্যে এক বা একাধিক মানুষের জীবনধারণ সম্ভব হয় তাকে নৈতিক অথবা অনৈতিকের তকমা দেওয়ার যোগ্যতা

সমাজের আছে কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষ করে যখন সমাজ সেই মানুষদের বেঁচে থাকা সুনিশ্চিত করতে পারেনি, পারেনি তাঁদের জন্য অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে কিংবা তাঁদের ভবিষ্যৎকে সামান্যতম সুরক্ষিত করতে। তাই সমস্যার সমাধান না করে, কোন স্থায়ী ব্যবস্থা না করে কোনো পেশাকে ঘৃণ্য, অনৈতিক, ন্যাকারজনক, ক্ষতিকর ইত্যাদি বলার অধিকার সমাজের ধ্বজাধারীদের নেই। প্রসঙ্গতঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘বিদ্যুৎলতা’ কাহিনীর একটি অংশ ফিরে দেখা যেতে পারে-

“যাদের মানুষের মন নেই, হৃদয় নেই অথচ গায়ে মানুষের চামড়া জড়ানো আছে তাদের সমস্যাটা আজ যেন আরো দুরূহ বলে মনে হলো পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে। কি পথ আছে? চামড়াটাই কি তুলে ছাড়িয়ে নিতে হবে, না হৃদয় মন সুবুদ্ধি ভরে দেওয়া যাবে এই দেহমাত্রধারিণী দেহোপজীবীদের মধ্যে”।^{৮৪}

গণিকাবৃত্তির প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাচীনযুগে গণিকাদের অবস্থান কিছুটা হলেও সমাজমান্য ছিল। যেভাবে বাৎসর্যয়ন এবং তাঁর পূর্বাচার্যগণ নিজ নিজ গ্রন্থে কামশাস্ত্রের বিবিধ বিষয়কে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে একথা বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, প্রাচীন ভারতে কামকলা-যৌনতা সংক্রান্ত ছুঁৎমার্গ বিশেষ ছিলোনা, আজকের মত সেই সমাজে তাকে অমেধ্যও মনে করা হতো না। সংস্কৃত কবি-সাহিত্যিকেরা তাঁদের কাব্যে কামকলাকে উপস্থাপন করেছেন রসাত্মক এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে। কাম সেখানে উদযাপনের বিষয় হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে গণিকাদের প্রসঙ্গ এসেছে হয় গণিকাসঙ্গের বর্ণনায়, তাঁদের রূপ-যৌবন বিলাস-বৈভব, শারীরিক লাস্য-বিভঙ্গাদির বর্ণনায় অথবা প্রতারণা-প্রবঞ্চনা-বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিমূর্তি রূপে। উচ্চশ্রেণীর গণিকা ব্যতীত অন্যান্য নিম্নস্তরের পণ্যাঙ্গনা-বাররামা-বেশ্যা-পুংচলীদের উল্লেখ রয়েছে অগণিতবার কিন্তু কোন সাধারণীকে নায়িকার মর্যাদা দিয়ে কাব্য রচনা করেননি কোনো কবি। হয়তো সাধারণীর সাধারণ জীবনগাথা কাব্যোচিত বলে মনে হয়নি তাঁদের। তাই স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবে তাঁদের নিয়ে কাব্য লিখিত হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্যে গণিকা চরিত্র যাঁরা তাঁদের জীবনের দৈন্য-দুঃখ-ইত্যাদি বিশেষ উল্লিখিত হয়নি। তাঁদের মহিমা অন্য। তাঁদের জীবন-জীবিকা একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরা অনেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব আবাসে, আবার অনেকেই গণিকাপল্লিতে বাস করেন কিন্তু সেই বর্ণনাতেও ঘুরে ফিরে এমন কিছু দৃশ্য এসেছে

যেখানে দেখা যাচ্ছে বিলাস-বিত্ত ইত্যাদিই প্রধান এবং নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে গণিকাদের স্থান, এই পেশার স্থান শূন্য।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনায় প্রবেশ করার আগে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা কিন্তু বাংলা সাহিত্য বলতে এখানে একেবারেই বাংলা ভাষার সাহিত্য অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে অবিভক্ত দুই বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ইতিহাসকে অবলম্বন করে রচিত, একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্যের কথা বলতে চেয়েছি। আলাদা করে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার একমাত্র কারণ হল, বাংলাভাষায় যদি প্রাচীন ভারতবর্ষকে অবলম্বন করে কোনো কাব্য রচনা করা হয়ে থাকে - যার মুখ্যচরিত্র একজন গণিকা- তাতে সত্যের ও বস্তুনিষ্ঠতার নিরিখে স্বাভাবিকভাবেই অনেকখানি সংস্কৃত কাব্যের ছায়া থাকবে। হয়তো তাতে আধুনিক লেখকের আধুনিক মননের গভীর ও সুস্পষ্ট ছাপ থাকবে, কিন্তু পরিবর্তনের ধারাটি সেই লেখায় থাকবে না।

এবার আসা যাক বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত ভাষায় উপলব্ধ গণিকা এবং সেই সম্পর্কিত পর্যায়গুলির তালিকা সংযোজন করেছিলাম। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এরকম বেশ কিছু শব্দবন্ধ আমরা পেয়েছি। মূলতঃ সেই শব্দগুলি যৌন-অনুষঙ্গবাহী। বঙ্গে গণিকাবৃত্তির প্রাচীনত্বের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। সুতরাং সেই প্রসঙ্গের পুনরবতারণা না করেই বলা যায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কালের নিয়মে এই পেশার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য এসেছিল তা খুব স্বাভাবিক। সময়ের সাথে সাথে যেকোনো পেশাতেই পরিবর্তন আসে; এক্ষেত্রেও তা হয়েছিল আর সেকারণেই মূল সুরটি একরকম থাকলেও বহিরঙ্গে তার ছাপ দেখা গিয়েছিল। রাজা-রাজতন্ত্রের পরে এলো জমিদারি এবং সামন্ততন্ত্র, ইংরাজ সরকারের হাত ধরে এলো বাবুসম্প্রদায়। নাম বদলালো, কিন্তু ক্ষমতাসীনদের প্রবৃত্তিগত কোনো পার্থক্য হলো না। তথাকথিত নবজাগরণের আলোয় কুলীন প্রথা-বাল্য বিবাহ-বহুবিবাহ এই ত্র্যহস্পর্শের ফলায় বিদ্ধ বাঙালি বালবিধবাদের অনেকেই কঠিন, কঠোর নিয়মের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে, কেউ বা মিথ্যে ভালবাসার মোহে প্রতারিত হয়ে আবার কেউ বা নিছকই ইন্দ্রিয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। যাঁরা ফিরে আসতে চাননি তাঁদের কথা আলাদা কিন্তু নিজেদের ক্ষণিকের ভুল,

নিজেদের পদস্থলন বুঝে যাঁরা ফিরে আসতে চেয়েছিলেন, সমাজ তাঁদের ফেরার ব্যবস্থা করেনি। বরং বাধ্য করেছিলো মৃত্যু আর এই না মরেও বেঁচে থাকার মত দেহবৃত্তির মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে।

এরপরে দেশভাগ। ইতিহাস আবর্তিত হয় চক্রাকারে। একইভাবে অত্যাচার নেমে আসে মেয়েদের উপর- যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, পাচার এবং হত্যা। শেষটি বাদ দিলে বাকিদের অন্তিম উপায় হল পতিতাবৃত্তি। এছাড়া আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য আর তা হল কন্যাসন্তান বিক্রয়। একাধিক সন্তানের পিতা অর্থের বিনিময়ে নিজের শিশুকন্যাকে বিক্রি করে দিচ্ছেন এরকম অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়।^{৮৫}

দেশভাগের অনিবার্য ফলশ্রুতি উদ্বাস্তু-সমস্যা। সীমিত স্থানে অসংখ্য মানুষের একত্র বসবাস। জীবনসংগ্রাম। বাধ্য হয়ে পরিবারের একমাত্র মেয়েটি অনেকসময়েই নিজ শরীরবেচার অর্থে বাড়ির সকলের মুখের গ্রাসটুকু সংস্থান করতে পেরেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়িতে কিছু না জানলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সব জেনেও তাঁরা একরকম নিরুপায়-নির্বাক হয়ে থাকেন অন্যনোপায় হয়েই।

পেশাগত যে যে বিষয়গুলো আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে সেগুলিকে লক্ষ করলে আমরা একটা দিক অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাবো, সংস্কৃত সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্য উভয়ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে যাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত তাঁদের জীবনযাত্রা একটু হলেও মসৃণ। এটি একান্তভাবেই পেশাসম্বন্ধীয় মতামত যা আমাদের বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আর্থিক সঙ্গতি থাকলে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অধিকার সচেতনতার বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ পাওয়া যায় কিন্তু যখন ‘অল্পচিন্তা চমৎকারা’ হয় তখন যে কোনো পেশার মানুষের কাছেই বাকি সবকিছু বিলাসিতার নামান্তর বলে প্রতিপন্ন হয়।

আমরা আমাদের নির্বাচিত সাহিত্যের জন্য নির্দিষ্ট একটি সময়খন্ড নিয়ে আলোচনা করেছি ঠিকই, কিন্তু আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় আমরা অন্যান্য অধ্যায়ে তুলে ধরেছি। বিশেষ করে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব গণিকাদের জীবনের ব্যক্তিগত দিকটিকে। তাঁদের অভিব্যক্তি আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়।

অন্ত্যটীকা ও তথ্যসূচি

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, ‘পতিতা’।

২। ডঃ স্মরজিৎ জানা- প্রখ্যাত চিকিৎসক ও যৌনকর্মীদের আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। শুধুমাত্র চিকিৎসক হিসাবেই নয় তিনি নানাভাবে এঁদের অধিকার রক্ষায় সাহায্য করেছেন। ‘দুর্বীর মহিলা সমন্বয় কমিটি’ র সঙ্গে বহু সচেতনতামূলক কাজ করেছেন। যৌনকর্মীদের জীবন, পেশা ও অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধাদি লিখেছেন।

৩। স্মরজিৎ জানা, ‘যৌনকাজ কি কাজ?’, *যৌনতা ও সংস্কৃতি*। পৃ.৩৩৫।

৪। Sukumari Bhattacharji ‘Prostitution in Ancient India’.In *Social Scientist*, Vol. 15, No. 2. (Feb.1987). pp.32-33.

৫। বারিদবরণ ঘোষ, *বারবনিতাদের গল্প*, ‘আদরিনী’, পৃ. ৫৪।

৬। Usha Chakraborty, Condition of Bengali Women around the 2nd Half of The 19th Century, Chapter II, p.27:

“Infectious diseases like diarrhoea and malarial fever were quite common in those days in Bengal. They carried off very many young adult males. This together with polygamy and child marriages was a potent cause of early widowhood in Bengal. Widow remarriage was not uncommon among the poorer classes of Bengal but not so in the upper castes. Women from the latter strata could not become Satis any longer, and they had to live on with their relatives. The joint family system was no longer stable, and widows sometimes found life intolerable; thus becoming an easy target of prostitution. It was reported in the Ananda Bazar Patrika on 11 March 1869 that about 90% of the prostitutes in Bengal were widows. Even married women lived a life of hard toil in subordination to many older relatives in the husband’s house. Some of them were driven to seek escape in suicide or prostitution.”

৭। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নিশিপদ্ম* (কাঞ্চনমালার মা); শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘পতিতার পত্র’(সুলোচনা);

মানদা দেবী, *শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত*, পৃ.১১৫।

৮। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘চিরকালিনী’, পৃ.৯০।

৯। R.P. Kangle, *The Kauṭīlīya Arthaśāstra*. Part II, p.162.

১০। M.R.Kale, *The Mṛichchhakaṭika of Śūdraka*, p.161:

Description of fourth quadrangle of Vasantasenā's house.

১১। ত্রিদিবনাথ রায়, দামোদর গুপ্ত, *কুটনীমতম্*, পৃ. ১৭০।

১২। সমুদ্র চক্রবর্তী (সম্পা.), *অন্দরে অন্তরে*, পৃ.৩৯।

১৩। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রতিদ্বন্দ্বী*, পৃ.২৬।

১৪। মানদা দেবী, *শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত*। পৃপৃ৫৩-৫৪:

“আমি সুশিক্ষা ও সংসঙ্গ কিছুই পাই নাই। স্কুলে শিক্ষার ফলে কাব্য কবিতা গল্প উপন্যাস প্রভৃতি তরল সাহিত্যই পড়িতে শিখিয়াছি। তাহাতে আমার হৃদয়ে কল্পনার উত্তেজনায় দুস্ত্রবৃত্তিই সকলের আগে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গ্রহ কখনও পড়ি নাই—যাহাতে সংযম শিক্ষা হয়, যাহাতে ধর্মভাবের উদয় হয় এমন কোন পুস্তক কেহ আমার হাতে দেয় নাই। আমোদ-প্রমোদ যাহা ভোগ করিয়াছি, তাহা সমস্তই অতি নিম্ন স্তরের।.....থিয়েটার দেখায় ও নভেল পাঠেও দেশের তরুণ তরুণীদের সেই মরণদশা ঘটিতেছে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতেছি।”

১৫। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*। ‘আদরিনী’, পৃ. ৫৯:

“বেশি বয়স হলেও সে লেখাপরা শিখতে আগ্রহী।” কারণ লেখক তাঁকে বুঝিয়েছিলেন শিক্ষিত হলে এই অনিচ্ছার, ঘৃণ্যপেশা তিনি সহজে ত্যাগ করতে পারবেন।

১৬। তদেব, ‘চিরকালিনী’, পৃ.৮৭:

এই গল্পের নায়িকা স্বপ্না, দেহবৃত্তি যাঁর পেশা তিনি এক বাবুর কৌতূহলী প্রশ্নের কারণে নতুন করে উদ্যোগী হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন, আশা হয়তো চাকরী পাওয়া যাবে।

১৭।

১৮। M.R.Kale, *op.cit.*, pp..160-162.

১৯। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, *শুকসংগতি*, পৃ.১৪০।

২০। ত্রিদিবনাথ রায়, দামোদর গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৯।

২১। M.R.Kale, *op.cit.*, p.132 :

“বসন্তসেনা: চেটি! কিং বেশবাসদাক্ষিণ্যেন মদনিকে, এবং ভণসি?

মদনিকা: আর্যে! কিং য এব জনো বেশে প্রতিবসতি, স এব অলীকদক্ষিণো ভবতি?

বসন্তসেনা: চেটি! নানাপুরুষসঙ্গেন বেশ্যাজনোহলীকদক্ষিণো ভবতি?”

২২। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাণ্ডজ*, ‘স্পর্শ’, পৃ.৩১৪।

২৩। M.R.Kale, *op.cit.* p.137.

২৪। *Kuṭṭanīmatam Kāvya* of Damodaragupta, Mitra Prakashan Pvt. Ltd., verse 306, p.67.

২৫। P. K. Gode, ‘The Role of the Courtesan in the Early History of Indian Painting’ in A. B. Gajendragadkar and R.N. Dandekar (ed.), *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Vol.XXII,1941, p. 27.

২৬। ত্রিদিবনাথ রায়, দামোদর গুপ্ত, *প্রাণ্ডজ*, শ্লোক ৮০১, পৃ.১৬৯।

২৭। Ajay Mitra Shastri, *India as seen in the Kuṭṭanī-mata of Damodaragupta*, p.112.

২৮। *Chaturbhāṇī or Srngarhata: A Collection of Four Sanskrit Bhanas*, Motichandra and V.S. Agarwal (ed. and trans.), *Padmaprābhṛtaka*, p.96.

২৯। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নিশিপদ্ম*, পৃ.৬।

৩০। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, পৃ.২১৫।

৩১। Motichandra and V.S. Agarwal, *op.cit.*, p.123.

৩২। ত্রিদিবনাথ রায়, দামোদর গুপ্ত, *প্রাণ্ডজ*, পৃ.২০৯।

৩৩। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নিশিপদ্ম*, পৃ.৭-৮।

৩৪। নীহাররঞ্জন গুপ্ত, *উত্তরফাল্গুনী*, পৃ.১৬২।

৩৫। ত্রিদিবনাথ রায়, বাৎসর্যায়ন, *প্রাণ্ডজ*, পৃ.১৮৮।

৩৬। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাণ্ডজ*, ‘কুসুম’ পৃ. ৭৬।

৩৭। M.R.Kale, *op.cit.* p.68.

৩৮। Motichandra and V.S. Agarwal, *Ibid*, *Pādatāḍitaka*, p.153.

৩৯। M.R.Kale, *op.cit.*

৪০। *Ibid*, p.28; p. 32.

৪১। Martha Feldman and Bonnie Gordon(ed.), *op.cit.*, p.6.

৪২। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নববাবুবিলাস, পৃ.৫১৬:

“....আমার পিতা ৪/৫ লক্ষ টাকা রাখিয়া দিয়াছিলেন তাহা আমি কেবল বাইনাচ ও বাইসঙ্গে মজা করিয়া উড়ায়েছি।”

৪৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবি*, পৃ.৬৬:

“বহু পূর্বকালে ঝুমুর অন্য জিনিস ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল।.....মেয়েরা নাচে, গায়—অঙ্গীল গান। ভনভনে মাছির মত এ রসের রসিত্রা আসিয়া জ্জমিয়া যায়।

আসরে কিছু পেলাও পড়ে। রাত্রির আড়াল দিয়া মেয়েদের ব্যবসাও চলে।”

৪৪। মানদা দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪।

৪৫। প্রমথ নাথ বিশী, কেরী সাহেবের মুন্সী, পৃ.২৫৩-২৫৪।

৪৬। M.R.Kale, *op.cit.*, p.262.

৪৭। R.P. Kangle, *op.cit.*, pp.160-161.

৪৮। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নিশিপদ্ম*, পৃ.৪২।

৪৯। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *অশ্রুত কণ্ঠস্বর ঔপনিবেশিক বাঙলার বারবনিতা সংস্কৃতি*। পৃ. ১৫১-১৫২।

৫০। The suppression of Immoral Traffic in Women and Girls act 1956 অনুযায়ী – “Prostitution means the sexual exploitation of abuse of persons for commercial purposes”.

৫১। Devin Finn, ‘Bonded Labor in India’, Topical Research Digest: Human Rights and Contemporary Slavery, p.6:

“Bonded labor, which is characterized by a long-term relationship between employer and employee, is usually solidified through a loan, and is embedded intricately in India’s socio-economic culture—a culture that is a product of class relations, a colonial history, and persistent poverty among many citizens.”

৫২। মহাশ্বেতা দেবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২।

৫৩। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘তারপর’, পৃ.১২৫।

৫৪। K.Sudha, *Prostitution Laws An Enigma And Some Dilemmas*, p.180.

৫৫। শুল্লা ঘোষাল (সংকলন ও সম্পাদ.), ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’, *বঙ্গে নারী নির্যাতন ও নারীর উত্থান*, পৃ.৩২:

“গণিকালয় হইতে বালিকাদের উদ্ধার – দুশ্চরিত্র লোকদের জন্য ব্রশ্যারা নিজেদের ব্যবসা বজায় রাখিবার নিমিত্ত ছোট ছোট মেয়ে সংগ্রহ করে, এবং তাহারা কিছু বড় হইলে তাহাদিগকে পাপকার্যে নিযুক্ত করে।”

৫৬। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫০:

“এই ‘মানুষ মারা’ বেশ্যাদের হত্যার খবর শুনে, অনেক পুরুষ-ই এক ধরনের Vicarious আনন্দ, গুপ্ত প্রতিশোধ-স্পৃহা পরিভূক্তি লাভ করত নিরাপদ দূরত্ব থেকে।”

৫৭। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘আঙুরলতা’, পৃ.৩০৮।

৫৮। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড।। অ-ন।। পৃ.৬৪২।

৫৯। *তদেব*, দ্বিতীয় খণ্ড।। প-হ।। পৃ.১৭৬৫।

৬০। ক্ষেমেন্দ্র, *সময়মাতৃকা*, কুটনীচরিত্র – কঙ্কালী।

৬১। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৮।

৬২। *তদেব*, পৃ.১৩৯-১৪২।

৬৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, পৃ.১৪৭।

৬৪। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘মাগুল’।

৬৫। মৌ ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, ‘বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি’, পৃ.৫১।

৬৬। মানদা দেবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০২।

৬৭। ত্রিদিবনাথ রায়, *কামসূত্রম্*, পৃ.১৮৮।

৬৮। ত্রিদিবনাথ রায়, *কুটনীমতম্*, পৃ.১০।

৬৯। Sumanta Banerjee, *Under the Raj: Prostitution in Colonial Bengal*, p.145:

“But by the mid-19th century, the female *kutni* had apparently been replaced by the male *dadal*—the pimps who came to occupy a well-defined slot in the variegated organization that was developing in the red-light areas of 19th century Bengal.”

৭০। WHO – World Health Organization.

৭১। সমুদ্র চক্রবর্তী, প্রাণ্ডু, পৃ.১০৮।

৭২। মহাশ্বেতা দেবী, প্রাণ্ডু, পৃ.১১০।

৭৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, পৃ.১৩৭।

৭৪। Indrani Sinha & Shamita Das Dasgupta, *Mothers for Sale women in Kolkata's Sex Trade*, pp.93-94:

‘The 600 participants in the *Sanlaap* study (Adult Mothers group) exhibited significant physical and emotional stress due to their occupation. These women were actively involved in sex work while pregnant since their profession was their main means of survival. Regardless of their stat of health, it was impossible for them to take time off from their work to nurture their pregnancies. Even though many of them felt strong urges for a baby, they also recognized that pregnancy, childbirth, and motherhood would affect their earning capacities as sex workers. This posed a dilemma for the majority of women. As a result, while some continued with their pregnancies, others opted for abortion.’

৭৫। মানদা দেবী, প্রাণ্ডু, পৃ.১০৩-১০৪।

৭৬। ত্রিদিবনাথ রায়, কামসূত্র, পৃ.১৯০।

৭৭। Shonaleena Kaul, *Imagining the Urban*, p.72.

৭৮। শংকর, প্রাণ্ডু, পৃ.১১০।

৭৯। ত্রিদিবনাথ রায়, কুটনীমতম্, পৃ.২০৮।

৮০। Ajay Mitra Sastri, *op.cit.* p.159.

৮১। Moti Chandra and V.S. Agarwal, *Ibid, Dhūrtaviṭasamvāda*, pp.31-32.

৮২। মানদা দেবী, প্রাণ্ডু, পৃ.১৬৮, পৃ.১৭৩।

৮৩। S.N. Sinha and N.K. BOSE, *History of Prostitution in India*, p.240.

৮৪। বারিদবরণ ঘোষ, প্রাণ্ডু, ‘বিদ্যুৎলতা’, পৃ.১৯৫।

৮৫। <https://tv9bangla.com/kolkata/sonagachi-the-story-of-purnima-chatterjee-the-elderly-woman-of-sonagachi-is-no-less-than-a-movie-992451.html>

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভিব্যাপ্তির সন্ধানে: ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তি

“আমাকে বিক্রি করে দিয়ে ছ’ হাজার টাকা পেয়েছিলে

তা দিয়ে একটা গোরু কেনা হয়েছে তো?

সেই গোরুটা ভালো দুধ দেয়?

আমার মতন মেয়ের চেয়ে গোরুও অনেক ভালো.....

.....বাড়িতে কন্যা সন্তান থাকলে কত জ্বালা

দু’বেলা ভাত দাও রে, শাড়ি দাও রে, বিয়ের জোগাড় করো রে

হাবলু, মিজান, শ্রীধরদের থাবা থেকে মেয়েকে বাঁচাও রে

আমি কি বুঝি না, সব বুঝি।

কেন আমায় বিক্রি করে দিলে, তাও তো বুঝি

সেই জন্যই তো আমার কোনও রাগ নেই, অভিমান নেই।

আমি তো ভালোই আছি, খেয়ে পরে আছি....”^১

বৃত্তিকেন্দ্রিক অভিব্যাপ্তি অনুসন্ধানের মাধ্যমে শুধুমাত্র একমাত্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব। আর সেই একমাত্রিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে কোনো পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় কারণ পেশাগত জীবনের বাইরে প্রতিটি মানুষেরই ব্যক্তিগত জীবন থাকে এবং ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো সেই মানুষটি সম্পূর্ণ আলাদা, নিজের পেশাগত জীবনের সাথে হয়তো তাঁর বিশেষ কোনো মিল নেই। পরিবার-পরিজন, নিজের একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরের মধ্যে একজন যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা পেয়ে থাকেন তা তাঁকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করে। জীবন ও জীবিকার নিত্যকার টানাপোড়েনে ক্লান্ত মানুষ অনেক সময়েই নিজের পরিবারের কাছে শান্তি খোঁজেন। আবার ব্যতিক্রমী উদাহরণও লক্ষিত হয়। অনেক সময়ে নানা কারণে মানুষ তাঁর পরিবারের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েন, পরিজনদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন এমনকি সম্পূর্ণ একাকী জীবন

বেছে নিয়েছেন এমনও দেখা যায়। কোন্ মানুষের জীবনের গোপন বাঁকে যে কোন গোপন রহস্য লুকানো থাকে তা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিটিই জানেন।

তাই কোনো মানুষের পূর্ণাঙ্গ চরিত্র যথাযথ অনুধাবন ও উপলব্ধি করার জন্য বহুস্তরীয় এবং বহুমুখী বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যাতে সেই মানুষটির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নির্মাণ করা সম্ভব হয়।

আগের অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি গণিকাদের পেশাগত অভিব্যক্তি নিয়ে আর এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন তথা মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। এখানে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কথা বলে রাখা প্রয়োজন। গণিকাদের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি ইত্যাদি নিয়ে আমরা সমানভাবে আগ্রহী, আমাদের আলোচনাতেও স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়গুলি উঠে এসেছে, কিন্তু যে বিষয়টি আলাদা করে উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং যে কথা আমরা আগেও বলেছি গণিকাবৃত্তি আদতেই একটি বৃত্তি তাই বৃত্তিকেন্দ্রিক অভিব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যের পরিমাণের পরিসর অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তুলনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভিব্যক্তি অনুসন্ধানের পরিসর বা অবকাশ অনেক কম।

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়গুলি আলোচনা করলে বা ফিরে দেখলে বোঝা যাবে, অন্যান্য বৃত্তির মতো এই বৃত্তিরও বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির অভিব্যক্তি খুঁজে বের করা আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু যাঁরা এই পেশাগ্রহণ করে বেঁচে আছেন পেশা অতিক্রম করে সময়ের সাথে সাথে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিসরের পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা পরিমার্জন হয়েছে কিনা তা গভীর বিশ্লেষণের বিষয়।

এই প্রসঙ্গটি পৃথকভাবে উত্থাপনের কারণ হল যাঁদের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির অনুসন্ধানে আমরা আগ্রহী, তাঁদের এই ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি এসেছে পেশাগত অভিব্যক্তি থেকেই অর্থাৎ বৃত্তিগত বিবিধ পরিবর্তনের ফলেই তাঁদের ব্যক্তিজীবনেও পরিবর্তন এসেছে। তবে আমরা গবেষণাকাজের যত গভীরে প্রবেশ করেছি তত বেশি করে যেন উপলব্ধি করেছি এক অন্য বাস্তব। গণিকাদের জীবনের একমাত্র সত্য যেন তাঁদের জীবিকা। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাঁদের ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে তাঁদের পেশাগত পরিচয়টাই প্রধান হয়ে রয়েছে।

কিন্তু জীবিকার প্রকৃতিগত পরিবর্তনের জন্য তাঁদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে নাকি সময়ের সাথে সাথে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে তাঁদের জীবিকায় – এ প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত।

একের জন্য অন্যের অভিব্যক্তিগত পরিবর্তন নাকি একান্তই পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এই পরিবর্তনের সূচনা – সেই বিষয়টিও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ধাপ রয়েছে। কোনো একটিমাত্র নির্দিষ্ট, নির্ধারিত নিয়মানুসারী পদ্ধতি অনুযায়ী তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, কারণ প্রতিটি মানুষের মন ও মনন তথা মানসিক ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যদিও আমরা মনস্তাত্ত্বিক শব্দটির প্রয়োগ করছি এবং তা সচেতনভাবেই করছি আর সেই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে রাখতে হবে একজন ব্যক্তিমানুষের মনোভুবন গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর পরিবার-পরিজন এবং পরিবেশ ইত্যাদির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গুরুত্বপূর্ণ বললেই হয় না, আসলে এগুলি সেই ব্যক্তিমানুষটিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে আর তাদের এই অনস্বীকার্য ভূমিকার জন্যই অনেকক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিমানুষটির স্বাভাব্য হারিয়ে যায়। তিনি আসলে যেমন হতে পারতেন বা চেয়েছিলেন তেমনটি হতে পারেন না।

কোনো মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরের মধ্যে সব সময় একমাত্র সেই মানুষটিরই অনন্য ভূমিকা বা স্বাভাব্য আমাদের সমাজে এখনও বহুদৃষ্ট নয়। এখানে কোনো মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরের মধ্যে, তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে, বহু মানুষের অনধিকার প্রবেশ ঘটে থাকে।

এই প্রসঙ্গগুলির অবতারণার কারণ হল গণিকাবৃত্তি এমন একটি বৃত্তি যার সাথে মানুষের অপ্রকাশ ও গোপন বোধ/ অনুভূতি জড়িয়ে রয়েছে। বাধ্য হয়ে হোক অথবা স্বেচ্ছায় হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পেশার সঙ্গে যাঁরা সরাসরি জড়িত থাকেন তাঁদের মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করে যে অপরাধের দায়ভার তাঁদের নয়। দীর্ঘদিন এই পেশার সাথে যুক্ত থাকার ফলে ধীরে ধীরে হয়তো এই অপরাধবোধ ক্ষীণ হয়ে আসে এবং একসময় তা অবচেতনে ডুবেও যায়। কিন্তু তাঁরা নিজেদের সমাজের মূলস্তরের একজন হিসেবে কল্পনা করতে পারেন না সহজে। অথচ সমাজের উঁচু-নীচু সবস্তরের পুরুষেরাই এঁদের কাছে আসেন। এই পুরুষেরা দিনে যাঁদের অস্তিত্বকে সামাজিকভাবে ঘৃণা করেন, উপস্থিতিকে উপেক্ষা করেন, রাতের অন্ধকারে তাঁদেরই ভোগ্য সামগ্রী বলে কণ্ঠলগ্ন করতে সঙ্কুচিত হন না। এক অর্থে গণিকাদের নীলকণ্ঠ বলা যেতে পারে। সমাজের কলুষ-পাপ-বৈকল্য-বিকৃতি সবকিছু ধারণ করেই বাঁচেন এঁরা।

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়কে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি আলোচনার সুবিধার্থে-

- পারিবারিক অভিব্যাপ্তি (কন্যা-প্রেমিকা-বধূ-মাতা),
- ব্যক্তিসত্তার অভিব্যাপ্তি,
- মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তি,

সম্পূর্ণভাবে একে অন্যের থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র এই অভিব্যাপ্তির স্তরগুলি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ভুললে চলবে না যে, একজন গণিকার মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তি আসলে তাঁর ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক অভিব্যাপ্তির মিলিত ফল।

আগের অধ্যায়ে আমরা গণিকাদের পেশাগত অভিব্যাপ্তি আলোচনার প্রসঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের নির্বাচিত বাংলাসাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্রগুলির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিব্যাপ্তির দিকনির্দেশ করার চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়েও একই বিন্যাসপদ্ধতি অনুসৃত হবে।

পারিবারিক অভিব্যাপ্তি (কন্যা-প্রেমিকা-বধূ-মাতা)

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের একাধিক পরিচয় থাকে। একই মানুষের সাথে অন্যান্য মানুষের সম্পর্কের বিভিন্নতায় তৈরি হয় আলাদা আলাদা পরিচয়ের সমীকরণ। তাই কোনো মানুষের সব দিকগুলি না জানলে সেই মানুষটিকে জানা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

সেইরকমই একজন গণিকার বৃত্তিগত পরিচয়ের বাইরে তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিচয়, পারিবারিক পরিচয় অনেকখানি সেই মানুষটির নিজস্ব পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরে। কন্যা, প্রেমিকা বধূ এবং মাতা - একজন পূর্ণ নারীর জীবনে এই কয়টি পর্ব সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত বা নির্দিষ্ট। অবশ্য একজন নারীর জীবনে যে এই সমস্ত পর্যায়গুলি আসবেই তা নাও হতে পারে। কখনো কখনো একটি মেয়ের জীবনে এগুলির মধ্যে এক বা একাধিক পর্যায়ের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল একটি মেয়েকে যখন সমাজ তাঁর পেশাগত পরিচয়ে চিহ্নিত করে এবং সেই পেশা যখন গণিকাবৃত্তির মতো সমাজনিন্দিত পেশা হয় তখন তাঁর অন্যান্য পরিচয়গুলি কোথাও যেন গৌণ হয়ে পড়ে আর এই অংশে আমরা সেই আপাত-গৌণ পর্যায়গুলিকে মুখ্যরূপে অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো।

প্রতিটি চরিত্রকে (নির্বাচিত সংস্কৃত তথা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত শাস্ত্রে বর্ণিত গণিকা) পৃথক পৃথকভাবে কন্যা-প্রেমিকা-বধূ ও মাতারূপে আলোচনা করা একপ্রকার অসম্ভব এবং শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে আলোচনার পরিধি বিস্তৃত হওয়ার এবং পুনরাবৃত্তি দোষদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে আমরা এই পর্যায়গুলিকে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করবো এবং সেই আলোচনাবসরে সেই পর্যায়ভুক্ত চরিত্রগুলি ও সেই সব চরিত্রের অনন্যসাধারণ কিছু বিশেষত্ব তুলে ধরবো। এই অধ্যায়ে আমরা গণিকাদের ব্যক্তিজীবনের স্বাতন্ত্র্যকে আলায় আনতে চেয়েছি, চেয়েছি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বহুমুখী আলোচনা করতে। গণিকাদের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ – সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার পাঠ এবং তার মাধ্যমে অভিব্যাপ্তির এক নতুন আঙ্গিক খুঁজে পেতেই এই আলোচনার অবতারণা।

প্রথমে কন্যা আর জননীরূপিণী গণিকাদের আলোচনা করবো, যে দুটি রূপ আসলে একে অন্যের সঙ্গে গাঢ় সম্পর্কযুক্ত।

মাতৃত্ব ও গণিকা: বাৎসল্যের বহুধা অভিমুখ

মাতৃত্ব এক অনন্য অনুভূতি। প্রকৃতির নিয়মে মেয়েরাই সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম। অধিকাংশ নারীই মা হতে চান। তবে সব সময়ে মেয়েমাত্রই সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়, নিজের সিদ্ধান্তে সন্তানের জননী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় গর্ভধারণ করে কিনা সেটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত প্রশ্ন। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের মননে, চেতনায় মাতৃত্ব এবং তার উদযাপন নিয়ে এমন কিছু চিত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে চিরাচরিত বদ্ধমূল ধারণা হল একজন নারীর জীবনের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা তাঁর মাতৃত্বে।

মাতৃত্বের প্রসঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নির্দিষ্ট একটি খোপের মধ্যে মাতৃত্ব এবং নারীত্বকে সমার্থক হিসেবে সহাবস্থানে বাধ্য করেছে। কিন্তু একটি মেয়ের মাতৃত্ব একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। অথচ সন্তান জন্ম দেবার বা নিঃসন্তান থাকার সিদ্ধান্ত যে নারী বা পুরুষেরও পুরোপুরি ব্যক্তিগত বিষয় তা ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সাংস্কৃতিকভাবে অনগ্রসর জনমানসে নেই বললেই চলে। আসলে এখনও বিবাহ ও মাতৃত্বকে অনিবার্য কার্যকারণসম্পর্কের সুতোয় বাঁধা বলে সমাজ ভাবতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। তাই বিবাহিত দম্পতির নিঃসন্তান থাকাটাও তার প্রশ্নের মুখে পড়ে আর বিবাহবহির্ভূত সন্তান তার ঘৃণা, বিদ্রূপ বিমুখতার শিকার হয়।

একজন মেয়ের জীবনে মাতৃত্ব বিভিন্নভাবে আসতে পারে। স্বেচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রসঙ্গ যদি সরিয়েও রাখি তাহলেও আরও কিছু বিষয় এই আলোচনার সাপেক্ষে আসে, যে বিষয়গুলি অত্যন্ত বাস্তব এবং স্পর্শকাতরও।-

প্রথমতঃ একটি মেয়ে বিবাহিত হয়ে অথবা অবিবাহিত হয়ে স্বেচ্ছায় সন্তানের জন্ম দিতে পারে। জন্মদাতার পরিচয় ছাড়াও তা সম্ভব এবং এই স্বয়ংসম্পূর্ণা একলা মা-কে আজকের পরিভাষায় সিঙ্গেল মাদার বলা হয়। ভারতীয় আইন তাকে সেই স্বীকৃতি দিয়েছে। দত্তক নেওয়ার মাধ্যমে অথবা সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গর্ভ-প্রতিস্থাপন করেও একটি মেয়ের পক্ষে সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ একটি মেয়ে যদি তার বিবাহোত্তর জীবনে সন্তানধারণ করতে না চায় তবে সেই স্বাধীনতাও তার থাকা উচিত।

তৃতীয়তঃ এই অংশে আমরা উল্লেখ করছি মেয়েদের লাঞ্ছনার কথা। নারীকে যেহেতু শারীরিক ভাবে দুর্বল বা দুর্বলতর লিঙ্গ হিসেবে বিচার করা হয়ে থাকে তাই যেকোনো যুদ্ধে, দেশভাগে অথবা নিতান্ত ক্ষুদ্র গৃহবিবাদে তার ওপর আঘাত নেমে আসে, এমনকি তথাকথিত প্রেমপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে প্রত্যাখ্যাত পুরুষও নারীকেই আঘাত করে। ধর্ষণের যন্ত্রণায় চিরতরে তার জীবনকে অসম্মানিত করে। আর যদি সেই ধর্ষণের ফলে মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে তাহলে সেই সন্তান অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্বের ফসল হিসেবে প্রাথমিকভাবে মাতৃস্নেহধারার স্বাভাবিক বর্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মাতৃত্ব নারীত্বের একমাত্র মাপকাঠি কখনই হতে পারেনা। কিন্তু মেয়েদের সন্তানধারণসংক্রান্ত এই বিষয়গুলির উল্লেখ একজন গণিকার মাতৃসত্তাকে তুলে ধরার জন্য অনিবার্য। নারীত্ব ও মাতৃত্ব সম্পর্কিত সমাজ প্রচলিত ধারণাগুলি আলোচনা করলে এই সব চরিত্রের সামাজিক অবস্থানগত আলোচনা সহজতর হবে।

আগের অধ্যায়গুলিতে দেখেছি একটি মেয়ের দেহবৃত্তিগ্রহণ স্বেচ্ছায় (বংশানুক্রমিক) হতে পারে অথবা বাধ্যতাবশতঃ হতে পারে। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন মেয়েটি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সন্তানসম্ভবা হয়। একজন গণিকার পেশাগত জীবনের প্রায় পুরো সময়টাই ঝুঁকিবহুল, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা প্রবল এবং আর্থিক সুরক্ষা প্রায় নেই বললেই চলে। এমনাবস্থায় একজন গণিকার পক্ষে সন্তানধারণ এবং সেই সন্তানের প্রতিপালন রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে

ওঠে। শুধু পালনপোষণই নয় একজন দেহপসারিনি প্রথম থেকেই এই সত্যটির সাথেও পরিচিত থাকে যে, যে সন্তান সে গর্ভে ধারণ করছে সে হয়তো কোনোদিনই সমাজে পিতৃপরিচয় পাবেনা। সে জারজ হিসেবেই পরিগণিত ও অবহেলিত হবে।

এইখানে অনিবার্য একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, যখন একজন গণিকা জানেন তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক জীবন দিতে সক্ষম হবেন না, তখন কেন তিনি সেই সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখান? বর্তমানযুগের কথা বা এই সময়ের দেহোপজীবিনীদের পরিস্থিতির কথা আমরা আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করিনি। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্য আমাদের সামনে যে দিকনির্দেশ করেছে তাতে একথা পরিষ্কার যে, একমাত্র কন্যাসন্তানই গণিকাবৃত্তিতে কাজিষ্কৃত। সাধারণতঃ অধিকাংশক্ষেত্রেই পুত্রসন্তানের প্রতি আকর্ষণ অথবা কামনা লক্ষিত হয় যার অন্যতম কারণ বংশরক্ষা, উত্তরাধিকার ইত্যাদি। কিন্তু গণিকাবৃত্তির ক্ষেত্রে বিষয়টি ব্যতিক্রম। এই বৃত্তিতে কন্যাসন্তান স্বাগত এবং তার কারণ হল পেশাগত সুরক্ষা। আমরা আগে এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছি। যেহেতু কন্যাসন্তান তার মায়ের পেশাগ্রহণ করে তাই জীবিকা-পরবর্তী সময়ের অর্থনৈতিক সুরক্ষার কথা ভেবেই কন্যাসন্তান মান্যতা পেয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি আমরা একজন গণিকার সন্তানধারণের বিষয়টিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি থেকে দেখি তাহলে এরকম মনে করা কিছু ভুল হবেনা যে, ভবিষ্যতের খাদ্য-বস্ত্রের-বাসস্থানের সুরক্ষার কথা ভেবেই তিনি সন্তানধারণ করেন। পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে বিট বা লঙ্ঘক-প্লাবকাদি কাজেই তাঁদের লক্ষ করা যায়।^২ অন্য আরও একটি বিষয় আমরা সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে লক্ষ করেছি যে, কোনো গণিকার বহুসংখ্যক সন্তানের উল্লেখ নেই, অথচ এই বৃত্তিতে যেহেতু অসুরক্ষিত যৌনসম্পর্কের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি থাকে তাই সন্তানধারণের সম্ভাবনাও অনেকাংশেই বেশি। গর্ভনিরোধ হল prevention আর গর্ভপাত হল একেবারে অন্তিম উপায়। বারংবার গর্ভবতী হয়ে পড়লেও বহু ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের। প্রথমতঃ তাঁদের পেশা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিতে হয়, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, ধকল – এই সমস্ত কিছু সরিয়ে তাঁদের দ্রুত কাজে ফিরতে হয় কারণ তাঁদের প্রতিপালন করার মত অন্য কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকেনা। তবে এমন বহু চরিত্র রয়েছে যাঁরা সন্তান চেয়েছেন ভালোবাসার স্বীকৃতিস্বরূপ। বহু পুরুষের সঙ্গ করতে বাধ্য হলেও কোনো একজন পুরুষের প্রতি প্রেম অনুভব করে তাঁর ঔরসজাত সন্তানকে ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে সাদরে গ্রহণ করেছেন। বাৎসল্যের টান তখন পেশার

থেকেও অনেক প্রবল হয়ে ওঠে। একজন নারীর কাছে তার জীবিকাকে ছাপিয়ে তার সন্তান হয়ে ওঠে একমাত্র সত্য।

নিজের সন্তানকে স্নেহে-মায়ায়-মমতায় সর্বস্ব দিয়ে পালন করার উদাহরণ যেমন আমরা দেখেছি, তেমনি বিপ্রতীপে দেখেছি একজন মায়ের স্বার্থপর ত্রুর রূপ। কী নির্মম কতোখানি পাষণদহৃদয় হলে একজন মা তার নিজের সন্তানকে এই ঘৃণ্য পেশা বেছে নিতে বাধ্য করেন তা দেখেছি। নিজের প্রয়োজনে কী অনায়াসে মাতৃত্বের পরিবর্তে প্রধান হয়ে ওঠে তাঁর পেশা তাও দেখেছি।

সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্রগুলিকে মাতৃত্বের নিরিখে বিচার করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি ‘মাতৃত্ব’, ‘বাৎসল্য’, ‘স্নেহ’ অথবা তৎসম্পর্কিত সূক্ষ্ম, অনুভূতিশীল মনোবৃত্তি প্রকাশের উদাহরণ বিশেষ নেই। গণিকাচরিত্রগুলিকে প্রধানতঃ তাঁদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করা হয়েছে। যদিও প্রেমিকা-মাতা-বন্ধুরূপের উদাহরণও রয়েছে সেগুলিকে ব্যতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে। গণিকাচরিত্রের সেই ব্যতিক্রমী উদাহরণগুলি সম্বন্ধে আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম।

আমরা আগের অধ্যায়ে পেশাগত অভিব্যক্তি নির্ণয় করার সময়ে দুটি ভাষার সাহিত্যের যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করেছি সেই অনুযায়ী বিচার করলে দেখি বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত গণিকাচরিত্রগুলির মধ্যে নানাবিধ মানবিক অনুভূতির প্রাবল্য অনেক বেশি। শুধুমাত্র ‘দেহোপজীবিনী’ – এই পেশাগত পরিচয়টাই তাঁদের একমাত্র পরিচয় নয়। একজন নারীর জীবনের প্রায় সবরকম পর্যায়ই বাংলা সাহিত্যের গণিকাদের মধ্যে লক্ষিত হয়। সবথেকে বেশি লক্ষিত হয় সেইসব চরিত্রগুলির মধ্যে যাঁরা বাধ্য হয়েছেন এই পেশা বেছে নিতে।

একজন নারীর জীবনে ক্রমান্বয়ে যে পর্যায়গুলি আসে একজন গণিকার জীবনেও যে সেই সমস্ত পর্যায়গুলি আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, বরং না আসার সম্ভাবনাই প্রবলতর। আমরা সাধারণ ভাবে একটি মেয়ের জীবনকে কন্যা-প্রেমিকা-বধূ এবং মাতা এই চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছি কারণ এগুলিই নারীজীবনের তথাকথিত মুখ্য ধাপ। এই এক একটি ধাপে পৌঁছানোর পরে একজন মেয়ের জীবনযাপনের বহুলাংশে পরিবর্তন হয়। কন্যা থেকে প্রেমিকা কখনো বধূ আবার মাতা এই পর্যায়ে চলতে থাকে তার জীবন। কিন্তু একজন দেহবিলাসিনীর জীবনে এই

সবগুলি পর্যায় নাও আসতে পারে বা এলেও সেগুলি কতোটা আনন্দদায়ক হবে সে প্রশ্নও থাকে।

একজন গণিকার জীবনবৃত্ত যেভাবে চলে তাতে সাধারণতঃ কন্যা ও মাতা এই দুটি পর্যায় স্বাভাবিকভাবেই এসে থাকে। তাই পারিবারিক অভিব্যাপ্তির মধ্যে আমরা প্রথমে এই দুটি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বর্তমানে যিনি কন্যা ভবিষ্যতে তিনিই মাতা হবেন। কন্যা থেকে মাতা হওয়ার এই যে যাত্রা তা একজন গণিকার ক্ষেত্রে সবসময় খুব সুখের বা আনন্দের হয়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে লজ্জা-বিড়ম্বনা-অপমানের নানা স্মৃতি।

আমাদের নির্বাচিত সাহিত্যগ্রন্থগুলিতে, উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই, এমন বহু চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে যারা পেশায় গণিকা হলেও তারা কারো মা, কারো মেয়ে। বংশানুক্রমিকভাবে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে এই দুটি রূপের উদাহরণ আমরা যেমন পেয়েছি আবার এমন উদাহরণও দুর্লভ নয় যেখানে আমরা দেখেছি একেবারেই আকস্মিকভাবে কেউ এই পেশা অবলম্বন করেছেন।

আমরা এবার উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করবো আর সেই কারণেই আলোচনা শুরুর প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, যেহেতু একজন নারী কন্যা থেকে মাতা হয়ে থাকেন তাই বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আমরা গণিকাদের কন্যারূপ ও মাতৃরূপের আলোচনা পৃথকভাবে না করে একসঙ্গে করবো। তবে মা হিসেবে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে একথা অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে যে, গণিকাবৃত্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রক্তসম্পর্কের মা নন, পেশাগত জীবনে প্রাপ্ত মায়ের কথাও উঠে আসবে। পেশাগত জীবনের এই মাতৃস্থানীয়া চরিত্রটি কখনো মা, কখনো মাসি পরিচয়ে পরিচিত হয়ে থাকেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে এঁদের কুটনী অথবা মাতৃকা বলা হয়ে থাকে। অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আমরা করেছি।

পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য পাঠের সময়ে এই মাতৃচরিত্রগুলির বিশেষ কোনো স্বভাবগত পরিবর্তন আমাদের অনুসন্ধানের ধরা পড়েনি। কাহিনীর সূত্র ধরে আলোচনা করলে বিষয়টি উপলব্ধি করা অনেকখানি সহজ হবে। প্রতিটি পর্যায়েই আমরা অভিব্যাপ্তিকেন্দ্রিক আলোচনা করার সময়ে পূর্ব অধ্যায়ে লিখিত ক্রমানুসারেই আলোচনা করেছি এবং কিছুটা সচেতনভাবেই আমরা তা করেছি।

প্রথম মুহূর্তটিকে দেখি গণিকা বসন্তসেনার মাতাকে। তাঁর চরিত্রের উপস্থিতি, তাঁর বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট তিনি নিজেও গণিকা ছিলেন। কন্যার মতো তিনিও ‘নগরনটী’ ছিলেন কিনা শূদ্রক সেকথা সরাসরি উল্লেখ করেননি তবে তাঁর আচরণ তুলনামূলকভাবে অভিজাত্যপূর্ণ ছিল তা বলাই বাহুল্য। পেশার কারণে তিনি বসন্তসেনাকে রাজার শ্যালককে ভজনা করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে গণিকা-জীবন অর্থসম্পদের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন বলেই সেই উপদেশ দিয়েছিলেন; একবার নয় বেশ কয়েকবার। কিন্তু তাঁকে কখনোই অর্থগুণ, নিষ্ঠুর আচরণ করতে দেখিনা উপরন্তু মনে হয় তিনি মনে মনে নিজের কন্যার প্রেমিকরূপে উত্তরণে আনন্দিত এবং কোথাও যেন নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর কন্যা চারুদত্তের মতো সৎ, গুণবান একজন পুরুষকে প্রেমিকরূপে পছন্দ করেছিলেন।^৭ নিজের কন্যার হত্যাপরাধে অভিযুক্ত চারুদত্তকে মুক্ত করে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন, এমনকি অভিযোগ প্রত্যাহার করতে চেয়েছেন তিনি। তবে এই অনুরোধ একটু জটিল মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিতবাহী। এই অনুরোধ চারুদত্তের অসামান্য ব্যক্তিত্বের জন্য ঠিকই কিন্তু কন্যা দেহজীবা বলেই কি মায়ের এহেন অনুরোধ? সমাজে তাঁর কন্যার থেকে চারুদত্তের মতো গুণবান ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজনীয়-

“তদ্যদি ব্যাপাদিতা মম দারিকা ব্যাপাদিতা। জীবতু মে দীর্ঘায়ুঃ। অন্যচ্চ।
অর্থিপ্রার্থিনোর্যবহারঃ। অহমর্থিনী। তন্মুঞ্চতৈতম্।(মুচ্ছ।/নবমাস্ক)”^৪

বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত এই মা অথবা মাতৃস্থানীয় চরিত্রগুলি উল্লেখ এই বৃত্তির সাথে যুক্ত প্রায় সব কাহিনিতেই স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বেশকিছু স্বভাবগত পার্থক্য (সদর্থক ও নঞর্থক) আমরা লক্ষ করেছি যদিও সদর্থক, সূক্ষ্ম গুণাবলী বা অনুভূতি এই চরিত্রগুলির মধ্যে খুব কম দেখা যায়।

আমাদের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে এমন বেশ কয়েকটি চরিত্র রয়েছে যাঁদের মধ্যে মাতৃসুলভ গুণাবলীর সন্নিবেশ খুব কম লক্ষ করা গেছে। কিছু চরিত্র এমন রয়েছে যাঁরা নিজেদের পেশা থেকে সন্তানকে, সেই সন্তান কন্যাসন্তান হলেও, দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। তার জন্য এই ঘৃণ্য পেশায় যতখানি কষ্ট সহ্য করতে হয় তাঁরা তা করেছেন। আবার এমন উদাহরণও আমরা দেখেছি যেখানে মা তাঁর নিজের সন্তানকে এই পেশায় নিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, সন্তান এই পেশা ত্যাগ করতে চাইলে তার উপরে অকথ্য অত্যাচার অবধি করেছেন। অর্থাৎ একথা

পরিষ্কার হয়ে যায় ‘মা’ কিংবা ‘মাতৃ’ এর চিরাচরিত, প্রচলিত সংজ্ঞায় সব নারী সংজ্ঞায়িত হতে পারেন না আর তার সঙ্গে জীবিকার কোনো সম্পর্ক নেই।

নিশিপদ্ম উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কাঞ্চনমালার মা নিজে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। নিজের দুই কন্যাসন্তানকেও এই পেশাতে এনেছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে গান, খেমটা নাচ ও ঢপ কীর্তনের মতো আনুষঙ্গিক বিষয়ও তাঁদের অর্থোপার্জনের মাধ্যম ছিল, ছিল রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ও। কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রয়েছে। আমরা এমন একজন গণিকামাতার চরিত্র বিশ্লেষণ করবো যিনি নিজের দুই সন্তানকে এই ন্যাকারজনক পেশায় এনেছিলেন। কী পরিস্থিতিতে তাঁদের তিনি এনেছিলেন, স্বেচ্ছায় নাকি নিতান্তই অনিচ্ছায়, তার ইঙ্গিত লেখক দেননি। কিন্তু কাঞ্চনের মায়ের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তাতে তাঁকে নিতান্তই নিষ্ঠুর, অর্থলোলুপ একজন নারী বলেই মনে হয়, যিনি কেবলমাত্র অর্থ-ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অভিলাষী। তিনি তাঁর মেয়েদের ‘রক্ষিতা’ হয়ে থাকার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দেন। আবার তিনি নিজের মেয়ের জীবনে প্রেম আসার কথা জানতে পেরে তাঁকে রীতিমত শারীরিক, মানসিক নির্যাতন করেন-

“প্রথম যেদিন আমাকে ঘরে বন্ধ করে সেই দিনই সে আমার গায়ের গয়না হাতের চুড়ি পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল। আঙুলে থেকে গিয়েছিল একটা আংটি।”^৫

সেই বর্ণনা পড়ে পাঠককে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়, কী করে একজন গর্ভধারিণী মা নিজের সন্তানকে নরকে থাকার জন্য বাধ্য করতে পারেন? মানবচরিত্রের এও এক বিস্ময়। দুই মেয়ের রোজগারের সিংহভাগ তিনি নিজে রাখতেন। তাই দিয়েই নতুন বাড়ি, সঞ্চিত অর্থসম্পদ— উপার্জন মেয়েদের কিন্তু ভোগ করেছেন তিনি।

কিন্তু তাঁর এহেন আচরণের অন্য আরেকটি দিক রয়েছে। একজন নারী যিনি পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন পতিতাবৃত্তি তিনি জানেন জীবনে টিকে থাকতে গেলে ঠিক কী পরিমাণে দুর্বিষহ লড়াই করতে হয়। বিশেষ করে তিনি যদি অনাথা, বালবিধবা হন। একবার যদি এই কালগহ্বরে কেউ প্রবেশ করে তবে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়না। কাঞ্চনমালার মাও এই বাস্তব সত্যটি বুঝতে পেরেছিলেন। হয়তো তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কাঞ্চন যাকে প্রেম ভেবে অনিশ্চয়তার পথ বেছে নিচ্ছে আসলে তা মরীচিকার মতো। বিলাসিতার প্রশ্ন দূরে থাক

সামান্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করাও তার জন্য দুষ্কর হয়ে উঠবে কারণ যে স্বীকৃতির আশা সে করেছে তা কোনোদিন বাস্তবায়িত হবেনা। তিনি সে কথা নিজের মুখেই বলেছিলেন-

“শোন্। ভাল ভাল লোকে বড় বড় লোকে বলেছে- আমার কথা নয়; আমাদের, যারা এই বৃত্তি করে তাদের ভালবাসা মানা; তাদের প্রেম করতে নেই। করলে সর্বনাশ হয়। শেষ জীবনে ভিক্ষে করতে হয়। মনস্তাপ সার হয়, যার প্রেমে পড়ে সে শেষ পর্যন্ত একদিন ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে দিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ঘরে ফেরে।”^৬

এতদিন সে একজন রক্ষিতা হয়ে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী জীবনযাপন করতো কিন্তু সেখানে তার অন্নবস্ত্রের অভাব ছিলোনা। কিন্তু কাঞ্চনের প্রেমের প্রতি ভক্তি ও একাগ্র নিষ্ঠা তাঁর মাকে আশঙ্কিত করে তুলেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর মেয়ের আগামী জীবন অনিশ্চয়তায় ভরে যাবে।

কিন্তু এই উপন্যাসের পরবর্তী প্রজন্ম কাঞ্চন তাঁর কন্যা মুক্তামালাকে নিজের পেশা থেকে অনেক দূরে রেখেছিলেন। সুস্থ-স্বাভাবিক সুন্দর জীবন দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে। মৃত্যুশয্যায় তিনি নিজের জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায়ের সবটুকুই মেয়েকে বলেছেন। সব সত্যি জানার পরে মেয়ের চোখে ঘৃণা দেখলেও কাঞ্চনের জীবনের এটুকুই সান্ত্বনা যে, তিনি নিজের মেয়েকে এই পেশা থেকে দূরে রাখতে পেরেছেন। যাঁরা এই পেশায় আছেন তাঁদের কাছে এ এক মস্ত সান্ত্বনা, মানসিক স্বস্তিও।

এরপরে আসা যাক *উত্তর-ফাল্গুনী* উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য চরিত্র দেবযানীর কথায়। বিবাহিতা দেবযানী স্বামীর অত্যাচারে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সংসার ত্যাগ করেছিলেন, ভেবেছিলেন আত্মহত্যার মাধ্যমে মুক্তি পাবেন। কিন্তু নিজের গর্ভের সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখানোর জন্য নিতান্ত বাধ্য হয়েই তাঁকে পতিতাবৃত্তি বেছে নিতে হয়েছিল। অবশ্য তাও মৃত্যুর থেকে কম কিছু নয়। মৃত্যুতে মানুষ একবারই মরে কিন্তু অনিচ্ছায় যাঁরা এই জীবিকা বেছে নিয়েছেন তাঁদের প্রতিটি দিন যেন মৃত্যুর শামিল। দেবযানী নিজের কন্যাসন্তানকে পাহাড়ের একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পেশা সম্বন্ধে সন্তান যেন কিছুই জানতে না পারে। নিজের বাৎসল্য, স্নেহ-মায়া, মাতৃত্বের যাবতীয় কোমল অনুভূতিগুলিকে অবদমিত করে রেখেছিলেন তিনি নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য। শুধু তাই নয়, গর্ভের সন্তান তাঁকে তাঁর পেশার কারণে ঘৃণা করে জেনেও যখন তাঁর আগামী জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস তিনি পেয়েছিলেন তখন মুহূর্তের মধ্যে নিজের হাতে স্বামীকে হত্যা

করতে তাঁর বাধেনি। অগ্রপশ্চাৎ কিছুই তোয়াক্কা তিনি করেননি, তাই হত্যার দায় নিজে নিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যে সন্তান একদিন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সেই সন্তান নিজে আদালতে দাঁড়িয়ে মাকে সসম্মানে মুক্ত করে। দেবযানীকে সারাজীবন ভালোবেসেছিলেন মনীশ, তিনি বিবাহ-প্রস্তাব দিলেও দেবযানী নিজেকে অপবিত্র ভেবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয়, নিজেকে মেন্টাল অ্যাসাইলামে স্বেচ্ছা-বন্দি করে রাখেন যাতে তাঁর তিক্ত, কলঙ্কময় অতীতের কারণে কন্যা সুপর্ণার ভবিষ্যৎ জীবনে কোনোরকম বিপদ না আসে।

দেবযানী বাধ্য হয়ে এই পেশায় এসেছিলেন শুধু নিজের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। তাঁর পারিবারিক শিক্ষা-রুচিবোধ ঠিক এই পেশাবলম্বিনীদের মতো ছিলোনা আর পরবর্তী জীবনে তিনি শুধু নিজের গানের জন্য পরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কন্যা সুপর্ণাকে প্রতিষ্ঠিত করা তাই তাঁর সাথেও সরাসরি কোনো সংশ্রব তিনি রাখেননি। এক অনন্য মাতৃহের উদাহরণ দেবযানী চরিত্রটি।

জন-অরণ্য উপন্যাসে আমরা এমন অনেকগুলি চরিত্রের উল্লেখ পেয়েছি যাঁদের সম্বন্ধে গভীর পাঠ আমাদের রীতিমত বিস্মিত করেছে। এই বৃত্তি একজন গর্ভধারিণীকে কতোখানি নির্মম ও নির্লজ্জ করে তুলতে পারে তার উদাহরণ এই উপন্যাসের পরতে পরতে পাই আমরা। অবশ্য আমরা আমাদের প্রচলিত শিক্ষা, চিন্তাভাবনা, মননের অনুদারতার কারণে দেহবৃত্তি ও এই বৃত্তি অবলম্বনকারীদের প্রতি প্রথম থেকে তীব্র বিতৃষ্ণা, ঘৃণার দৃষ্টি পোষণ করে থাকি। তাই তাঁদের দিকের কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়। কিন্তু এই উপন্যাসে যে চরিত্রগুলির উল্লেখ আমরা পেয়েছি তাঁদের অনেকেই একাধারে দেহবৃত্তির সাথে জড়িত আবার তাঁরা সন্তানেরও মা, যেমন মিসেস গাঙ্গুলী, উড স্ট্রীটের মিসেস চক্রবর্তী, মিসেস বিশ্বাস। এঁদের মধ্যে মিসেস বিশ্বাস নিজেকে ও দুই মেয়েকেও এই পেশায় নিয়োগ করেছিলেন। উদ্দেশ্য হল আরও উন্নতমানের জীবনযাত্রা। দেহকে এঁরা পণ্য বলেই মনে করেন। তাই নিত্যনতুন পুরুষের কাছে অর্থ, দামী উপহার, বিদেশভ্রমণের বিনিময়ে দেহকে নিবেদন করায় দ্বিধা নেই তাঁদের। নীতি-নৈতিকতা সব কিছু বিলাসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন এঁরা। মাতৃহের সাবেক ধারণা মিসেস বিশ্বাসের মতো চরিত্রের সামনে কল্পনা বলে মনে হয়। তিনি গর্ববোধ করেন মেয়েদের পুরুষরঞ্জিনী পারদর্শিতায়। পেশাদারিত্বের মূর্ত দৃষ্টান্ত তিনি-

“টাকা নিই বতে—কিন্তু সার্ভিসও দিই। প্রত্যেক কাস্টমারের জন্যে আমার এখানে ফ্রেস বেডশিট এবং তোয়ালের ব্যবস্থা। অ্যাটাচড বাথরুমে নতুন সাবান। প্রত্যেক ঘরে ট্যালকাম পাউডার, লোশন, অডিকোলন, ডেটল। যত খুশী কফি খাও—একটি পয়সা দিতে হবে না।”৭

অর্থই যে যাবতীয় অনর্থের মূল, ভোগের সাগরে একবার নামলে যে তার আর নিস্তার নেই তারও উদাহরণ এই চরিত্রটি।

নিশিপদ্ম উপন্যাসে কাঞ্চনমালার মা যতখানি নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিলেন তার অনেকটাই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে। তিনি নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছেন একজন পতিতাকে দেহপট বিক্রয়যোগ্য থাকতে থাকতেই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে হয়। তাঁদের পেশায় আর্থিক নিরাপত্তা শব্দবন্ধটি অনেকটা যেন ‘সোনার পাথরবাটি’-র মত অলীক। কিন্তু জন-অরণ্যের মিসেস বিশ্বাস? তাঁর নিজের ও কন্যাদের এই পেশায় আসা কোনো অর্থনৈতিক অনিরাপত্তার কারণে নয়, আরও ভালো থাকার লোভে। সমাজে উঁচু স্থান, প্রাচুর্যের মোহ তাঁকে মাতৃত্ব, বাৎসল্য সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই তিনি অনায়াসে নিজের কাজকে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। অবশ্য এর পেছনে সমাজের আমূল পরিবর্তন, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, জীবনযাত্রার মানবদল এগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কিন্তু সবকিছুর পরেও একজন মা শুধু লোভের কারণে নিজের সন্তানদের এই পেশায় এনেছিলেন— এটা ভাবা ও মেনে নেওয়ার মতো পরিণতমনস্কতা আমাদের এখনও হয়নি।

এরপরে যে কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য সেটি হল, ‘বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি’। সৌদামিনী একজন পোড়খাওয়া বেশ্যা। তিনি কন্যা হেমলিনীকে ‘বাবু ধরা’ ও ‘বাবু ছাড়ার’ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নানারকম কৌশল উপদেশ দিয়ে থাকেন। নিজের কন্যা ও সেই সঙ্গে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও উন্নত করাই যে তাঁর মূল উদ্দেশ্য একথা তিনি বারবার বলেছেন—

“হু! মাছের মায়ের আবার পুত্র শোক চোরের আবার ধর্ম ভয়, যে খেলতে পারে, এক এক জনের চার পাঁচটা আছে, আর তোর দুট থাকতে পারে না, ...।”৮

আমাদের নির্বাচিত গল্পসংকলন *বারবনিতাদের গল্প* থেকে বেছে নিয়ে কয়েকটি আখ্যান আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। প্রথম যে কাহিনীটি আমাদের আলোচনায় এসেছে সেটি হল হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বাঈজী’। আনোয়ারীবাঈ প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী, কিন্তু তাঁর অন্য আরও একটি পরিচয় আছে তিনি বাইজী। নিজের একমাত্র কন্যা মোতিকে তিনি তাঁর বাড়ির পরিবেশ

থেকে সম্পূর্ণ দূরে লালন করতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর কাছে থাকলে মেয়ের ভবিষ্যৎও তাঁর মতোই হবে। তাই দীর্ঘকালের বিশ্বস্ত বন্ধু মনোহরপ্রসাদের সাহায্যে নিজের শিশুকন্যাকে দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থায় সম্মতি জানিয়েছিলেন তিনি। নিজের সমস্ত অনুভূতি, ভালোবাসাকে একপ্রকার অবদমিত করে তিনি কোনোদিন নিজের মেয়ের সামনেও উপস্থিত হননি, শুধু মেয়ের ভালো থাকার কথা চিন্তা করে গেছেন তিনি। প্রায় দেড় যুগ পরে আবার লক্ষ্যেতে এসেছে মোতি নিজের স্বামীর বদলি সূত্রে। মায়ের মন মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে দূর থেকে হলেও নিজের ঔরসজাতাকে একবার চোখের দেখা দেখার-

“যে মেয়েকে দুহাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন পক্ষিল পরিবেশ থেকে, বাঈজীর ঘণ্য জীবন থেকে উন্নীত করেছেন গৃহস্থ-বধূর পর্যায়ে। তাই বুঝি হৃদয় অধৈর্য হয়ে পড়েছে, অপেক্ষা করতে মন সরছে না।”^{১৭১}(বা.গ./পৃ.১৭১)

কিন্তু মেয়েকে দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর সুখকর হল না মোটেই। বাস্তবের তীব্র অভিঘাতে নিমেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তাঁর যাবতীয় স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা। তিনি দেখলেন মোতির সাজপোশাক, আচার-ব্যবহার সবকিছু যেন উগ্র। কোনো সুস্থরুচির ছাপ নেই তার মধ্যে। এক অসহায় মায়ের কান্নায় ধরা পড়েছে সর্বহারার বেদনা, স্বপ্নভঙ্গের হতাশা-

“.... বাঈজীর মেয়ে বাঈজীই হয়ে রইল! ছেলেবেলা থেকে কাছছাড়া করেও রক্তের দোষ ছাড়াতে পারলাম না। পোশাক-আশাক, রং-ঢং, চালচলন-- এ সবে চকের রাস্তায় দাঁড়ানো বাঈজীদের যে হার মানালো! এ কি হলো ভাইসাব, এ আমার কি হলো!”^{১৭২}(বা.গ./পৃ.১৭৩)

আনোয়ারীবাঈ নিজে বাঈজী-জীবনের বাস্তব জানতেন বলেই একমাত্র কন্যাসন্তানের ভালোর জন্য, ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য ঐ পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন শিক্ষিত, ভদ্র পরিবার, তাঁদের রুচি দিয়ে মোতিকে তাঁরা গড়েপিটে নেবেন। নিজের মায়ের জীবনের কালিমা তাকে স্পর্শ করবেনা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি, মোতিকে দেখে তার জন্মদাত্রী মা দুঃখে-লজ্জায়-হতাশায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন কারণ তাঁর ত্যাগ বিফল হয়েছে। আনোয়ারীবাঈ-এর মাতৃসত্তার পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে এই গল্পে।

এহেন মাতৃত্বের উদাহরণ সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। আগেই বসন্তসেনার মায়ের প্রসঙ্গ এসেছে তবে তা সামান্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি মায়েরা পরবর্তী প্রজন্মকে প্রস্তুত করছেন এই পেশায় টিকে থাকার জন্য, জীবনধারণের জন্য। তবে বাংলা সাহিত্যে সে ধরনের উদাহরণও বড় কম নয়।

এরপরের গল্প আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘মাণ্ডল’। মাণ্ডল গল্পের কাহিনীটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক, বিড়ম্বিত মাতৃহের কাহিনী; যে মাতৃত্ব নিষ্ঠুর, বীভৎস। গল্পে রয়েছে নীলা নামের একটি যুবতীর কথা, দেহবিক্রয়ের মাধ্যমে জীবন চলে তাঁর। জয়ন্ত নামে গল্পের পুরুষচরিত্রটি প্রায় আসেন তাঁর কাছে। অর্থের বিনিময়ে সুখ খোঁজেন তিনি। সেরকমই এক প্রবল শীতের রাতে জয়ন্ত সেই নৈশবাসরে এসে দেখেন নীলা অনুপস্থিত কিন্তু অন্ধকার সিঁড়িতে বসে থাকা বুড়ি ঝি তাঁকে একরকম আদেশ দিয়ে ঘরে অপেক্ষা করতে বলে। অনিচ্ছুক নীলার সাথে ঝির কথোপকথন শুনে এবং পরে নীলার কথা, আচরণ থেকে জয়ন্ত তাঁর অন্যমনস্কভাব বুঝতে পারেন। নীলা আরও অধৈর্য হয়ে ওঠেন দরজার বাইরে থেকে আসা কাশির শব্দে। কৌতূহলী জয়ন্তের প্রশ্নে নত, বিব্রত নীলা জানান বাইরে তাঁরই মেয়ের কাশির শব্দ যাকে অর্থাভাবে সময়ে ওষুধটুকুও তিনি দিতে পারেননি। জয়ন্তের কথায় মেয়েকে ঘরে নিয়ে এলেও একটু পরেই সেই বুড়ি ঝি ভেতরে আসে শিশুটিকে আবার বাইরে নিয়ে যাবার জন্য কারণ তা না হলে নীলার পক্ষে উপার্জন করা সম্ভব হবে না। নীলা তাঁর কথা অগ্রাহ্য করতে না পারায় জয়ন্তের মনে একটি সন্দেহ দেখা দেয়, সেই সন্দেহ প্রবল হয়ে ওঠে যখন তিনি ঝির দৃষ্টিতে এক তীব্র অর্থলোলুপতা দেখতে পান। সন্দেহ নিরসনের জন্য নীলাকে জোর করেন মহিলার প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য, জানতে পারেন ঐ বুড়ি আসলে নীলার জন্মদাত্রী মা। ঘটনার এহেন আকস্মিকতায় জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে গেলেও কোথাও যেন এরকমটা অনুমান করেছিলেন তিনি।

এই গল্পটিতে একজন গণিকার জীবনের সবথেকে নির্মম নিষ্ঠুর সত্যটি নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। লেখক নিজেই সেই কথা বলেছেন –

“মেয়েদের মাতৃত্ববোধ বিধাতার সকলের বড় আশীর্বাদ...সকলের বড় অভিশাপও নয় কেন?”

” (বা.গ./পৃ.২১৫)

যে কথা দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম, মেয়েদের মাতৃত্ব সেই প্রসঙ্গটিই উঠে এসেছে এই গল্পের মধ্যে দিয়ে। প্রতিটি মেয়ের কাছে মাতৃত্ব সুখের, আনন্দের কিন্তু যে মা সন্তানের মুখে অন্নযোগানের জন্য বাধ্য হন দেহবিক্রয় করতে কিংবা অসুস্থ মরণাপন্ন কোলের শিশুটির অসুখে ওষুধের ব্যবস্থা করতে হয় শরীরের বিনিময় মূল্যে সেই মায়ের যন্ত্রণার সীমা কোথায়? নিজের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করতে করতে কখন যেন সেই যুবতীর মাতৃসত্তা ধ্বংস হয়ে যায়, পড়ে থাকে এক পেশাসর্বস্ব, অর্থলোলুপ পিশাচমূর্তি। যার মধ্যে থেকে স্নেহ-মায়া-মমতা-করুণা-বাৎসল্য সব অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে, যে জানে জীবনে বেঁচে

থাকতে গেলে দেহটুকুই সম্বল আর সম্বল নিজের আত্মজা, যাকে ভবিষ্যতে এই পেশাই গ্রহণ করতে হবে। কারণ? জয়ন্তের কল্পনায় তার উত্তরও দিয়েছেন লেখক-

“...বিশ বছর, পঁচিশ বছর পরের একটা সম্ভাবনা ভাসছে। সামনের তাজা নারী দেহ মিলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। তার বদলে বসে আছে পলিতকেশ লোলচর্ম এক জরাজর্জর বৃদ্ধা, কোলে তার নতুন কোনো আধমরা শিশু, মাথার ওপরে ছাদ নেই, ভিজে স্যাঁতসেঁতে শীতের হাওয়া—সামনের দরজা বন্ধ।... নগ্ন প্রত্যাশার উল্লাসে সেখানে ধক ধক, ধক ধক করছে এক আদিম নর-দানবের জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড- নির্মম, নৃশংস, মাংস-লোলুপ।”^{২২} (বা.গ./পৃ.২১৬)

আসলে লেখক এই গল্পে লেখক সমাজের লোভী, নির্লজ্জ, কদর্য, নারীমাংসভোজী রূপটাকেই তুলে ধরেছেন। একটি মেয়ে, সে যে কোনো কারণেই গণিকাবৃত্তি নিয়ে থাকুক না কেন সে এই চক্রবূহ থেকে সহজে বেরোতে পারেনা। একটা সময়ের পরে একেই ভবিষ্যৎ বলে মেনে নেয় এবং নিজের কন্যাকেও একই পেশায় নিয়ে আসে। নিজের বা নিজের মেয়ের – কারো মুক্তিরই কোনো মূল্য তার কাছে আর থাকেনা।

সমরেশ বসুর ‘নিষিদ্ধ পল্লী গৃহে গমন’ গল্পেও আমরা এরকম একটা চরিত্রের কথা জেনেছি। গল্পে সরাসরি চরিত্রটির উপস্থিতি নেই এবং খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ রয়েছে। আমরা তাঁর কথা জানতে পারি তাঁরই মেয়ের বয়ানে। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে যে গণিকা চরিত্রটি, তাঁর উল্লেখ রয়েছে ‘দী’ নামে। অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় ‘দী’র বিধবা মা ধীরে ধীরে পুরুষবিলাসিনী হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমশঃ এক থেকে বহু পুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পরেছিলেন তিনি এবং যাবতীয় সংস্কার ত্যাগ করে একটা সময়ে তিনি স্বৈচ্ছাচারী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিদারুণ কষ্ট-দুঃখ, অপমান-লাঞ্ছনার থেকে নিজের দেহের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন অনেক বেশি সহজ মনে হয়েছিল বোধহয় তাঁর। অন্ততঃ অন্যের গলগ্রহ হয়ে তাঁদের দয়াভিক্ষা করে বেঁচে থাকার তুলনায় তা সহজ এমন চিন্তাধারা থেকেই তিনি নিজের মেয়েকেও এই পেশাতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন, অবশ্য তার কতোটা স্বৈচ্ছায় আর কতোটা অন্যের চাপে সে কথা জানা যায়না। কিন্তু কুমারী মেয়েকে এই পেশায় নিয়ে আসার আগে কোনোরকম চিন্তা-ভাবনা করেননি তিনি। লেখকের কাছে নিজের ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা বলতে গিয়ে মেয়েটি তাঁর মায়ের প্রসঙ্গ এনেছিলেন, তাঁর বয়ানে-

“আমার ভাগ্য ঠিক হয়ে গেছলো। বিয়ে আমার হয় নি। তখন সবে ক্লাস এইটে উঠেছি। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছি। শীতকাল। মায়ের এক পুরুষ বন্ধু আমাকে আর মাকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন

তাঁর এক বন্ধুর বাগানবাড়িতে। আসলে সেই দিনটি ছিল আমার বলির দিন। বারুই-পুরের সেই বাগান বাড়িতে আমার বলির হাড়কাঠ তৈরি করেই রাখা ছিল। আমার মায়েরও হাত ছিল তাতে। তখন জানতে পারি নি, কিছু বুঝতে পারি নি--।”^{১০}(বা.গ./পৃ.২৩৪)

একজন মা তাঁর প্রায় কিশোরী মেয়েকে কিছু না জানিয়ে তাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাধ্য করেন দেহব্যবসায় আসতে। তিনি যে পেশায় আছেন সেই পেশা যে কতোখানি ঘৃণ্য বা একটি মেয়ের পক্ষে তা যে কতোখানি অপমানজনক সব জানার পরেও কেন, কীসের জন্য তিনি নিজের মেয়ের এত বড় সর্বনাশ করেছিলেন তা জানা যায়নি। তিনি চাইলে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারতেন, হয়তো বা এই পেশার সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে পারতেন। অবশ্য সবটাই আমাদের অনুমান। এমনও হতেই পারে তিনি আরও রুঢ় সত্য অনুভব করেছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল তিনি যে পেশায় আছেন জানলে কোনোদিন মেয়ের বিয়ে হবেনা, হতে পারে তিনি এই পথে এসে যে আর্থিক স্বাধীনতা পেয়েছিলেন চেয়েছিলেন তাঁর মেয়েও সেরকম পাক। এইসবই হতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই একজন মায়ের এই কাজ নৈতিক সমর্থনের যোগ্য নয়।

এছাড়া ‘কুসুম’ গল্পেও আমরা দেখি কুসুমের মা তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন পেশায় অবহেলা না করার জন্য। তিনি যেন অসুস্থ রোগীর সেবা করতে গিয়ে নিজের ব্যবসা নষ্ট না করেন, অন্যথা তাঁর নিজের যে আর্থিক ক্ষতি হবে তা কোনভাবেই পূরণযোগ্য নয়-

“আপনাদের পাঁচ জনের দয়ায় কোনোরকমে দুটাকা-পাঁচটাকা ঘরে আসে, তা ও হ্যানরে ত্যানরে, রুগী রে ডাক্তার রে, ওষুধ রে পত্তি রে ..।”^{১১}(বা.গ./পৃ.৭৮)

যে মেয়েটি আজকে বেশ্যাবৃত্তিতে যুক্ত সেই মেয়েটি পরবর্তী জীবনে মা হয়ে কখনো নিজের সন্তানকে একই বৃত্তিতে নিযুক্ত করেছেন আবার কখনো তাকে নিজের পেশার পরিধি থেকে বহু যোজন দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। যদিও আলোচনার শুরুতে আমরা ভেবেছিলাম যে এই পার্থক্য মানসিকতার ভেদে হয়, কিন্তু যত গভীরে প্রবেশ করেছি দেখেছি মানসিকতার এই পরিবর্তন অনেকাংশেই নির্ভর করে মায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপরে, তাঁর শিক্ষার উপরে, জীবনবোধের উপরে। তাই কখনো একটি চরিত্রকে দিয়ে অন্যকে বিচার করা যায়না, প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা।

এই প্রসঙ্গে বর্তমানের যৌনকর্মীদের চিন্তাভাবনার ছবি দেখতে পাই ডঃ স্মরজিৎ জানার ‘যৌন কাজ কি কাজ’ শীর্ষক প্রবন্ধে। যেহেতু তিনি সরাসরি ‘দুর্বীর মহিলা সমন্বয় কমিটি’-র সঙ্গে জড়িত ছিলেন, জড়িয়ে ছিলেন যৌনকর্মীদের চিকিৎসায়, এমনকি তাঁদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়েও তাই এই বিষয়গুলি রীতিমত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন, তুলে ধরেছেন তাঁদের জবানবন্দী –

“আমরা কি তাহলে মাতৃত্বকে অস্বীকার করি? যেহেতু আমরা এমন এক পেশায় আছি যেখানে বৈধ মাতৃত্বের কোন জায়গা নেই, আমরা কি গায়ের ঝাল মেটাতে সব মাতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছি। তা নয়। কোন মেয়ে যদি মা হতে চায় তাহলে তার অবশ্যই সেই চাহিদা পূরণ করার অধিকার আছে।.....অন্যদিকে আমরা যৌনকর্মীরাও অনেকেই মা। সেই সন্তানেরা আমাদের খুবই প্রিয়। সমাজের ভাষায় তাঁদের অনেকেরই ‘বাপের ঠিক নেই’, কিন্তু এর মধ্যেও এই মাতৃত্ব ‘বংশ’ রক্ষার সংকীর্ণ দাবী, নির্মম দায়ের থেকে কিছুটা মুক্তি দেয়। এই মাতৃত্ব খানিকটা মেয়েদের নিজের। যদিও বৃহত্তর সমাজের নারীত্ব ও মাতৃত্বের ধারণা থেকে আমরা কখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারি না। পরিবার, সংসারের অসম্ভবতা আর বাসনা বহু যৌনকর্মী মেয়ের জীবনে চিরস্থায়ী যন্ত্রণার উৎস।”^{১৫}

গণিকা যখন কন্যা

গণিকাদের মাতৃরূপের আলোচনা পরে আমাদের আলোচনায় এসেছে কন্যারূপা গণিকার প্রসঙ্গ। আজকের কন্যা ভবিষ্যতের মাতা। যাঁরা স্বেচ্ছায় এই পেশায় এসেছেন তাঁদের আমরা এই আলোচনার বাইরে রেখেছি। বংশপরম্পরায় যাঁরা এই পেশায় আছেন তাঁদের কন্যাসত্তা নিয়েই এই আলোচনা। এমন কিছু চরিত্র আমরা পেয়েছি যাঁরা নিজের জন্মদাত্রী মাকেও এই পেশায় দেখেছেন, আবার নিজেও এই পেশায় রয়েছেন। আবার এমন কিছু চরিত্র পেয়েছি যাঁদের মায়েরা দেহব্যবসায় যুক্ত থাকলেও মেয়েরা সেই পেশার সংস্পর্শ থেকে অনেকখানি দূরে অবস্থান করেন। এই আলোচনায় আমরা কেবলমাত্র সেই সমস্ত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি যাঁদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বসন্তসেনা এমন একটি নারী, যাঁকে প্রায় সর্ব অর্থেই আদর্শ নারীর মান্যতা দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে শূদ্রক সব রকম সাধারণতা, ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে গিয়ে এই চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছিলেন। তাই গণিকাসুলভ চরিত্রের তুলনায় অনেক বেশি আদর্শ নারীত্বের লক্ষণ তাঁর মধ্যে নিবেশিত হয়েছে। তাঁর বাৎসল্যের কথাও আমরা জেনেছি। কিন্তু

এই প্রকরণে কন্যারূপেও বসন্তসেনাকে পাওয়া গেছে। তাঁর মায়ের প্রসঙ্গ আমরা উল্লেখ করেছি।

কন্যারূপে বসন্তসেনার ভূমিকা *মৃচ্ছকটিকে* বিস্তারিত পাওয়া যায়না। যেটুকু জানা যায় তাতে বসন্তসেনাকে একজন দায়িত্বসম্পন্ন সন্তান বলেই মনে হয়েছে। আমরা সচেতনভাবেই এখানে ‘সন্তান’ শব্দটি প্রয়োগ করেছি। গণিকার কন্যা, তাই বংশানুক্রমিকভাবে পেশাগ্রহণ করলেও তিনি নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি মায়ের কথা অমান্য করেছেন আর বলেছেন-

“যদি মাং জীবন্তীমিচ্ছসি তদেবং ন পুনরহং মাত্রাহস্তাপয়িতব্য।”^{১৬} (মৃচ্ছ./চতুর্থাক্ষ)

তাঁর মা যে তাঁরই আর্থিক সুযোগ-সুবিধার কথা ভেবে রাজশ্যালকের সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছেন তা তিনি জানতেন, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। এর থেকে স্পষ্ট যে বসন্তসেনা তাঁর গণিকালয়ের প্রধান ছিলেন। কন্যা বসন্তসেনার প্রেম সম্পর্কে তাঁর মাও অবগত ছিলেন এবং কন্যার প্রতি মায়ের স্নেহ, ভালোবাসার উল্লেখ আমরা দশম অঙ্কে পেয়েছি।

কুটনীমত গ্রন্থে রক্ত সম্পর্কিত মাতা ও আত্মজার উল্লেখ নেই। *শুকসপ্ততি* ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

বাংলা সাহিত্যের যে গল্পগুলি আমরা বেছে নিয়েছি তার মধ্যে ‘কুসুম’ অন্যতম। এই গল্পে আমরা দেখেছি কুসুম তাঁর মায়ের পরামর্শ না শুনে নিজের ব্যবসা বন্ধ রেখে দিনের পর দিন একজন অসুস্থ, অচেতন রোগগ্রস্ত বৃদ্ধের সেবা করেছেন। খদ্দেরের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ ছিল যাতে রোগীর বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটে। এমনকি কুসুমের এহেন আচরণে তাঁর মা আপত্তি করলে তিনি মাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন-

“ফের, যদি ক্যাচ্-ক্যাচ্ করবি মা, তাহলে এই ঘটি দিয়ে-।”^{১৭} (বা.গ./পৃ.৭৮)*

আবার ‘মাশুল’ গল্পে দেখতে পাই গল্পের বর্তমান পতিতা চরিত্র নীলার মা উপস্থিত রয়েছেন আর তাঁরই কোলে শায়িত রয়েছে নীলার শিশুকন্যা। জ্বরতপ্ত, অচেতন্য শিশুকন্যাটিকে নিয়ে নীলার মা তীব্র শীতের রাতে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করেছেন যাতে মেয়ের অর্থোপার্জনের পথ সুগম হয়। কন্যা হিসেবে নীলা কিন্তু তাঁর মায়ের কথার প্রতিবাদ অথবা বিরুদ্ধাচরণ কোনোটাই করেননি, কারণ তিনি জানেন দেহের বিনিময়েই তাঁকে তাঁর কন্যার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে

হবে। মা হিসেবে অসহায় বলেই তিনি মেয়ে হয়ে মায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করতে পারেননি।

‘নিষিদ্ধ পল্লী গৃহে গমন’ গল্পে ‘দী’ চরিত্রটি নিজের মায়ের প্রতি ক্ষুণ্ণ, সেটাই স্বাভাবিক। নিরুপায় হয়ে সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁর মা এই পেশায় এসেছিলেন বলে দী এর মনে দুঃখ থাকলেও কোনো ক্ষোভ ছিলোনা কারণ তিনি তাঁর মায়ের অসহায় অবস্থা বুঝেছিলেন। কিন্তু সেই মা যখন নিজের কিশোরী কন্যাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে পরিকল্পনামাফিক এই পেশায় এনেছিলেন সেই কষ্ট সেই যন্ত্রণা দী কোনোদিন ভুলতে পারেননি। নিজের মাকে তিনি ক্ষমা করতে পারেননি; পারার কথাও নয়। কিন্তু মায়ের প্রতি ক্ষীণ হলেও সহানুভূতি কাজ করেছিল তাঁর^{১৮}।

আসলে যে বিষয়টি ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে আমাদের সামনে উঠে আসছে সেটি হল মাতা অথবা কন্যা কিংবা একই চরিত্র একাধারে দুইরূপে থাকলেও পেশার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও মানবিক অভিব্যক্তি বহুলাংশে গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই আমরা এমন উদাহরণও পেয়েছি যেখানে এক নারী নিজেদের আত্মজাকে এই নারকীয় পেশায় নিয়ে এসেছেন।

মাতা ও কন্যারূপে আলোচনা থেকে বোঝা গেছে যে, দুটি ক্ষেত্রেই বেশ কিছু সাধারণ বিষয় রয়েছে এবং সেগুলি গণিকাবৃত্তির সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের জীবনের অঙ্গ হয়ে এসেছে। মাতা-কন্যা-মাতা -এই যে প্রবাহ এর মধ্যে নারীদেহটুকুই কখনো কখনো নগ্ন সত্য হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে থাকে আর তাই এই পেশারও কোনো শেষ দেখা যায়না।

ভিন্ন দুই রূপে গণিকা: প্রেমিকা এবং/ অথবা জায়া

প্রাচীনযুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত গণিকাদের জীবনবৃত্তে এমন উদাহরণ খুব কম পাওয়া যায় যেখানে দেখা যায় যে, পেশাগত পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে কোনো পুরুষ একজন গণিকাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিচ্ছেন। একজন দেহপসারিনিকে সসম্মানে অর্ধাঙ্গিনীর পরিচয় দিয়েছেন এমন উদাহরণ কিন্তু দুই ভাষার সাহিত্যেই তুলনামূলকভাবে বেশ কম। যদিও কামসূত্রে গণিকাবিবাহের উল্লেখ রয়েছে।

সন্তানলাভ, বংশরক্ষা, পরিবার-প্রতিপালন, পিতামাতার সেবা ইত্যাদি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু কারণ ছাড়াও সঙ্গলাভের কারণেও অনেকে বিবাহ করেন, মনোমত সঙ্গী নির্বাচন করেন। কখনো স্বয়ং-নির্বাচিত অথবা কখনো অভিভাবক নির্বাচিত হয়ে থাকেন সেই সঙ্গী। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক পুরুষই অন্য এক বা একাধিক নারীতে আসক্ত হন। অনেকেই গণিকাসঙ্গও করে থাকেন। আর এই গণিকাসঙ্গের কারণ কেবলমাত্র যৌনতা নয়। কী কী কারণে পুরুষ গণিকাসঙ্গ করে থাকেন তা আমরা আগে আলোচনা করেছি। দৈহিক-মানসিক সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ পুরুষই তাঁদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে আগ্রহী থাকেন না। তাঁদের বৈবাহিক স্বীকৃতি দিতে সম্মত হননা। এমনকি ক্রেতা-বিক্রেতার ভূমিকার ঊর্ধ্বে প্রেমসম্পর্ক থাকলেও সেই সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠা পায়না। এমনও উদাহরণ রয়েছে যেখানে পুরুষটির সঙ্গে গণিকার গভীর সম্পর্ক, কিন্তু কেবলমাত্র বিবাহিত স্ত্রী না হওয়ার কারণে সমাজে সেই মেয়েটির পরিচয় ‘রক্ষিতা’ হয়েই রয়ে যায় আর পুরুষটি রয়ে যায় ‘বাঁধা বাবু’ হয়ে। ‘রক্ষিতা’ রাখা ছিল বাবুদের ফ্যাশান^{১৯}। আবার কখনো এমন উদাহরণও দেখা যায় যে, প্রেমিক পুরুষটিকে ভালবেসে তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করলেও গণিকা থেকে পত্নীত্বে উন্নীত হওয়া হয়না সেই মেয়েটির। স্বীকৃতি পায়না তার সন্তান অথবা স্বীকৃতি পেলেও তা একেবারেই চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে যায়; সমাজমান্য হয়না। এমন অনেক উদাহরণ দেখা যায় আগত পুরুষ এবং সেই গণিকার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক, তার ফলশ্রুতিতে গর্ভে আগত সন্তান, কিন্তু পুরুষটি বিবাহে অনিচ্ছুক। এখন এমতাবস্থায় স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, সত্যি কি পুরুষ ও নারীটির মধ্যে ‘প্রকৃত প্রেম’- এর সম্পর্ক ছিল? কারণ প্রকৃত ভালোবাসা দায়িত্ববোধ তৈরি করে। সমাজ-সংসারের বিধিনিষেধ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে আপনসত্ত্বা প্রেমিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে নেওয়া কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নয়; প্রেমই তার একমাত্র কারণ হিসেবে যথেষ্ট। কিন্তু সেরকম উদাহরণ প্রায় নেই বললেই চলে।

আবার অন্যদিকে এমন উদাহরণও দুটি ভাষার সাহিত্যে পাওয়া যায় যেখানে আমরা দেখি, গৃহস্থের কুলবধূ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ যৌনসঙ্গ করছেন (কাহিনিসংখ্যা-পঞ্চদশ, ষোড়শ ইত্যাদি)^{২০}। কখনো তা নিছক শারীরিক প্রবৃত্তির কারণে আবার কখনো কোনো বিশেষ বহুমূল্য উপহারের বিনিময়ে – আর কোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু তাঁরা সমাজ বা সংসারের নিয়মনীতিকে গুরুত্ব দেননি।

উপরের আলোচনাটি নিতান্তই সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে। এই আলোচনা করার অন্যতম উদ্দেশ্য হল একটি পরিষ্কার চিত্রের উপস্থাপনা করা, যার সাহায্যে একথা খুব সহজেই বোঝা যায় যে, গণিকা যেমন গৃহিণী হতে পারেন ঠিক তেমনি গৃহিণীও গণিকা হতে পারেন। আর সবটাই নির্ভর করে পরিস্থিতি ও মানবচরিত্রের উপরে। যদিও এই দুটি ধারার উদাহরণই আমরা আমাদের নির্বাচিত সাহিত্যে পেয়েছি। এবার আমরা সেই উদাহরণগুলির সাহায্যে ক্রমশঃ সাধারণ থেকে একটি বিশেষ আলোচনার দিকে এগিয়ে যাবো। Simone De Beauvoir. *The Second Sex* গ্রন্থে বিবাহিত স্ত্রী ও গণিকার অবস্থানের তুলনা করেছেন এবং তিনি পেশার নিরিখেই সেটা করেছিলেন^{২১}।

এই পর্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল পত্নীরূপিণী গণিকা। গণিকাবৃত্তি সমাজনিন্দনীয় পেশা এবং গণিকাদের অবস্থানও তথৈবচ। আবার অন্যদিকে যখনই আমরা পত্নী শব্দটির প্রয়োগ করছি তখন যেন তার সঙ্গে সামাজিক সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় জুড়ে যায় অর্থাৎ সমাজনিন্দিত একটি পেশা অবলম্বনকারিণীদের কোনো পুরুষ যদি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন তাহলে সেই সামগ্রিক, সামাজিক লাঞ্ছনা থেকে মেয়েটি মুক্তি পায়। একটি মেয়ে দেহবৃত্তির সাথে সরাসরি যুক্ত জানার পরেও একজন পুরুষ সেই মেয়েটিকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হতে পারে। সেই পুরুষটির এহেন ইচ্ছা বা আগ্রহের কিছু কারণ থাকা সম্ভব।

প্রথমতঃ নিতান্তই আবেগের বশবর্তিতা,

দ্বিতীয়তঃ প্রেমজ-আকর্ষণ,

তৃতীয়তঃ একটি মেয়েকে তার অসহায়তা থেকে মুক্তি দেওয়ার সদিচ্ছা,

চতুর্থতঃ নিজেকে সমাজে মহান ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি।

উপরের কারণগুলির মধ্যে কোনো একটি অথবা সবগুলি একসঙ্গে কোনো একজন পুরুষের এহেন সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ হতে পারে।

এবারে আমাদের নির্বাচিত সাহিত্যগ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত পত্নীরূপিণী গণিকাচরিত্রগুলির আলোচনা করা যাক।

সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল গণিকা চরিত্র হলেন *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণের বসন্তসেনা। তাঁর বিস্তারিত চারিত্রিক বর্ণনা ব্যতিরেকে এই পর্যায়ে আমরা শুধু আলোচনা করবো তাঁর বধূরূপটি

নিয়ে। বসন্তসেনা নগরনটী; উজ্জয়িনী জুড়ে তাঁর সুনাম কিন্তু কাহিনী-বিন্যাসে আমরা প্রথম থেকে শেষ অবধি অন্য এমন কোনো পুরুষের অস্তিত্ব বা উল্লেখ দেখতে পাইনা যার সাথে তাঁর কোনোরকম শারীরিক বা মানসিক সংস্রব রয়েছে। তিনি প্রথম থেকেই চারুদত্তের গুণমুগ্ধা, তাঁর প্রেমে বিভোর। নিজের প্রেমের প্রতি এতোটাই একনিষ্ঠ তিনি যে রাজশ্যালক শকারের লালসাপূর্ণ আহ্বান অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর এই প্রত্যাখ্যানে তাঁকে সাহস দিয়েছে চারুদত্তের প্রতি তাঁর প্রেম। চারুদত্তও বসন্তসেনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। চারুদত্তের নিজের গৃহে তাঁরা মিলিতও হয়েছেন কিন্তু নিজের মুখে চারুদত্ত প্রেমিকাকে পত্নীত্বে বরণ করে নেওয়ার কথা উচ্চারণ করেননি। স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে তবে কি বসন্তসেনা গণিকা বলেই চারুদত্তের মনে দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে? প্রেম সম্ভব কিন্তু বিবাহ নয়। একথার পক্ষে যুক্তি দেওয়া যায়, বসন্তসেনার অলংকারসমূহ গচ্ছিত রাখার প্রসঙ্গে চারুদত্ত মিত্র মৈত্রেয়কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সেগুলিকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করানোর প্রয়োজন নেই-

“অলং চতুঃশালমিমং প্রবেশ্য প্রকাশনারীধৃত এষ যস্মাৎ।”^{২২} (মৃচ্ছ.৩/৭)

কেন এই সিদ্ধান্ত? উত্তর সেই এক। বসন্তসেনা গণিকা তাই তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হলে পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। শুধু যদি আমরা এই প্রকরণে উল্লিখিত ঘটনাবলীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকি তাহলে বলা যেতে পারে বসন্তসেনা বংশানুক্রমে এই পেশায় এসেছেন কিন্তু তাঁর অন্য পুরুষসঙ্গের নামমাত্র উল্লেখ নেই তবে কি চারুদত্ত বসন্তসেনার পেশা ও বংশ উভয় কারণেই দ্বিধাবোধ করেছেন? অথচ এই চারুদত্তই বসন্তসেনাকে হত্যার মিথ্যা অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নিজের ধর্মপত্নী, শিশুপুত্রের সাথে নিজের প্রেমিকা বসন্তসেনাকে স্মরণ করেছেন। তিনি প্রেমে যতখানি আত্মত্যাগ করেছিলেন বিবাহের প্রসঙ্গে ততখানি নয়। বসন্তসেনাকে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে নির্বাচিত রাজা আর্যকের সিদ্ধান্ত ও অনুমত্যানুসারে প্রথম ‘বধূ’ সম্বোধনে সম্বোধিত করেছিলেন শর্বিলক -

“আর্যে বসন্তসেনে পরিতুষ্টো রাজা ভবতীং বধূশব্দেনানুগৃহ্ণতি।”^{২৩}

প্রসঙ্গতঃ M. R. Kale মহোদয় দশমাস্কের টীকা (Notes) অংশে ‘অবগুষ্ঠ্য’ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন- “As was necessary for a woman of family.”^{২৪}

অর্থাৎ ‘অবগুণ্ঠন’ পরিবারে স্ত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয়, অত্যাবশ্যক বিষয়। বলা যায়, এ যেন সমাজের চিহ্নস্বরূপ। যার সাহায্যে একজন প্রকাশ্য নারী আর একজন গৃহবধূর পার্থক্য করা যায়।

শূদ্রকের *মুচ্ছকটিকে* গণিকার বিবাহের উল্লেখ তাও রাজাদেশে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত বলে মনে করা যেতে পারে কিন্তু এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে বসন্তসেনার দাসী মদনিকার কথা। বসন্তসেনা মদনিকা ও শর্বিলকের প্রেমের কথা কথা জেনে সানন্দে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর তাঁরই কথার সূত্র ধরে শর্বিলক বলেছিলেন-

“সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তামেষ শিরসা বন্দ্যতাং জনঃ।

যত্র তে দুর্লভঃ প্রাপ্তং বধূশব্দাবগুণ্ঠনম্।।”^{২৫} (মুচ্ছ.৪/২৪)

সুতরাং সেই সময়ে সমাজে গণিকাবিবাহ খুব বিরল বা ব্যতিক্রম অথবা সমাজ বহির্ভূত ঘটনা ছিলনা। তবে দুটি ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে এরকম সিদ্ধান্তে আসা হয়তো ভুল হবেনা যে, দাসীস্থানীয়া গণিকার মুক্তি যেমন নির্ভর করে তাঁর স্বামিনীর উপরে ঠিক তেমনি প্রখ্যাত নগরনটী নিজের বৃত্তি থেকে মুক্তি লাভ করে প্রেমিক পুরুষটির সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবেন কিনা তা নির্ভর করে সেই রাজ্যের শাসক রাজার সিদ্ধান্তের উপরে। তাই প্রেমিকপুরুষটি বিবাহ প্রস্তাব দিলেও তা গ্রহণ করার স্বাধীনতা গণিকাদের কতোখানি ছিল বা আদৌ ছিল কিনা যে প্রশ্ন রয়েছেই যায়।

কিন্তু অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থগুলিতে বসন্তসেনা বা মদনিকার মতো গণিকার কুলবধূ হওয়ার কোনো উদাহরণ লক্ষিত হয়নি। *কুটনীমত*, *চতুর্ভাগী* কিংবা *গুরুসগুতি* ইত্যাদি গ্রন্থে গণিকার বিবাহের উল্লেখ নেই। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক হলেও যে এই রীতি প্রচলিত ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় কলহনের *রাজতরঙ্গিনী*তে^{২৬}।

পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে গণিকাদের বিবাহের প্রসঙ্গ বহুভাবে বহুবার এসেছে এবং তা এসেছে সময়ের দাবি মেনেই। সময় যত এগিয়েছে গণিকাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমশঃ পরিবর্তন হয়েছে। তাঁদের প্রতি ঘৃণার ভাব যেমন বজায় ছিল তার পাশাপাশি তাঁদের জীবন, জীবনসংগ্রামকে সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে নতুন করে দেখা শুরু হয়েছিল। এই বদলের অন্যতম একটি কারণ হল বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনা। আসলে মানুষের মধ্যে যে শুভবুদ্ধি বর্তমান থাকে তা যখন কোনও কারণে ঢাকা পড়ে যায় তখন তার অন্তরের শক্তি দুর্বল, ক্ষীণ

হয়ে পড়ে। আর এই বদ্ধঅবস্থা থেকে চিন্তাধারাকে মুক্ত করার জন্য বাইরে থেকে প্রবলতর শক্তির প্রয়োজন হয়। অনেকক্ষেত্রেই শিক্ষা সেই ভূমিকা পালন করে থাকে। গণিকাদের বিষয়েও মনুষ্যসমাজ আংশিক হলেও সহানুভূতিশীল ছিল, যতই তাঁদের ঘৃণ্য, সমাজবহির্ভূত বলে মনে করা হোক না কেন। তাঁদের বিয়ের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যে এ নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা করলে বাংলা সাহিত্যের এই সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ তথা কাহিনীর উল্লেখ করতে হয়, কিন্তু আমাদের আলোচনার পরিসর পূর্ব নির্ধারিত হওয়ার কারণে আমরা কেবলমাত্র আমাদের নির্বাচিত গ্রন্থাদি নিয়েই আলোচনা করবো এবং সেক্ষেত্রেও যে কাহিনিগুলিতে গণিকা-বিবাহের ঘটনা বা সেই সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে সেইগুলিই আলোচনা করেছি। তার মধ্যে কিছু কাহিনি এমন রয়েছে যেখানে বিবাহ সংঘটিত হয়েছে আবার কয়েকটি এমন কাহিনি রয়েছে যেখানে সরাসরি বিবাহ না হলেও প্রত্যক্ষভাবে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

নিশিপদ্ম

আমাদের নির্বাচিত বাংলা আখ্যানগুলির মধ্যে গণিকাবিবাহের প্রসঙ্গটি সরাসরি এসেছে *নিশিপদ্ম* উপন্যাসে। কাঞ্চনমালা প্রথম জীবনে মঞ্চাভিনয় করতেন। সেই অভিনয়কুশলতা ও নৃত্যগীতাদির পারঙ্গমতা দেখে লালপাহাড়ীর কুমার তাঁকে নিজের রক্ষিতা করে রাখেন। অর্থ, বিলাস-ব্যসনের অভাব না থাকলেও কাঞ্চনের জীবনে প্রেম ছিল না। এই ধরনের রক্ষিতাদের জীবনে প্রেম অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। যাঁদের জীবনে প্রেম আসে তাঁদের জীবনে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ঠিক এরকমই এক অনুভূতি জন্মায় কাঞ্চনের মনে যখন তিনি কুমারের উকিল বোসবাবুর সাথে পরিচিত হন। বোসবাবুও তাঁর প্রতি, তাঁর গানের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন। কাঞ্চনের এই মানসিক পরিবর্তনের কথা জানামাত্র তার পালক প্রভু এবং নিজের গর্ভধারিণী মাতা উভয়ের কাছ থেকে শারীরিক মানসিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত কিছু জানার পরেও বোসবাবু কাঞ্চনকে বিবাহ করেননি যদিও তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের ফলে এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় কাঞ্চনের কন্যা মুক্তার সাথে। কৈশোরে নিজের পিতৃসত্য জানার পরে যৌবনে তার জীবনে যে পুরুষটির সঙ্গে সম্পর্ক হয়, সন্তান হলেও পুরুষটি তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। দুটি ক্ষেত্রেই যে সন্তানের জন্ম হয়েছে সমাজের চোখে তাঁরা অবৈধ।

এবার বিবাহের আলোচনায় আসা যাক। কাঞ্চনকে বোসবাবু বিবাহ করেননি, বিবাহের প্রস্তাব দেননি। তিনি তাঁকে বুঝিয়েছেন কৃষ্ণপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি প্রেমের একটি পন্থা তাই কাঞ্চনের পক্ষিল জীবনের মুক্তিলাভ হবে সেই পথেই। আর কাঞ্চনমালাও সরল বিশ্বাসে নিজের সারাটা জীবন এই ভেবে কাটিয়েছেন যে, তাঁরা বৈষ্ণবীয় প্রথায় ‘মালা-চন্দন’ মতে বিবাহ করেছিলেন। তার সামনে বাস্তব নিয়ে আসে তাঁর কন্যা মুক্তা, যখন সে বারংবার প্রশ্ন করে নিজের মাকে যে তার পিতা কেন তার মাকে সমাজস্বীকৃত পথে বিবাহ করেননি? নিতান্ত অসুবিধা থাকলেও কেন নিজের উকিল হওয়া সত্ত্বেও আইনী-বিবাহ করে সামাজিক সম্মান, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেননি। কাঞ্চনের বিশ্বাসের ভিত টলে গেলেও তিনি কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকেই নিজের স্বামী হিসেবে মেনেছেন।

এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে কাঞ্চনমালা গণিকা, একজনের রক্ষিতা বলেই কি বোসবাবু তাঁকে সামাজিক বা আইনী কোনোরকম বিবাহই করেননি? অথচ তাঁর দেহসংসর্গে কোনো আপত্তি বা অসুবিধা হয়নি। তিনি কাঞ্চন ও তাঁর কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মান তাঁকে দেননি। এই উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র কাঞ্চনের বোন চম্পকমালা। তাঁর জীবন ও জীবিকার বিশেষ ব্যতিক্রম প্রথম পর্যায়ে ছিলোনা। কিন্তু চম্পার জীবনের সবথেকে বড় পরিবর্তনটি হল তাঁর বিবাহ। প্রথম জীবনে মঞ্চে অভিনয় করার সময়ে তাঁর পরিচিত সহ অভিনেতা তাঁর ‘রক্ষিতা’ পরিচয়টি জানার পরেও বিয়ে করেন সামাজিক ভাবে। সসম্মানে তাঁরা একত্র বসবাস শুরু করেন, বিবাহিত স্বামীস্ত্রীর পরিচয়ে ও তাঁদের সম্ভানেরা কাঞ্চনের কন্যার মতো অবৈধ হওয়ার জ্বালায়, অপমানে মানসিকভাবে জর্জরিত হয়নি কোনদিন। মঞ্চে বারবনিতা-অভিনেত্রীদের বিয়ের ঘটনা খোদ কলকাতাতেই হয়েছিল, উল্লেখ করেছেন সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *অশ্রুত কণ্ঠস্বর ঔপনিবেশিক বাঙলার বারবনিতা সংস্কৃতি গ্রন্থে*^৭। শুধুমাত্র যথাযথ পিতৃপরিচয় না থাকায়, বিয়ের সত্যতা না থাকায় মুক্তামালার কৈশোর আক্রমণে, লাঞ্ছনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছিল যার তিক্ত স্মৃতি সে সারা জীবন বয়ে বেড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, এই স্মৃতি তার পরবর্তী জীবনকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ করেছে। নিজের পিতৃপরিচয়, জন্মপরিচয় সমাজ স্বীকৃত না হওয়ায় একজনের জীবন কতোখানি আমূল বদলে যেতে পারে তার উদাহরণ এই উপন্যাসটি।

কবি

কবি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র যাঁরা, সমাজ তাঁদের অন্ত্যজ বলে চিহ্নিত করেছে। তাঁরা ঠিক তথাকথিত ভদ্র-সভ্য-শিক্ষিত সমাজের বাসিন্দা হিসেবে পরিগণিত হন না। উপন্যাসের নায়ক নিতাই জাতিতে ডোম। পিতৃপুরুষের পেশা ছেড়ে নিতাই তার স্বভাববশে হয়ে কবিয়াল হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে তার পরিচিতি হল ‘নিতাই কবিয়াল’। তার কবিমনের প্রেমানুভূতি যে মেয়েটিকে ঘিরে মান্যতা পেল, নাম তার ‘বসন’। একটি বুমুরের দলের প্রধান গায়িকা সে। ভ্রাম্যমাণ বুমুরের দল, সমাজের সামনে যাঁদের পেশা বুমুরগান আর লোকচক্ষুর আড়ালে যাঁদের পেশা দেহবৃত্তি যেটা সর্বজনবিদিত।

নিতাই এবং বসন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর, ভিন্ন মানসিকতার মানুষ তবু তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক হয়। নিতাই বসনের প্রকৃত পেশা জেনে তাঁকে বিয়ে করে, একত্র বাস করে বিবাহিত দম্পতির মতো। এমনকি বসনের কাছে গ্রাহক এলে নিতাই ঘর ছেড়ে দূরে নিজের বইখাতার দপ্তর নিয়ে থাকত। নিবিড়, নিবিষ্ট পাঠে মগ্ন নিতাই। তাকে যেন কোনো জাগতিক তুচ্ছ বিষয় স্পর্শ করতে পারেনা। তাই যাকে সে বিয়ে করেছে তার অন্য পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্কে কোনোরকম আপত্তি তাকে করতে দেখিনা। আবার ব্যাধিগ্রস্ত বসনকে নিরন্তর সেবা করে নিতাই। মৃত্যুর পরে তার অন্তিম সংস্কারও সম্পন্ন করে সে। কাহিনী থেকে জানতে পারি, এই ধরণের পেশা অবলম্বনকারিণীদের মৃত্যুর পরের সংস্কার কাজটুকুও কপালে থাকেনা। নিতাই সব অর্থেই যেন নিজের স্বামী হওয়ার কর্তব্য পালন করেছে।

কবি উপন্যাসে একজন পথবেশ্যা বা ভ্রাম্যমাণ বেশ্যার বিবাহের কথা বর্ণনা করা আছে। তাঁদের সমাজে কোনো মেয়ের বিবাহিত নারীর সম্মান পাওয়া দুষ্কর। যে কারণে নিতাই বসনকে বিবাহ করলে বসনের দলের বান্ধবীরা তাকে, তার অদৃষ্টকে ঈর্ষা করে। নিতাই বসনকে বিয়ে করেছিল ভালোবেসে। আপাত মুখরা, চটুল, অশ্লীল নৃত্যগীত প্রদর্শনকারিণী মেয়েটি যে আদতে ভালোবাসা, স্নেহ-মমতার কাণ্ডাল সে কথা নিতাই তার অনুভূতিপ্রবণ মন দিয়ে বুঝেছিল। সমাজ যাঁদের নীচু চোখে দেখে তাঁদের জীবনযাত্রা, দৈনন্দিন সংগ্রামের প্রতিও তথাকথিত শিক্ষিত, উঁচুতলার বাসিন্দাদের উল্লাসিক মনোভাব লক্ষ করা যায়। কিন্তু সহজ সরল দুটি প্রাণ যাঁদের নিয়তই সংগ্রাম করে জীবন চালাতে হয় তাঁদের জীবনে ভালোবাসা দুর্লভ, সেই ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরা বৈবাহিক সম্পর্কে গেছেন। বিষয়টিকে আমরা এইভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি নিতাইয়ের কাছে বসনের জীবিকা প্রধান ছিল না। বসনের পেশার উর্ধ্বে উঠে, তার দেহকে নয়, মনকে ভালোবেসেছিল নিতাই আর সেই কারণেই বসনকে বিয়ে করে

স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পেরেছিল সে। কোনো ছুঁমার্গ ছিল না তার ভালোবাসায়। এখানে নিতাই চরিত্রের একটু গভীরে প্রবেশ করলে মনে হয়, সে প্রথম জীবনে যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিল এবং যাকে নিজের করে পাওয়া সামাজিক কারণেই তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, সেই ঠাকুরঝি কোথাও যেন তাকে এক বিমূর্ত প্রেমের ব্রতে দীক্ষিত করেছে, তাকে উন্নীত করেছে এক উচ্চতর মানবিক ও মানসিক মার্গে যার ফলে বসনের প্রতি তার প্রেম হয়ে উঠেছে নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ এক অনুভূতি।

আমাদের নির্বাচিত গল্প-সংকলন *বারবনিতাদের গল্প*-তে যে গল্পগুলি রয়েছে তাতে তাঁদের পেশার বিবিধতার বর্ণনা রয়েছে, রয়েছে তাঁদের জীবনযাপনের নানা ওঠাপড়ার গল্প। এমন কয়েকটি গল্প আমরা এই সংকলনটিতে পেয়েছি যেখানে গণিকা-বিবাহের প্রসঙ্গ আছে। আমরা এবার সেইসমস্ত কাহিনী অনুসারে আলোচনা করবো।

প্রেমাক্ষুর আতর্ষীর ‘আদরিণী’ গল্পের মূল চরিত্র আদরিণী যুক্ত ছিল দেহব্যবসার সঙ্গে। তাঁকে ভালোবেসে বিয়ে করে হাড়ী সম্প্রদায়ের হেমা নামের একটি ছেলে। লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী-

“হেমা হচ্ছে হাড়ীদের মধ্যে বড়লোকের ছেলে। তাদের বাড়ির কেউ মেথর মেথরানীর কাজ করে না। হেমা শানাই বাজায় আর অন্য সময় বাঁশের কাজ করে।”^{২৮}(বা.গ./পৃ. ৫৮)

বিয়ের পরে তাঁরা দুজনেই নতুন সংসারের স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্ন দেখার কারণ পেশাগত পরিবর্তন। আসলে সংপথে পাওয়া আর্থিক-স্বাবলম্বন সহজেই মানুষকে নিজের ফেলে আসা জীবনকে ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। আদরিণী কোনোদিনই এই পেশাটিকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেননি, অধিকাংশ মেয়েই করেনা। কিন্তু যখন তাঁর জীবনে তিনি প্রকৃত ভালোবাসার সন্ধান পেলেন তখনই এই ঘৃণ্য, অসুখী জীবন ছেড়ে বেছে নিলেন স্বাভাবিক, অন্য এক কায়িক পরিশ্রমের জীবন। সেখানে তিনি সুখী। নিত্য লাঞ্ছনার ন্যূনতম অবকাশ নেই আর তাঁর জীবনে। নিজের পুরোনো জীবনের তিক্ত স্মৃতি ফেলে তিনি নতুন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

পরবর্তী গল্পটি ‘নিষিদ্ধ পল্লী গৃহে গমন’, লেখক সমরেশ বসু। কাহিনীর বর্ণনা থেকে এটিকে লেখকের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়েছে। কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলের এক দেহোপজীবিনীর নিজের জীবনকাহিনী ও লেখকের সাথে পূর্বপরিচয়ের সূত্রে স্মৃতিরোমন্থন এই

গল্পের মূল উপজীব্য। গল্পের একবারে শেষে লেখক পাঠককে নিতান্ত তথ্য দেওয়ার মতো করেই জানিয়েছেন –

“পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার তিন বছরের মধ্যেই, দী এক ভদ্রলোককে বিয়ে করেন। দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত অঞ্চলে একটি বাড়ি কিনেছেন। সেখানেই থাকেন।”^{২৯}(বা.গ./পৃ.২৩৬)

আসলে লেখক ও তাঁর পরিবারের প্রতি মেয়েটির এক অদ্ভুত ভালবাসা ছিল, ছিল তাঁর সম্ভানদের প্রতি স্নেহ। তিনি তাঁদের সাথে একাত্মবোধ করতেন আর সেই কারণেই নিজের জীবনের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা যেমন তিনি লেখককে জানিয়েছেন, সেরকমই নিজের আনন্দের খবরটিও তাঁকে নিজের স্বামী মারফৎ দিতে ভোলেননি। একজন পতিতা, যিনি নিষিদ্ধ পল্লীতে বাস করতেন তিনিও বিবাহযোগ্য। একজন ভদ্র, শিক্ষিত জীবনসঙ্গীর সাহচর্যে নিজের ছিন্নভিন্ন জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

এই সংকলনের অন্তিম গল্প যে গল্পে বেশ্যাদের বিয়ের প্রসঙ্গ রয়েছে সেটি হল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রচিত ‘পটের বিবি’ গল্পটি। এই গল্পে পটুয়াদের কথা রয়েছে। আসলে তাঁরা কোন্ডিয়াটোলার খানাবদোশ যাযাবর সম্প্রদায়^{৩০}। তাঁদের দলের পুরুষেরা পাখি শিকার করে, নানা ধরনের পাহাড়ি গাছের শিকড়-বাকড়, ভেষজ জড়িবিটি, পাখির নখ, মৃত পাখির অঙ্গের অংশবিশেষ ইত্যাদি বিক্রয় করে আর তাঁদের স্ত্রীরা বিভিন্ন দেবদেবীর পট দেখিয়ে, আনুষঙ্গিক গল্পকথা বলে জীবন নির্বাহ করেন। কিন্তু তাঁদের আয়ের প্রধান উৎস হল দেহবৃত্তি। পট দেখানোর আড়ালে তাঁরা নিত্য তাঁদের শিকার খুঁজে চলেন অর্থাৎ পুরুষপ্রত্যাশী তাঁরা। এমন পুরুষ যারা অর্থের বিনিময়ে তাঁদের দেহ ভোগ করতে ইচ্ছুক। মূলতঃ এইভাবেই তারা অর্থ উপার্জন করে থাকেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের সম্প্রদায়ে কুমারী, বিবাহিতা সব নারীকেই দেহব্যবসায় আসতে হয় অলিখিত নিয়মের মতো।

এই অংশের আলোচনার জন্য কেন আমরা এই কাহিনিটির উল্লেখ করলাম? কারণ এতক্ষণ যে যে কাহিনীর কথা বলেছি সেখানে দেহব্যবসার সাথে যুক্ত একটি মেয়েকে বিয়ে করার কথা রয়েছে। এই কাহিনীটি একটু ব্যতিক্রমী। এখানে এমন একটি জনজাতির কথা, তাঁদের নিয়মের কথা বলেছেন লেখক যেখানে একটি মেয়ে নিজের সঙ্গী পুরুষটির সঙ্গে বছরের ছয়মাস প্রায় বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করে এবং মেয়েটি ও সেই পুরুষটি একে অন্যের

যৌনসঙ্গী হয়ে থাকে। সেই সময় তারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। কিন্তু যে ছয়মাস তারা যাযাবর ধর্ম পালন করে সেই ছয়মাস মেয়েটি নির্দিষ্ট কারো শয়্যাসঙ্গিনী থাকেনা। নিত্য নতুন পুরুষ ‘খদ্দের’ না আনতে পারলে দলে মেয়েটির ‘দাম’ থাকেনা। শুধু বাইরের পুরুষ নয়, দলপতিও যেকোনোদিন যে কোনো মেয়েকে নিজের সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিতে পারে; সে স্বাধীনতা তার রয়েছে এবং এই বিষয়ে মেয়েটির পুরুষসঙ্গীর সম্মতি থাকে যেহেতু এটাই তাদের দলের নিয়ম। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল গল্পের নায়িকা ভামরী তার সঙ্গী গণশীর কাছে রীতিমত ভৎসিত হয় এই বলে –

“যে কোণ্ডিয়াইন এ কথা বলে সে কোনো ভালোমানুষের বিবি নয়, সে রাণ্ডি। যে মেয়ে খালি নিজের ঘর চেনে বড় চেনে সে নাগিন। নাগিন শুধু নিজের জোড়াটাকে চেনে, নিজের গর্ত চেনে, এমন নাগিন নিয়ে কোনো ভালোমানুষ ঘর করতে পারে না।”^{৩১} (বা.গ/পূ. ২৭৩)

যাযাবর সম্প্রদায়ে ‘নিজস্ব’ বলে কিছু হয়না। একজন যাযাবরী নিজের জীবনের সব সত্যি মেনে নেওয়ার পরেও যদি একান্ত নিজস্ব কিছুর স্বপ্ন দেখে - তা নিজের স্বামী, নিজের ছোট ঘর-গৃহস্থালীর মতো যত সামান্য কিছুই হোক না কেন - সে স্বাধীনতাও তাকে তার সমাজ দেয়না। বিবাহের যে একত্র-বন্ধন তাকে যতই একটি নারীমন নিজের জীবনের চরমতম সুখস্বপ্ন বলে ভাবুক না কেন, যাযাবরের সমাজ এমনকি তার একান্ত নিজস্ব পুরুষটিও নিমেষে তার সেই স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। বুঝিয়ে দেয় আসলে সেই মেয়েটি ‘সাধারণী’ যার নিজের শরীর বা মনের মালিক সে নিজেই নয়।

পতিতা যাঁরা, তাঁদের বিয়ে করে স্ত্রীর সম্মান দিয়ে সংসার করার কথা চিন্তা করতে হয়তো অনেক পুরুষই শেষপর্যন্ত পেরে ওঠেন না। পরিবার-পরিজন, সমাজ ইত্যাদির চাপ যেমন থাকে তেমনই থাকে শারীরিক সংসর্গের বিষয়টি। অস্বীকার করতে অসুবিধা নেই মেয়েদের এখনও বিচার করা হয় শারীরিক পবিত্রতা দিয়ে অর্থাৎ যদি মেয়েটি কুমারী হয় তবেই বিবাহের জন্য সে উপযুক্ত। এই চিন্তাধারা এখনও সমাজের সর্বস্তরে প্রবলভাবে বর্তমান। সুতরাং একটি সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি যদি এরকম হয় তবে সেই সমাজে নারীদের সাধারণভাবেই যথেষ্ট নীচু নজরে দেখা হয়। যে সমাজে মেয়েমাত্রেরই ‘পণ্য’ সেই সমাজে যদি কোনো মেয়ে দেহবৃত্তির সাথে যুক্ত থাকে তাহলে তার পেশাই যেন তার একমাত্র পরিচয় হয়ে যায়। যে মেয়েটি বহুভোগ্যা সেই মেয়েটিকে কূলবধূ করার জন্য যথেষ্ট মানসিক দার্ঢ্যের প্রয়োজন। শুধু তাইই নয় সেইসঙ্গে প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষা, উদার মানসিকতারও।

যেমন আমরা দেখেছি *উত্তরফাল্গুনী* উপন্যাসে মনীশ নামক চরিত্রটিকে। তিনি তাঁর শেষপর্যন্ত তাঁর প্রেমিকা দেবযানীর সঙ্গে থেকেছেন, সমস্ত রকম বিপদে তাঁকে সাহায্য করেছেন যথাসাধ্য। দেবযানীকন্যা সুপর্ণাকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, উঁচুমহলের ব্যক্তিত্বদের সাথে তাঁর আলাপ করিয়ে দেওয়ার সব আয়োজন করেছিলেন তিনি। এই সমস্তই তিনি করেছিলেন দেবযানীর প্রতি প্রেমে ও ভালোবাসায়। তাই প্রায় প্রৌঢ়ত্বে এসেও তিনি বিবাহ প্রস্তাব দিয়েছিলেন দেবযানীকে; সেই সময় তো শারীরিক আকর্ষণ প্রাধান্য পায়না। তাহলে? এর একমাত্র উত্তর ভালোবাসা। নিঃশর্ত, নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় তিনি বিয়ে করে দেবযানীকে সুখী করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন তাঁর যাবতীয় জীবনসংগ্রামের দৈন্য-ক্লান্তি মুছে দিতে। কিন্তু দেবযানী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন কারণ তিনি নিজেকে অশুচি ভেবেছেন আর সেই কারণেই মনীশকে ভালোবাসলেও সাড়া দিতে পারেননি।

আবার মহাশ্বেতা দেবীর *দৌলতী* উপন্যাসে দেখতে পাই এই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে গ্রামের অন্ত্যজ, কামিয়া সম্প্রদায়ের মেয়েদের (নাবালিকাদের) শহরে নিয়ে এসে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এই উপন্যাসে বিয়ে, নারীপাচার ও রেপ্তী পেশার এক শৃঙ্খল ঝুঁকেছেন লেখিকা। বিয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে, দারিদ্র্য দূরীকরণের কাল্পনিক ছবি দেখিয়ে দিনের পর দিন ধরে সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দারা কামিয়া মেয়েদের ‘কামিয়া রেপ্তী’ বানিয়ে রেখেছে। বিয়ে একটা মুখোশের আড়াল মাত্র।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘একজিবিশন’ গল্পে উঠে এসেছে দেশভাগের কারণে ছিন্নমূল একটি মেয়ের কথা। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে মেয়েটি বলে তাঁর নাম চাঁপা। চম্পা থেকে চাঁপা। লেখক ব্যাখ্যা দিয়েছেন –

“চম্পা থেকে চাঁপা। অর্থটা খুব সহজ। ভদ্র জীবনের চিহ্ন রাখব না। সবই যখন বদলেছে, তখন নামটাও ‘ভালগার’ করে নেওয়াই ভালো।”^{৩২} (বা.গ./পৃ.২০৬)

প্রথমে মেয়েটি, তাঁর আচরণ ও পেশা সম্বন্ধে তীব্র বিবমিষা জন্মালেও তাঁর জীবনসংগ্রামের সত্য জানার পরে বসন্ত তাঁকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং এই বিয়ের কারণ প্রেম নয়, মেয়েটিকে একটি সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার সদাকাঙ্ক্ষা। হয়তো এটা হঠকারী সিদ্ধান্ত ছিল ও তার ফল কী হতে পারে পাঠক জানতে পারেননা কারণ ঘটনাস্থলেই একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় চাঁপার মৃত্যু হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য হলেও পুরুষটি যে একটি

মেয়েকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চেয়েছিল এটাই গল্পটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। এখানে কিছু প্রশ্ন সন্ধিস্থ পাঠককে একটু হলেও অস্বস্তিতে ফেলতে পারে – লেখক কি এই বিবাহের পরিণাম কী হতে পারে তা বলতে চাইছেন না বা পারছেন না বলে ইচ্ছা করেই চাঁপার মৃত্যু ঘটালেন? তাঁর পাঠককুলের বহুস্তরীয় রুচি ও শিক্ষার সাধারণ সন্তোষবিধানের দায়বদ্ধতা কি তাঁকে প্ররোচিত করেছে এই সহজ সমাধানের মাধ্যমে গল্পের ইতি টানতে যাতে ঐ মেয়েটির প্রতি সহানুভূতির কমতি না হয়? লেখকের কি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বা সামাজিক কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল যা তাঁকে এই ধরনের সাহস থেকে নিবৃত্ত করেছে? এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কারণ এক সময় দেখা গেছে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মাপের ঔপন্যাসিকরাও তাঁদের সাহিত্যে তথাকথিত সমাজনিষিদ্ধ প্রণয়সম্পর্ককে সার্থকতা বা পূর্ণতা দান করতে পারেননি ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সামাজিক চাপের কারণে। মৃত্যু বা পরিত্যাগকে হাতিয়ার করে সামাল দিয়েছেন পরিস্থিতির।

এই প্রসঙ্গে সংকলনের অন্তর্গত সুবোধ ঘোষ লিখিত ‘বারবধূ’ গল্পটির উল্লেখ না করলেই নয়। এই গল্পটি সংকলনের অন্যান্য গল্পগুলির থেকে একেবারেই ভিন্নস্বাদের। ‘বারবধূ’ বেশ্যা বা গণিকাদেরই আরেকটি নাম^{৩০} প্রসাদের ‘বাঁধা মেয়েমানুষ’ পঞ্চীবীবি ওরফে লতা। তাঁকে নিয়ে প্রসাদ মাঝেমাঝে বিভিন্ন জায়গায় কিছু দিনের জন্য বাসা ভাড়া করে থাকে। উদ্দেশ্য স্ফূর্তি, অবাধ মদ্যপান ইত্যাদি। কিন্তু তাদের এই জীবনযাত্রায় ছন্দপতন ঘটলো যখন তাদের মত হাওয়া বদল করতে আসা কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবারের সাথে তাদের পরিচয় হল। সেখানে লতার পরিচয় সে প্রসাদের বিবাহিতা স্ত্রী। নিখুঁত তার অভিনয়। একেবারেই শান্ত, নম্র গৃহস্থ কুলবধূর প্রতিমূর্তি সে। সমস্যার সৃষ্টি হল প্রসাদের জীবনে যখন প্রকৃত প্রেম এলো। তার মনে সম্মানহানির ভয় দেখা দিল, যদি লতার আসল পরিচয় কেউ কোনোভাবে জানতে পেরে যায়, যদি লতাই কোনোদিন তা প্রকাশ করে ফেলে! অন্যদিকে রয়েছে একজন বেশ্যা যে সমস্ত কিছুই অর্থের বিনিময়ে পরিমাপ করে, যার কাছে সংসার-সম্মান-প্রেম এসব নিছকই মূল্যহীন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লতার মনের মধ্যে জন্ম নেয় অদ্ভুত এক আকাঙ্ক্ষা। নিজেকে একজন সাধ্বী গৃহবধূরূপে দেখার আকাঙ্ক্ষা, নামের আকাঙ্ক্ষা, সম্মান-স্নেহ-ভালবাসা পাবার দুর্মর অভিলাষ জেগে ওঠে তার মধ্যে। নিজের অপূর্ব অভিনয়-দক্ষতার কারণে সে পাড়া-প্রতিবেশিনীদের সকলের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছিল। যে নাম-যশ সে নিজের পেশায় কোনোদিন

পাবেনা, তা অভিনয় করে সে অর্জন করেছে। একজন বারবধু নিজেকে গৃহবধুর জায়গায় কল্পনা করেছে কারণ সেটাই তার কাঙ্ক্ষিত পরিচয়।

এই কাহিনীটি এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য হল একজন পুরুষ একজন বেশ্যাকে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর পরিচয়ে সমাজে পরিচিত করান, ধীরে ধীরে কখন যেন মেয়েটির মনে সেই খেলনাবাড়ি সত্যি সংসার হয়ে ধরা দেয়। নিজেকে সে ‘কূলবধু’ রূপেই ভাবতে থাকে কারণ আদতে তার মনের মধ্যে নিজের সংসার-স্বামী-সন্তানের ইচ্ছা লালিত হয় সুগোপনে।

আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা সচেতনভাবে পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট হতে না চাইলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। আমরা আগেই বলেছি সংস্কৃত সাহিত্যে গণিকাদের জীবনযাপনের যে তত্ত্ব বা তথ্য রয়েছে তার সাথে বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত গণিকাদের জীবনযাপনের বহুলাংশে পার্থক্য রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের জীবনের দৈনন্দিন সংগ্রামের কথা অনেক বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই বর্ণনাগুলি থেকে আমরা অনেক বিস্তারিত চিত্র পাই। পেশার বাইরে এই চরিত্রগুলির ব্যক্তিসত্তার অনেকখানি পরিচয় বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়।

আসলে প্রতিটি সাধারণ মেয়ের মধ্যেই নিজের স্বামী-সন্তান, নিজের সংসারের আকাঙ্ক্ষা থাকে। যুগযুগান্তর ধরে চলে আসা পিতৃতান্ত্রিক অভ্যাসের ফলে একটি মেয়ে অনেকসময় স্বভাবগতভাবেই নির্দিষ্ট কোনো একজন পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল হতে স্বচ্ছন্দবোধ করে এবং শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনও কিন্তু এই পুরুষনির্ভরতা দূর করতে পারেনা। আবার যদি সেই আর্থিক সচ্ছলতা সমাজনিন্দিত কোনো পেশা থেকে অর্জিত হয়, তাহলে সেই মেয়েটি আরও হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকে। তাই যদি এমন একজন পুরুষ তার জীবনে আসে যে তাকে বিবাহ করে তাকে স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা দেবে তাহলে সেই মেয়েটি স্বৈচ্ছায়, স্বচ্ছন্দে এই পেশা ত্যাগ করতে রাজি থাকে। অবশ্য শুধুমাত্র দৈহিক সুখের কারণ যাঁদের রয়েছে তাঁরা ব্যতিক্রম।

প্রেমিকারূপিণী গণিকা

গণিকাদের জীবনে প্রেম আসে কিন্তু তাঁরা প্রকৃতই প্রেমিকা হতে পারেন কিনা সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ। আর সেই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের প্রবেশ করতে হবে গণিকাদের পেশাগত বৈশিষ্ট্যের গভীরে। বাৎসর্য্যন বলেছেন-

“রত্নিতঃ প্রবর্তনং স্বাভাবিকং কৃত্রিমমর্থার্থম্। তদপি স্বাভাবিকবদ্রপয়েৎ, কামপরাসু হি পুংসাং
বিশ্বাসযোগাৎ।”^{৩৪}

তাদের পেশার কাঠামো বহুলাংশে অভিনয়নির্ভর। আমাদের গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছি। এই বৃত্তির অন্যতম শর্ত যেমন মনোরঞ্জন করা তেমনি প্রেমের অভিনয়ের করাও আরেকটি শর্ত। সংস্কৃত শাস্ত্রে গণিকাদের যে বর্ণনা রয়েছে তাতে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার অন্য নাম গণিকাবৃত্তি বললেও অত্যুক্তি হয়না। কিন্তু সকলেই কি সেরকম ছিলেন? সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু আমাদের সামনে সেরকম চিত্র তুলে ধরেনা। প্রকৃত প্রেম বা প্রেমিকার উদাহরণ সেখানে অপ্রতুল নয়।

আমাদের নির্বাচিত সাহিত্যের মধ্যে প্রথম উদাহরণ বসন্তসেনা। তিনি তাঁর প্রেমিকাসত্ত্বায় চিরভাস্বর। প্রথাগত গণিকাচরিত্রের বাইরে বসন্তসেনা চরিত্রটি একপ্রকার সচেতন বিনির্মাণ বলা যেতে পারে। প্রেমিকা থেকে পত্নীত্বে তাঁর উত্তরণ আমরা দেখেছি। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখি তাঁর দাসী মদনিকার ক্ষেত্রেও। বসন্তসেনা নিজের মুখেই বলেছেন-

“যত্নেন সেবিতব্যঃ পুরুষঃ কুলশীলবান্দরিদ্রোহপি।

শোভা হি পণস্ত্রীণাং সদৃশ জনসমাশ্রয়ঃ কামঃ।।”^{৩৫} (মৃচ্ছ.৮/৩৩) পৃ.২৮৬

তিনি নিজেকে চারুদত্তের ‘গুণনির্জিতদাসী’ বলেছিলেন। অন্যদিকে কুটনীমতমের দ্বিতীয় উপাখ্যান হারলতার কাহিনীটি যদিও কুটনী বিক্রালার মস্তিস্কপ্রসূত। এই কাহিনীর জালবিস্তারের উদ্দেশ্য গণিকার প্রেমিকাসত্ত্বার প্রলোভনে পুরুষদের প্ররোচিত করা ও প্রতারণা করা। কিন্তু যদি শুধু স্বতন্ত্র কাহিনী হিসাবে বিচার করা হয় তাহলে হারলতা সংস্কৃত সাহিত্যে একজন আদর্শ প্রেমিকার স্থান পেতেন। দামোদরগুপ্ত কুটনীমতমে কয়েকটি শ্লোকে গণিকার প্রেমের উল্লেখ করেছেন-

“যেন স্নেহঃ ক্রোধঃ শাঠ্যং দাক্ষিণ্যমার্জবং ব্রীড়া।

এতানি সন্তি তাস্বপি জীবদ্ধর্মোপনীতানি।।”^{৩৬} (কুটনী.১৭২)

তিনি সামগ্রিকভাবে গণিকাদের হৃদয়বৃত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, যদিও গণিকারা প্রধানতঃ অর্থের জন্য এই পেশায় এসেছেন কিন্তু যাকে তাঁরা ভালোবাসেন তাঁর কাছ থেকে অর্থসংগ্রহের প্রবৃত্তি তাঁদের থাকেনা।^{৩৭}

নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে আমরা এমন অসংখ্য উদাহরণ দেখেছি যেখানে গণিকারা ভালোবাসায়, প্রেমে সমুজ্জ্বল। *কেরি সাহেবের মুঙ্গী* উপন্যাসের টুশকি রামরাম বসুর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। আবার *নিশিপদ্মের* কাঞ্চনমালা ‘বোসবাবু’র প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমে শারীরিক, মানসিক সবরকম কষ্ট সহ্য করেছিলেন, ত্যাগ করেছিলেন রক্ষিতার পেশা। *উত্তর-ফাল্গুনী* উপন্যাসের দেবযানী মনীশকে ভালোবাসলেও পেশার কারণে নিজের শারীরিক অশুচিতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন; বিবাহ প্রস্তাবে রাজি হন নি। *কবি*-তে বসন্তও নিতাইকে ভালোবেসেছিলেন।

‘বিচারক’ গল্পে ব্রাহ্মণ বিধবা হেমশশী যাকে ভালোবেসে প্রতারিত হওয়ায় এই নিন্দনীয় পেশাগ্রহণ করতে হয়েছিল ফাঁসির সাজা ঘোষণার পরেও তাঁর কাছে সেই প্রতারক পুরুষটির ছবি আঁকা আংটি পাওয়া যায়। নিজের প্রবল অর্থকষ্টেও তিনি সেটি বিক্রি করেন নি। দেহবৃত্তিগ্রহণের আগে ও পরে প্রেমিকারূপে কোনো পরিবর্তন হয়নি তাঁর। প্রতারক পুরুষটির কাছে তিনি দেবীতুল্য-

“তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।”^{৩৮} (বা.গ./পৃ.৭)।

‘আঁধারে আলো’ গল্পেও দেখি বাইজি বিজলীকে যিনি প্রকৃতপ্রেমের স্বরূপ চিনতে পেরে নিজের মনকে বুঝতে পেরেছিলেন আর তাই অনায়াসে ঘৃণ্য পেশা ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। ‘আদরিণী’কে ভালোবেসেছিল জাতিতে ডোম হেমা। আদরিণীও তাঁর প্রেমিকপুরুষটিকে বিয়ে করে নিজের জীবিকা ত্যাগ করে সংসারধর্মে মন দিয়েছিলেন। ‘উৎসর্গ’ গল্পে আমরা পেয়েছি একজন প্রায় নিম্নবিত্ত গৃহবধূর কাহিনী; যিনি উপায়ান্তর না পেয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য এক ব্যক্তির রক্ষিতা হয়েছিলেন। নীলিমা কিন্তু তাঁর প্রাক্তন স্বামীর প্রতি নিজের ভালোবাসা, সহমর্মিতা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ‘পটের বিবি’ ভামরী তাঁর নিজের আদিবাসী, পটুয়া সমাজের নিয়মের বেড়াজালে আটকে থাকলেও নিজের পুরুষটির প্রতি একান্ত অনুগত। ‘পহেলি পেয়ার’ এর কথা নিজের মুখেই উচ্চারণ করেছিলেন জহর। মর্মস্তুদ বিরহকষ্টে স্বীকার করেছিলেন নিজের ভালোবাসার কথা-

“তুমি এখনো ছোট আছ। যা তোমাকে দিয়েছি, তার দাম আরো বড় হলে বুঝতে পারবে।

তবু অধৈর্য হয়ে বললাম, বলো না তা কি জহর, বলো না?

জহর কান্নার মতো হাসলো।

তারপর দরজায়-রাখা আমার হাতের উপর ওর হাতটা ছুঁয়ে বললো, পহেলি
পেয়ার।”^{৩৯} (বা.গ./ পৃ. ৩২৮)

বাইজি জহরের প্রেম কোনোদিন সমাজে স্বীকৃতি পাবে না। তিনি সেটা জানতেন, বুঝে ছিলেন
আর বহু শতাব্দী আগে দামোদর গুপ্ত তাঁর কুটনীমত এ নায়িকার মুখ দিয়ে একই কথা
বলিয়েছেন-

“অবিশুদ্ধকুলোৎপন্ন দেহার্পণজীবিকা শঠাচরণা।

ক্বাহং রূপাজীবা ক ভবন্তঃ শ্লাঘনীয়জন্মগুণাঃ।।”^{৪০} (কুটনী./৪৫৮)

সংস্কৃত শাস্ত্রে, সাহিত্যে প্রেমিকারূপা গণিকাদের যে চিত্র আঁকা রয়েছে তার সাথে বাংলা
সাহিত্যের বেশিরভাগ চরিত্রগুলির একেবারেই মিল নেই। সংস্কৃতে তাঁরাই প্রতারণা করেন
এমনকি তাঁদের পেশার কারণে প্রতারণা করা ও পুনরায় বিশ্বাস অর্জন করার কথা বলা
হয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে অন্ততঃ নির্বাচিত সময়সীমার মধ্যবর্তী সাহিত্যের অধিকাংশই
গণিকাচরিত্রগুলি নিজেই প্রতারণা করে। তাঁরা প্রবঞ্চিত হয়ে নিতান্তই পাকেচক্রে এই পেশায়
আসতেন কারণ সমাজ এঁদের কাউকে ফিরিয়ে নিতে চায়নি, ভুল শোধরানোর কোনো সুযোগ
দেয়নি। বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমরা প্রেমের পরিণতিতে বিবাহ দেখতে পাই।
যদিও গণিকা-বিবাহ হলেও শেষপর্যন্ত তার পরিণতি খুব সুখকর হত না।

ব্যক্তিসত্তার অভিব্যক্তি

আমাদের গবেষণার এই উপপর্বে একজন গণিকাকে আমরা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিমানুষ
হিসেবে বিচার করবো। এই কথাটি এইভাবে বলার উদ্দেশ্য হল, একজন মানুষের অসংখ্য
পরিচয় থাকে; সেটাই স্বাভাবিক। যেমন এক্ষেত্রেও একজন গণিকার প্রথম পরিচয় অর্থাৎ
ব্যক্তিগত স্তরের প্রাথমিক পরিচয় স্বাভাবিকভাবেই একজন নারী হিসেবে। কিন্তু এই পর্যায়ে
আমরা তাঁর লিঙ্গপরিচয় এমনকি কর্মপরিচয় ব্যতিরেকেও কেবলমাত্র একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি
হিসেবে তাঁর বিশ্লেষণ করায় আগ্রহী। আমরা মূলতঃ সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকা চরিত্রগুলিকে
নির্বাচন করেছি, কারণ শাস্ত্রে গণিকাদের সম্বন্ধে কিছু সাধারণ তত্ত্ব ও তথ্যাদি দেওয়া থাকে,
কিন্তু কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তিরূপে তাদের উল্লেখ সেখানে থাকেনা। অন্যদিকে আমরা
সংস্কৃত ও বাংলা এই দুই ভাষার সাহিত্য বেছে নিয়েছি এবং সেই অনুসারী একটি তালিকাও
প্রস্তুত করেছি অর্থাৎ নির্বাচিত সাহিত্যকৃতি নিয়ে আমরা আমাদের গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে

চলেছি। তাই এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি আসতে পারে সেটি হল এতগুলি গ্রন্থে অসংখ্য গণিকা চরিত্র রয়েছে সুতরাং ‘ব্যক্তিসত্তা’-র অন্বেষণ কিভাবে সম্ভব? কারণ কোনো একজন ব্যক্তির কথা উল্লিখিত নেই অথবা কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষকে নিয়েও আমাদের আলোচনা সম্ভব নয়। ‘ব্যক্তিসত্তা’ আদতে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল, তা ব্যক্তিবিশেষ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই আমরা সংস্কৃত ও বাংলা উভয় সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ কোনো মানবিক গুণ লক্ষিত হয়ে থাকলে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করবো। অবশ্য নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলেও আমাদের প্রাথমিক ও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গণিকাদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলির আবরণ সরিয়ে, তাঁদের প্রকৃত পরিচয় অনুসন্ধান করা যেখানে পেশাগত পরিচয়ের থেকেও বড় হয়ে উঠেছে তাঁদের মনুষ্যত্ব।

মানবিক অনুভূতি বা মানবিক গুণাবলী-এই শব্দগুলি অত্যন্ত আপেক্ষিক। আর সেকারণেই এগুলির একটি নির্দিষ্ট তালিকা হয়না।

গবেষণা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি গণিকাদের সম্বন্ধে বেশ কিছু পূর্ব প্রচলিত ধারণা রয়েছে। স্বাভাবিক কৌতূহলে আরও বিশদ পাঠ করার ফলে আমাদের কাছে বিষয়টি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাচীনযুগে বাৎস্যায়ন তাঁর *কামসূত্রে* গণিকাদের কর্তব্য-কর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে তাঁদের সেই অনুযায়ী নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেগুলি আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।^{৪২} বাৎস্যায়ন গণিকাদের পেশাদারিত্বের শিক্ষা দিয়েছিলেন। যেহেতু গণিকাদের এটিই জীবনধারণের মাধ্যম তাই প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে সচেতন থাকার শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন বিশেষতঃ অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে। নিত্য যাঁদের দেহের মূল্যে বেঁচে থাকতে হয়, একটা সময়ের পরে তাঁদের সমস্ত অনুভূতির মৃত্যু হয়। এমনকি তাঁদের জীবনে প্রেমও সুলভ নয়। যদি বা জীবনে প্রেম আসে অন্ধকারে আলোর মত, এই নরক থেকে মুক্তির পথ তাঁদের বন্ধ। ডানা ভাঙ্গা পাখির মত আকাশের দিকে তাকিয়েই জীবন কেটে যায় তাঁদের। কিন্তু যতই তাঁদের জীবন অন্ধকারে কাটুক তাঁদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বোধ পুরোপুরি মুছে যায়না। হয়তো কোনো মানুষেরই যায় না কিন্তু নানাকারণে চাপা পড়ে থাকে। চাপা পড়ে থাকা সেই অনুভূতিগুলি বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে প্রকাশ পায়। এই অংশে আমরা সেইধরনেরই কিছু মুহূর্ত তুলে ধরতে চেয়েছি যেখানে একজন ‘পতিতা’ তাঁর পরিচয়ের ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ গণ্ডিটুকু পেরিয়ে মনুষ্যত্বের উদার আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারেন।

কয়েকটি বিশেষ মানবিক অনুভূতির প্রাবল্য আমরা এই চরিত্রগুলির মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। সব চরিত্রের মধ্যে সবধরনের অনুভূতি যেমন নেই তেমনই একটি চরিত্রের মধ্যে একের বেশি অনুভূতির সহাবস্থান আমরা দেখেছি। কিছু সাধারণ অনুভূতি রয়েছে যেমন- বাৎসল্য, স্নেহ, সেবা প্রেম, ত্যাগ, নেতৃত্ব, সততা, নৈতিকতা, সাহস, সমানুভূতি ইত্যাদি যেগুলি আমরা আমাদের বেছে নেওয়া গণিকাচরিত্রগুলির মধ্যে পেয়েছি। আমরা এই অনুভূতিগুলি কোন্ কোন্ চরিত্রের মধ্যে পেয়েছি এবার সেটা নিয়ে আলোচনা করবো।

বাৎসল্য

বাৎসল্যরসের উপলব্ধি যে কেবলমাত্র মা ও সন্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। লিঙ্গ-বয়স নির্বিশেষে কারো প্রতি বাৎসল্য অনুভূত হতে পারে এবং তা রক্তসম্পর্ক ব্যতিরেকেও হতে পারে। গণিকাদের সম্বন্ধে প্রচলিত যে সমস্ত সাধারণ ধারণা রয়েছে তাতে মনে করা হয় গণিকাদের একমাত্র লক্ষ্য অর্থোপার্জন। কোনোরকম সূক্ষ্মানুভূতির বোধ তাঁদের মধ্যে থাকে না। আমরা এর আগে পারিবারিক অভিব্যক্তির প্রসঙ্গে মাতা ও কন্যারূপিণী গণিকাচরিত্রগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এই অংশে আমরা সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো না। কিন্তু বাৎসল্যের বেশ কয়েকটি মর্মস্পর্শী উদাহরণ আমরা পেয়েছি যা বর্তমান আলোচনায় বিদ্বিত হবে।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণের নায়িকা গণিকা বসন্তসেনা। এই চরিত্রটিতে নারীসুলভ গুণের সঙ্গী প্রায় সমস্ত ধরনের মানবিক গুণাবলি। বাৎসল্যরসের জীবন্ত প্রতিমা তিনি। নিজের প্রেমিকের পুত্রের প্রতি তাঁর যে বাৎসল্য লক্ষিত হয়েছে তা অপত্য স্নেহেরই নামান্তর। ক্রন্দনরত বালক রোহসেন তাঁর অন্তরের সুপ্ত মাতৃত্বকে জাগিয়ে তুলেছিল। সুবর্ণময় ক্রীড়া-শকটিকার অভাবে তার কান্না ও মনঃকষ্ট দেখে মুহূর্তের মধ্যে নিজের অঙ্গের সমস্ত অলংকার খুলে তার মৃৎ-শকটিকাটি ভরে দিয়েছিলেন। হয়তো বালকটির নিজের মা (চারুদত্তপত্নী ধূতা) এমতাবস্থায় তাকে বোঝাতেন বা হয়তো শাসনও করতেন কারণ তিনি নিজেদের আর্থিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। কিন্তু বসন্তসেনা চাননি যে, তাঁর প্রেমাস্পদের (যিনি একসময় দাতারূপে উজ্জয়িনী-প্রসিদ্ধ ছিলেন) সন্তান এটি সামান্য খেলনাগাড়ির জন্য এভাবে কষ্ট পাক, তাই একজন গণিকা হয়েও তিনি মাতৃত্বের টানে নিজের সমস্ত আভূষণ ত্যাগ করেছিলেন স্বেচ্ছায়, ঠিক যেভাবে মায়েরা সন্তান

বায়না করলে নিজের হাতের জিনিস দিয়ে তাদের প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। আবার রোহসেন এতো অলঙ্কারপরিহিতা বসন্তসেনাকে ‘মা’ বলতে অস্বীকার করে কারণ তাঁর মা আভূষণহীনা। এতো সুসজ্জিত নারী তার মা হতে পারেননা^{৪২}। বালকের স্পষ্ট উক্তি বসন্তসেনাকে কষ্ট দেয়, তিনি বুঝতে পারেন একজন মা তাঁর স্নেহে-মায়ায়-মমতায় মা হয়ে উঠলেও বাহ্যিক রূপটিও সন্তানদের চোখে আঁকা থাকে। তিনি বুঝতে পারেন, যে বাৎসল্যের ধারা তাঁর অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে তা গণিকার দেহকেন্দ্রিক জীবনযাপন থেকে তাঁকে উচ্চতর মহত্ত্বে উন্নীত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য গণিকা চরিত্রের উপস্থিতি। তাঁদের অনেকের মধ্যে বাৎসল্যের প্রকাশ দেখেছি আমরা। প্রেমাস্কুর আতর্থীর ‘আদরিণী’ গল্পের মূল চরিত্র আদরিণী ওরফে আত্মরী নিজের সহোদরকে সন্তানস্নেহে বড় করতে চেয়েছিল। তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল ভাইকে পড়াশোনা করিয়ে শিক্ষিত করে নিজের পায়ে দাঁড় করানো যাতে নিজের দিদির দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনাভরা দিনযাপনের দৈন্য সে মুছে ফেলতে পারে। নিজের সৎমায়ের গঞ্জনা সহ্য করে সে শুধুমাত্র নিজের ভাইকে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন দেওয়ার জন্য, তার মুখে অন্ন জোগানোর জন্য বেশ্যাবৃত্তি বেছে নিতেও পিছুপা হয়নি কারণ তার কাছে তার ভাইয়ের ভালো থাকাটাই প্রধান ছিল। অবশ্য আদরিণীর স্বপ্ন সত্যি হয়নি। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘তুরূপ’ গল্পের নায়িকা বিনোদিনী পতিতা। বিনোদিনীর সঙ্গে জমিদার চৌধুরীবাবুদের অশান্তি এক নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। বিনোদিনীর নিজের কোনো সন্তান ছিল না। চৌধুরীদের ছোট ‘খুকী’ যখন তাঁকে দেখে ‘মা’ বলে সম্বোধন করেছিল তখন তাঁর মনের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়-

“বিনোদিনীর মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল—সেই বালিকা যেন তাহার আপনার ধন; --সে যেন একবার মাত্র মাতৃ সম্বোধনেই তাহাকে চিরদিনের মতো মাতৃত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া লইয়াছে। বসিয়া বসিয়া সে কেবলই ভাবিতেছিল—সে আমাকে মা বলিয়াছে। মা বলিয়াছে! এই মা বলাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলনা।”^{৪৩} (বা.গ/পৃ.৬৭)

এই যে টান, এই যে একটি শিশুর মুখ থেকে মা ডাক শুনে অদ্ভুত এক অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভব— এগুলি বিনোদিনীর কাছে একেবারেই আনকোরা, নতুন। সমস্ত কাজ বা রেষারেষি ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয়ের থেকে অনেক অনেক দূরে তিনি শুধু সেই খুকীর কথা ভাবতে থাকেন, সারাটা দিনের কাজ তাঁর আবর্তিত হতে থাকে শিশুকন্যাটির কথা কল্পনা করে। সমস্ত কিছুর মধ্যে তার মুখ, তার ছায়া মনে ভাসে তাঁর। শিশুর স্পর্শ তাঁর কাছে অনাস্বাদিত সুখের মতো-

“খুকী তাহার কোমল বাহু দিয়া বিনোদিনীকে এক একবার আঁকড়াইয়া ধরিত; --বিনোদিনীর সর্বাঙ্গ নিস্পন্দ হইয়া যাইত; --একী আনন্দ এ আনন্দের স্পর্শ তো সে জীবনে কখনো অনুভব করে নাই!”^{৪৪} (বা.গ./পৃ.৭২)

একজন পতিতার জীবনের অর্থ, তাঁর যাপন সমস্ত কিছু বাৎসল্যের ধারায় বদলে গিয়েছিল।

‘মেলা’ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি ছোটগল্প। এই গল্পে মণি নামের একটি ছোট মেয়ে মেলার ভিড়ে তার দাদার হাত ছাড়িয়ে হারিয়ে যায়। সেই মেলারই এক প্রান্তে বসেছে আনন্দবাজার অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ বেশ্যাদের বসতি। পতিতা কমলমণি নিজের ঘরের খিড়কির দরজায় রাত্রেবেলায় মণিকে খুঁজে পান, কথায় কথায় জানতে পারেন সে হারিয়ে গেছে। বালিকাটিকে নিজের ঘরে সে রাত্রে মতো আশ্রয় দেন কমলমণি। ঘরে খন্দেরবাবু এলেও তাকে নিষেধ করেন। মণিকে খাইয়ে, মেলায় তার যা যা পছন্দ হয়েছিল সেই সমস্ত কিছু নিয়ে আসেন তিনি- যেন এক রাতের জন্য যে শিশুটি তাঁর কাছে রয়েছে তার যাবতীয় কথা শুনে, আদার-ইচ্ছে পূরণ করেই তাঁর শান্তি। বালিকার ‘মাসীমা’ সম্বোধন যেন তাঁর তাপিত হৃদয়ে বারিধারার মতো। স্নেহে, ভালোবাসায় তাঁর মনের ভেতরে এক অদ্ভুত তোলপাড় চলছিল আর তাই ঘুমন্ত মণিকে দেখে-

“কমলি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।”^{৪৫} (বা.গ./পৃ. ১১)

কিন্তু বিধি বাম! দলের মাসী যিনি এই বেশ্যাদলের অভিভাবিকাস্বরূপ তিনি ঘরের মধ্যে শিশুকন্যাকে দেখেই বলেন-

“বেশ, তবে ভোরের আগেই ওকে সরিয়ে দিতে হবে। সরকারকে বলে আসি আমি। ভালো করে আগড়টা সরিয়ে দে।”^{৪৬} (বা.গ./পৃ.১১৩)

বৃদ্ধার উদ্দেশ্য পরিষ্কার, যার সামান্যতম ইঙ্গিত বোঝামাত্র কমলমণি বালিকা মণিকে বুকে জড়িয়ে রাতের অন্ধকারেই নিরুদ্দেশের পথে এগিয়ে গেলেন। আসলে মাসী চেয়েছিলেন মণিকে বালিকা বয়স থেকে দলে রেখে শিখিয়ে পড়িয়ে দেহবৃত্তিতেই যুক্ত করতে। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর সত্যটুকু বুঝতে পেরে কমল তা হতে দেননি কারণ দেহব্যবসার নরকযন্ত্রণা তিনি জানেন, ফুলের মত নিস্পাপ একটি বালিকার প্রতি মাতৃসুলভ যে বাৎসল্য তিনি অনুভব করেছিলেন তার জন্য নিজের আশ্রয়, নিজের পেশা মুহূর্তের মধ্যে ফেলে অনিশ্চিতের দিকে এগিয়ে যেতে তাঁর

এতটুকু চিন্তা হয়নি। তাঁকে মায়ের মতো দেখেছে যে বালিকা, তাঁকে রক্ষা করাই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করেছেন তিনি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ‘মহানগর’-এ এক দিদি আর তাঁর কিশোর ভাইয়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গ্রামের ছেলে রতন তার দিদি চপলাকে খুব ভালবাসে। দিদির নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার খবর পেলেও কিশোর রতন অন্যদের কথাবার্তায় বুঝতে পারে যে, তার দিদিকে অপহরণ করা হয়েছে। খোঁজ পেলেও কেউ চপলার ফিরে আসা নিয়ে কোনো কথা বলেনা। মনমরা রতন নিজেই তার বাবার সাথে দিদিকে খুঁজতে এসে পৌঁছায় মহানগরে। অচেনা অজানা শহরে একটি ছোট্ট ছেলে নিজের চেষ্টায় তার দিদিকে খুঁজে বার করে, চপলাও স্তব্ধ হয়ে পড়েন ভাইকে দেখে। স্নেহে-মায়ায় ভাইকে ভরিয়ে দেন তিনি। কিন্তু ভাইয়ের অনুরোধ-উপরোধ-জেদ সব উপেক্ষা করে তিনি জানিয়ে দেন বাড়ি ফেরার পথ তাঁর বন্ধ। দিদির স্নেহকাঙ্গাল অবুঝ ভাইকে সত্যি বলার সাহস নেই তাঁর, তিনি এখন পতিতা, সমাজ তাঁকে একঘরে করেছে তাই তাঁর নিজের জনেরাই এড়িয়ে চলে, কোনো বাড়ি নেই তাঁর ফিরে যাওয়ার মতো। কিশোর রতন প্রথমে কিছু না বুঝলেও অনুভব করে দিদির অসহায়তা, তাঁর কষ্ট, তাই সে কথা দিয়ে যায়-

‘বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি! কারুর কথা শুনব না!’ ^{৪৭}(বা.গ./পৃ.১৩৯)

এই গল্পে ভাই-বোন উভয়ের স্নেহধারায় পাঠকের চিত্ত অভিভূত হয়ে পড়ে।

প্রমথনাথ বিশীর *কেরী সাহেবের মুঙ্গী* উপন্যাসের অন্যতম মূল চরিত্র টুশকি। এই চরিত্রটিকে লেখক তৈরী করেছিলেন স্নেহশীলা রূপে। স্নেহবোধ যে শুধুমাত্র বয়সে ছোটদের প্রতিই অনুভূত হয়ে থাকে তা কিন্তু নয়। টুশকি রামরাম বসুর অশান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবনে আশ্রয়ের মত। জ্বরতপ্ত শরীরে কোমল স্পর্শের মতো। তাঁর চরিত্রে এক অদ্ভুত মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্য আছে, আছে সকলকে আপন করে নেওয়ার সহজাত দক্ষতা, অবশ্য তা কিছুটা পেশাগত কারণেও অর্জিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সবটাই মেকী নয়। সেই কারণেই অসহায় রেশমিকেই হোক কিংবা পরিচয়হীন খ্রিষ্টান সাহেবের ভৃত্য ন্যাড়া যখনই কারো বিপদ হয়েছে অথবা আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়েছে রামরাম বসু নিশ্চিত্তে তাকে নিয়ে এসেছেন টুশকির আশ্রয়ে। কারো কাছে তিনি মায়ের মতো আবার কারো কাছে তিনি বড় দিদির মতো। পেশায় দেহবিলাসিনী হলেও নারীমনের প্রবৃত্তিগুলি প্রায় সবই তাঁর মধ্যে ছিল। নিজের স্নেহের আঁচল দিয়ে শুধু আশ্রয় দেওয়াও নয়,

বিপদে সাহায্য করতে বিনা দ্বিধায় এগিয়ে গেছিলেন তিনি – এমন বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে।

কণা শঙ্করের *জন-অরণ্য* উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। কাহিনী ও ঘটনাক্রম আগেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। কণা গল্পের নায়ক সোমনাথের বন্ধু সুকুমারের বোন, সে নাম পরিবর্তন করে দেহব্যবসা বেছে নিয়েছে। কারণ আর কোনো পথ তার সামনে খোলা ছিলো না বা বলা ভালো সমাজ খুলে রাখেনি। সেই কণা হোটেলের ঘরে গোয়েন্দাজীর কাছে অনুরোধ করে, যাতে তার দাদার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়^{৪৮} (*জন-অরণ্য*/পৃ. ১১৬-১১৭)। কণা নাম-পরিচয় সমস্ত কিছু বদলে শরীর বিক্রি করতে এসেছিল শুধু নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আর সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তেও নিজের জন্য নয়, নিজের বেকার, অর্ধোন্মাদ দাদার জন্য একটা চাকরি চেয়েছে সে। যে পরিবারের জন্য আক্ষরিক অর্থেই পথে নামতে হয়েছে তাকে সেই পরিবারের প্রতি ক্ষোভ নেই তার। রয়েছে নিজের দাদার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ আর ভালোবাসা।

সেবা

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘কুসুম’ গল্পে মূল চরিত্র কুসুম একজন পতিতা। তাঁর বাড়ির কাছে ট্রাম দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পথচারীরা তাঁর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলে কুসুম বিভিন্ন কটুক্তি উপেক্ষা করে তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। দিবারাত্রি তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেন একরকম একা হাতে। এমনকি ডাক্তার ডেকে তাঁর সাম্মানিক দিয়ে সেই অচৈতন্য রোগীকে দেখানোর ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি, হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। নিজের পেশা বন্ধ রেখে বৃদ্ধের সেবা করে গেছেন তিনি। অথচ জ্ঞান হওয়ার পরে নিজের প্রাণদায়িনী একজন ‘পতিতা’ জানতে পেরে কুসুমকে চরম অপমান করেন সেই বৃদ্ধ, তাঁর কাছে তখন প্রাণের থেকে তাঁর জাত-কূল-ধর্ম-আভিজাত্য প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। একজন বারবিলাসিনী তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছেন তার থেকে মৃত্যুই শ্রেয় হয়ে ওঠে বৃদ্ধের কাছে, তীব্রস্বরে বলেন-

“কথা ক’! বল, কি চাস তুই? বখশিস্?”^{৪৯} (বা.গ./পৃ. ৮২)

আড়ষ্ট-দুঃখিত কুসুম ‘হ্যাঁ’ বলায় তিনি দশ টাকার নোট ছুঁড়ে ফেলে দেন আর বেরিয়ে এসে সেই নোট কুসুম এক খঞ্জ ভিখারীকে দিয়ে দেন।

কুসুমের মন এই ঘটনার আকস্মিকতায়, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আচরণের রূঢ়তায় এতখানি আঘাত পেয়েছিল যে তাঁর বিস্ময় কাটতে চায়নি। একজন মরণাপন্ন অসুস্থ মানুষকে সেবা করার প্রতিদানে কোনো পার্থিব বিষয়ের প্রত্যাশা তাঁর ছিলোনা; ছিল একটু সম্মান, একটু স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায় যখন ভদ্রলোক তাঁর সমস্ত প্রয়াসকে অর্থমূল্যে পরিমাপ করেন এবং কুসুমকে শুধুমাত্র তাঁর পেশা দিয়ে বিচার করেন। কুসুম বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তরের শুভসত্তা পেশাগত পরিচয়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

‘বারবধু’ গল্পে বারবধু লতাকে প্রসাদ নিজের স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছিলেন নিজের সামাজিক সম্মানরক্ষা করার উদ্দেশ্যে। লতাকে কিছুটা বাধ্য হয়েই তাই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের গৃহবধুর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। বারবিলাসিনী লতা নিজের জীবিকার কারণেই অভিনয়ে যথেষ্ট দক্ষ, তাই তাঁর কথাবার্তায়, আচরণে কোনোরকম ত্রুটি খুঁজে পাননি কেউ, এমনকি সন্দেহজনক কোনো বিসদৃশ বিষয়ও কারো নজরে আসেনি। এই অংশে এই কাহিনীটি উল্লেখ করার কারণ হল, অভিনয়ের জন্য হলেও লতা নিজের মিথ্যে ‘বধু’ পরিচয়টির প্রতি কোথাও যেন দায়বদ্ধতা অনুভব করেছিলেন আর তাই তিনি নিজের নতুন ভূমিকাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। অভিনয় হলেও প্রতিবেশী, আগত অতিথিদের কাছে সেবাপরায়ণা, আদর্শ গৃহবধুর প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এমনকি চলে যাওয়ার আগের রাত্রে প্রসাদের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়েও শেষপর্যন্ত কিছুই করেননি লতা, বরং ঘুরেফিরে তাঁর মনে পড়েছে সকলের স্নেহ-সমাদর। ভীরা, ঈশ্বরবিশ্বাসী, সাধবী গৃহবধুর মতো সকলের কল্যাণ কামনা করেছেন তিনি –

“আহা! বুড়ো মানুষ রাখালবাবু, মেসোমশাই। ঠাকুর দেবতার মতো শুদ্ধ। মাথা ছুঁয়ে কতবার আশীর্বাদ করেছেন! সব পাপ আমার লাগুক। মেসোমশাই চিরদিন এমনি সুখী থাকুন, মাসিমার বেরিবেরি সেরে যাক।”^{৫০} (বা.গ./ পৃ. ১৬০)

এ প্রার্থনা একজন সেবাময়ী বধুর প্রার্থনা যিনি আদতে একজন ‘বারবধু’। অভিনয় করতে করতে কখন যে মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে গেছে তাঁর কাছে। কারণ জীবিকার পরেও থাকে মানুষের হৃদয়বৃত্তি আর সেখানেই লতা সব কালিমা মুছে দিতে পেরেছেন।

বিমল করে ‘আঙ্গুরলতা’ ছোট গল্পটিতে গণিকাচরিত্রের বা আরও বিশদে বললে গণিকাদের মনস্তত্ত্বের এক অনন্য দিক বর্ণিত হয়েছে। আমাদের আলোচনার পরিসরে আমরা সেইসব চরিত্রগুলিকে নিয়েই কাটাছেঁড়া বা চর্চা করতে চেয়েছি যাঁরা ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম পেশার নিরিখে। আসলে যে যে গুণগুলি থাকার জন্য আমরা তাঁদের ‘ব্যতিক্রমী’ তকমা দিয়েছি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সেগুলি যে কোনো মানুষের মধ্যেই থাকতে পারে, থাকেও। কিন্তু যখনই কোনো গণিকার প্রসঙ্গে এই গুণগুলি উল্লিখিত হয় তখন কেবলমাত্র ঐ পেশায় থাকার কারণে তাঁদের ‘ব্যতিক্রমী’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়, আলাদা করে তাঁদের উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু আঙ্গুরলতা এই গল্পের ‘আঙ্গুর’ আক্ষরিক অর্থেই যেন ব্যতিক্রম। নন্দ, যার হাত ধরে একদিন তিনি ঘর ছেড়েছিলেন, পরেছিলেন লোকদেখানো, মনভোলানো শাঁখা-সিঁদুর, এক বছরের মধ্যে আঙ্গুরকে ত্যাগ করে চলে যায়। পতিতাপল্লির জীবনে অভ্যস্ত আঙ্গুরেরই কাছে অসুস্থ, মৃতপ্রায় নন্দ ফিরে আসে। শত অপমানেও আঙ্গুর তাঁকে দূর করে দিতে পারেন না। ডাক্তার দেখানো, ওষুধ-পথ্য এমনকি কলকাতা নিয়ে যাওয়া সবটাই একা হাতে করেন এবং তার জন্য নিজের সোনার গয়নাও বিক্রি করে দেন। নন্দ মারা গেলে সেই মৃতদেহ দাহ করার জন্য নিজের সবটুকু সঞ্চয় নিঃশেষ করেও যখন ব্যবস্থা করতে পারেননি তখন বাধ্য হয়ে চরমতম সিদ্ধান্ত নেন আঙ্গুর। অকল্পনীয় সেই সিদ্ধান্ত! মৃতদেহ খাটের নীচে রেখে খদ্দেরের সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হন তিনি যাতে সেই অর্থে ‘ব্রাহ্মণ’ নন্দের অন্তিম সংস্কারটুকু সম্ভব হয়। কতোখানি নির্মম হতে পারে সমাজ তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই গল্পটি। আঙ্গুরের সেবাপরায়ণতার উদাহরণ যেমন এই গল্পটি, ঠিক সেরকমভাবে গণিকাদের যে চিরকাল সমাজের বাইরে করে রাখা হয়, তাঁদের জীবনযাত্রা যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কতোখানি কঠিন, প্রতি পদক্ষেপে তাঁদের জন্য কতো নতুন লড়াই অপেক্ষা করে থাকে তারও উদাহরণ এই গল্পটি।

কেরী সাহেবের মুঙ্গী উপন্যাসে টুশকি চরিত্রটির যে ধরণের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাতে তাঁর সেবাপরায়ণ, অনুভূতিপ্রবণ কোমল মনের ছায়া লক্ষ করা যায়। তাঁর নিজের কাজে, রাম বসুর কথায় এমনকি উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ থেকে আমরা এরকম বেশ কিছু উদাহরণ পেয়েছি। শুধু সেবাশুশ্রূষা করাই নয়, অন্যের বিপদে এগিয়ে যাওয়া, বিপদগ্রস্ত মানুষটিকে সাহায্য করা, ক্ষমতাবান ব্যক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ইত্যাদি কাজে টুশকির উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই কাহিনীতে গণিকারূপে তাঁর বর্ণনা ততখানি বিশদেও নেই যতখানি রয়েছে মানুষ হিসেবে তাঁর অন্যান্য গুণের উল্লেখ প্রসঙ্গে।

কাঞ্চনমালা *নিশিপদ্ম* উপন্যাসের প্রথম ভাগের নায়িকা, উপন্যাসের সূত্রপাত তাঁর জীবনকাহিনীর বর্ণনায়। তাঁর সেবাময়ী মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বোসবাবুকে সেবা করার সময়ে। কাঞ্চনের মনে জাগরিত প্রেম তাঁকে তাঁর পেশার সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে প্রেমিকার পর্যায়ে উন্নীত করেছিল, অন্যথা একজন মরণাপন্ন রোগীকে সেবা করার অন্য কোনো কারণ অন্ততঃ এই কাহিনীতে নেই।

উপরের উদাহরণগুলি একেবারেই স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে সমাজনির্মিত ছকে বাঁধা গণিকাসম্পৃক্ত ছবিগুলিকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিতে সক্ষম।

ত্যাগ

যে সমস্ত মেয়েরা অনিচ্ছায় এই পেশায় আসেন তাঁদের অনেকেরই নানারকম বাধ্যবাধকতা থাকে। সংসারের জটিলতার পাকেচক্রে তাঁদের ঠাঁই হয় পতিতাপল্লীর অন্ধকারগলিতে, স্বপ্ন আঁকা চোখগুলি ভরে যায় ধূসর রঙে। যদিও গণিকাদের জীবনের সঙ্গে ‘ত্যাগ’ শব্দটি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত কারণ একটি সাধারণ মেয়ের সাধারণ জীবনযাপনের গল্পে যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বা সুখ থাকে তার কিছুই একজন পতিতার ভাগ্যে থাকেনা। তাই এমনিতেই সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আবার ত্যাগ শব্দটি উচ্চারণে কোথাও যেন মহত্বের ইঙ্গিত জড়িয়ে থাকে। যাঁদের জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো ভাবে ত্যাগ করতে হয় তাঁদের কাছে উদারতা, মহত্ব এই শব্দগুলি অনাবশ্যক রকমের ভারী হয়ে পড়ে।

আমরা দুটি কাহিনীকে নির্বাচন করেছি যে গল্পের নায়িকারা নিজেদের জীবনে কঠিন ত্যাগ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আঁধারে আলো’ গল্পের বাইজি বিজলী এক আশ্চর্য ত্যাগের নজির রেখেছেন নিজের জীবনে। যে পুরুষটিকে একদিন নিজের রূপের মোহে, অভ্যস্ত ছলাকলায় ভোলাতে চেয়েছিলেন সেই পুরুষটি সর্বসমক্ষে যখন তীব্র বিতৃষ্ণায়, ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন সেই অপমান তাঁর কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আসলে তিনি প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পেয়েছেন আর সেই প্রেম তাঁর অন্তরের যাবতীয় মালিন্য দূর করেছিল। কিন্তু প্রত্যেক জীবিকার কিছু নিজস্ব শর্ত আছে। নিজের ভালোবাসার প্রতি সৎ থেকে বিজলী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই ঘৃণ্য পেশা ত্যাগ করার, তিনি তা করেছিলেন। যে জীবিকা থেকে তাঁর অন্তর্বস্ত্রের সংস্থান হয় তা তিনি ‘শপথ করিয়া ত্যাগ’

করেছিলেন। এই ত্যাগ করার মনের জোর তিনি পেয়েছিলেন তাঁর ভালোবাসা থেকে। যদিও তিনি জানতেন এ ব্যতীত অর্থোপার্জনের দ্বিতীয় পন্থা তাঁর নেই তাই ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজের মজুরী বাড়িয়ে করেছিলেন দুশ টাকা যাতে সহজলভ্য হতে না হয়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পতিতার পত্র’ কাহিনীতে ত্যাগের অন্য একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এটি ব্যতিক্রম কারণ এখানে একজন সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের হিন্দু বিধবা মেয়ের কাহিনী রয়েছে। সুলোচনা শৈশবেই মাতৃহারা; অল্প বয়সে বিধবা হয়ে নিজের পিতার কাছে ফিরে আসেন এবং পিতার সাহচর্যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে দুজন (গল্পে সুলোচনা তাঁদের রাম-লক্ষ্মণ বলেছেন) স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতার আলাপ হয় ও সেই আলাপ তাঁর মনকে দুর্বল করে তোলে। কিন্তু এই দুজনের মধ্যে যিনি তুলনায় কঠোর, তিনি এক সন্ধ্যায় সুলোচনাকে কাশীতে নিয়ে যান এবং সেইখানেই তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেন। কেমন সেই আশ্রয়? সুলোচনা নিজেই বলেছেন ‘ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলুম, পতিতা হলুম।’ তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ‘লক্ষ্মণ’ জানিয়েছিলেন-

“দেশের জন্য অনেকে আত্মবলি দিয়েছে, যথাসর্বস্ব খুইয়েছে, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। আমি আজ এই মহাপাতক করলাম। কীসের কী ফল হবে জানি না, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। আমার বন্ধু যখন জেল থেকে বেরিয়ে তোমাকে খুঁজতে আসবে তখন তোমাকে পাবে না। পরে যদি তোমাকে খুঁজে পায়ও তোমার কাছে আসতে পারবে না। এই ভরসায় এত বড় পাপ করেছি।- চললাম। আর দেখা হবে না।”^{৫১} (বা.গ./পৃ.১২৩)

এই ত্যাগ কোনো গণিকার ত্যাগ নয়। একটি বিধবা মেয়েকে বলি দিয়ে, তাঁর বিয়ে-সংসারের স্বপ্নকে ধ্বংস করে দিয়ে ‘দেশোদ্ধার’-এর নামে একজন দুর্বলচিত্ত পুরুষকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে পতিতাবৃত্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত করে আর যাইহোক না কেন মহত্ব হয়না। হতে পারেনা। কিন্তু সুলোচনা? তিনি তাঁর ভবিষ্যৎকে মেনে নিয়ে পতিতার জীবন কাটিয়েছেন সারাজীবন, কারো নাম উচ্চারণ করেননি কোনোদিন। এ তাঁর ত্যাগ, তাঁর মহত্ব তো অবশ্যই।

নেতৃত্ব

এই বৃত্তিতে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই একা থাকেন কিন্তু অধিকাংশের ঠাই হয় কোনো না কোনো পতিতাপল্লিতে। উভয় ভাষার সাহিত্যেই আমরা পতিতাপল্লির বিশদ উল্লেখ পেয়েছি। আমরা দেখেছি কোনো একজন পুরুষকে নিয়ে একে অন্যের সাথে বিবাদ করতে,

আবার কখনো পল্লিতে কোনো বিপদ এলে একসাথে সেই বিপদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, যদিও এই রুখে দাঁড়ানোর কারণ নিজেদের পেশায় বাধা পড়া। সেইরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে তাঁরা একে অন্যের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনে হয়তো তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো নয়, কিন্তু বিপদ তাঁদের সবাইকে এক পঙ্ক্তিতে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘বিদ্যুৎলতা’ এরকমই একটি গল্প। রাণীঘাটের ‘কাপুড়ে পট্টির পিছনে’-র গণিকাপল্লী উচ্ছেদের আইনী নোটিশ জারী হওয়া মাত্র পল্লীর বাসিন্দারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। কারো মতে কিছুই হবেনা আবার কেউ চিন্তা করছেন নতুন করে তাঁরা কোথায় যাবেন- এমতাবস্থায় প্রায় সর্বসম্মতি ক্রমে তাঁরা বিদ্যুৎলতা ওরফে বিদ্যুৎকে নিজেদের দলনেত্রী মনোনীত করেন। মিছিল করে পৌরপিতার সঙ্গে দেখা করে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন পল্লীর পতিতারা। আর এই সমস্ত বিষয়টিতে তাঁদের মুখপাত্র বা বলা যেতে পারে দলনেত্রী ছিলেন বিদ্যুৎ কারণ তিনি শিক্ষিতা, রুচিশীলা ও ব্যক্তিত্বময়ী। সম্পূর্ণ লড়াইটির পরিকল্পনা করা এবং তা বাস্তবায়িত করা, পরিচালনা করা সবক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন কারণ -

“সে আবিষ্কার করেছে মাথা ঘামানোর মধ্যে যেন অদ্ভুত এক উত্তেজনা আছে। মাথা ধরার যন্ত্রণার সঙ্গে মাথা খাড়া করার সুখ।”^{৫২}(বা.গ./পৃ.১৮৫)

সততা ও নৈতিকতা

প্রচলিত ধারণা অনুসারে এই পেশাবলম্বনকারিণীদের সঙ্গে সততা ও নৈতিকতার লেশমাত্র যোগাযোগ নেই। বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা ইত্যাদি যেন সমাজে তাঁদের পরিচায়ক হয়ে থাকে। ধারণাটি যে সম্পূর্ণ ভুল তা নয় কিন্তু ব্যতিক্রমী কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। সততা ও নৈতিকতা যেমন পেশার ক্ষেত্রে হতে পারে তেমনি আবার ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। *মৃচ্ছকটিকে* চতুর্থ অঙ্কে মদনিকা যখন বুঝতে পারেন তাঁর প্রেমাস্পদ শর্বিলক চারুদত্তের বাড়ি থেকে অলংকার চুরি করেছে (তিনি বসন্তসেনার অলংকারাদি চিনতেন) তখন তিনি তাঁকে নিরস্ত করেন^{৫৩}। মদনিকা এও জানতেন যে, তাঁকে মুক্ত করার জন্যই শর্বিলকের এই প্রয়াস তবু তিনি নিজের প্রভুর প্রতি সৎ ছিলেন। আবার বাংলা সাহিত্যে পেশাগত সততার উদাহরণ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘স্পর্শ’ গল্পটিতে পাই। যেখানে গল্পের নায়িকা স্বপ্না আগত অতিথির সন্দেশ, ভীতি পেরিয়ে স্বচ্ছন্দ হতে সাহায্য করে। তাঁরা যে পেশা ও পেশাদিরিত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল সেটা নিজেই জানিয়েছেন-

“ধরুন আপনার কাছে কুড়ি টাকা আছে, আমি বা আমার লোক সব কেড়ে নিলাম, কুড়িটা টাকা পেলাম ঠিক, কিন্তু আপনি আর আসবেন কেন? কেমন কি না। ব্যবসা করতে বসে এটা ভাবতে হয় বই কী! কোন্টা হয় তাহলে লাভের শেষ পর্যন্ত?”^{৫৪} (বা.গ./পৃ.৩১৪)।

আমরা যে অভিব্যাপ্তির অনুসন্ধান করছি তার নিরিখে বলা যায়, সংস্কৃত শাস্ত্রের ক্ষেত্রে একজন গণিকাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তিনি উপার্জন করবেন এবং তারপরে সেই ব্যক্তির সংশ্রব ত্যাগ করবেন। কিন্তু চুরি বা তহরুপ সেই সময়েও অপরাধ ছিল। তবে সেপ্রসঙ্গে কৌটিল্য বলেছেন যদি আগত ব্যক্তি গণিকার অলংকারাদি চুরি করে তবে তার শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল।^{৫৫} আর আমাদের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে তাঁদের সাথে প্রতারণা করা হলেও গণিকারা তহরুপ করতে পারেন সেই চিন্তাধারা লক্ষিত হচ্ছে।

অন্যদিকে সমরেশ মজুমদারের ‘নিরুদ্দেশ-প্রাপ্তি-হারানো’ গল্পের পতিতা পদ্মা নিজের ব্যক্তিগত সততা, নৈতিকতার প্রসঙ্গে উজ্জ্বল। তাঁর ‘বাঁধাবাবু’র মৃত্যু বা হত্যারহস্যের কিনারা করার জন্য সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করতে প্রস্তুত। হয়তো এর কারণ প্রেম বা আর্থিক নির্ভরশীলতা কিন্তু এই পেশায় থেকে অপরাধজগতের সঙ্গে শত্রুতা করার সাহস ও সততা তার ছিল, যার ফলে তাকে খুন হতে হয়।

আমরা এমন কিছু গুণের কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম যেগুলি খুব স্বাভাবিক মানবিক গুণাবলী। আমাদের গবেষণা কাজের ক্ষেত্রে এগুলি নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজন হয়েছে কারণ যাঁদের জীবন ও সেই সম্পর্কিত অভিব্যাপ্তির উপর নির্ভর করে আমরা আমাদের গবেষণা কাজটি নিয়ে এগিয়ে চলেছি তাঁদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের দায়বদ্ধ করেছে সাহিত্যের গণিকাচরিত্রগুলির গুণাবলির উপর অনুসন্ধানী আলোকপাত করতে। খুব সংক্ষেপে আমরা কাহিনিগুলিও উল্লেখ করেছি যাতে গুণের প্রকাশ সহজে অনুধাবন করা যায়।

মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তি: আত্মগ্লানি নাকি আত্মপ্লাঘা

একজন নারী যখন দেহবৃত্তিগ্রহণ করেন, তখন স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ তাঁর মনোজগতে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। বলা যেতে পারে নিরবিচ্ছিন্ন মানসিক টানাপড়েন একপ্রকার সঙ্গী হয় তাঁর। ‘যৌনকাজ’ বা ‘যৌনপেশা’ আদতে পেশা এই কথা বলা হলেও এই পেশার প্রতি, পেশাগ্রহণকারী মানুষের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। একদিকে

পেশার কারণে সমাজের ঘৃণা, নিন্দার রক্তচক্ষু অন্যদিকে পরিবার-পরিজনদের থেকে দূরত্ব আর এই দুইয়ের কারণে একজন দেহবৃত্তি-অবলম্বনকারিনী নারীর ব্যক্তিসত্ত্বাতেও পরিবর্তন হয়। মানসিক অবসাদ একজন দেহজীবীর নিত্যসঙ্গী।

এই পর্বে আমরা তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি আলোচনা করেছি যদিও গণিকাদের মনের থেকেও শরীরে কথাই প্রাধান্য পায় বেশি। এই পেশায় যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকের আত্মবিশ্বাস শেষপর্যন্ত টিকে থাকে। বেশিরভাগই সমাজের প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, নিজেদের কলঙ্কিত, নিন্দিত বলে ভাবতে থাকেন। এই অধ্যায়ের সূচনাতেই বলেছিলাম যে একজন গণিকার জীবনে বহুবিধ অভিব্যক্তি আসতে পারে। সেগুলি একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা হয়ও। পারিবারিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভিব্যক্তি অনুসন্ধান করলেও সেগুলি যেন বৃহত্তর মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংরূপ।

প্রাচীন ভারতবর্ষের গণিকাসম্প্রদায়ের যে চিত্র আমরা পেয়েছি তাতে একান্তভাবে তাঁদের মানসিক অবস্থা, মনস্তাত্ত্বিক চেতনা ইত্যাদি বিষয়গুলি ব্যক্তিসত্ত্বার সাথে মিলেমিশে রয়েছে, সেখান থেকেই আগ্রহী পাঠককে তা খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মনোজগতে প্রবেশ করছেন এবং তাঁর এই প্রয়াস অনেকাংশেই সচেতন প্রয়াস। এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁদের এহেন প্রয়াসের কারণে তথাকথিত এই নিন্দিত চরিত্রগুলিকে পাঠকসমাজ নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছে।

কোনো ব্যক্তিই প্রথম থেকে নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। বহির্জগতের সাথে মেলামেশার কারণে ধীরে ধীরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্মিত হয়ে হয়ে থাকে। কিন্তু সমাজ, সমাজে প্রচলিত তথাকথিত নিয়মকানুন যখন দেখে যে, কোনো মানুষ সেই নির্ধারিত নিয়মনীতির বাইরে তখনই তাকে বর্জন করে বা পৃথকীকরণ করে আর সেইকারণেই মানুষটির আত্মবিশ্বাস একেবারেই তলানিতে গিয়ে ঠেকে। নিজেকে ‘প্রান্তিক’ ভাবতে সে কার্যতঃ বাধ্য হয়। সমাজের দৃষ্টিতে গণিকারা এই তালিকাতেই পড়েন। আংশিকভাবে তাঁদের নিয়ে, তাঁদের জন্য বহু আন্দোলন, সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলেও সামগ্রিকভাবে তাঁরা ‘একঘরে’ হয়েই রয়ে গেছেন। এক নিরন্তর আত্মগ্লানি সঙ্গী তাঁদের।

মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল মানসিক স্বাস্থ্য। গণিকাদের মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের নির্বাচিত সাহিত্যে আলোচিত হওয়ার বিশেষ উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়নি। আসলে তৎকালীন সময়ের কথা যদি বাদ দিয়েও ধরি তাহলেও ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল, তৃতীয়বিশ্বের দেশে ‘মানসিক স্বাস্থ্য’ নিয়ে সচেতনতা খুব বেশি দেখা যায় না, গণিকাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও অবহেলিত। পেশার কারণেই তাঁরা অনেক বেশি মানসিক অবসাদ, স্নায়বিকদৌর্বল্য, অপরাধবোধ, হীনমন্যতা, একাকীত্বে ভুগতে থাকেন। জীবনযাপনে আগ্রহ, উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। আমরা আগে বলেছি যাঁরা বংশপরম্পরায় এই পেশায় আছেন, তাঁদের পেশাগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করলেও স্বেচ্ছায় এই পেশায় এসেছেন এমন উদাহরণ খুব কম পাওয়া যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে মেয়েটির অসহায়তা ব্যতীত অন্য কিছু চোখে পড়েনা। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ হবে।

নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি ‘বিচারক’ এর মত গল্প যেখানে দয়িতের প্রতারণায় হেমশর্মা নিরুপায় হয়ে এই বৃত্তি বেছে নিয়েছিলেন, ‘আদরিণী’র সৎমা একরকম বাধ্য করেছিলেন তাঁকে এই পেশায় আসতে, ‘তুরুপ’ এর বিনোদিনীকে মিথ্যা অপবাদে অপরাধী সাব্যস্ত করা, ‘কুসুম’ গল্পে কুসুম যে বৃদ্ধকে সেবা করেছেন তিনি তাঁর পেশা জেনে অপমান করেন, ‘মহানগর’ গল্পে অপহৃত চপলাকে তাঁর পিতৃকুল-পতিকুল কেউই গ্রহণ করেননা; তাঁর স্থান হয় কলকাতার পতিতাপল্লিতে। ‘নিষিদ্ধ পল্লী গৃহে গমন’ গল্পে ‘দী’ নিজের মায়ের কারণে বাধ্য হয়ে এই পেশায় এসেছিলেন, ‘আঙ্গুরলতা’ গল্পের নামচরিত্রটির মা পতিতা হলেও আঙ্গুরকে যিনি বিয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সেই নন্দও যখন প্রতারণা করেন তাঁর সাথে তখন বাধ্য হয়েই আঙ্গুর এই পেশায় আসেন –

“আমার মা না হয় পা পিছলে কাদায় পড়েছিল কিন্তু আমি তো সাত-ভাতার করে বেড়াই নি। তখন ফুসফাস করে ভাগিয়ে নিয়ে এলে। কত রস- আদিখ্যেতা, মধুমিছরি কথা- আঙুর তখন বড্ড মিষ্টি, রস টুসটুসে। একাই চাখব, একাই খাব। ফন্দি-ফিকির, ছেনালি কত! শাঁখা পর, সিঁদুর দাও সিঁথিতে। বর-বউ; স্বামী-স্ত্রী আমরা। ভগবান সাক্ষী, যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, এই মাটি সাক্ষী, এই ঘরের চুন, দেওয়ালে ছাদের বন্ধন – এরা সাক্ষী।”^{৫৬}

প্রতারণিত আঙুরের তখন বোধহয় ‘সাত-ভাতারী’ হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

এই সমস্ত উদাহরণগুলিই প্রতারণা, অপমান, বঞ্চনার যার ফলশ্রুতিতে একটি মেয়ে দেহবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ার উদাহরণ। কখনো প্রতারণিত হয়ে এই পেশায় এসেছে আবার কখনো

সে গণিকা বলে তাকে অপমানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়েটি মানসিকভাবে দুর্বল হয়, রক্তাক্ত হয়, ভেঙে পড়ে আর সমাজ তাঁকেই ‘অপরাধী’ সাব্যস্ত করে। এ ছাড়াও Simone De Beauvoir মনে করেছেন যে, পেশার আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিও তাঁদের মানসিক অবসাদের অন্যতম কারণ-

“It is not their moral and psychological situation that makes the prostitutes’ lot hard to bear. It is their material condition that is most often deplorable. Exploited by their pimps and their madams, they live in a state of insecurity.”^{৫৭}

পেশার জন্য যেমন তাঁদের কেউ বিশ্বাস করে না, তেমনি তাঁরাও বোধহয় কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

প্রতিটি মানুষের মনন, তার চিন্তন আলাদা তাই স্বাভাবিকভাবেই তার মনস্তত্ত্বও আলাদা। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকা চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা পেশাজনিত কারণে তাঁদের মধ্যে বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক সংকট লক্ষ্য করতে না পারলেও বাংলা সাহিত্যে আমরা কারণগুলি পড়েছি, জেনেছি। আমাদের গবেষণার বৃত্তে যে চরিত্রগুলি আমরা পেয়েছি তাঁদের মুখে আক্ষেপ শুনেছি, অভিযোগ শুনেছি। সেই আক্ষেপ, অভিযোগের অনেকটাই অদৃষ্টের উদ্দেশ্যে। অনেকে নিশ্চুপে নিজের ভাগ্য বিড়ম্বনাকে মেনে নেয়। আবার কবি উপন্যাসের বসনের মতো প্রশ্ন করে অনেকে-

“কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কি দিয়েছে? না।”^{৫৮}(কবি/পৃ.১৪৫)

আবার কখনো ‘শেষ পারানি’ গল্পের পদ্মের মতো সমাজের মুখে ছুঁড়ে মারে ব্যঙ্গের কশাঘাত-

“ভগবানের গান ফান এখানে চলবে না। ভগবান এ পাড়ায় ঢোকে না, আমরা ঢুকতে দিই না। কেনই বা দেবো বলো? ভগবান আমাদের দিয়েচেটা কী? এই নরকের জঞ্জালে ছুঁড়ে দিয়েচে। নরকেই যাকন এসেচি তাকন এখেন কার মতোই চলব।”^{৫৯}
(বা.গ./পৃ.২৮৫)

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অশ্রুত কণ্ঠস্বর ঔপনিবেশিক বাঙলার বারবানিতা সংস্কৃতি গ্রন্থে “পতিতাদের ‘মন বদলায়’ কি?” শীর্ষক অংশে পতিতাদের মন বদলানোর বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি মূলতঃ গণিকাদের পেশাত্যাগ ও পুনর্বাসনের কথা বলেছেন। সে প্রসঙ্গে আমরা দেখি লেখক গণিকাদের থেকেও বেশি দায়ী করছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে। যে পুরুষের কাছে প্রতারিত হয়ে একটি মেয়ে দেহবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য

হয়েছিল তাঁর পক্ষে কোনোভাবেই সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা একজন পুরুষকে বা বলা ভালো পুরুষের প্রচলিত নিয়মনীতিকে সহজে মেনে নেওয়া, বিশ্বাস করা সম্ভব হয়না। আমরা আমাদের নির্বাচিত সাহিত্যের মধ্যে থেকে এইধরনের উদাহরণ আলোচনা করেছি। তিনি উনিশ শতকের কয়েকটি গণিকাবিবাহের উল্লেখ করে বিশদে বুঝিয়েছেন যে, গণিকাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলেও সমাজ তাঁদের মূল স্রোতে ফিরে আসতে দেয়না^{৬০}। ফলে বাধ্য হয়ে দৈন্যে, দারিদ্র্যে দিন অতিবাহিত করতে হয় বলে অনেকেই সুযোগ পেয়েও এই বৃত্তি ত্যাগ করেন না। আবার তিনি এও বলেছেন হয়তো ‘বারাঙ্গনা’রা কিছুটা স্বাধীনতা উপভোগ করতেন বলেই বোধহয় এই পেশা ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, সবাই না হলেও অন্ততঃ কিছু জন তো অবশ্যই^{৬১}।

নিজেদের পেশার জন্য অনেক সময় এঁরা নিজেদের দোষী সাব্যস্ত করে, সংকুচিত হয়ে থাকেন। ‘আঁধারে আলো’ গল্পের বিজলীর ভাবনাতে তারই প্রতিফলন দেখি-

“অপরাধের শতকোটি চিহ্ন সর্বাপেক্ষে মাখিয়া বিচারের সুমুখে দাঁড়াইয়া, আজ কি করিয়া সে মুখে আনিবে, অপরাধ করাই তার পেশা বটে, কিন্তু এবার সে নির্দোষ!...”^{৬২}(বা.গ./পৃ.৩০)

তবে সময় বদলেছে তার সাথে সাথে বদল এসেছে দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিস্থিতির আর তাই এযুগের গণিকারা সোচ্চারে নিজেদের দেহবিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতে পারেন^{৬৩}।

সময়ের সাথে সাথে একজন গণিকাকে তাঁর দৈহিক রূপজ আকর্ষণ আর কলাবিদ্যায় পারদর্শিতার বাইরে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ নারী রূপে বা আরও ভালো করে বললে একজন মানুষ হিসেবে দেখা ও বিচার করা শুরু হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের গণিকা থেকে বাংলা সাহিত্যের গণিকা--এই অভিব্যাপ্তি যেন সেই উদার যাত্রার চিহ্ন বহন করে চলেছে নিজের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। বাংলা সাহিত্যের গণিকারা আরও বেশি “মানবী”ক হয়ে উঠেছেন সময়ের সাথে সাথে। চিরাচরিত শাস্ত্রনির্মিত ছকের বাইরে গিয়ে ব্যক্তি হিসেবে উত্তরণ হয়েছে তাঁদের। সমাজের দৃষ্টিতে তাঁদের অবস্থানগত অবনমন হয়েছে একথা সত্য কিন্তু সাহিত্যে তাঁদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, তাঁদের পাওয়া-না পাওয়া, ভালোবাসা, ত্যাগ এই সবকিছু অনেক বেশি বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের প্রতি সহানুভূতির একটা যাত্রাপথ সাহিত্যিকরা তৈরি করে দিয়েছেন বললে অত্যাুক্তি হয় না।

অন্ত্যটীকা ও তথ্যসূচি

১। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ‘না পাঠানো চিঠি’, *সুনীলের কবিতা* (সেই মুহূর্তে নীরা)।

২। R.P. Kangle, *The Kauṭīlīya Arthaśāstra*, p. 82:

“গণিকাপুত্রান্ রঙ্গোপজীবিনাং চ মুখ্যান্নিস্পাদয়েয়ুঃ, সর্বতালাবচারণাং চ।২৯।

৩। M.R. Kale, *The Mṛichchhakatika* of Śūdraka, p.321:

“He is that well-known grandson of the merchant Vinayadatta, and the son of Sagardatta, who is called the worthy Charudatta, and whose name it is auspicious to invoke; - he who dwells in the merchants’ quarter.”

৪। *Ibid.* p. 346.

৫। তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নিষিদ্ধ*, পৃ.৫২।

৬। *তদেব*, পৃ.৪০।

৭। শংকর, *জন-অরণ্য*, পৃ. ১১০।

৮। মৌ ভট্টাচার্য (সম্পা.), *বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ*, ‘বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি’, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃ.৩৯।

৯। বারিদবরণ ঘোষ, *বারবনিতাদের গল্প*, ‘বান্ধিজী’, পৃ.১৭১।

১০। *তদেব*, পৃ.১৭৩।

১১। *তদেব*, ‘মাণ্ডল’, পৃ. ২১৫।

১২। *তদেব*, পৃ.২১৬।

১৩। *তদেব*, ‘নিষিদ্ধ পঙ্কী গৃহে গমন’, পৃ.২৩৪।

১৪। *তদেব*, ‘কুসুম’, পৃ.৭৮।

১৫। স্মরজিৎ জানা, ‘যৌনকাজ কি কাজ?’, *যৌনতা ও সংস্কৃতি*, পৃ.৩৪১।

১৬। M.R. KALE, *Op.cit.* p.168.

১৭। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘কুসুম’, পৃ.৭৮।

১৮। তদেব, 'নিষিদ্ধ পঙ্খী গৃহে গমন', পৃ.২৩৬।

১৯। রাজনারায়ণ বসু, *সেকাল আর একাল*, পৃ.৬২-৬৩:

“সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত।”

২০। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, *শুকসংগৃহীত*, পৃ.১২১:

‘সা চাপরেণ সুবুদ্ধিনাম্না বণিজা সহ রমতে।’

২১। as cited in Simone De Beauvoir, *The Second Sex*, p. 569:

‘Viewed from the standpoint, her positions correspondes with that of the married woman. In La Puberté Marro says: ‘The only difference between women who sell themselves in prostitution and those who sell themselves in marriage is in the price and the length of time the contract runs.’

২২। M.R. KALE, *Op.cit.* p.108.

২৩। *Ibid.* p. 402.

২৪। *Ibid.* notes Act X, p.595.

২৫। *Ibid.* p.142.

২৬। কল্হন, *রাজতরঙ্গিনী* (অনু. হরিলাল চট্টোপাধ্যায়, সম্পা. অমিত ভট্টাচার্য), পৃ. ১১৮।

২৭। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *অশ্রুত কণ্ঠস্বর ঔপনিবেশিক বাঙলার বারবনিতা সংস্কৃতি*, পৃ.৩৫-৩৬।

২৮। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘আদরিণী’, পৃ. ৫৮।

২৯। তদেব, ‘নিষিদ্ধ পঙ্খী গৃহে গমন’, পৃ.২৩৬।

৩০। খানাবদোশ যাযাবর সম্প্রদায়- ‘খানা’ উর্দু শব্দ, অর্থ গৃহ। যে ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায়ের কোনো নির্দিষ্ট বা স্থায়ী গৃহ থাকে না। এঁরা মূলতঃ ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায়।

৩১। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘পটের বিবি’, পৃ. ২৭৩।

৩২। তদেব, ‘একজিবিশন’, পৃ.২০৬।

৩৩। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড।। প-হ, পৃ.১৫০৭:

‘বারবধূ’- বেশ্যা ।

৩৪। ত্রিদিবনাথ রায়, *কামসূত্র*, পৃ. ১৮৯।

৩৫। M.R. KALE. *Op.cit.* pp.286.

৩৬। ত্রিদিবনাথ রায়, দামোদর গুপ্ত, *কুটনীমতম্*, পৃ. ২৯।

৩৭। *তদেব*, পৃ. ১০৩:

“নো ধনলাভো লাভো লাভঃ খলু বহ্নভেন সংযোগঃ।

অক্ষিগতার্থাণ্ডিন ভবতি মনসঃ প্রসাদায়।।” (কুটনী. /৫৪৭)

৩৮। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘বিচারক’, পৃ. ৭।

৩৯। *তদেব*, ‘পহেলি পেয়ার’, পৃ. ৩২৮।

৪০। ত্রিদিবনাথ রায়, দামোদর গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

৪১। অয়ন্তিকা সরকার, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ।

৪২। M.R. KALE *Op.cit.* pp.218:

দারক - “রদনিকে অলীকং ত্বং ভণসি। যদ্যস্মাকমার্যা জননী তৎকিমর্থমলংকৃতা।”

৪৩। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘তুরূপ’, পৃ. ৬৭।

৪৪। *তদেব*, পৃ. ৭২।

৪৫। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘মেলা’, পৃ. ১১১।

৪৬। *তদেব*, পৃ. ১১৩।

৪৭। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘মহানগর’, পৃ. ১৩৯।

৪৮। শংকর, *জন-অরণ্য*, পৃ. ১১৬-১১৭।

৪৯। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘কুসুম’, পৃ. ৮২।

৫০। *তদেব*, ‘বারবধূ’, পৃ. ১৬০।

৫১। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘পতিতার পত্র’, পৃ. ১২৩।

৫২। *তদেব*, ‘বিদ্যুৎলতা’, পৃ. ১৮৫।

৫৩। M.R. KALE, *Op.cit.* pp.149.

৫৪। বারিদবরণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, ‘স্পর্শ’, পৃ. ৩১৪।

৫৫। R.P. Kangle, *op.cit.*, p.161:

“If a (man) robs a courtesan of her ornaments, her goods or the payment due to her, her shall be fined eight times (the amount).”

৫৬। বারিদবরণ ঘোষ, প্রাগুক্ত, ‘আঙুরলতা’, পৃ.২৯৩।

৫৭। Simone De Beauvoir, *Op.cit.* p.578.

৫৮। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, পৃ.১৪৫।

৫৯। বারিদবরণ ঘোষ, প্রাগুক্ত, ‘শেষ পারানি’, পৃ.২৮৫।

৬০। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃপৃ. ১৫৪-১৫৫।

৬১। তদেব, পৃপৃ. ১৫৬-১৫৭:

“ভদ্রলোক সমাজের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা কতটা নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবেন আর কতটা নিজেদের দাসত্বে বিক্রি করবেন-এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তঁরা জর্জরিত ছিলেন। বারবনিতালয়ে বাড়িওয়ালির কর্তৃত্ব, খদ্দেরদের দাবি, পুলিশের হেনস্থা- এ সব সত্ত্বেও সে যুগে দেহোপজীবিনীরা বোধ হয় কিছুটা স্বাধীনতা উপভোগ করতেন। স্বচ্ছন্দে রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে, আত্রুর শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবার অধিকার ছিল। এর থেকেও বড়ো- সে যুগের নাট্যমঞ্চ তঁদের সামনে একটা বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল। তঁদের সাংগীতিক ও অভিনয় ক্ষমতার আত্মপ্রকাশের রাস্তা তৈরি করে।”

৬২। বারিদবরণ ঘোষ, প্রাগুক্ত, ‘আঁধারে আলো’, পৃ.৩০।

৬৩। <https://thewire.in/woman/photo-essay-sonagachi-sex-work> accessed on 21st December 2023 on 11.58 p.m .

শেষের কথা

সাধারণতঃ কোনো শোধপত্রের অন্তিম অধ্যায়টির শীর্ষক হয় ‘উপসংহার’ যেখানে গবেষণালব্ধ ফলাফলকে সিংহাবলোকনে দেখা হয়, অথচ বস্তুতঃ তাকে ‘উপসংহার’ বলা চলেনা। ‘উপসংহার’ অর্থাৎ বক্তব্যবিষয়ের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘোষণায় গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তকে নিঃসন্দেহতার সঙ্গে সবসময় উপস্থাপন করা সম্ভবপর হয়না। এ কথা কলাশাখার গবেষণার ক্ষেত্রে তো বটেই, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্য ইত্যাদি যে কোনো শাখার গবেষণার ক্ষেত্রেই সময় সময় সত্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণেই এই অধ্যায়টিকে আমরা চিরাচরিত ‘উপসংহার’ না বলে ‘শেষের কথা’- শিরোনাম দিয়েছি যার উদ্দেশ্য গবেষণাসংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত।

আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সেই ক্রমানুযায়ী আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের প্রথমে রয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

অধ্যায়সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা:

প্রথম অধ্যায়ে এই বৃত্তির প্রাচীনত্ব, বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রে, কাব্যে গণিকাবৃত্তির উদাহরণ, তাঁদের বিবিধ পর্যায় উল্লেখ করেছি। গণিকাবৃত্তির প্রাচীনত্ব নির্দিষ্ট করে নির্ধারণ করা দুষ্কর কিন্তু সমগ্র বিশ্ব তথা ভারতবর্ষে এই বৃত্তি যে সুপ্রাচীন তা স্বীকৃত। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে *রামায়ণ-মহাভারত*দি মহাকাব্যে, *পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্রে* বর্ণিত নিয়মকানূনের বর্ণনায়, আবার বিবিধ কামশাস্ত্রে গণিকা ও তাঁদের পেশার বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত শাস্ত্রে নানাবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে এঁদের বর্ণনা রয়েছে। এইসমস্ত গ্রন্থে তাঁদের যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে *কামসূত্র* ও *অর্থশাস্ত্র*- এই দুটি শাস্ত্রের আলোকে গণিকা ও তাঁদের বৃত্তিসম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের উল্লেখ ও সেইসময়ের নিরিখে তাঁদের অবস্থান বর্ণিত হয়েছে। *কামসূত্রে* গণিকার লক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ ও পেশাগত যাবতীয় বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে* রয়েছে রাজা, রাজতন্ত্রের সঙ্গে এই বৃত্তি অবলম্বনকারিণীদের সংযোগ, তাঁদের

অর্থনৈতিক অবস্থানাদি বিষয়। আচার্য বাৎসর্যয়ন তাঁর গ্রন্থটিকে বিষয়ানুসারে সাতটি অধিকরণে বিভক্ত করেছিলেন। চতুর্থ অধিকরণটি ‘বৈশিকাধিকরণ’ নামে পরিচিত যেটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। একজন গণিকার কর্মপদ্ধতি কোন ক্রমানুযায়ী হওয়া উচিত এবং কেন সেটি আদর্শ তা বৈশিকাধিকরণ নিবিড়ভাবে পাঠ করলে বোঝা যায়। মহামতি আচার্য কৌটিল্য তাঁর *অর্থশাস্ত্রে* সমাজে বসবাসকারী প্রায় সব ধরনের পেশার মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন আর সেই সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গণিকাদের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। *অর্থশাস্ত্র*-র দ্বিতীয় অধিকরণ ‘অধ্যক্ষপ্রচার’-এর সপ্তবিংশ অধ্যায় হলো গণিকাধ্যক্ষ। কৌটিল্য গণিকাদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন; তাঁদের কাজের শ্রেণীবিভাগ করেছেন, শ্রেণী অনুযায়ী তাঁদের কার্যক্রম, উপার্জনের পরিমাণের যেমন উল্লেখ আছে, তেমনি কোনো গণিকা যদি মুক্ত হতে চান তাহলে কী উপায় অনুসৃত হবে সেকথাও তিনি বলেছেন।

এই অধ্যায়ে যে দুটি সংস্কৃত-শাস্ত্র আলোচিত হয়েছে সেই *কামসূত্র* ও *অর্থশাস্ত্র* থেকে আমরা তৎকালীন যুগে গণিকাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থান সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারি।

তৃতীয় অধ্যায়ে সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্যের চারটি গ্রন্থে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্র, তাঁদের জীবনযাপন, তাঁদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত দিকগুলির বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শূদ্রক রচিত *মৃচ্ছকটিক*, দামোদর গুপ্তের *কুটনীমত*, চতুর্ভাণী (শূদ্রকের *পদ্মপ্রভূতক*, বররুচির *উভয়াভিসারিকা*, শ্যামিলক বিরচিত *পাদতাড়িতক* ও ঈশ্বরদত্তের *ধৃতবিটসংবাদ*- এই চারটি ভাণকে একত্রে *চতুর্ভাণী* বলা হয়) আর *শুকসমুতি* সত্তরটি গল্পের মূল সংকলন; যেটি জৈনাচার্য পূর্ণভদ্রের রচনা মনে করা হলেও চিন্তামণি ভট্টের নামে প্রচলিত সংস্কৃত সংকলনটি আমরা নির্বাচন করেছি। প্রথম তিনটি কাব্যে বংশানুক্রমে গণিকাবৃত্তিগ্রহণকারিণীদের কাহিনী বর্ণিত আছে। তাঁদের পেশাগত পরিচয়, গণিকাপল্লীর অনুপুঞ্জ বিবরণ, গম্য-বিট-চেট-কুটনী প্রভৃতি এই পেশার সাথে যুক্ত প্রায় সবধরনের চরিত্রগুলির উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে এই কাব্যগুলিতে। চতুর্থ গ্রন্থটি তুলনায় ব্যতিক্রম। পূর্বে গণিকাবৃত্তিগ্রহণের যে সমস্ত কারণগুলি বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল স্বেচ্ছায় অন্য পুরুষের সঙ্গে দৈহিকসম্পর্ক কিন্তু তা অর্থের বিনিময়ে নয় কেবলমাত্র শারীরিক সম্পর্কের কারণে। তথাকথিত অর্থে গণিকা না হলেও সমাজের চোখে এরা আরও নিন্দনীয়।

শাস্ত্রের প্রদত্ত বর্ণনার সাথে সৃজনশীল সাহিত্যে কবির বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচিত সময়সীমার মধ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যের গণিকাদের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থানের বর্ণনা রয়েছে। সময়সীমা নির্বাচনের কারণ ও বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত সময়সীমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছি। এই সময়ের মধ্যে লিখিত মোট দশটি ভিন্নধর্মী সাহিত্যকর্মকে বেছে নিয়েছি আমরা এবং সেগুলিতে বর্ণিত অসংখ্য গণিকাচরিত্রগুলির আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান বিশ্লেষণ করেছি। একজন গণিকার জীবনের পেশাগত ও ব্যক্তিগত দুটি দিকই কাহিনীগুলিতে থেকে আমরা পেয়েছি। যে অভিব্যাপ্তির অনুসন্ধান আমরা করতে চেয়েছি তার সূত্রপাত হয়েছে এই অধ্যায়টি থেকে।

পঞ্চম অধ্যায়ে গণিকাদের পেশাগত অভিব্যাপ্তিগুলি আমরা আলোচনা করেছি। পেশাগ্রহণের কারণ, শিক্ষা, চৌষটি কলা এবং তার চর্চা, গণিকাদের সাথে অপরাধের যোগ, আইনী ব্যবস্থা, কুটনীতি, তাঁদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও সেইসংক্রান্ত সচেতনতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি ইত্যাদি কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। একেবারে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বৃত্তি হিসেবে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সৃজনশীল সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকাদের পেশাদারিত্ব এবং নির্বাচিত সময়ের মধ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যের গণিকাদের পেশাগত জীবনের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে ব্যক্তিগত তথা মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তির আলোচনা। বৃত্তিকেন্দ্রিক অভিব্যাপ্তি অনুসন্ধানের মাধ্যমে শুধুমাত্র একমাত্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্তে আসার জন্য বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পারিবারিক অভিব্যাপ্তি (কন্যা-প্রেমিকা-বধূ-মাতা), ব্যক্তিসত্তার অভিব্যাপ্তি, মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তি – তিনটি ভাগে ভাগ করেছি। সম্পূর্ণভাবে একে অন্যের থেকে পৃথক অভিব্যাপ্তির এই স্তরগুলি। এই পর্যায়ে আমরা পেশাগত সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে একজন স্বতন্ত্র নারীসত্তারূপে এই চরিত্রগুলিকে দেখতে চেয়েছি। প্রাচীন যুগ আর আমাদের নির্বাচিত সময়ের মধ্যে শুধু একজন গণিকা নয়, নারী হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে তাঁদের যে অভিব্যাপ্তি সেটি এই অধ্যায়ে ফিরে দেখতে চেয়েছি আমরা।

গবেষণালব্ধ ফলাফল পর্যালোচনা:

এই পর্বে আমরা আমাদের অনুসন্ধানের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছি অর্থাৎ যা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তার যথাযথ অনুসন্ধান আমরা করতে পেরেছি কিনা, কোনোরকম সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছি কিনা সেগুলি উল্লিখিত হয়েছে। অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তাকারে আগে বলা হয়েছে। এখানে আমরা তুলে ধরেছি এমন কিছু বিষয়, যেগুলি মূল অধ্যায়গুলিতে অনালোচিত রয়ে গেছে।

দুটি ভিন্ন ভাষার সাহিত্যে গণিকাদের যে চিত্র আমরা পেয়েছি তাতে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে উপস্থাপিত গণিকাচরিত্রগুলির প্রতি একটি বাঁধাধরা দৃষ্টিভঙ্গীই মূলতঃ আমাদের চোখে পড়েছে। তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের জ্ঞান, বিবিধ কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা, বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য তাঁদের সমাজে উচ্চাঙ্গ দিচ্ছে। রাজতন্ত্রে, রাষ্ট্রযন্ত্রে গণিকাদের যথেষ্ট উচ্চ অবস্থান ছিল এমনকি রাষ্ট্র তাঁদের নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতো। বিষয়টিকে আমরা কতকটা এরকমভাবে ভাবতে পারি, তৎকালীন আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁদের অবস্থান এতখানি জোরালো ছিল যে, সেইসময়ের ইতিহাসে এঁদের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি প্রায় সবকিছু ক্ষেত্রেই একথা বলা চলে। শুধু তাই নয়, প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নিরিখে একথা বললেও খুব ভুল হবে না যে, গণিকারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ছিলেন। যদি এই বৃত্তিটিকে আমরা ন্যায়-নীতি, উচিত-অনুচিতের বাইরে কেবলমাত্র একটি জীবিকা হিসেবে বিচার করি তাহলে দেখবো গণিকারা আদতে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নারী। কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত হলেও সবার ক্ষেত্রে সেকথা প্রযোজ্য ছিল না। গণিকাদের সম্পর্কে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তাঁদের বৃত্তিতে মাতৃতন্ত্রের সুর শোনা যায়। অবশ্যই একথা বলতেই হয় পুরুষেরা এই পেশার অন্যতম ধারক ও বাহক এবং এই পেশার সাথে বিভিন্ন পুরুষ যুক্ত থাকেন। কিন্তু প্রধানতঃ নারীরাই এই পেশায় যুক্ত মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করেন। যেমন আমরা ‘কুউনী’ বা গণিকামাতার মত চরিত্র দেখেছি। তাঁদের অর্থনৈতিক-স্বাবলম্বন, স্বাধীন যৌনতা ও যৌনসম্পর্কের বোধ, যৌনসঙ্গী নির্বাচনের অধিকার (কয়েকটি ক্ষেত্রে) পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে কিছুটা হলেও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করেছিল আর সেই কারণেই সেইসময়ের পুরুষলেখকের লেখায় তা সে শাস্ত্রই হোক কিংবা সাহিত্য গণিকামাত্রেরই প্রতারণা-প্রবঞ্চক। বসন্তসেনা,

আম্রপালীর মতো চরিত্র তাই সেখানে ব্যতিক্রম। পেশাগত কোনো মালিন্য তাঁদের স্পর্শ করেনা। কিন্তু দেহবৃত্তির বাইরে শিল্পকলা-সঙ্গীত-নৃত্যাদি ও আরও নানাবিধ চারুকলার বাহকরূপে, সংরক্ষকরূপে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান (সামাজিক সম্মান, রাজার স্বীকৃতি ইত্যাদি) পেলেও কোথাও যেন মনে হয় এই বিষয়গুলি চর্চা করার একমাত্র উদ্দেশ্য পেশাগত সমৃদ্ধিলাভ, পুরুষের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে অর্থোপার্জন। এ ব্যতীত যেন এগুলির অন্য কোনো সার্থকতা নেই। আমাদের মনে হয়েছে হয়তো সেই কারণেই সংস্কৃত শাস্ত্র ও সৃজনশীল সাহিত্যে গণিকাদের ব্যক্তিগত জীবন ও মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি বিশদে আলোচিত হয়নি যতখানি তাঁদের পেশাগত দিকটি আলোচিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সময়ের সাথে সাথে লেখকের সহানুভূতির দৃষ্টি গণিকাদের ঘিরে রেখেছে। পেশাগত পরিচয়ের বাইরে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে তাঁদের ব্যক্তিসত্তা, তাঁদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও সবকিছুর আগে তাঁদের পেশাগ্রহণের কারণটি খুঁজে দেখা। যে দীর্ঘ সময়সীমাটি আমরা বেছে নিয়েছি তাতে মেয়েদের এই পেশাটিতে আসার কিংবা পেশাগ্রহণের অনেক কারণ দেখতে পাওয়া গেছে। বংশানুক্রমিকভাবে যাঁরা এই পেশায় এসেছিলেন তাঁদের এই পেশায় আসার উৎসমুখ খুঁজলেও সেই একই কারণগুলির পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হবে, এ যেন চক্রাকার ঘূর্ণন কেবল। কৌলীন্য প্রথা-বাল্য বিবাহ-বহু বিবাহ, নিতান্ত বালিকা বা কিশোরী অবস্থায় বৈধব্যযন্ত্রণা, বৈধব্যযাপনের নিদারুণ কষ্ট- বাইরের পৃথিবীর আহ্বান, প্রেম সম্পর্কে জড়িয়ে পরে প্রতারিত হওয়া, প্রত্যাখ্যাত হওয়া। গৃহত্যাগ করার কারণে মেয়েটির আর ঘরে ফিরে যাওয়ার উপায় থাকেনা বাধ্যতঃ সে বেছে নেয় দেহবৃত্তি। দেশভাগের পরে অগণিত মানুষের ভিটেমাটি ছাড়া হওয়ার যন্ত্রণা, ধর্ষিতা- অপহৃত মেয়েদের কপালে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই যেন। কখনো পরিবারের সকলের অন্নসংস্থানের জন্য তাঁদের এই বৃত্তিতে আসতে হয়েছিল।

দেহবৃত্তি অবলম্বনকারিণীদের ছাড়া সমাজের চলেনা আবার তাঁদের অপরাধী করে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেও সমাজের বাধেনা। প্রাচীন সাহিত্যে যেমন উৎসবে-অনুষ্ঠানে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হতো দেখেছি। সেরকম উদাহরণ বাংলা সাহিত্যেও দেখা যায়। বিভিন্ন সামাজিক

উৎসব-অনুষ্ঠানে, মেলায় তাঁদের নিয়ে যাওয়া হতো কারণ তাঁদের প্রতি পুরুষ আকর্ষণবোধ করে সুতরাং অধিক জনসমাগমের উদ্দেশ্যে তাঁদের আহ্বান জানানো হতো।

বাস্তবে পতিতা নারীরা সমাজের দৃষ্টিতে অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য হলেও তাঁদের সমাজসচেতনতার বেশ কিছু উদাহরণও আমরা পেয়েছি। অসহযোগ আন্দোলনের মত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবী হয়ে, শোভাযাত্রার আয়োজনের মাধ্যমে, স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে, চরকায় সুতো কেটে তাঁরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরিণামে সর্বদা সদর্থক হয়নি কিন্তু তাঁদের চেষ্টাটুকু আন্তরিক ছিল। তারকেশ্বর সত্যগ্রহ, উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত মানুষদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ তাঁরা করেছেন। অন্যদিকে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা বিনোদিনী, তিনকড়ি দেবীরা এই পেশাতেই যুক্ত ছিলেন। আবার মানদা দেবী, বিনোদিনী দেবীরা নিজেদের জীবনী লিখেছিলেন যেগুলি একজন পতিতার জীবনের প্রকৃত তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে এমন কাব্যের প্রকারভেদ নির্দিষ্ট করে উল্লিখিত আছে যেগুলিতে ‘গণিকা’ নায়িকা হতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাঁদের নামে কোনো কাব্যের নামকরণ লক্ষিত হয়নি। কুটনীমত বা সময়মাতৃকা অথবা চারুদত্ত বা মুচ্ছকটিক এই উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে গণিকারা নায়িকা হয়েছেন, তাঁদের নিয়ে কাব্য লেখা হয়েছে কিন্তু তার পরেও তাঁদের নামে নামকরণ হয়নি। সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণিকাবৃত্তির নেতিবাচক দিক, ইত্যাদির ব্যাখ্যা করাই যেন কাব্যগুলির মূল উদ্দেশ্য। গণিকারা কাব্যে এসেছেন কারণ সমাজে তাঁদের উপস্থিতি অনস্বীকার্য, কাহিনীর স্বাভাবিক অনুসঙ্গে তাঁরা এসেছেন। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখি একইভাবে তাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে এই পেশার কারণে সমাজের অবক্ষয়িত রূপ, সামাজিকদের ভোগবিলাস ইত্যাদির চিত্র বর্ণিত হয়েছে অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের উপস্থিতি কাহিনীর ঘটনাক্রম নিয়ন্ত্রণ করেছে। আরো পরে আমরা দেখেছি ‘বিদ্যুৎলতা’, ‘আঙুরলতা’, ‘কুসুম’ ইত্যাদি গল্পে নায়িকার নামে নামকরণ করা হয়েছে। কোথাও ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যার নায়িকা একজন গণিকা আবার কোথাও গণিকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য তাঁদের নায়িকা করে কাহিনী রচনা করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে দৃষ্টিভঙ্গী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, চরিত্রগত উপস্থাপনার বদল হয়েছে। সদর্থক

বা নঞর্থক যাই হোক না কেন তাদেরকেই মূল চরিত্র করে, তাঁদের নামেই নামকরণ করে কাহিনী লেখার প্রবণতা লক্ষিত হয় যা ব্যতিক্রম অবশ্যই।

এই পেশা দেশ-কাল-সময়ের সীমারেখার উর্ধ্বে। এমনকি জাতি-ধর্ম-শ্রেণীর উর্ধ্বে। সময়ের সাথে সাথে সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরের নারীরা কোনো না কোনো কারণে এই পেশা বেছে নিয়েছেন। মনুষ্যকৃত দুর্ভোগ (প্রতারণা-প্রবঞ্চনা), অপহরণ-পাচার, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি এক বা একাধিক কারণ এই পেশা বেছে নেওয়ার পেছনে থাকতে পারে। তবে শুধুমাত্র অসহায় অবস্থার কারণেই নয় নিজের জীবনযাপনের মান আরও উন্নত করার জন্যও স্বেচ্ছায় এই পেশায় আসার সংখ্যা খুব একটা নগণ্য নয়। মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত গৃহবধূ সমাজে নিজের আর্থিক উপস্থিতি তথাকথিত উন্নত করার জন্য এই পেশায় এসেছেন। সাহিত্যের উদাহরণ শংকরের *জন-অরণ্য* আর খুব সাম্প্রতিক সময়ের চলচ্চিত্রে একই উদাহরণ দেখা যায়।^২ আদতে বিষয়টি হল শরীর নিয়ে কোনো ছুঁৎমার্গ না থাকা বা ‘আমার শরীরের মালিকানা একান্তই আমার’- এই বোধ কাজ করলে আবার কখনো দেহ কেবল পণ্যমাত্র তাকে ব্যবহার করে, কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করে নিজের আরও একটু ভালো থাকার ব্যবস্থা করা আদতেও অপরাধ কিনা সেসব নিয়ে মতান্তর থাকা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যখন পরিবার প্রতিপালনের জন্য মেয়েটিকে এই উপায় অবলম্বন করতে হয় তখন আরও বেশি করেই যেন সমাজ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়।^৩

যখন কেউ নিতান্ত বাধ্য হয়ে এই পেশাকে বেছে নেন তাঁর প্রতি সমাজ সামান্য হলেও করুণার দৃষ্টি রাখে কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠে যখন কেউ নিজের সুখের জন্য; বলা যায় বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য এই পেশায় আসেন তখন তাঁর জন্য ঘৃণা ও নিন্দা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা।

এই বৃত্তিটির বৈধতা বা বলা ভালো আইনসম্মতভাবে বিধিবদ্ধ করার প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের উকিল Suneita Ojha বলছেন, যদি তা করা হয় তবে তাঁদের পক্ষে সরকারী সুবিধা পাওয়া সহজ হয় আবার পাশাপাশি যাঁরা এই পেশা থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন।^৪

যাঁরা স্বেচ্ছায় এই পেশায় এসেছেন তাঁরা ছাড়া অন্যান্য কারণে এই পেশায় আসা মেয়েদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন যতদিন না সামগ্রিকভাবে নারীজাতির মধ্যে আসবে ততদিন গণিকাবৃত্তি নির্মূল করা যাবে না। যদিও সেই বিষয়ে এই পেশাবলম্বনকারিণীরা নিজেরাও সন্দেহান।^৭ নারী-শিশুপাচার, ধর্ষণ, গার্হস্থ্য-হিংসা, প্রতারণার মত অপরাধের সংখ্যা যত বাড়ছে সেইরকমভাবে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের বড় শহর এমনকি শহরতলিগুলিতেও অল্পবয়সী স্কুল-কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের এই পেশার আসার পরিমাণও অনেকখানি বেড়েছে।^৮ বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। আবার কোভিড-১৯ এর কারণে দীর্ঘসময় লকডাউনের ফলে অজস্র মানুষ কাজ হারিয়েছিলেন। যৌনকর্মীরাও তার ভুক্তভোগী অথচ সেইসময়ে বিপুল সংখ্যক মহিলারা দেহবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন নিতান্ত নিরুপায় হয়েই।^৯

সমাজের দাগিয়ে দেওয়া ‘দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক’ বা ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’ এর পরিচয় মুছে মেয়েদের আত্মসচেতন হয়ে ওঠা অনেক বেশি জরুরী কারণ প্রকৃত শিক্ষা ও আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তি দুটি শব্দ হলেই পারিপার্শ্বিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-তাত্ত্বিক ও মানসিক সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। মেয়েদের শরীর ব্যবহার করে জীবনযাপনের যে ধারণা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের (যার বাহক নারী-পুরুষ উভয়েই) মধ্যে রয়েছে সেই মানসিকতার বদল হলে তবেই ‘নারীমাংস’ বা ‘কাঁচাচামড়া’-র ব্যবসা বন্ধ হবে। নারীমাত্রই ভোগের বস্তু এই ধারণার পরিবর্তন হলে দেহবৃত্তি একেবারে লুপ্ত না হলেও কম হওয়া সম্ভব। মেয়েদের উদ্দেশ্যে সহজেই যৌনগন্ধী শব্দের প্রয়োগ, ‘বেশ্যা’, ‘পতিতা’-র মত অপমানজনক শব্দের উচ্চারণ বন্ধ হবে আর একাজে পরিবার-সমাজ-সরকারের একত্রিত প্রয়াসই হতে পারে চাবিকাঠি। খুব সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ‘সেক্স ওয়াকার’-এর পরিবর্তে ‘ট্র্যাফিকড ভিক্টিম’ শব্দবন্ধ ব্যবহার(হ্যান্ডবুক অন কমব্যাটিং জেন্ডার স্টিরিওটাইপ) করার কথা বলা হয়েছে এবং কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, অধিকাংশ মহিলারাই কোনো না কোনো কারণে এই পেশায় আসেন; স্বেচ্ছায় এই পেশায় আসা মহিলাদের সংখ্যা তুলনায় কম। তাই ‘সেক্স ওয়াকার’-এর পরিবর্তে ব্যবহার্য প্রস্তাবিত শব্দতালিকা –

১) ট্র্যাফিকড ভিক্টিম বা সারভাইভার (পাচার হওয়া মহিলা)

২) উওম্যান এনগেজড ইন কমার্শিয়াল সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি (স্বেচ্ছায় যুক্ত)

৩) উওম্যান ফোর্সড ইন টু কমার্শিয়াল সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন (জোর করে পেশায় যুক্ত)

এই সদর্থক পদক্ষেপের ফলে সমাজ, আইন সব থেকেই দেহবৃত্তি অবলম্বনকারিণী মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বদল হবে এমন আশা আমরা করতে পারি।^৮

আগামী গবেষণা-চিন্তাসূত্রের রূপরেখা:

একজন গবেষক যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন সেই নির্দিষ্ট গবেষণাটি সম্পন্ন হলেও তার থেকে আরও অসংখ্য গবেষণাযোগ্য বিষয়ের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। একটি বিষয়ের মধ্যে আরও অনেক সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে তাই এই গবেষণা পরবর্তী গবেষকদের নতুন চিন্তাসূত্র নির্মাণে সহায়ক হতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের গবেষণার সাহায্যে ভবিষ্যতে গণিকাবৃত্তির অভিব্যাপ্তি বিষয়ক আরও ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা সম্ভব। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সৃজনশীল সাহিত্যে যে গণিকাচরিত্রগুলি আমরা পেয়েছি ও এই বৃত্তির প্রকৃতিসংক্রান্ত আলোচনা আমরা দেখেছি তার সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার (১৯৪০-১৯৭৫ খ্রি.) বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্রগুলি অভিব্যাপ্তি নির্মাণ করার প্রয়াস করেছি আমরা। এই সময়সীমা ব্যতীত অন্য সময়ের বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত গণিকাচরিত্রগুলি কীভাবে অভিব্যাপ্ত হয়েছে তা নির্ণয় করা যেতে পারে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এই পেশার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রাচীন যুগের সাথে তার তুলনামূলক আলোচনা গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে এবং এই গবেষণা সাহিত্যনির্ভর বা সমাজতত্ত্বের নিরিখেও হতে পারে।

শুধু বাংলা সাহিত্য নয়; অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যে এই বৃত্তি কীভাবে অভিব্যাপ্ত হয়েছে সেটি গবেষণার বিষয় হতে পারে। দেশভাগ যেমন বাংলার বুকে ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে ঠিক সেরকমই ভারতের উত্তর ও উত্তরপশ্চিম সীমানার মানুষেরাও এই যন্ত্রণার শরিক। অগণিত মানুষ কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন আর মেয়েদের ভাগ্য তো চিরকাল বিড়ম্বিত তাই দেশ-কালের সীমার পরিবর্তন হলেও তাঁদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়না। শরীরের অতিরিক্ত তাঁদের যেন অন্য পরিচয় নেই। ফলতঃ অনেককেই অনিবার্য ফলশ্রুতি

হিসেবে দেহবৃত্তি বেছে নিতে হয়েছিল, যার উল্লেখ রয়েছে বহু সাহিত্যে।^{১৮} সেই সব সাহিত্যের চরিত্রগুলির সাথে সংস্কৃত শাস্ত্র তথা সাহিত্যের চরিত্রগুলির অভিব্যক্তি খুঁজে দেখা যেতে পারে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যে উপস্থিত গণিকাচরিত্রগুলির সাথে সংস্কৃত শাস্ত্র তথা সাহিত্যের চরিত্রগুলির অভিব্যক্তির অনুসন্ধানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে।

আয়তনের সীমাবদ্ধতার আমরা কেবলমাত্র মেয়েদের কথাই আলোচনা করেছি কিন্তু ভবিষ্যতে আগ্রহী গবেষক দেহবৃত্তিগ্রহণকারী পুরুষদের নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। নারীপুরুষের লৈঙ্গিক পরিচয়েও এই পেশা সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচীন ভারতীয় কামশাস্ত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনযুগ ও বর্তমানযুগের দৃষ্টিতে দেহবৃত্তিগ্রহণকারী পুরুষদের অবস্থান ও অবস্থানগত অভিব্যক্তি নিয়েও আলোচনা সম্ভব। ১৯৯৭ সালে কলকাতায় আয়োজিত যৌনকর্মী সম্মেলনে পুরুষ-যৌনকর্মীদের কথা বলা হয়েছে, তাঁদের কাজের প্রকৃতি, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সেই অভিব্যক্তি ও তাঁদের অবস্থান অনুসন্ধান করা যেতে পারে।^{১৯}

পরিশেষে আমরা আমাদের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি, কোনো গবেষণাই সম্পূর্ণরূপে শেষ নয় কারণ তার থেকে নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অথবা একটিমাত্র সিদ্ধান্ত নির্ণয় সম্ভবপর হয়না। তেমনি গণিকাদের নিয়ে, তাঁদের পেশা অথবা ব্যক্তিগত জীবন বিষয়ে অনুভূতিপ্রবণ দৃষ্টি নিয়ে গবেষণার “শেষ নাই যে, শেষ কথা কে বলবে?”

অন্ত্যটীকা ও তথ্যসূচি

১। শংকর, জন-অরণ্য, পৃ. ১০৩।

২। https://youtube/SvK_aqMR96s?si=ComfgWuv5ZybP1jK

৩। <https://thewire.in/women/photo-essay-sonagachi-sex-work>

Accessed on 08.09.2023 at 8.00 p.m.

৪। “The numbers keep growing and so do their problems, abuses, discrimination, disease and exploitation. The latest initiative of the International Labour Organisation (ILO) on

HIV/AIDS prevention focuses on sex workers, who are the most vulnerable segment and face serious hurdles in accessing health services. Sex workers are doubly marginalized and stigmatized when it comes to accessing any government-sponsored schemes or facilities concerning health, education, old age and the like..... Empowering and providing exit routes to those sex workers who do not wish to continue will be a more effective way of addressing the issue of this segment in the country.”- Suneeta Ojha, Supreme Court Lawyer “Recognition of Sex Work is not its Glorification”

<https://m.economictimes.com/magazines/panache/rights-of-sex-workers-should-prostitution-be-legalised/articleshow/45397117.cms>

Accessed on 27.12.2023 at 9.00 p.m

५। “People who are interested in our welfare, and many are genuinely concerned, often cannot think beyond rehabilitating us or abolishing prostitution altogether. However, we know that in reality it is perhaps impossible to ‘rehabilitate’ a sex worker because the society never allows to erase our identity as prostitutes. Is rehabilitation feasible or even desirable?” – Theme paper of the First National Conference of Sex Workers organized by Durbar Mahila Samanwaya Committee, Calcutta, 14-16th Nov., 1997.

७। <https://editimes.in/college-girls-found-in-high-end-prostitution-and-escort-services-in-delhi-mumbai/>

accessed on 10.10.2023 at 6.30 p.m.

९। <https://www.anandabazar.com/west-bengal/many-women-working-as-sex-worker-after-losing-their-job-in-lockdown-dgtldx-1.1244911>.

accessed on 20.01.2023 at 02.00 a.m.

८। <https://eisamay.com/nation/supreme-court-amends-its-handbook-to-substitute-the-term-trafficked-survivor/articleshow/105201331.cms>

Accessed on 30.11.2023 at 3.22 a.m.

६। Khushwant Singh. *Train to Pakistan* (published on 1956).,

Saadat Hasan Manto. ‘Sahae’, *An Epic Unwritten* (Ed. and Trans. Muhammad Umar Memon). Haryana: Penguin Random House India, (published in Penguin Books 2010, 1st published by penguin Books India 1998).

१०। Theme paper of the First National Conference of Sex Workers organized by Durbar Mahila Samanwaya Committee, Calcutta, 14-16th Nov., 1997.

সংযোজনী ১

শিরোনাম থেকে স্পষ্ট এটি প্রস্তাবিত গবেষণাসন্দর্ভের অধ্যায়-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই অংশটিতে এমন বিশেষ কিছু গ্রন্থ আলোচিত হয়েছে যেগুলির বিষয়বস্তু মূলতঃ আমাদের নির্বাচিত সময়সীমার (বাংলাসাহিত্য) ইতিহাস ও সেই সম্পর্কিত তথ্যসমূহ। গণিকাবৃত্তির আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অভিব্যাপ্তির প্রেক্ষিত অনুধাবনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিশিষ্টে বর্ণিত বিষয়-অনুসারে একটি গ্রন্থ-তালিকা নির্মাণ করে সংক্ষেপে সেই তথ্যগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা সাহিত্যের যে সময়সীমাটিকে আমরা নির্বাচন করেছি সেই সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিপুল সংখ্যক মেয়েরা এই পেশায় এসেছিলেন বা বলা যেতে পারে বাধ্য হয়েছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যে দশটি গ্রন্থ আমরা নির্বাচন করেছি তার মধ্যে আমরা বংশগত গণিকাবৃত্তির উদাহরণ যেমন পেয়েছি তেমনি দেখেছি-

- ১) ইংরাজ আমলে নব্য বাবু সম্প্রদায়ের খামখেয়াল বিলাসিতায় রক্ষিতা থাকার পাশাপাশি গৃহবধূদের জোর করে তুলে এনে ভোগ করা ফল পতিতাবৃত্তি,
- ২) নারীপাচার, শিশুপাচার যার অন্তিম অবস্থা পতিতাবৃত্তি। দাসপ্রথার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য,
- ৩) বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের আশায় গৃহত্যাগ। প্রতারণা হয়ে এই বৃত্তিগ্রহণ।
- ৪) মন্বন্তরের কারণে খাদ্যকষ্ট। তার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পতিতাবৃত্তি,
- ৫) দেশভাগ, উদ্বাস্তু মানুষ। পরিবার প্রতিপালনের জন্য উপায়ান্তর না পেয়ে দেহবৃত্তি,
- ৬) নারীশিক্ষার প্রচলন হওয়ার ফলে অনেকক্ষেত্রেই পারিবারিক শিথিলতা, অভিভাবকের শাসনের অভাবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অনভিজ্ঞ বালিকাদের গৃহত্যাগ। পরিণামে গণিকাবৃত্তি।
- ৭) গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করা, লালন করার জন্য দেহবৃত্তি ইত্যাদি।

স্বল্প পরিসরের কারণে আমরা খুব সংক্ষেপে কয়েকটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু আলোচনা করবো যেগুলি আমাদের গবেষণায় সহায়তা করেছে-

হুতোম প্যাঁচার নকশা: উনিশ শতকের সমাজের বাস্তব চিত্রটি যে গ্রন্থে সবথেকে পরিষ্কার পাওয়া যায় সেটি হল, কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা*। এই বইটি এতোটাই জনপ্রিয় যে সেকালের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ধারণা পেতে গেলে এটি অবশ্যপাঠ্যরূপে বিবেচিত হয়; এমনকি লেখকের ভাষা ‘হুতোমিভাষা’ নামেই প্রচলিত হয়েছিল। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত এই বইটিতে কলকাতার আদ্যোপান্ত বর্ণিত হয়েছে। লেখক নিজে বনেদী, ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন তাই কোনো কাল্পনিক বৃত্তান্ত নয় একেবারেই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখেই বইটি লেখা। তৎকালীন বাবুদের জীবন, বংশের থেকে অর্থের গৌরব-প্রতিপত্তি, বাইজি-বারাঙ্গনায় আসক্ত লাগামছাড়া ভোগের উদ্‌যাপন-সবকিছুই তিনি তুলে ধরেছেন এই নকশায়। তাঁর নিজের কথাই যেন সারাৎসার - “হুতোম দাসে স্বরূপ ভাসে, তফাৎ থাকাই সার কথা।” (পৃ.৮৮)

নববাবু বিলাস: ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৫ সালে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। নামকরণ থেকেই স্পষ্ট বাবুসম্প্রদায়ের যে ধারা কলকাতা নগরীতে প্রচলিত হয়ে গেছিল তারই উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলেন ‘নববাবু’ রা। পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত প্রভূত অর্থের কারণে এঁরা বিলাসে-ব্যসনে নিমগ্ন থাকতেন। উপার্জনের কোনো দায় বা দায়িত্ব এঁদের ছিলোনা। ইংরাজি শিক্ষা, ইংরাজ শাসকদের নেকনজরে থাকার চেষ্টা, মোসাহেবদের উমেদারি ও বেশ্যা-বিলাস এই ছিল এঁদের জীবনযাপনের মূল। অনেক সময়েই অত্যধিক দান, ভোগ ও বিপুল ব্যয়ের কারণে মহাজনদের থেকে চড়া সুদে ধার করে জেলে রাত কাটানোর উল্লেখ পাই। আবার যে বারবিলাসিনীদের প্রতি তাঁরা উপুড়হস্ত ছিলেন তাঁরাই এঁদের দৈন্যাবস্থায় সঙ্গত্যাগ করেন। সামগ্রিকভাবে শহর কলকাতার নৈতিক অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় এই গ্রন্থে।

রাতের কলকাতা: মেঘনাদ গুপ্ত ছদ্মনামে হেমেন্দ্রকুমার রায় রাতের কলকাতার লেখক বলে মনে করা হয়। যদিও লেখকের মতে বইটি তিনি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য লিখেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং রাতের কলকাতায় ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, সরাসরি অনেকের সাথে কথা বলে বইটি লিখেছেন যাতে বাস্তবের কুটিল নগ্ন চিত্র সকলের সামনে আসে এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা সচেতন থাকেন। ‘কলকাতার পথ’, ‘গণিকা-পল্লি’ ইত্যাদি পরিচ্ছেদে তিনি কলকাতা শহরে যে ভয়াবহ, বিপদজ্জনক দৃশ্য তুলে ধরেছেন তা বিশ্বয়ের উদ্রেক করে। এ যেন চিরপরিচিত শহরের সম্পূর্ণ অপরিচিত এক চিত্র। বারবনিতাদের বিভাগ, তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত

যোগ্যতা, নগরের কোথায় কোথায় তাঁদের বাসছিল আর ‘বাবু’দের সাথে তাঁদের সম্পর্ক এইসবকিছুই এই গ্রন্থে আছে। মূলতঃ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা হলেও একথা বলতেই হবে শহরে রাতের অন্ধকারে ঘটে চলা অপরাধপ্রবণতার কথা দিনের আলোয় নিয়ে আসায় লেখকের উদ্দেশ্য ছিল।

অন্য কলকাতা: বিশ্বনাথ জোয়ারদার লিখিত এই বইটিতে(২০০৩ প্রথম সংস্করণ) উনিশ শতকীয় কলকাতা, কলকাতাস্থ ও কলকাতায় আগত জনজীবনের চালচিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। আসলে এই বইটি তাঁর গবেষণার ফসল। তিনি ‘কলকাতার পত্তন’, ‘সেই শহর সেই সমাজ’, ‘স্ত্রীশিক্ষা ও কিছু কথা’, ‘দুর্গাপূজা ও বাইনাচ’, ইত্যাদি কয়েকটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটিকে ভাগ করেছেন। সমগ্র বইটিই গবেষণার জন্য সহায়ক হলেও ‘অন্য মেয়েরা—কিছু কথা’, ‘থিয়েটার, সাহিত্য ও অন্য মেয়েরা’ ও ‘প্রতিরোধ, আন্দোলন ও পুনর্বাসন’ এই তিনটি প্রধানতঃ আমাদের কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। লেখকের গভীর অনুসন্ধান, বিচার-বিশ্লেষণের উদাহরণ এই বইটি।

ফুলমণি এল কলকাতা উনিশ এবং বিশ শতকের নারী ও গণিকা সমাজ:

প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরীর এই বইটির নামকরণে ‘ফুলমণি’র উল্লেখ আছে। ফুলমণি কি কোনো কাল্পনিক চরিত্র? না, আসলে ফুলমণি এমন বহু মেয়েদের প্রতিভূ যাঁরা নিজেরদের পরিবারের হাল ফেরাতে, উপার্জনের আশায় কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন। কুলতলি থেকে কলকাতা---গ্রামীণ অর্থনীতির ক্রমভঙ্গুর দৈন্যদশা এঁদের মতো মেয়েদের বাধ্য করেছিল শহরে পাড়ি দিতে। পরিচারিকার কাজ কিংবা কারখানার শ্রমিক হয়ে উপার্জন করলেও তা স্বল্প হওয়ায় বাধ্য হয়ে গণিকাবৃত্তিতে আসেন। ফুলমণি নিজের গ্রামে প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তাই হয়তো কালগর্ভে হারিয়ে যাননি। বইটিতে এই বৃত্তির প্রাচীনত্ব, কন্যাসন্তানের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব, কন্যাসন্তানবিক্রয়, সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, নারীপাচার ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও এগুলি কীভাবে গণিকাবৃত্তির সাথে যুক্ত, কীভাবে অতীতের পথ ধরে আজও অগণিত ফুলমণির এই পেশায় প্রবেশ ঘটে সেকথা বর্ণনা করেছেন লেখক।

আরও অসংখ্য গ্রন্থের সাহায্য আমাদের কাজে সাহায্য করেছে। এখানে তার কয়েকটি মাত্র আলোচিত হয়েছে।

সংযোজনী ২

নির্বাচিত সংস্কৃত শাস্ত্র ও সৃজনশীল সাহিত্যে এবং বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত ‘গণিকা’-র সমতুল শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা:

তালিকাদুটি নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করেছি যত বেশি সম্ভব বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দ তালিকাভুক্ত করতে এবং একই শব্দ বিভিন্ন সাহিত্য গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সেটিকে তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

সংস্কৃত শাস্ত্র ও কাব্যে প্রাপ্ত শব্দের তালিকা:

কুম্ভদাসী, পরিচারিকা, কুলটা, স্বেরিণী, নটী, শিল্পকারিকা, প্রকাশ-বিনষ্টা, রূপাজীবা, গণিকা, বাররামা, শূলা, বারবনিতা, বাররমণী, পণ্যবধূ, বেশবিলাসবতী, স্বাধীনা, ক্ষুদ্রা, পণ্যনারী, বারাগ্ণা, বারযোষিতা, বারস্ত্রী, নকূলসমুৎপন্ন, বেশ্যা, বারবধূ, স্বেরিণী, পুংচলী ইত্যাদি।

নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত সমতুল শব্দসমূহ:

পতিতা, বাইজী, বেশ্যা, গণিকা, রাত্রিজীবিনী, নিশাচারিনী, নটী, মাগী, রক্ষিতা, বারবধূ, বাঁধা মেয়েমানুষ, বিলাসিনী, বারাগ্ণা, দেহোপজীবিনী, বেবুশ্যে, দেহদানী, কল-গার্ল, রাভি, কামিনী, খানকি, খারাপ মেয়ে, ছেনাল মাগী, কসবী, দেহ-ব্যবসায়িনী, বাঈ, বাঈজী, খানকী, বারবিলাসিনী, রূপোপজীবিনী ইত্যাদি।

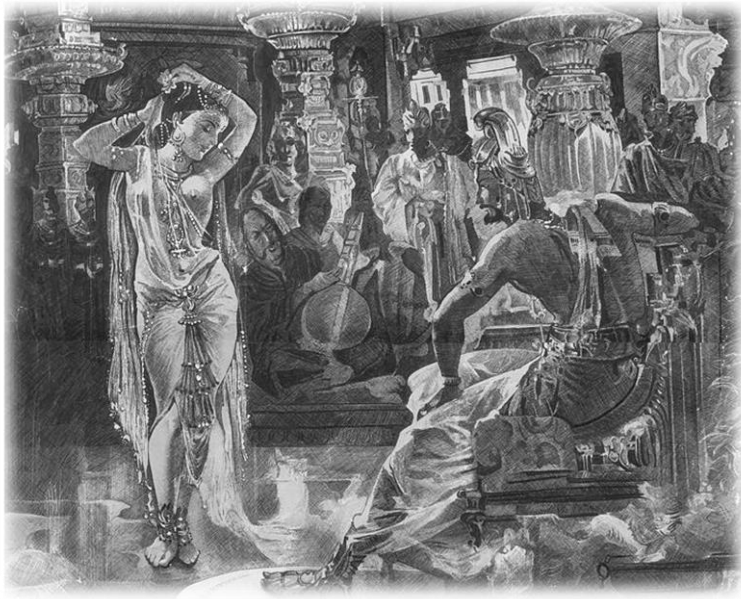
২.২ সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত গণিকাদের চিত্র (অন্তর্জালে প্রাপ্ত):



Amrapali, the Ganika (courtesan) from Vaishali. Oilpainting. Source- Exoticindiaart.com



Raja Ravi Varma, Vasanthasena (oleographic print). Source- Wikipedia



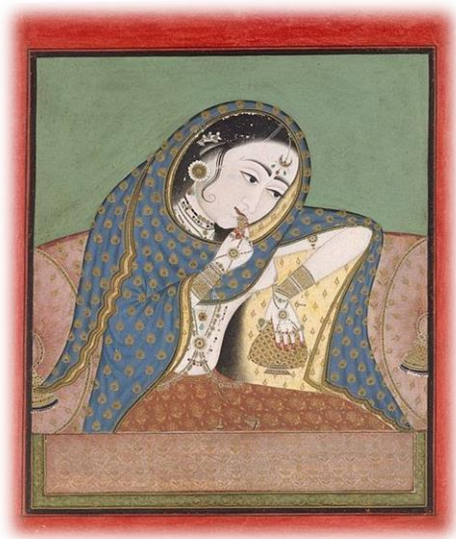
Amrapali Drawing by Sunil Sharma. Source- www.fineartamerica.com



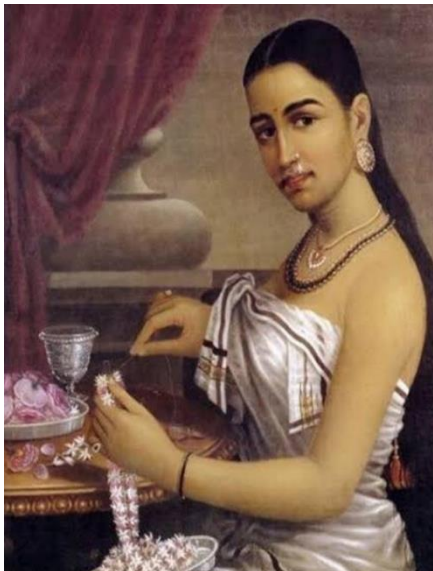
Courtesans of Ancient India by Tsem Rinpoche. Source- www.tsemrinpoche.com



Ancient Indian Prostitutes (Rajasthani paintings) Source- Google



Melancholy Courtesan. India (Culture-Rajasthan), Source- www.metmuseum.org



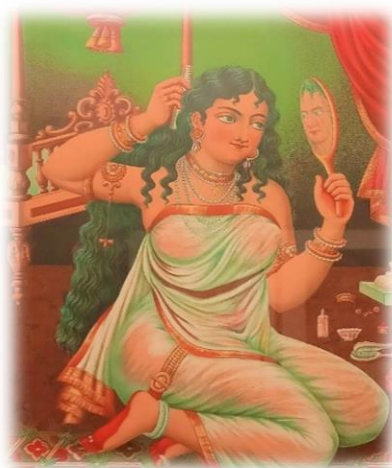
Courtesans of Ancient India by Tsem Rinpoche. Source- www.tsemrinpoche.com



A prostitute and Babu. Source: Google

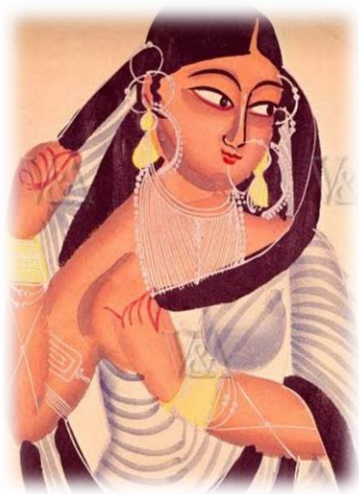


A Courtesan Arranging a Flower in Her Hair.
Source – Google



Promoda Sundari. By Chorebagan Art studio. Late 19th Century. Chromolithograph on paper. Displayed at the DAG “The Babu & The Bazaar” exhibition 2023.

Source- Wikipedia



A Bengali courtesan. 19th Century. Kalighat, Calcutta, India. C.1890. Source- Google.

Citation Bibliography

- Altekar, A.S. *The Position of Women in Hindu Civilization from Prehistoric Times to the Present Day*. Delhi: MLBD Pvt. Ltd., 2016. (12th rpt. of 2nd ed. 1959).
- Amaruka. *Amaruśatakam*. Ed. and Trans. Chintaman Ramchandra Devadar. Delhi: Motilal Banasidass, 1984. (rpt. of 1st ed. 1959: Poona).
- Apte, Vaman Shivram. *The Student's English-Sanskrit Dictionary*. Delhi: MLBD Pvt. Ltd. 2006. (rpt. of 3rd rev. & enl. ed. Of 1920; 1st Ind. ed. 1984).
- Banerjee, Biswanath. *Mṛcchakaṭika: A Myriad Prism*. Kolkata: The Asiatic Society, 2005.
- Banerjee, Sumanta. *Dangerous Outcast: The Prostitute in Nineteenth-Century Bengal*. Calcutta (now Kolkata): Seagull Books, 2019. (1st ed. 1998).
- _____, _____. *Under the Raj Prostitution in Colonial Bengal*. New York: Monthly Review Press, 1998.
- Banerji, S.C. and R. Banerji, *The Castaway of Indian Society: History of Prostitution in India Since Vedic times, based on Sanskrit, Pāli, Prākṛit and Bengali Sources*. Calcutta (now Kolkata): Punthi Pustak, 1989.
- Bharata. *Nāṭyaśāstra*. Ed. R.S. Nagar. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni*. Vol 1. Delhi: Parimal Publications, 2012. (4th rpt.).
- _____, _____. _____. _____. Vol 2. Delhi: Parimal Publications, 2012. (4th rpt.).
- _____, _____. _____. _____. Vol 3. Delhi: Parimal Publications, 2012. (4th rpt.).
- _____, _____. _____. _____. Vol 4. Delhi: Parimal Publications, 2012. (4th rpt.).
- Bhattacharji, Sukumari. *History of Classical Sanskrit Literature*. Calcutta (now Kolkata): Orient Longman, 1993.
- _____, _____. 'Prostitution in Ancient India'. In *Social Scientist*, Vol. 15, No. 2. (Feb.1987).
- Chakladar, Haran Chandra. *Social Life in Ancient India: Studies in Vātsyāyana's Kāmāsūtra*. Calcutta (now Kolkata): Bhṛattra Bhārata Pariṣad (Greater India Society), 1929.
- Chakraborty, Usha. *Condition of Bengali Women Around the 2nd Half of the 19th Century*. Calcutta (now Kolkata): 1963.

- Chakravarti, Ranabir. *Exploring Early India up to c.AD 1300*. Delhi: Primus Books, 2017. (rpt. of 3rd ed. 2016).
- Chandra, Moti. *The World of Courtesans*. Delhi: Hind Pocket Books (P) Ltd., 1976.
- Chaturbhāṇī (Plays)*. Ed. & Trans. Motichandra & Vasudevasharan Agarwal. New Delhi: Rajkamal Prakashan Pvt. Ltd. 2020. (1st pub. 1959).
- Dāmodara Gupta. *Kuṭṭānīmatam Kāvyaṃ*. Ed. Madhusudan Kaul. Bibliotheca Indica, Calcutta (now Kolkata): The Royal Asiatic Society of Bengal, 1944.
- De, Sushil Kumar. *Ancient Indian Erotics and Erotic Literature*, Calcutta (now Kolkata): Firma K.L. Mukhopadhyay, 1969. (rpt. of 1st ed. 1959).
- , ———. *History of Sanskrit Poetics: Vol. I*. Calcutta (now Kolkata): Firma K.L. Mukhopadhyay, 1960. (2nd ed.; 1st ed. 1923).
- , ———. *History of Sanskrit Literature: Prose, Poetry and Drama*. Calcutta (now Kolkata): University of Calcutta, 1947.
- Ellis, Havelock. *Psychology of Sex: A Manual for Students*. London: William Heinemann (Medical Books) Ltd. 1933.
- Faraone, Christopher A. & Laura K McClure. (ed.). *Prostitutes & Courtesans in the Ancient World*. England: The University of Wisconsin Press, 2006.
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality: Volume I: An Introduction*. (Trans. Robert Hurley). New York: Panthon Books, 1976.
- Joardar, B. *Prostitution in India*, New Delhi: Inter India Publication. 1986. (rpt.).
- , —, *Prostitution in Nineteenth and Early Twentieth Century Calcutta*, New Delhi: Inter India Publication, 1985.
- Kane, P.V. *History of Sanskrit Poetics*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2019. (6th rpt. Of 4th ed. 1971).
- Kauṭilya, *Arthaśāstra*. Ed. and Beng. trans. Manabendu Bandyopadhyaya. *Kauṭīlyam Arthaśāstram*. Vol. 1 and 2. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2010-11.
- , ———. Ed. and Eng. trans. with notes R. P. Kangle. *The Kauṭīlyam Arthaśāstra*. 3 Vols. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2014. (8th rpt. of 2nd ed. 1969).
- , ———. Eng. trans. with comm. Patrick Olievell. *Kings, Governance and Law in Ancient India: Kauṭilya's Arthaśāstra*. New York: OUP, 2013.

- _____, _____. Ed. and Beng. trans. Radhagobinda Basak. *Kautilīyam Arthaśāstram*, vol.1. Calcutta (now Kolkata): General Printers and Publishers Pvt. Ltd., 1997. (rpt. of 2nd ed. 1964; 1st ed. 1950).
- Keith, Arthur Berriedale. *A History of Sanskrit Literature*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2019. (6th rpt. Of 4th ed. 1971).
- _____, _____. *Classical Sanskrit Literature (The Heritage of India Series)*. London: Oxford University Press, Calcutta (now Kolkata): Association Press, 1923. www.forgottenbooks.com
- _____, _____. *The Sanskrit Drama in its Origin, Development Theory and Practice*. Delhi: Motilal Banasidass, 1998. (rpt. of First Indian Edition 1992).
- Kokkoka. Rati Rahasya. *The Hindu Secrets Of Love Rati Rahasya Of Pandit Kokkoka*. (Trans. S.C. Upadhyaya; Foreword V. Raghavan). Bombay (now Mumbai): D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd. First ed. Central Archeological Library, ASI, GOI.
- Leslie, Julia. *Roles and Rituals of Hindu Women*. Delhi: MLBD, 2015. (2nd reprint; 1st ed.1992).
- Mahābhārata. Ed. Haridāsa-Siddhāntavāgīśa-Bhaṭṭcārya, with Beng. trans and Sans. Comm. *Bhāratakaumudī*, together with Nilkaṇṭha's comm. *Bhāratabhāvadīpa*, Vols. (parvan). Kolkata: Biswabani Prakashani, 1400 BY. (2nd ed.; 1st ed. 1345 BY).
- _____. with intro. and summary in Beng. by Rajsekhar Basu. Kolkata: M.C. Sarkar and Sons Pvt. Ltd., 1422 BY. (15th ed.; 1st ed.1356 BY).
- Mananda Devi. *An Educated Woman in Prostitution*. trans. Arunava Sinha. New Delhi: Simon & Schuster, 2021. (1st publication in India).
- Markun, Leo. *Prostitution in the Ancient World*. USA: Haldeman-Julius Company, 1925.
- Meyer, Johann Jakob. *Sexual Life in Ancient India: A Study in The Comparative History Of Indian Culture*. Calcutta (now Kolkata): The Standard Literature Co Ltd. 1952. Central Archeological Library, ASI, GOI.
- Mitra Shastri, Ajaya. *India as seen in the Kuṭṭnī-mata of Dāmodaragupta*. Delhi: MLBD, 2010. (Reissued; 1st ed. 1975).
- Mukherjee, B.N. *The Character of the Maurya Empire*. Kolkata: Progressive Publishers, 2000.
- Rāmāyaṇa. *Śrīmad Vālmīki-Rāmāyaṇa*. Gorakhpur: Gita Press, 2017. (12th rpt.).

- _____. with intro. and summary in Beng. by Rajsekhar Basu. Kolkata: M.C. Sarkar and Sons Pvt. Ltd., 1429 BY. (16th ed.; 1st ed.1353 BY).
- Roy, Hemendra Kumar. *Calcutta Nights* with trans. Rajat Chaudhuri. New Delhi: Niyogi Books, 2020.
- Singh, Nagendra kr. *Divine Prostitution*. New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation, 1997.
- Singh, Snigdha, et al. *Beyond the Woman Question Reconstructing Gendred Identities in Early India*. With an introduction by Kumkum Roy. Delhi: Primus Books, 2018. (1st Published).
- Shah, Shalini. *Love, Eroticism and Female Sexuality in Classical Sanskrit Literature Seventh-Thirteenth Centuries*. New Delhi: Manohar, 2009.
- Sinha, Indrani. & Sharmila. Dasgupta. *Mothers for Sale Women in Kolkata's Sex Trade*. Kolkata: Dasgupta-Allaince, 2009.
- Sinha, S.N. and N.K. Basu, *History of Prostitution in India*. New Delhi: Cosmo Publications. 1994.
- Sri Vedavyasa. *Agnimahāpurāṇam*. Ed. K.L. Joshi (Sanskrit Text and English Translation M.N. Dutt) Vol.II. Delhi: Parimal Publications, 2019. (Fourth Edition).
- Sudha, K. *Prostitution Laws an Enigma and Some Dilemmas*. New Delhi: Promila & Co. Publishers, 2016.
- Śūdraka. *Mṛchchhakaṭika*. Ed. M. R. Kale. *The Mṛchchhakaṭika of Śūdraka*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2015. (10th reprint of 1st ed. 1924, Poona).
- Vatsyana Mallanaga. *Kāmasutra*. Trans. and ed. Wendy Doniger and Sudhir Kakar. *Kamasutra A new, complete English translation of the Sanskrit text*. New York: Oxford University Press, First published as an Oxford World's Classics 2003.
- _____, _____. Ed. Mulk Raj Anand and Lance Dane). *Kama Sutra of Vatsyayana*. New Delhi: Sanskrit Pratishthan, for Arnold-Heinemann Publishers (India) Private Limited, First published in India 1982.
- _____, _____. Ed. S.C. Upadhaya. *KamaSutra of Vatsyayana* Foreword Moti Chopra. Bombay (now Mumbai): Taraporevala, 1974, (rpt.) First edition 1961.

- _____, _____. Trans. The Hindoo Kama Shastra Society. *The Kama Sutra of Vatsyayana*. Benaras, New York: The Society for the Friends Of India, 1885-1925.
- _____, _____. Ed. Tarkaratna Nyāyaratna. *The Kāmāsūtra by Śrī Vātsyāyana Muni*. Benares City: Vidya Vilas Press, 1929.
- Viswanātha. Sāhityadarpaṇa. Ed. Bimalakanta Mukhopadhyay. *Viswanātha kavirāja kṛtaḥ Sāhityadarpaṇaḥ*. Kolkata: Sanskrit Pustaka Bhandar, 2008.
- Watts Alan W. *Nature, Man and Woman*. New York: Vintage Books- A Division of Random House, Inc, 1991.
- Warder, A.K. *Indian Kāvya Literature, Volume One: Literary Criticism*. Delhi: MLBD Publishers, 2009. (2nd revised ed. of 1989; 1st ed. 1972).
- _____, _____. *Indian Kāvya Literature, Vol. II: The Origins and Formations of Classica Kāvya*. Delhi: MLBD Publishers Pvt. Ltd., 1990. (2nd revised ed. 1st ed. 1974).
- Williams, Monier Monier. *A Dictionary Sanskrit-English*. Delhi: MLBD, 1976. (rpt.; 8th ed. Delhi, 2018).
- Winternitz, Maurice. *History of Indian Literature VOL.III*. Trans. Subhadra Jha. Delhi: MLBD Publishers Pvt. Ltd. rpt. combined 2008. (First ed. 1967).

গ্রন্থপঞ্জি

মূল গ্রন্থ

গুপ্ত, নীহাররঞ্জন। *উত্তরফাল্গুনী*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ
ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৪২০।

ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.)। *বারবনিতাদের গল্প*। কলকাতা: মন্ডল বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ ১৩৭০
সন।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *কবি*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চৌত্রিশ মুদ্রণ
আষাঢ় ১৪২৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *নিশিপদ্ম*। কলকাতা: বাক্-সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৮।

বিশী, প্রমথনাথ। *কেরী সাহেবের মুঙ্গী*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, সপ্তবিংশ
মুদ্রণ ১৪২০ (প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৫)।

ভট্টাচার্য, মৌ (সম্পা.)। *বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
প্রথম সংস্করণ ২০১১।

মহাশ্বেতা দেবী। *দৌলতী*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭২।

মানদা দেবী। *শিক্ষিতা পতিতার আত্ম-চরিত*। কুমাররুলি, মৈমনসিংহ: আর চক্রবর্তী, চতুর্থ
সংস্করণ, পৌষ ১৩৩৬। প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৩৬।

মিত্র, বিমল। *সাহেব বিবি গোলাম*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পেপারব্যাক্
সংস্করণ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪২১ (প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৮৪)।

শংকর। *জন-অরণ্য*। কলকাতা: দে বুক স্টোর, ত্রয়োদশ সংস্করণ ১৯৮২; পৌষ ১৩৮৮, (প্রথম
দে'জ সংস্করণ ১৯৭৮)।

সহায়ক গ্রন্থ

অমরসিংহ। *অমরকোষ বা অমরার্থ চন্দ্রিকা (সটীকানুবাদ)*। শ্রীমদ্গুরুনাথ বিদ্যানিধি-ভট্টাচার্য (সম্পা.)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৭।

আচার্য, অনিল। *সাহা অর্ণব(সম্পা.)। যৌনতা ও বাঙালি*। কলকাতা: অনুষ্টিপ, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৮, (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯)।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। *সেই সময়*। প্রথম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৯৬।

-----, -----। দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, উনবিংশ মুদ্রণ, ১৩৯৬।

-----, ---। *পূর্ব-পশ্চিম*। প্রথম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, চতুর্দশ মুদ্রণ, ১৪১৬।

-----, -----। দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, দ্বাদশ মুদ্রণ, ২০১০।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। *মিত্র, অশোককুমার(সম্পা.) পরকীয়া*। কলকাতা।

গুপ্ত, মেঘনাদ। *রাতের কলকাতা*। কলকাতা।

ঘোষাল, শুক্লা (সংকলন ও সম্পা.)। *বঙ্গে নারী নির্যাতন ও নারীর উত্থান*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ ২০১১।

চক্রবর্তী, সুধীর(সম্পা.)। *যৌনতা ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ২০০২।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫।

জানা, ডঃ স্মরজিৎ। *জীবন, যৌনতা ও যৌনকর্মী*। কলকাতা: দুর্বার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

জোয়ারদার, বিশ্বনাথ। *অন্য কলকাতা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৩।

দত্ত রায়চৌধুরী, প্রজ্ঞাপারমিতা। *ফুলমণি এল কলকাতা উনিশ এবং বিশ শতকের নারী ও গণিকা সমাজ*। কলকাতা: গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০১৩।

দাস, সুবোধ। *চলমান যৌনকর্মী*। কলকাতা: গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০০৬।

_____, _____। *চলমান যৌনকর্মী ২*। কলকাতা: গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০০৭।

_____, _____। *চলমান যৌনকর্মী ৩*। কলকাতা: গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০০৮।

দেব, অর্ক(সম্পা.)। *গণিকাসম্বাদ ইতিহাস ও বহমানতা*। হুগলী: বৈভাষিক প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২২ (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

ধর্মপাল, রোহিণী। *মহাকাব্যের নারী পুরুষের মিলন কাহিনী*। কলকাতা: লালমাটি, প্রথম প্রকাশ ২০২১।

নাগ, অরুণ(সম্পা.)। *সটীক হতোম প্যাঁচার নকশা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৩, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৮, (প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৮)।

নাসরিন, তসলিমা। *নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, ২০১৮।

পাণ্ডা, বিশ্বজিৎ। *যৌনতা ও বাংলা সাহিত্যের পালাবদল*। কলকাতা: পরশপাথর প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪২২ (প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিবার্ণ। *গণিকামঙ্গল*। অশোকনগর: অসময় প্রকাশনী, ২০১৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী। *ধর্ম ও নারী সেকাল ও একাল*। কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা): এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্ (সমন্বয় ও সম্পা)। *বাই-বারাঙ্গনা গাথা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০০৯/সি।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (সঙ্কলন ও সম্পাদনা)। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩০)*। কলিকাতা (কলকাতা): বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৪, প্রথম সংস্করণ ১৩৩৯।

_____, _____। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৩০-১৮৪০)*। কলিকাতা (কলকাতা): বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির, প্রথম সংস্করণ ১৩৪০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ। *কলিকাতা কমলালয়*। কলকাতা: সমাচারচন্দ্রিকা প্রেস, প্রথম প্রকাশ ১৮২৩।

_____, ____। *নববাবুবিলাস*। কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা): বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১২৬০ সন।

_____, ____। *নববিবিবিলাস*। কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা): রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ১৮৩০ (আনুমানিক)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র। *ভেদ-বিভেদ ১*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৮।

_____, _____। *ভেদ-বিভেদ ২*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ। *জনপদবধূ*। কলকাতা: সাহিত্য বিহার, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৬৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্রাজ্ঞী। *মেয়েদের ছেলেধরা বাংলা ভাষায় লিঙ্গবৈষম্যের রাজনীতি ও পিতৃতন্ত্রের পুনর্নির্মাণ*। কলকাতা: ধানসিড়ি, প্রথম প্রকাশ, ২০২৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুনীতা। *আধুনিকতার অভিযুগে বঙ্গনারী*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটারস, ২০০৫ (১৪১২)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত। *অশ্রুত কণ্ঠস্বর ঔপনিবেশিক বাঙলার বারবানিতা সংস্কৃতি*। কলকাতা: একলব্য, প্রথম একলব্য সংস্করণ ২০২১ (প্রথম প্রকাশ ২০০২)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রথম খণ্ড*। অ-ন। নতুন দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই, বাঙ্গালোর: সাহিত্য অকাদেমি, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৮ (প্রথম খণ্ড ১৯৬৬)।

_____, ____। *বঙ্গীয় শব্দকোষ দ্বিতীয় খণ্ড*। প-হ। নতুন দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই, বাঙ্গালোর: সাহিত্য অকাদেমি, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৮ (দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৭)।

বসু, ঝর্ণা (সংকলন ও সম্পা)। *ভাগফল ৭১ মেয়েদের কথা*। কলকাতা: ঈশ্বকাল বুকস, প্রথম প্রকাশ ২০১৮।

বসু, বাণী। *মৈত্রেয় জাতক*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৫।

_____, ____। *খনামিহিরের টিপি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৪।

বসু, রাজনারায়ণ। *সেকাল আর একাল*। কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা): শব্দ ১৭৯৬।

বিশ্বাস, অদ্রীশ(সম্পা.)। *বটতলার বই উনিশ শতকের দুপ্পাপ্য কুড়িটি বই ১*। কলকাতা: গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১।

_____, ____। *বটতলার বই উনিশ শতকের দুপ্পাপ্য কুড়িটি বই ২*। কলকাতা: গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৭ (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১)।

ভট্টাচার্য, তারাপদ (অনু. ও সম্পা)। *সংস্কৃত রসসাহিত্য সম্ভার*। কলকাতা: প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৯০।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, নবম মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ (প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৯৪)।

ভট্টাচার্য, সুবীর(সংকলক)। *মানদাদেবী ও রমেশদার চাপান উতোর*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০।

ভাণ্ডারী, মানস। *সেকালের কলিকাতার যৌনাচার*। হাওড়া: খড়ি প্রকাশন, ২০১৮।

ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। *মহাভারতের অষ্টাদশী*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, দ্বিতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

রায়, প্রফুল্ল। *মন্দ মেয়ের উপাখ্যান*। কলিকাতা: ক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭।

রায়চৌধুরী, গার্গী(সম্পা)। মেয়েদের যৌনতা: প্রবাদ, অনুভূতি ও বাস্তবতা। কলকাতা: কারিগর, ২০২১।

রায়চৌধুরী, যশোধরা (সংকলন, ভূমিকা,সম্পাদনা)। অবদমনের কবিতা বাংলা কবিতায় নারীর স্বর ও শরীরী কথন। কলকাতা: ধানসিড়ি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩।

লাহা, বিমলা চরণ। বৌদ্ধরমণী। কলিকাতা(বর্তমান কলকাতা): গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯২৯।

শাস্ত্রী, শিবনাথ। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৬, প্রথম নিউ এজ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫, (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯০৪)।

শ্রীপাত্ত। কেয়াবাং মেয়ে। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৮৮।

_____, ____। দেবদাসী। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ২০০১, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩ (প্রথম প্রকাশ ১৯৭০)।

_____, ____। বটতলা। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭।

মোহন্ত-এলোকেশী সংবাদ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ মে ১৯৮৪।

সরকার, পবিত্র। মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ। দাশগুপ্ত, প্রশান্তকুমার (সংকলক)। আকাদেমি বানান অভিধান। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ১৯৯৮ (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৭)।

সান্যাল, নারায়ণ। অবিস্মরণীয় ইতিহাসের পথে-প্রান্তরে। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ (প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৭)।

_____, ____। অনির্বচনীয়। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং,।

_____, ____। ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ (প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১২)।

_____, _____। *সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম*। কলকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, পুনর্মুদ্রণ ২০১৪ (প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৯৯৮)।

_____, _____। *সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয়*। কলকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, পুনর্মুদ্রণ ২০১৪ (প্রথম প্রকাশ ১৩৯৩)।

সাহা, অর্ণব। *উনিশ শতক বাঙালি মেয়ের যৌনতা*। কলকাতা: প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ২০১৭।

সিমোন, দ্য বোভায়ার। *দ্বিতীয় লিঙ্গ* (অনু. হুমায়ুন আজাদ)। আগামী প্রকাশনী, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। www.amarboi.com

_____, _____। (অনু. কঙ্কর সিংহ)। কলকাতা: র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১৯।

সুর, অতুল। *দেবলোকের যৌনজীবন*। কলকাতা: স্বপ্নদীপ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩।

সেনগুপ্ত, সুকান্ত(সম্পা.)। *সংস্কৃত আদিরসের কাহিনী (আদিকাল থেকে জয়দেব পর্যন্ত)*। কলকাতা: গ্রন্থনা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৫।

চৌধুরী, ঋতু(সম্পা.)। *নারীবাদের নানা পাঠ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০২১।

সেন, মল্লিকা। *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

হালদার, শৈলেন্দ্র(সম্পা.)। *মন্দ মেয়ের উপাখ্যান*। কলকাতা: পারুল প্রকাশন, পুনর্মুদ্রণ ২০১৪ (প্রথম সংস্করণ ২০১২)।

Web Sources

<https://thewire.in/article/history> Faisal Fareed and Shah Alam, *Gendered Violence and the Horrors of Partition: The Price Paid by Women*. Aug 15,2021, Accessed on 18.03.2023. 4.00 p.m.

<https://www.lawyersclubindia.com> Raghav Arora, *Prostitution in India and it's legal analysis*. July 2nd, 2018, Accessed on 17.04.2020. 2.00 p.m.

<http://jagadanandadas.blogspot.com> Jagat, *Adultery in works of Sanskrit literature*. September 13,2015. Accessed on 09.07.2023. 11.00 p.m.

<https://facebook.com> Meet Sandhya: Not just a sex worker's daughter. Brut India. 29 July 2023. Accessed on 23.09.2023. 6.00 p.m.

<https://www.outlookindia.com> Ruchika Sharma, *Understanding Ganikā, The Courtesan in The Indian Cultural Memory*. Updated on 07.03.2023. Accessed on 08.06.2023. 6.00 a.m.

<https://m.economictimes.com/magazines/panache> Devdutt Pattanaik *Remembering the contribution of Courtesans*. Updated Apr 06,2019. Accessed 10.10.2020. 10.20 a.m.

<https://m.economictimes.com> Devdutt Pattanaik, *Donation of courtesans: Ganikas were valuable sources of pleasure, income and information for the State*. Updated Feb 17 2023, 11:54 P.M. Accessed on 15.04.2023. 7.15 a.m.

<https://youtube.com> (brightwideitalia) L'incontro con Zana Briski- Born Into Brothels.

<https://youtube.com> (Shukla Telecom) UTSAV Movie.

www.academia.edu Malik Sankarsan, Shasini Sasmita Rani. "Reconstruction of Women's History of India". *EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH*, Vol. III, Issue 2/ May 2015.

<https://www.cambridge.org/core> Richard David Williams, *Songs between cities: listening to courtesans in colonial north India*. SOAS, 28TH Sep, 2017.

<https://digitalcommons.du.edu/hrhw> Devin Finn, 'Bonded Labor in India', *Human Rights & Human Welfare*: Vol.8: Iss. 1, Article 28.

www.academia.edu Madhuparna Mitra Guha, 'Partition and The Saga of Uprooted Women in West Bengal: A Review', *Karatoya*: NBU J. Hist. Vol.10.

www.academia.edu Anindita Roy Chowdhury, 'The Savings Habits of Prostitutes in Kolkata Red Light Areas: A comprehensive Study'.2013.

www.jstor.com I. W. Mabbet, The Date of The Arthaśāstra. Accessed on 06.10.2020. 9.45 a.m.

www.jstor.com P.V. Kane, The Arthaśāstra of Kauṭilya. Accessed on 06.01.2022. 3.45p.m.

www.jstor.com Ludwik Sternbach, Legal Position of Prostitutes According to Kauṭilya's Arthaśāstra. *Journal of the American Oriental Society*, Vol.71 No.1. Accessed on 08.09.2019. 5.00 p.m.

Anantika Sarkar
Signature of the Candidate
25.01.24